(সপ্তম হইতে একাদশ শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম. এ. ডি. ফিল.

প্রণীত

এইচ. চ্যাটার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিবেদন

বই লিখিয়া অর্থলাভ হইবে এই আশায় লেখকগণ যে বয়সে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, সে বয়স কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর যে কারণেই হউক না কেন, উপার্জ্জনের আশায় যে এ পুস্তক লিখি নাই শিক্ষকমহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটি বিশ্বাস করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চক্রবর্তীর কথা স্মরণ করুন। কমলাকান্ত বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া যৌবনের দিকে হঠাৎ একদিন ফিরিয়া তাকায়। সেদিন বুঝিতে পারে, "আশা সেই রঙ্গিন কাচ", যে কাচ যৌবনে মনশ্চক্ষুকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকসমাজ জানেন, বর্ত্তমান গ্রন্থকার কমলাকান্তের সমবয়সী না হইলেও "আশার ছলনে" ভুলিবার বয়স অতিক্রম করিয়াছেন।

তবে বই লিখিলাম কেন? রচনার বই কি আর নাই? আছে, কিছু বেশীই আছে। রচনার বভিন্ন ভঙ্গী (Style) আছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী। ভঙ্গীর ভাল-মন্দ-মাঝারির কথা এখানে তুলিব না, ভঙ্গীর বৈচিত্র্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। শিক্ষকমহাশয়গণ ছাত্রছাত্রীদিগকে কিরূপ রচনাশৈলী শিখাইতে চান মনে মনে তাহা স্থির করিলেও দৃষ্টান্তের অভাবে অনেক সময় অসুবিধা বোধ করেন। রচনার বই অনেক থাকিলেও ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর দিক দিয়া তেমন বৈচিত্র্য কমই মিলে যেমন মিলে মলাটের সুদৃশ্য পরিকল্পনার এবং সমুজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসে। এই কারণেই আর একটি বই বাজারে বাহির করার প্রয়োজন বোধ করিলাম। এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, পাঁচটি বইয়ের একটি বই নয়।

মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী ছেলেরা তো আজ জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন। অসির ব্যবহার তাহারা অনেকদিন ভুলিয়াছে। মসীটা ছিল, কিন্তু বিবিধ বর্ণের জল ঢালিতে ঢালিতে তাহা ক্রমশঃ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এ বইখানি আর কিছু নয়। শুধু পুরাতন পাত্রে একটুখানি নূতন রঙক্ষেপের প্রয়াসপরিচয়। ইহার সাহায্যে বিবর্ণ কালির কালিমা যদি কিছুটা ফিরে, তাহা হইলে একলা আমার নহে, অনেকেরই আনন্দ হইবে।

কলিকাতা

২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৯

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পদপ্রকরণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাক্যপ্রকরণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবন্ধাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বঙ্গভারতী

প্রথম খণ্ড

রচনা ও অনুবাদ

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

বাঙ্গালা ভাষা

কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত যে ধ্বনিসমষ্টি ভাবপ্রকাশের জন্য মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় তাহাই ভাষা। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ভাবপ্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোক যে ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহার করে তাহার নাম বাঙ্গালা-ভাষা। বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও অনেক লোক এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

বহু বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় আর্যগণ যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা লোকের মুখে মুখে ক্রমশঃ বিকৃত হয়। এদিক বিকৃতির ফলে এই বৈদিক সংস্কৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন ভাষায় পরিণত হইল। এই নবজাত ভাষাসমূহের সাধারণ নাম হইল প্রাকৃত ভাষা বা জনসাধারণের ভাষা। কিন্তু এই প্রাকৃতও অপরিবর্তিত রহিল না, কালে কালে উহারও পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল। ফলে উহা হইতে আবার জন্ম লইল বহুতর নূতন ভাষা। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ইহাদেরই একটি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আর্যভাষা সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বাংলা দেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে, সে ভাষার ঐক্য নিয়ে, এতকাল আমাদের যে, বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।"

স্বজাতি এবং স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ বর্তমান যুগে আমাদের অন্তরকে

যে ভাবে আন্দোলিত করিয়াছে, বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে এমন আন্দোলন আর কখনও জাগে নাই। আমরা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিতে শিখিয়াছি, দেশের জন্য চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, দেশ আর আমাদের কাছে মৃন্ময় প্রতিমামাত্র নয়, ঐ মৃন্ময়ী জননীর বুকের উপরে মুখ রাখিয়া আমরা তাঁহার প্রাণের স্পন্দন শুনিতে পাইয়াছি। আজ দেশ আমাদের মাতৃভূমি, দেশের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এমন একদিন ছিল যেদিন বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালাভাষা আদর পায় নাই, অবজ্ঞা পাইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে ইংরাজী ভাষা যে সম্মান পাইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার শতাংশের একাংশও পায় নাই। তখনকার ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যে এমন লোকেরও অসদ্ভাব ছিল না, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া গর্ববোধ করিতেন। আজ দেখিতেছি যুগ পরিবর্তিত হইয়াছে। আজ ইংরাজী জানিলে অহংকার করি না, কিন্তু বাঙ্গালা জানি না বলিতে লজ্জায় সংকুচিত হই।

যেমন মাতার প্রতি, তেমনি মাতৃভাষার প্রতি, মানুষের মমত্ববোধ থাকা উচিত। বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আমাদের সেই মমত্ববোধ এতদিন ছিল না। আজ বিলম্বে হইলেও তাহা যে উদ্বোধিত হইয়াছে, ইহা আশার কথা। বাঙ্গালা ভাষা তো হীন নহে। মাতৃভাষা হিসাবে কোন্ ভাষা কত লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাহার সংখ্যানুপাত লইয়া দেখা গিয়াছে যে বাঙ্গালার স্থান পৃথিবীর তাবৎ ভাষাসমূহের মধ্যে সপ্তম। ভাবৈশ্বর্যের দিক দিয়াও বাঙ্গালার স্থান নিতান্ত নিম্নে নহে। সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা যে ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা শুধু বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে। বিহারী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী এমন কি দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু-ভাষী বহু শিক্ষিত লোক এখন সাগ্রহে বাঙ্গালা বই পড়িতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বহু লেখকের বই অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতি যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারতের সর্বত্র এমন কি ভারতের বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা তাহার উপযুক্ত বাহন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ আজ সেটা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

১, প্রথম উত্তরচীনা, দ্বিতীয় ইংরাজী, তৃতীয় রুশ, চতুর্থ জার্মান, পঞ্চম জাপানী, ষষ্ঠ স্পেনীয়, সপ্তম বাঙ্গালা। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।"

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

ভাষাপ্রকরণ

১. কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা

যে ভাষায় কথা বলা হয় তাহার নাম কথ্য ভাষা। যে ভাষায় লেখা হয় তাহার নাম লেখ্য ভাষা। স্থানভেদে কথ্য ভাষার রূপ বিভিন্ন। চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙ্গালা ভাষাতে কথা বলে।

বাঙ্গালাদেশে যতগুলি কথ্য ভাষা আছে, তাহাদের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ব্যবহৃত ভাষাই সর্বপ্রধান। বঙ্গে বা বঙ্গের বাহিরে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে কথোপকথনের জন্য সাধারণতঃ এই ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর ভাববিনিময়ের ইহাই প্রধান বাহন। এক হিসাবে ইহাও প্রাদেশিক ভাষা। কিন্তু অন্যান্য প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষার অপেক্ষা ইহার প্রাধান্য অধিক। বিগত দেড়শত বৎসর ধরিয়া কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষা দেশের জনসমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সমগ্র দেশ যে আজ এই ভাষাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশের বাঙ্গালী একত্র হইলে এই ভাষাতেই কথা বলার চেষ্টা করেন। ইস্কুলে, কলেজে, পাঠশালায় শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই ভাষার বাহকতায় শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, অন্ততঃ তাহার চেষ্টা করেন। এই ভাষায় ভাবপ্রকাশের অক্ষমতা আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে একটা ত্রুটি বলিয়াই গণ্য হয়।

২. সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

লেখ্য ভাষার দুই প্রকার (form)—সাধু ও চলিত। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালায় একমাত্র সাধু ভাষাই প্রচলিত ছিল। বর্তমানে দুইটি রূপই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে যে বাঙ্গালা শিখি তাহাই সাধু বাঙ্গালা। সংবাদপত্রে, মাসিক পত্রিকায় এবং অধিকাংশ পুস্তকে এই ভাষাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে চলিত ভাষার প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও সাধু ভাষার ব্যবহার কমে নাই।

কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রসমাজে যে ভাষায় কথোপকথন চলে সেই

কথ্য ভাষারই একটি সংস্কৃত ও শিষ্ট রূপকে 'চলিত ভাষা' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক কালের লেখকগণ এই ভাষার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন। এ যুগের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস এই চলিত ভাষায় রচিত হইতেছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও ইহার অধিকার ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যে গদ্যভাষার ব্যবহার প্রাচীনকালে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। ভারতে ইংরাজগণের আগমনের পর হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাচীনকালে এদেশের লোকেরা কি গদ্যে কথা না বলিয়া পদ্য রচনা করিয়া দৈনন্দিন কাজ চালাইত? না, রাজকর্মের জন্য, ঘর-গৃহস্থালীর জন্য, এমন কি দলিল, দস্তাবেজ, চিঠিপত্র লিখিবার জন্যও গদ্য ভাষারই ব্যাপক প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইলেও অনেক সময় বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদ্যেরই ছিল অপ্রতিহত প্রভাব।

২. কঃ সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য প্রধানতঃ সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপে। সাধু ভাষার সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় পূর্ণতর। চলিত বাঙ্গালায় এই সকল পদের রূপ অপেক্ষাকৃত সংকুচিত।

ক্রিয়াপদ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
আসিতেছি	আসছি	আসিয়া	এসে
করিলাম	করলাম	লইব	নেব
চলিতেছি	চলছি	লইলাম	নিলাম
ডাকিতেছি	ডাকছি	দিব	দেব
পড়িব	পড়ব	দিতেছে	দিচ্ছে
ফেলিব	ফেলব	গাহিতাম	গাইতাম
বাজিতেছে	বাজছে	গাহিতেছিল	গাইছিল, গাচ্ছিল
ভুলিলাম	ভুললাম	আসিল	এল (আসল নহে)
মরিয়া	মরে	চাহিতেছে	চাইছে, চাচ্ছে
যাইতেছে	যাচ্ছে	পাইতেছে	পাচ্ছে
শুনিতেছি	শুনছি	বহিবে	বইবে
সহিতে	সইতে	গাহিবে	গাইবে, গাবে

সর্বনাম

সাধু	চলিত
ইহাতে	এতে
ইহাকে	একে
কাহার	কার
তাহারা	তারা
তোমাদিগকে	তোমাদিকে, তোমাদের
আমাদিগকে বলিয়াছিল	আমাদিকে (আমাদের) বলেছিল
তাঁহারা আসিয়াছিলেন	তাঁরা এসেছিলেন
তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছি	তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি

বর্তমান সময়ে সাধু ভাষার কোনো কোনো সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের উপর চলিত ভাষার প্রভাব দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

"আমার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি, তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া **গেছে**।

"প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া **তোলা**, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া—**এ-তো** অন্যত্র দেখি নাই।"

"মানুষের বল যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া **গেছে**, সেইখানে আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণ শক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি।"

"কন্যার সহিত বিবাহবিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ, **সে ও** একটা বিষম শেল।"

"যাহারা আপনাকে ভালোরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি নিজেকেও ভালোরূপ **চেনে না**।"

উপরি-উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি সাধু ভাষায় রচিত হইলেও কয়েকটি সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ চলিত ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সাধু ভাষায় 'গেছে, তোলা, এ, সে, চেনে' এই শব্দগুলির রূপ যথাক্রমে 'গিয়াছে, তুলা, ইহা, তাহা, চিনে'। ইহা ব্যতীত 'তাহার' শব্দের পরিবর্তে 'তার' শব্দের ব্যবহার সাধু ভাষায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

'মিশা, কিনা, লিখা, শুনা, ঘুরা' প্রভৃতি ক্রিয়া চলিত ভাষার অনুকরণে অনেক স্থলেই 'মেশা, কেনা, লেখা, শোনা, ঘোরা' প্রভৃতি রূপ ধারণ করে।

সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছাড়াও অনেক শব্দের সাধু ও চলিত রূপে পার্থক্য আছে। যেমন,

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
আঁইঠুয়া	এঁঠো	কাঠুরিয়া	কাঠুরে
আলিগা	আলগা	খড়ুয়া	খোড়ো
আলিসা	আলসে	ঘাসুয়া	ঘেসো
আবড়া খোবড়া	এবড়ো খেবড়ো	চিমটা	চিমটে
আড়ুয়া	এড়ো	জুতা	জুতো
ইচ্ছা	ইচ্ছে	পড়ুয়া	পড়ো
উখা	উকো	পুরাপুরি	পুরোপুরি
উঁচা	উঁচু	বুড়া	বুড়ো
উত্তরিয়া	উত্তরে	বিদ্যা	বিদ্যে
কুলা	কুলো	মিথ্যা	মিথ্যে

বর্তমান কালে সাধু ভাষাতে চলিত রূপের এতই প্রভাব পড়িয়াছে যে, দেখা যায় অনেক শব্দের পূর্ণতর সাধুরূপ (যেমন কাঠুরিয়া, খড়ুয়া, আঁইঠুয়া প্রভৃতি) একরূপ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার উভয় ভাষাতেই আছে, সাধু ভাষায় কিছু বেশী, চলিত ভাষায় কিছু কম। আধুনিক যুগের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার শতকরা চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। কলিকাতার হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক ভাষায়—তথাকথিত চলিত ভাষা যাহার মার্জিত রূপ—সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ শতকরা পনের হইতে কুড়ি। কথার ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ অল্প হইলেও লেখকের রুচিভেদে লেখার ভাষায় (চলিত ভাষায়) সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ কখনও কখনও চল্লিশের কাছাকাছি গিয়া পৌছায়।

বিদেশী শব্দের প্রয়োগও চলিত এবং সাধু উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট আছে। তবে চলিত ভাষায় ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক। শব্দের প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

৩. ভাষার প্রকার (form) ও ভঙ্গী (style)

বাঙ্গালা ভাষার প্রকার (form) দুইটি বটে, কিন্তু ভঙ্গী (style) অসংখ্য। লেখকের ব্যক্তিগত শক্তি এবং রুচি অনুসারে ভাষার ভঙ্গী বিভিন্ন রকম হয়।

একই প্রকারের ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীর ব্যবহার সর্বদাই দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গের বিখ্যাত লেখকগণের রচিত সাধু বাঙ্গালার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলিয়া দেওয়া হইল। এই রচনাগুলির প্রকার এক হইলেও ভঙ্গী বিভিন্ন তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে।

ক. ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা

উজ্জয়িনী নগরে ভোজনামে অতুল ঐশ্বর্যশালী অত্যন্ত পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এমন রূপলাবণ্যসম্পন্ন ও কান্তিপুঞ্জপরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রও আপনাকে হীনকান্তি বিবেচনা করিয়া লজ্জিত হইতেন। ভোজরাজ অতিশয় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। এবং এমন প্রতাপান্বিত ছিলেন যে, তাহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগ এক ঘাটে জল পান করিত। তাঁহার অধিকারে যথার্থ সদ্‌বিচার ও ন্যায়াচার ছিল। তাহাতে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিত না। এই নিমিত্তই রাজধানী এমন জনাকীর্ণ ছিল যে, তিলার্ধস্থান শূন্য ছিল না, তাবৎ নগর অতি অপূর্ব অট্টালিকায় সুশোভিত ছিল। পথঘাট সকল এমন সুন্দর সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল যে, ঐ নগরকে পাশার ছক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং সমস্ত রাজপথের প্রান্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকষ্ট মাত্র ছিল না। প্রজারা সকলে ঐ রাজধানীতে নানাপ্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, তাহাদের পণ্যবীথিকাসকল সকল সময়েই দ্রব্যে সুশোভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। কাহারও কিছুমাত্র দুঃখ ও দুরবস্থা ছিল না। অতএব নগরের কোনস্থানে নৃত্য, কোনস্থানে সংগীত, কোনস্থানে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা, কোনস্থানে দেবার্চনা দিবারাত্রই হইত। ভোজরাজের সভায় বহুসংখ্যক মহা মহা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাঁহাদের বিধানানুসারে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। —বত্রিশ সিংহাসন

খ. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা

এই গভীর অনিবার্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখ নেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরমূর্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়া ছিল। আপনা ভুলিয়া, কাল কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল, ব্যথিতপ্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা, বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময় দুই চারিবার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল। —বিষবৃক্ষ

গ. রবীন্দ্রনাথের রচনা

সকল পুরাতন এবং বৃহৎ আদর্শের মধ্যেই বিনাশ ও রক্ষার একটি সামঞ্জস্য আছে; অর্থাৎ তাহার যে শক্তি বাড়াবাড়ি করিয়া মরিতে চায়, তাহার অন্য শক্তি তাহাকে সংযত করিয়া রক্ষা করে। আমাদের শরীরেও যন্ত্রবিশেষের যতটুকু কাজ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত অনিষ্টকর, সেই কাজটুকু আদায় করিয়া সেই অকাজটুকুকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরতন্ত্রে রহিয়াছে। নিজের দরকারটুকু শরীর লয়, অদরকারটুকু বর্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

—ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষ

ঘ. শরৎচন্দ্রের রচনা

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা চৌকি টানিয়া আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল।

মোকদ্দমায় সর্বস্ব হারিয়া মানুষ যে রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসে, একেবারে মানুষটাকে যেন ওবেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না, এই এক ঘটিকার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সদ্য হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন জ্বলন্ত লোহা দিয়া পোড়াইয়া ছাপিয়া দিয়াছে।

—পরিণীতা

ঙ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা

আজ কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন। সেথায় সমস্ত ভূচর, খেচর, উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বৎসরব্যাপী, কৌশাম্বীর চতুর্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমস্ত ক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। একটা অজানা জনসমুদ্রের মধ্যে যখন চারিদিকে এরূপ বৈচিত্র্য ও শত্রুতা, তখন একটুকুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্যবংশীয় নরপতি, ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী পত্র, দুর্বণ ও বলিরাজকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেক দিবসাবধি বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থদ্বারা বশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন।

আবার চলিত ভাষার রচনাতেও বিভিন্ন লেখকের স্বকীয়তা কেমন বিভিন্নভাবে ফুটিয়া উঠে, তাহাও লক্ষ করিবার বিষয়। এক সময় লোকের ধারণা ছিল, চলিত ভাষায় যদি বা সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়, গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনার পক্ষে ইহা উপযোগী হইবে না। সে ধারণা যে অমূলক শক্তিমান লেখকগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। চলিত ভাষায় লেখা, কয়েকটি গুরুগম্ভীর বিষয়ের রচনার নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল :

চ. রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে চলেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ। এইগুলিকে বলি অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ লাগা, আমাদের সুখদুঃখ। আমাদের এইসব অনুভূতির সীমানা বেশী বড় নয়। আমরা কতদূরই বা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি। অন্যান্য বোধগুলিরও দৌড় বেশী নয়। তার মানে আমরা যেটুকু শক্তির সম্বল নিয়ে এসেছি, সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলার হিসেব মতো। —বিশ্বপরিচয়

ছ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক রচনা

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত দেশ জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্তা কইছি, লিখছি, এর জীবন্ত মূর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙালা ভাষার মূর্তি কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম্ নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশ পায়, যত লোক তত মানুষ তত বিচিত্ররূপ একই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষাই একটি বহুরূপী বস্তু—সম্প্রদায়ভেদে, জাতিভেদে, ব্যবসায়ভেদে, স্থানভেদে, ব্যক্তিভেদে যেমন এর রূপ বদলায়, আবার কালভেদেও তেমনি বদলায়। —বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

জ. অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্যালংকার বিষয়ক রচনা

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র রসসৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। কোন্ কবি কোন্ কাব্য কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রস হবার প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসন দেবার অধিকারী নয়। এক আস্বাদন বহু ভোগে অরুচি হলে, হয়তো কিছুদিন কাব্যপাঠকের অন্য আস্বাদের রসে একান্ত রুচি দেখা যায়। এই রুচিপরিবর্তন দিয়ে কাব্যের বিচার হয় না।

অনুশীলনী

১। সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য কি ?

২। কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার সহিত লেখ্য চলিত ভাষার পার্থক্য কোথায় ?

৩। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

ক. আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটি লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবার্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে দেখি যে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না, আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত।

—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

খ. কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনার কম মানুষকে—কত কোটি তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ণ হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা, গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শতশত উর্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ. মানবপ্রকৃতির উচ্ছেদকারী মনুষ্যসমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন এক অভিনব ধর্মপ্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদপ্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্থাপনে বৌদ্ধধর্মের যেমন বল তেমনি দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাসনাবিবর্জিত বনবাসী সন্ন্যাসী মিলিয়া মনুষ্যসমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম অধিকদিন টিঁকিতে পারে না। —সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিকে সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর :

ক. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁচিশদিন পূর্বের কথা। যুধিষ্ঠির সকাল বেলা তাঁর শিবিরে বসে আছেন, সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ পড়ে শোনাচ্ছেন। অর্জুন পাঞ্চাল শিবিরে মন্ত্রণাসভায় গেছেন, নকুল সৈন্যদের কুচকাওয়াজে ব্যস্ত। ভীম যে এক-শ গদা ফরমাস দিয়েছিলেন তা পৌঁছে গেছে, এখন তিনি প্রত্যেকটি আস্ফালন করে এক একজন ধার্তরাষ্ট্রের নামে উৎসর্গ করেছেন। সব গদা শাল কাঠের, কেবল একটি কাপড়ের খোলে তুলো ভরা। এটি দুর্যোধনের ১৮ নং ভ্রাতা বিকর্ণের জন্য। —রাজশেখর বসু

খ. সত্যিকথা গল্প পড়ে পড়ে অরুচি ধরে যাচ্ছে। সবই যেন এক ছাঁচে ঢালা। সেই মোটর, বাস, ট্রাম, সিনেমা আর গড়ের মাঠ। শিখেরা সব সিল্কের পাঞ্জাবী ঢাকা ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বলরত্ন। এ গরীবের দেশ বাঙ্গালায় এত কুবের কুমারও ছিল। তা হোক, মিষ্টি জিনিষই বেশী মুখ মেরে দেয়। তাই আর তা ঘাঁটতে ইচ্ছে হয় না। এদিকে সময়ও কাটে না। —কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বসে থাকতে থাকতে মনে হ'ল গঙ্গার রূপ,—বর্ষার গঙ্গা হয়ত ভরে উঠেছে এতক্ষণে, সেবার এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে একবার গেলুম দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাকে দেখতে। কোথায় গেল তার সেইরূপ। মনে হ'ল কে যেন গঙ্গার আঁচল কেটে সেখানে বিচ্ছিরি একটা ছিটের কাপড় জুড়ে দিয়েছে। —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

শব্দপ্রকরণ

১. শব্দের শ্রেণীভেদ

বাঙ্গালা ভাষার নানা শ্রেণীর শব্দ আছে। এই শব্দগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, বিদেশী ও দেশী।

১. ক. তৎসম

খাঁটি সংস্কৃত ভাষার যে শব্দগুলি অপরিবর্তিত আকারে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম তৎসম। 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত, 'সম' সমান।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার চর্চা চলিয়া আসিতেছে। আদি আর্য ভাষা লোকমুখে রূপান্তর লাভ করিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতে পরিবর্তিত হইল, প্রাকৃত ভাষায় নানা সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল, তথাপি সংস্কৃতের আদর কমিল না। সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ। সেই কারণে প্রাকৃত ভাষা নিজস্ব শব্দাবলীর সহিত সংস্কৃত শব্দও অজস্র গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃত শব্দ কম গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহৃত সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

অঙ্ক অগ্র অঞ্জন অতএব অথচ বন্ধ অধ্যক্ষ
অনিষ্ট উৎপত্তি কমল ছাগ ধনঞ্জয় বেদ লূতাতন্তু
অনুমান উৎস কবি ছিদ্র ধাত্রী বৈজয়ন্ত লেপন
অস্ত্র উরু খাদক ছেদ ধুবন্ধর ব্যপদেশ শক্তি
অন্ধ ঊর্ধ্ব খ্যাত জগৎ ধূর্ত ব্রহ্মা শান্ত
আবিষ্কার ঊর্মিলা গজ জাগরণ ধৈর্য ভানু শূদ্র
আয়তন ঊহ্য গণ্ড জিগীষা ধ্যান ভিক্ষা শৃঙ্খলা
আরম্ভ ঋকৃথ গতি জেতা ধ্রুব ভুবন শৈত্য
আর্য ঋণ গবেষণা জৈব ধ্বনি ভূষণ শোণিত
অবলম্বন ঋত গম্ভীর জ্ঞান নক্ষত্র ভৃঙ্গ শৌচ
আস্তিক ঋত্বিক গর্ভ ঝটিকা নিদ্রা ভৌম শ্বেত
আত্রিক ঋষি গাত্র তৎপর নূপুর মগ্ন ষাণ্মাষিক
ইচ্ছা এক গিরিশ তান নেতা মাল্য ষোড়শ
ইদানীন্তন এবং গুরু তুষ্ট নৌকা মীন সামান্য

ইন্দু	এষণা	গোলক	তৃপ্তি	ন্যায়	মুকুর	সাধারণ
ইন্ধন	ঐকিক	গ্রাম	তৈল	ন্যাস	মুক্ত	সমুদ্র
ইষ্ট	ঐহিক	গ্রাম্য	তৃষ্ণা	নীতি	মুদ্রা	স্বতন্ত্র
ইষ্টি	ঐকমত্য	গ্লানি	তেজস্বী	তক্ষ	মূল	সিক্ত
ঈক্ষণ	ঐকান্তিক	ঘট	ত্যাগ	পঙ্ক	মৃত	সুন্দর
ঈশান	ঐরাবত	ঘাতক	দার	পিতৃ	মৈত্রী	সৃষ্টি
ঈশ্বর	ঐশ্বর্য	ঘূর্ণ	দিব্য	পীড়া	মোক্ষ	সেবা
উগ্র	ওষ্ঠ	ঘোষ	দীর্ঘ	পূর্ব	ম্লান	সোম
উচিত	ঔচিত্য	ঘ্রাণ	দুঃখ	পৃথক	লক্ষ	সৌরভ
উচ্ছিষ্ট	ঔষধ	চন্দন	দৃপ্ত	পৌরষ	যূপ	স্পর্শ
উচ্ছ্বাস	কক্ষ	চাতক	দৈব	প্রকাশ	যোগ	স্বপ্ন
উৎকর্ণ	কর্ণ	চূর্ণ	দোষ	ফাল্গুন	লিখিত	হানি
উদ্ভব	কন্দর্প	চৈত্র	দ্যাবাপৃথিবী	বক্তা	লুপ্ত	হীন

১. খ. তদ্ভব

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইতে হইতে ধীরে ধীরে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। এগুলির নাম তদ্ভব। 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত, 'ভব' অর্থাৎ তাহা হইতে উদ্ভূত। প্রাকৃত হইতে জাত বলিয়া তদ্ভব শব্দের আর এক নাম প্রাকৃতজ।

সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইতে হইতে কিরূপে তদ্ভব রূপ লাভ করিয়াছে, নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহা বুঝা যাইবে :

সংস্কৃত		প্রাকৃত		বাঙ্গালা
অদ্য	>	অজ্জ	>	আজ
কর্ণ	>	কণ্ণ	>	কান
গর্দভ	>	গদ্দভ, গদ্দহ	>	গাধা
চন্দ্র	>	চন্দ	>	চাঁদ
হস্ত	>	হত্থ	>	হাত
কার্য	>	কজ্জ	>	কাজ
আদিত্য	>	আইচ্চ	>	আইচ
অর্ধ	>	অদ্ধ	>	আধ
কাষ্ঠ	>	কট্‌ঠ	>	কাঠ

১. ঘ. বিদেশী

ফারসী-

ইংরাজী, ফরাসী, আরবী, পর্তুগীজ, চীনা প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। এগুলির নাম বিদেশী শব্দ।

নিম্নে কতকগুলি বিদেশী শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

ফারসী-

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত ফরাসী শব্দ

অকু	কাওয়াজ	জমি	দোয়াত
অছিলা	কাগজ	জরি	নগদ
আইন	কিসমিস	জাহাজ	নমুনা
আউলিয়া	কিংখাপ	জারি	নাবালক
আদব	কুলুপ	জিদ	নিকাহ্
আবক	কোরবানি	জুম্মা	পরদা
আসল	খাজনা	তল্লাস	পরী
আসামী	খাতা	তহসীল	পাজামা
আয়না	খাবিজ	তাকিয়া	পিয়াদা
আঙুর	খানসামা	তাগ্গা	পোলাও
আতশবাজি	খোরাক	তালুক	ফেরার
ইসাদী	গজল	দখল	ফুরসত
ঈদ	গাজী	দম	বরফ
উজির	গোলাপ	দরবার	বন্দোবস্ত
এক্রিয়ার	চশমা	দরবেশ	বাদাম
ওজন	চাপকান	দলিল	বাগিচা
ওয়াসিল	চাঁদা	দস্তানা	বারকোশ
কবর	জমা	দালান	বীমা
কম	জলদি	দুরবীন	হামেশা
কয়েদী	মিছরি	শিশি	হপ্তা
বেকুব	বেকার	হুজুরী	হজম
মখমল	মুনসি	রুজু	সালিস
মলম	মুরুব্বি	রোশনাই	সোরাই
মসজিদ	বদ	শহীদ	হাজার
মীনা	বসদ	সাদা	হালুয়া

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত পর্তুগীজ শব্দ

আলপিন	কেরানী	গামলা	তামাক
আলমারি	খাতা	চাবি	নিলাম
আনারস	খোঁপা	ছিট	পাঁউরুটি
কামরা	গরাদে	জানালা	পেয়ারা
পেঁপে	বাসন	বোতাম	সাগু
বালতি	বেহালা	মিস্ত্রি	সাবান

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ

আপিস	টেবিল	ব্ল্যাক-আউট
ইস্টিশন	ডেপুটি	ব্রেসলেট
এরোপ্লেন	থিয়েটার	ব্যাঙ্ক
কলেজ	পিওন	বেয়ারা
কংগ্রেস	পিন	মনি-অর্ডার
ক্লাস	পুলিস	মাস্টার
গেলাস	পেন	কল
চেক	পেনসিল	লণ্ঠন
চক	পোস্ট-কার্ড	লম্প
টকি	ফুটবল	লেস
টিকিট	বাক্স	শার্ট
টেলিগ্রাফ	বায়স্কোপ	সাবমেরিন
টেলিফোন	সাইন-বোর্ড	সেফটিপিন

এতদ্ব্যতীত ওলন্দাজ, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি ভাষা হইতেও কিছু কিছু শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।

ওলন্দাজ : ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইসক্রুপ ইত্যাদি।

ফরাসী : কুপন, কার্তুজ, দিনেমার, ওলন্দাজ ইত্যাদি।

জাপানী : রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার শব্দর কিছু কিছু বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। যেমন, হরতাল (গুজরাটী), বর্গী (মারাঠী), জরু, পানি (হিন্দী)।

দেশী

তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে। এই সকল শব্দের মূল নির্ণয় করা কঠিন। ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ভাষা হইতেই ইহারা বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। এই শব্দগুলিকে দেশী নামে অভিহিত করা হয়।

নিম্নে কয়েকটি দেশী শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

কুলা, ঢেঁকি, ঘোমটা, ঝোপ, ঘোড়া, পেট, ডাগর, আড্ডা, গোড়া, ডাহা, ডাঁসা, ছাল, টোপর, ডাব, ডেকরা ইত্যাদি।

ঝন্‌ঝন্, কট্‌কট্, মড়মড়, কনকন, ঝুমঝুমি, মুচমুচে, টনটন, খটখট প্রভৃতি অনুকার শব্দগুলিকেও দেশী পর্যায়ে ফেলা হয়।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত নিম্নপ্রদত্ত বংশতালিকায় বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলীর পারস্পরিক সম্বন্ধ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।
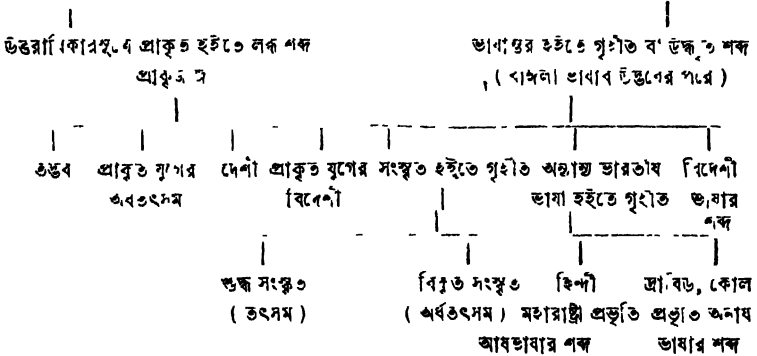
অনুশীলনী

১। বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলীকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়?

২। তদ্ভব এবং তৎসম শব্দ কাহাকে বলে উদাহরণ সহযোগে বুঝাও।

৩। তদ্ভব এবং অর্ধ-তৎসম—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৪। নিম্নের উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে যে সকল শব্দ আছে, তাহাদের শ্রেণী নির্দেশ কর :

ক. আমাদের স্কুলের গোবিন্দবাবু ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কালো চাপকান পরিয়া দোতালায় আফিস ঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখা

পড়া করিতেন। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামী ছিল চার পাঁচ জন বড় বড় ছেলে ; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারীতে আমি জিতিয়াছিলাম, এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

খ. ১৯১৬ সনের কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট ১৯১৭ সনে ভারতের দাবী বলে মিঃ মণ্টেগুর নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল। এই প্যাক্ট মিঃ জিন্নার সহায়তায় সাধিত হয়েছিল কিন্তু ১৯১৯ সনের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন যখন জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন—মিঃ জিন্না কংগ্রেস হ'তে দূরে গিয়ে মোসলেম লীগকে মুসলমান সমাজের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য দল গঠন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

গ. কিন্তু ভারতেশ্বরী নুরজাহানের অযত্নে পরিত্যক্ত সমাধিমন্দিরের দিকে চাইলে মন উদাস হ'য়ে যায়। ভারতের অধীশ্বরীর কিনা এই বিশ্রামস্থল। ছোট একটা চৌকা বাড়ীতে কয়েকটি ছোট ছোট খিলানের দরজা, মাথার উপর গম্বুজ নেই, আশেপাশে প্রাচীর ফটক মিনার কিছুই নেই, যেন কোনও গৃহস্থের পোড়োবাড়ী।

ঘ. জার্মানীর ডেপুট ফুয়েরার রুডলফ্ হেসের পত্নীর সহিত সাক্ষাৎকারের এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালে হেস জার্মানী হইতে বিমানযোগে স্কটল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। ফরাসীরা এই মহিলাটিকে বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিযাছে। তিনি ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর প্রতিনিধিকে বলেন, পলায়নের পর হইতে তাঁহার স্বামীকে জার্মানরা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে।

চ. কর্মকারের ও তাঁতীর দশা উপস্থিত। গ্রামে দুইটা ফাল, পাঁচখানা কাস্তে গড়িয়া তাহার দিনপাত হয় না। ধনী বণিক কোদাল, হাঁড়ি, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, গজাল, জলুই, কব্জা, চাবি প্রভৃতি যাবতীয় লৌহকর্ম মেলায় ও হাটে পাঠাইতেছে। হাজার হাজার কর্মকার বংশ নির্মূল হইয়াছে।

২. শব্দের প্রকারভেদ

২. ক. মৌলিক ও সাধিত

শব্দকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—১. মৌলিক এবং ২. সাধিত।

যে শব্দকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাহাকে মৌলিক শব্দ বলে। মা, বাবা, বই, খাতা, হাট, বাজার, ইঁদুর, ছুঁচা, বেগুন, পটল, কর্, খা, যা ইত্যাদি শব্দকে বিভক্ত করা অসম্ভব। বিভক্ত করিলেও বিশ্লিষ্ট অংশগুলির পৃথক্ কোনও অর্থ থাকে না। মা শব্দের অর্থ আমরা জানি। কিন্তু এই শব্দকে যদি 'ম' এবং 'আ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করি তাহা হইলে ম-এর বা আ-এর

কোনো স্বতন্ত্র অর্থ থাকে না। 'বাজার' শব্দকে যদি 'বা' 'জার' বা 'বাজা' 'র' এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহা হইলে ঐ বিভক্ত অংশগুলি নিরর্থক হয়। অতএব উদ্ধৃত শব্দগুলি মৌলিক।

মৌলিক শব্দের সহিত প্রত্যয় যোগ করিলে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়। যেমন,—চাষী (চাষ+ঈ), পটুয়া (পট+উয়া), করা (কর্+আ যথা, কাজ করা), বলা (বল্+আ যথা, বলা কথা) ইত্যাদি।

একাধিক মৌলিক বা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দকে সমাসের নিয়মে (সমাস দেখ) যুক্ত করা যায়। এইরূপ সমাসবদ্ধ শব্দকে সমস্ত শব্দ বলা হয়। যেমন,—হাত-পা, ফুল-বড়ি, ঘরভাঙানী, মাসকাবারি, গাঁটকাটা, পটলচেরা ইত্যাদি।

প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ও সমস্ত শব্দসমূহকে সাধিত শব্দ বলা হয়।

২. ক. প্রকৃতি ও প্রত্যয়

মৌলিক শব্দসমূহের সাধারণ নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—১. নাম ও ২. ধাতু।

যে মৌলিক শব্দ দ্বারা দ্রব্য গুণ ভাব জাতি ইত্যাদি সূচিত হয় তাহাকে নাম-প্রকৃতি বলা হয়। যেমন,—ছেলে, মেয়ে, ঘাট, মাঠ, নাক, কান, লাল, নীল, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি।

যে মৌলিক শব্দদ্বারা কোনো ক্রিয়া সূচিত হয় তাহার নাম ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু। যেমন,—শু (শোওয়া), বস্ (বসা), যা (যাওয়া), ধর্ (ধরা), চল্ (চলা), ফির্ (ফেরা), হাস্ (হাসা) ইত্যাদি।

এই সমস্ত প্রকৃতির সহিত প্রত্যয় যোগ করিলে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ধাতু সৃষ্ট হয় তাহাদের নাম প্রাতিপদিক। যেমন,—মাঠ+উয়া = মাঠুয়া, < মেঠো, লাল+চে = লালচে, চল+তি = চলতি, ধর+তা = ধরতা, হাস্+আ = হাসা ইত্যাদি।

২. খ. অর্থভেদে শব্দের শ্রেণীবিভাগ

শব্দের অর্থ চিরকাল সমান থাকে না। ভাষার একই শব্দ এক সময় একপ্রকার অর্থ এবং সময়ান্তরে অন্যপ্রকার অর্থ বহন করিতে পারে। যেমন ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তি করা যায়, তেমনি অর্থের বিভিন্নতা অনুসারে শব্দকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ অর্থানুসারে ভাগ করিয়া শব্দের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—যৌগিক শব্দ, রূঢ় (বা রূঢ়ি) শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ।

২. গ. যৌগিক শব্দ

একাধিক মৌলিক শব্দের যোগে অথবা প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের যোগে যে সাধিত শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহার অর্থ পদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থের অনুসরণ করিলে সেই সাধিত শব্দকে যৌগিক শব্দ বলে।

গাইয়ে (<গা+ইয়া, যে গায়), পাচক (যে পাক করে), চাষা (যে চাষ করে), উড়ন্ত (যাহা উড়িতেছে), মাস্টারি (মাস্টারেব কাজ), পটো (<পটুয়া, যে পট আঁকে), পড়ুয়া (=পড়্+উয়া, অধ্যয়নশীল), বোকামি, চালাকি (=চালাক+ই), হাত-পা, বিজলিবাতি, লুপ্ত (যাহা লোপ হইয়াছে), দস্যুতা (ডাকাতি), চন্দ্রমুখ, কুসুমকোমল, স্বর্ণলঙ্কা, বংশীধারী—এই শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে কোনো অসুবিধা নাই। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশেব যে অর্থ তাহা একত্র করিলেই সমগ্র শব্দটির অর্থ পাওয়া যায়। 'দস্যু' শব্দেব অর্থ ডাকাত তাহা আমরা জানি, আব ভাব বুঝাইতে যে 'তা' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, ব্যাকবণ পড়িলে তাহাও জানা যায। উভয়ে মিলিয়া অর্থ হইল দস্যুর ভাব বা ডাকাতি। কুসুম শব্দেব অর্থ ফুল, কোমল শব্দের অর্থ নরম। অতএব কুসুমকোমল শব্দেব মানে হইল ফুলের মতন নরম। এইরূপে শব্দেব ভিন্ন ভিন্ন অংশেব অর্থযোগে যে সম্পূর্ণ শব্দেব অর্থ উপলব্ধি হয, অন্য কোনো বিশেষ অর্থের উপব নির্ভব কবিতে হয না, সেই সকল শব্দেব নাম যৌগিক শব্দ।

২. ঘ. রূঢ় শব্দ

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দেব অর্থ কখনো কখনো শব্দের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি ও প্রত্যয়েব অর্থানুযায়ী না হইয়া অন্যরূপ হইয়া থাকে। যেমন,—

বাঁশী—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়, বাঁশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু বিশেষ অর্থে ফুঁ দিয়া বাজাইবার উপযোগী বাদ্যযন্ত্র।

লক্ষ্মী—মূল অর্থ দেবতাবিশেষ, বিশেষ অর্থ শান্তশিষ্ট।

হঠাৎ—মূল অর্থ সবলে, বিশেষ অর্থ অকস্মাৎ।

সন্দেশ—মূল অর্থ সংবাদ, বিশেষ অর্থ মিষ্টান্ন-বিশেষ।

অন্ন—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আহার্য, খাদ্যদ্রব্য ; বিশেষ অর্থে চাউল সিদ্ধ।

তত্ত্ব—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, যথার্থ অবস্থা ও সংবাদ। তাহা হইতে বিশেষ অর্থ উপঢৌকন। সন্দেশ তুলনীয়।

ডালি—মূল অর্থ চাঁচারি ইত্যাদির তৈয়ারী থালা। বিশেষ অর্থ ভেট।

দারুণ—মূল অর্থ ছিল কাষ্ঠনির্মিত, এখন কঠিন এই বিশেষ অর্থেই ইহার ব্যবহার সুপ্রচলিত।

মৃগ—এ শব্দের মূল অর্থ ছিল পশু, যেমন মৃগরাজ। বিশেষ অর্থ হরিণ।

ছড়িদার—মূল অর্থ বেত্রধারী। বর্তমানে 'পাণ্ডার অনুচর' এই বিশেষ অর্থে প্রচলিত।

চাষাড়ে—চাষা বা কৃষকের তুল্য। বিশেষ অর্থ অশিক্ষিত, অমার্জিত।

দেউলিয়া—দেউল শব্দের অর্থ দেবমন্দির। দেউল+ইয়া=দেউলিয়া। যে ব্যক্তি সর্বস্ব খোয়াইয়া দেবমন্দিরে আসিয়া বাস করিত তাহাকে দেউলিয়া বলা হইত। এখন নিঃসম্বল বা ঋণশোধে অসমর্থ এই বিশেষ অর্থে দেউলিয়া শব্দের ব্যবহার হয়। এখন দেবমন্দিরের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

যে সকল প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থকে না বুঝাইয়া অন্য অর্থ বহন করে তাহাদের নাম রূঢ় শব্দ।

২. ঙ. যোগরূঢ় শব্দ

সমাসবদ্ধ অথবা একাধিক শব্দ বা ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ সমস্যমান পদ কিংবা প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

পঙ্কজ—পদ্মফুল। পঙ্ক হইতে জাত বহু পদার্থের মধ্যে একটি বিশেষ পদার্থকে বুঝাইতেছে।

দুর্ভিক্ষ—মূল অর্থ ভিক্ষার অভাব। বিশিষ্ট অর্থ দেশব্যাপী অন্নকষ্ট, আকাল।

দণ্ডবৎ—মূল অর্থ দণ্ডের ন্যায়, বিশিষ্ট অর্থ প্রণাম করিবার জন্য ভূমিতে পতিত।

বৈবাহিক—মূল অর্থ বিবাহের দ্বারা সম্বন্ধ যুক্ত। বিশিষ্ট অর্থ পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।

সম্বন্ধী—মূল অর্থ যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে। বিশেষ অর্থ পত্নীর ভ্রাতা।

জলদ—মূল অর্থ যাহা জল দেয়। বিশিষ্ট অর্থ মেঘ।

বিশেষ অর্থজ্ঞাপক এইরূপ শব্দসমূহের নাম যোগরূঢ় শব্দ।

—চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

পদপ্রকরণ

১: বাক্য ও পদ

কতকগুলি শব্দ একত্র মিলিত হইয়া যদি একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐ শব্দসমষ্টিকে **বাক্য** বলা হয়। যেমন,—রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন।

বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলির ব্যবহার হয় তাহাদের নাম **পদ**। পদ পাঁচ প্রকারের। **বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ ও অব্যয়**। 'রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন' এই বাক্যে চারিটি পদ।

এক বা একাধিক পদ লইয়া একটি বাক্য গঠিত হয়। যেমন,—শোন, এস, কোথা যাও ?

১. ক. পদমাত্রই দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম শব্দ বা ধাতু, দ্বিতীয় অংশের নাম বিভক্তি। যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দ্বারা শব্দ বা ধাতু বাক্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বা ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করে সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির নাম বিভক্তি।

বিভক্তির দুই রূপ—১. **শব্দবিভক্তি** ও ২. **ক্রিয়াবিভক্তি**।

১. ক.১. বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের কারক ও বচন বুঝাইবার জন্য যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সহিত যুক্ত হয়, তাহাকে **শব্দবিভক্তি** বলা হয়। যেমন,—মানুষের (মানুষ+এর), উহারা (উহা+রা), ছুরিতে (ছুরি+তে), সকলকে (সকল+কে) ইত্যাদি।

১. ক২. ধাতুর সহিত যে বিভক্তি যোগ করিলে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, তাহাই হইল **ক্রিয়াবিভক্তি**। ক্রিয়াবিভক্তির দ্বারা ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ সূচিত হয়। যেমন,—করি (কর+ই), আসিতেছে (আস্+ইতেছে), যাউক (যা+উক) ইত্যাদি।

২. বিশেষ্য

যে সকল পদ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, বর্ণ, ভাব, অবস্থা, কার্য প্রভৃতির নাম বুঝায় তাহাদিগকে বিশেষ্য কহে। যেমন,—

২. ক. ব্যক্তিবাচক—রাম, হরি, যদু, মধু, দীনেশ, কল্যাণী, নমিতা, নন্দিনী, হোসেন, হায়দর, জর্জ, চার্চিল।

২. খ. বস্তুবাচক—ধান, গম, জল, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ, কয়লা, তৈল, মাটি, সিমেন্ট।

২. গ. জাতিবাচক—গোরু, মহিষ, মানুষ, ইংরাজ, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, জার্মান।

২. ঘ. গুণ, ভাব বা অবস্থাবাচক—দয়া, ঘৃণা, ভীরুতা, হিংসা, সুখ, দারিদ্র্য, সরলতা, ভীতি, সততা, বিশ্বাস, শৈত্য, উষ্ণতা, ঘনতা, বৈষম্য, বিপদ, নিশ্চয়তা।

২. ঙ. ক্রিয়াবাচক—রোদন, পঠন, পাঠ, লিখন, আসা, দেখা, যাওয়া, ছোঁয়া, বসা, ওঠা, লওয়া, দেওয়া।

সমষ্টিবাচক পদসমূহ ও বিশেষ্য। যেমন,—শ্রেণী, সমূহ, গণ, দল, আবলী।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বিশেষ্যপদগুলির শ্রেণী নির্দেশ কর:

ক্ষণেক পরে আমার চৈতন্য হইলে—আমি চক্ষু খুলিলাম। দেখি যে আমার সঙ্গী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ একেবারে শুষ্ক, তিনি বিষণ্ণমনে কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি অমনি আমার ও তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিলাম এবং তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য হাসিয়া উঠিলাম।

৩. সর্বনাম

যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাহারই নাম **সর্বনাম**। আমি, তুমি, সে, তিনি, তাহা, যাহা, ইহা, উহা, কে, কি, এ, ও, যা, তা প্রভৃতি শব্দ **সর্বনাম**।

পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি।
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী॥

এই উদাহরণে তিনটি 'আমি' যথাক্রমে পথ, রথ এবং মূর্তির পরিবর্তে বসিয়াছে। পুনরুক্তি-দোষ নিবারণই সর্বনাম পদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাক্যে বিশেষ্য শব্দ উহ্য থাকিলেও তাহার পরিবর্তে সর্বনামের ব্যবহার হয়। যেমন,—

যে যাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে না।

বাঙ্গালা সর্বনাম শব্দগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন,—

৩. ক. ব্যক্তিবাচক—সে, যে, তিনি, যিনি, কে, এ, ইনি, ও, আমি, তুমি, আপনি।

৩. খ. ব্যক্তি বা প্রাণিবাচক—সে, যে, কে।

৩. গ. ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণিবাচক—এ, ও।

৩. ঘ. বস্তু বা ক্ষুদ্র প্রাণিবাচক—তাহা, তা, যাহা, যা, কি, ইহা, উহা।

৩. ঙ. কয়েকটি সর্বনাম পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—এ (কথা), সে (বার), এমন, যেমন।

সর্বনামের প্রথম পুরুষে দুই রূপ, মধ্যম পুরুষে তিন রূপ এবং উত্তম পুরুষে এক রূপ। 'পুরুষ' দেখ।

অনুশীলনী

১। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি সর্বনাম পদের নাম কর এবং স্বরচিত বাক্যে উহাদের প্রয়োগ দেখাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর সর্বনাম পদ আছে?

অগস্ত্য যে দিন দক্ষিণে যান, সে দিন ছিল ভাদ্রমাসের পয়লা তারিখ। এজন্য কোনো মাসের প্রথম দিন কেহ কোথাও যাত্রা করিলে হিন্দুরা তাহাকে বলে অগস্ত্য-যাত্রা।

৪. লিঙ্গ

বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার—**পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ** এবং **ক্লীবলিঙ্গ**।

৪. ক. পুরুষ-বোধক শব্দমাত্রই **পুংলিঙ্গ**। যেমন,—পিতা, পুত্র, বালক, মেসো, মাস্টার, ষাঁড়, ছেলে, গুরু, শিষ্য, হরি।

৪. খ. স্ত্রী-বোধক শব্দ **স্ত্রীলিঙ্গ**। যেমন,—মা, মাসী, বাধা, খুড়ী, ধাত্রী, কাকা, দেবী, ঝি, দিদি, ধোপানী, বুড়ী।

৪. গ. পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন বাকী সকল শব্দই **ক্লীবলিঙ্গ**। যেমন,—ঘাস, ফল, খাট, পুস্তক, পেন্সিল, কলম।

সংস্কৃত ভাষায় বহু শব্দ বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভার্যা, দার ও কলত্র এই তিনটি শব্দেরই অর্থ স্ত্রী। কিন্তু ভার্যা স্ত্রীলিঙ্গ, দার পুংলিঙ্গ এবং কলত্র ক্লীবলিঙ্গ। পূর্বেই বলা হইয়াছে—বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর। সেই সকল সংস্কৃত শব্দের লিঙ্গ নিরূপণ করিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানই অনুসরণ করিতে হইবে। এই কারণেই অনেক বস্তুবাচক এবং ভাববাচক শব্দও পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন,—

পুংলিঙ্গ—অগ্নি, নদ, বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র, পর্বত, হিমালয়, আশ্রয়, লাভ, শাপ, তাপ। স্ত্রীলিঙ্গ—তারা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারা, সন্ধ্যা, নিদ্রা, লতা, শোভা।

"বাঙ্গালা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক বা উচ্চারণ-মূলক স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। এমন কি অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রী-বাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো

প্রত্যয় গ্রহণ করে না। সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রী-জাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুব, বিড়াল, উট, মহিষ প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের নিয়মে ব্যবহারকালে লিখিত ভাষায় কুক্কুরী, বিড়ালী, উষ্ট্রী, মহিষী হইয়া থাকে, কিন্তু কথিত ভাষায় একপ্র ব্যবহার হাস্যকর।"

৪.খ. স্ত্রী প্রত্যয়

কোনো কোনো বাংলা শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিতে হইলে বিশেষণের আশ্রয় লইতে হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশ শব্দই বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ।

৪. খ[১] সংস্কৃত প্রত্যয়

১. অকারান্ত শব্দেব উত্তর আ প্রত্যয় কবিযা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওযা যায়। যেমন,—চপল চপলা, প্রথম প্রথমা, পবম পবমা, শুদ্ধ শুদ্ধা, বিবদমান বিবদমানা, বিবাহিত বিবাহিতা।

২. অক-ভাগান্ত শব্দেব উত্তব আ প্রত্যয কবিলে অক স্থানে ইক হয়। যেমন,—পালক পালিকা, পাচক পাচিকা, গায়ক গাযিকা, নাযক নাযিকা, পাঠক পাঠিকা।

৩. গৌব, কুমাব, কিশোব প্রভৃতি শব্দেব উত্তব ঈ প্রত্যয় হয। যেমন,—গৌব গৌবী, কুমাব কুমাবী, কিশোব কিশোরী।

৪. জাতিবাচক অকারান্ত শব্দেব উত্তব ঈ প্রত্যয় হয। যেমন,—ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী, সিংহ সিংহী, মৃগ মৃগী।

৫. ঈ প্রত্যয হইলে মনুষ্য ও মৎস্য শব্দেব য লোপ হয়। যেমন,—মৎস্য মৎসী, মনুষ্য মনুষী।

৬. ঋকাবান্ত শব্দেব ঋ স্থানে বী হয। যেমন,—দাতৃ দাত্রী, কর্তৃ কর্ত্রী।

৭. ইন্-ভাগান্ত শব্দেব উত্তর ঈ প্রত্যয় হয়। যেমন,—ধনিন্ (ধনী) ধনিনী, কামিন্ (কামী) কামিনী, মানিন্ (মানী) মানিনী, তপস্বিন্ (তপস্বী) তপস্বিনী।

৮. মান্ ও বান্ প্রত্যয়যুক্ত শব্দেব স্ত্রীলিঙ্গে মান্ স্থলে মতী এবং বান্ স্থলে বতী হয়। যেমন,—গুণবান্ গুণবতী, দয়াবান্ দযাবতী, পুণ্যবান্ পুণ্যবতী, বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী।

৯. পত্নী অর্থে জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তব ঈ হয়। যেমন,—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, শূদ্র শূদ্রী, গোপ গোপী।

১০. পত্নী অর্থে ভব, সর্ব প্রভৃতি শব্দের উত্তর আনী প্রত্যয় হয়। যেমন, ভব ভবানী, সর্ব সর্বানী, ইন্দ্র ইন্দ্রাণী।

১১. হিম, অরণ্য প্রভৃতি শব্দের উত্তর আনী প্রত্যয় হয়। যেমন,—হিম হিমানী, অরণ্য অরণ্যানী।

১২. বহুব্রীহি সমাস হইলে অবয়ব-বাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈ ও আ হয়। যেমন—চন্দ্রমুখ, চন্দ্রমুখী ও চন্দ্রমুখা, সুকেশ সুকেশী ও সুকেশা।

১৩. অবয়ব-বাচক শব্দের উপধা অর্থাৎ অন্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণ সংযুক্ত হইলে তাহাদেব উত্তব আ হয়। যেমন,—মৃগনেত্র মৃগনেত্রা। কিন্তু অঙ্গ, গাত্র, কর্ণ, দন্ত প্রভৃতি শব্দেব উত্তর আ এবং ঈ উভয়ই হয়। যেমন,—কৃশাঙ্গা কৃশাঙ্গী, মৃদুগাত্রা মৃদুগাত্রী।

১৪. যে সকল অবয়ব-বাচক শব্দে দুইযের অধিক স্বববর্ণ থাকে তাহাদের উত্তব আ হয়। যেমন,—মৃগনযন মৃগনয়না, চন্দ্রবদন চন্দ্রবদনা।

১৫. বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন শব্দেব উত্তব ঈ হয়। যেমন,—চতুষ্পদ চতুষ্পদী, ত্রিপদ ত্রিপদী।

১৬. গুণবাচক উকাবান্ত শব্দেব উত্তব বিকল্পে ঈ হয়। গুরু গুর্বী, গুরু; সাধু সাধ্বী, সাধু।

১৭. এমন অনেক শব্দ আছে স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে যাহাদেব রূপ স্বতন্ত্র। যেমন,—পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, পুরুষ স্ত্রী, কন্যা জামাতা।

৪. ঘ² বাঙ্গালা স্ত্রী প্রত্যয়

১. কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে ই ও ঈ প্রত্যয় যোগ কবিয়া স্ত্রীলিঙ্গ কবা হয। যেমন,—কাকা কাকী, মামা মামী, বুডা বুড়ী, দাদা দিদি, ঘোড়া ঘুড়ী, বামুন বামনী, খোকা খুকী, অভাগা অভাগী, খাঁদা খেঁদী, নেকা নেকী।

২. কতকগুলি শব্দে নী প্রত্যয় হয়। স্থল বিশেষে এই প্রত্যযেব পূর্বে আ বা ই আগম হয। যেমন,—কলু কলুনী, তেলী তেলিনী, গয়লা গয়লানী, মালি মালিনী, ধোবা ধোবানী, নাপিত নাপ্‌তানী, চাকর চাকবাণী, বাঘ বাঘিনী, চৌধুরী চৌধুবাণী। নী স্থলে কেহ কেহ নি লিখেন।

৩. "কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন,—সিংহিনী (সিংহী), গৃধিনী (গৃধ্রী), অধীনী (অধীনা), হংসীনী (হংসী), সুকেশিনী (সুকেশী), মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী),

কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।"*

৪. কয়েকটি শব্দ আছে পুংলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গে যাহাদের রূপ স্বতন্ত্র। যেমন,—পুরুষ মেয়ে, মদ্দা মাদী, এঁড়ে বকনা, বর কনে, বাবা মা, মেয়ে জামাই, ভাই বোন, সাহেব মেম, বা বিবি, কর্তা গিন্নী, শ্বশুর শাশুড়ী, বাদশা বেগম।

৫. শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া স্থলে ঈ প্রত্যয় হয়। যেমন,—ঘরভাঙ্গানিয়া ঘরভাঙ্গানী, পাড়াকুঁদুলিয়া পাড়াকুঁদুলী, কীর্তনিয়া কীর্তনী, মনমাতানীয়া মনমাতানী।

সংস্কৃত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। তবে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহাব করিবার সময় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণকে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গসূচক করা হয়।

আমরা বলি,—সুন্দব মেয়েটি, মিষ্ট কথা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। আবার সংস্কৃতের অনুকবণে এরূপ প্রয়োগও হইয়া থাকে,—চঞ্চলা লক্ষ্মী, পল্লবিনী লতা, কনিষ্ঠা অঙ্গুলী, বুদ্ধিমতী বালিকা।

বাঙ্গালা শব্দেও কখনো কখনো এইরূপ হয়। যেমন,—ঘরভাঙ্গানী বউ, উঁচকপালী মেয়ে।

দেশবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,—ভাবতমাতা, বঙ্গজননী, দেশমাতৃকা।

স্ত্রীপ্রত্যয়-বিষয়ক প্রধান বিধিগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। অনেক বিধিব আবাব ব্যতিক্রমও আছে।

নিম্নে স্ত্রীলিঙ্গ রূপসহ কয়েকটি শব্দেব তালিকা দেওয়া হইল—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বালক	বালিকা	প্রথম	প্রথমা
পাচক	পাচিকা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
গায়ক	গায়িকা	অধম	অধমা
নায়ক	নায়িকা	মধুর	মধুরা
বাদক	বাদিকা	দীন	দীনা
পালক	পালিকা	সরল	সরলা
তারক	তারিকা (ত্রাণকর্ত্রী)	কৃষ্ণ	কৃষ্ণা
	তারকা (নক্ষত্র)	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা

* শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কোকিল	কোকিলা	মানব	মানবী
অজ	অজা	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
বৎস	বৎসা	হরিণ	হরিণী
অশ্ব	অশ্বা	গোপ	গোপী
বৈশ্য	বৈশ্যা	সিংহ	সিংহী
বৈদ্য	বৈদ্যা	(খাঁটি বাঙ্গালায়)	সিংহিনী
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়াণী (জাতি)	ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী
	ক্ষত্রিয়ী (ভার্যা)	গর্দভ	গর্দভী
শূদ্র	শূদ্রা (জাতি)	গো	গবী
	শূদ্রী (পত্নী)	মানুষ	মানুষী
সূর্য	সূর্যা, সূরী	মৃগ	মৃগী
শূর্পণখ	শূর্পণখা (নাম)	হয়	হয়ী
মৃগনেত্র	মৃগনেত্রা	মৎস্য	মৎসী
কৃশাঙ্গ	কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী	প্রাক্	প্রাচী
বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী	প্রত্যক্	প্রতীচী
কুন্দদন্ত	কুন্দদন্তা, কুন্দদন্তী	উদক্	উদীচী
কোকিলকণ্ঠ	কোকিলকণ্ঠা	নিশাচর	নিশাচরী
	কোকিলকণ্ঠী	দশম	দশমী
নর	নারী	ষোড়শ	ষোড়শী
ঈশ্বর	ঈশ্বরী	ভয়ঙ্কর	ভয়ঙ্করী
দেব	দেবী	নর্তক	নর্তকী
কিশোর	কিশোরী	চতুষ্টয়	চতুষ্টয়ী
সুন্দর	সুন্দরী	বরুণ	বরুণানী
ব্রহ্মা	ব্রহ্মাণী	ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
শ্রীমান্	শ্রীমতী	মাতুল	মাতুলানী
বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী	"	মাতুলী, মাতুলা*
সৎ	সতী	শিব	শিবানী, শিবা
প্রেয়ঃ	প্রেয়সী	হিম	হিমানী

* মাতুলী ও মাতুলা বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চণ্ড	চণ্ডী, চণ্ডা	অরণ্য	অরণ্যানী
চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখী	যবন	যবনানী
সুকেশ	সুকেশী, সুকেশা	পতি	পত্নী
(খাঁটি বাঙ্গালায় সুকেশিনী)		রাজা	রাজ্ঞী
ধনবান্	ধনবতী	সম্রাট্	সম্রাজ্ঞী
পুত্রবান্	পুত্রবতী	খ্যাতনামা	খ্যাতনাম্নী
কর্তা	কর্ত্রী	মৃদু	মৃদ্বী, মৃদু
ধাতা	ধাত্রী	সাধু	সাধ্বী, সাধু
দাতা	দাত্রী	গুরু	গুর্বী, গুরু
জনয়িতা	জনয়িত্রী	বহু	বহ্বী, বহু
তপস্বী	তপস্বিনী	তনু	তনূ, তনু
মানী	মানিনী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ
			(খাঁটি বাঙ্গালায় শাশুড়ী)
সখি	সখী	পিতা	মাতা
ভব	ভবানী	পুত্র	কন্যা
শর্ব	শর্বাণী	বর	বধূ
রুদ্র	রুদ্রাণী	ভ্রাতা	ভগিনী

নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির অর্থ ও রূপ লক্ষণীয় :

পঞ্চপতি ইহার	পঞ্চপত্নী
সমান পতি ইহার	সপত্নী
অন্তরে সন্তান আছে ইহার	অন্তর্বত্নী
সুন্দর দন্ত আছে যাহার	সুদন্তী
রম্ভার ন্যায় উরু যাহার	রম্ভোরু

৪. খ^৩. নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

মতি, শ্রেণী(-ণি), বুদ্ধি, রাজী(-জি), গতি, রাত্রি(-ত্রী), ভক্তি, রজনী(-নি), স্তুতি, আবলী(-লি)।

নদী, দিক্, ভূমি, রাত্রি, লতা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বোধক শব্দ, তা ও তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং গঙ্গা, উমা প্রভৃতি কতকগুলি আকারান্ত শব্দ নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিব লিঙ্গ পবিবর্তন কর :

জ্যেঠা, মানুষ, মৎস্য, গুরু, লঘু, মাতুল, ষাঁড, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা, পতি, ইন্দ্র, শূদ্র, ক্ষত্রিয, মানুষী, শর্বাণী, যুবতী, শ্রীমতী, নাবায়ণী, মা, বোন, ঘরভাঙানী, নাগ, জনয়িত্রী, ধাত্রী, পিতামহী, বকনা, তাবকা।

২। নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদেব অন্তর্গত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গ কব :

সেই কুমারী সঞ্চাবিণী ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত পুত্তলিকার ন্যায়। সে নিদ্রার মত লোচনগ্রাহিণী, অশবীবিণীর মত স্পর্শবর্জিতা, চিত্রলিখিতাব মত শুধু দর্শনীয়া, মূর্ছাব ন্যায় মনোহবা।

৩। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পবিণত কবিবার জন্য সাধাবণতঃ কি কি প্রত্যয প্রযুক্ত হইযা থাকে? উদাহরণ সহযোগে প্রদর্শন কর।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিব শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচাব কব :

হেমাঙ্গিনী, সুকেশিনী, বাঘিনী, হংসিনী, ভারতজননী, বঙ্গমাতা।

৫। একপদে রূপান্তবিত কর :

ক. উঁচু কপাল যাহাব সেই (স্ত্রীলোক)

খ. কোঁদল কবে যে সেই "

গ. চিকণীব মত দাঁত যাহাব সেই "

ঘ. পঞ্চ পতি যাহার সেই "

ঙ. হাড জ্বালায় যে সেই "

৫. বচন

যাহাব দ্বাবা ব্যক্তি বা বস্তুব সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় তাহারই নাম **বচন**। বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদেবই বচন-বিভেদ আছে।

বাঙ্গালায় দুইটি বচন আছে—**একবচন** ও **বহুবচন**। একটি বস্তু বা ব্যক্তি বুঝাইতে একবচনেব এবং একাধিক বস্তু বা ব্যক্তি বুঝাইতে বহুবচনেব প্রয়োগ হয়। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই।

বা, এবা, গুলা, গুলি প্রভৃতি বিভক্তি যোগে একবচন বহুবচনে পরিণত হয়। যেমন,—মেযেবা, লোকে (বলে), বালকেবা, লোকগুলি, ছেলেগুলি, ঘরগুলি, আমবা, তোমবা, ইহাবা ইহাদেব, তাহাদিগেব।

জাতি বা শ্রেণী-বাচক বিশেষ্যপদ বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত না হইয়াও বহুবচনের ভাব প্রকাশ করে। যেমন,—গোরু ঘাস খায়, ক্ষত্রিয়ের কাজ যুদ্ধ

করা, গুরুজনকে ভক্তি করিও। কিন্তু এই জাতি বা শ্রেণী-বাচক শব্দ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলে বহুবচনের বিভক্তি গ্রহণ করে। যেমন,—গোরুগুলি ঘাস খাইতেছে। এস্থলে কয়েকটি গোরু নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সব, সকল প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া উহার বহুবচন সূচিত করে। যেমন,—সকল লোক, সব দেশ, অনেক কথা, কয়েকটি ছেলে, বহু দিন।

দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া বিশেষ্যকে বহুবচনে রূপান্তরিত করে। যেমন,—দুই ক্রোশ, তিন মাস, চার হাত, সাত বার।

গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্যের পরে বসে। যেমন,—দেবগণ, সেনাদল, জাতিসমূহ, ছাত্রবৃন্দ।

চলিত বাঙ্গালায় ঝাঁক, গোছা, আঁটি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যের বহুবচন করা হয়। বলা হয়,—পাখীর ঝাঁক, চাবি গোছা, খড়ের আঁটি। অথবা—এক-ঝাঁক মৌমাছি, দু-গোছা চাবি, দশ আঁটি খড়।

পত্র শব্দের যোগে কয়েকটি শব্দের বহুবচন হয়। যেমন,—খরচপত্র, ঔষধপত্র, চিঠিপত্র, পুঁথিপত্র, হিসাবপত্র।

উপাদান, গুণ ও ভাববাচক শব্দের বহুবচন হয় না। তবে আধিক্য-বাচক শব্দের সহযোগে পরিমাণের প্রাচুর্য সূচিত করা হয়। যেমন,—এক-মানুষ জল, এক-কাঁড়ি ভাত, প্রচুর খাদ্য, অনেক আশা।

পরিমাণের আধিক্য বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালায় শব্দদ্বৈত ঘটে। যেমন,—কলসী কলসী জল, বাটি বাটি দুধ, হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, মুঠা মুঠা টাকা, ঝুড়ি ঝুড়ি আম।

সময়ের বহুত্ব বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত করা হয়। যেমন,—বার বার বলিয়াছি, দিন দিন এক কথা শুনিতে পারি না।

একার্থক বা নিকটার্থক দুই শব্দের শব্দদ্বৈত সহযোগে বহুবচন সূচিত হয়। যেমন,—কাজ-কর্ম, ছেলে-পুলে, জীব-জন্তু, গরীব-দুঃখী, দোকান-হাট, মুটে-মজুর, বন-জঙ্গল। কোনও কোনও যুগ্মশব্দের একাংশ অনেক সময় অর্থহীন দেখা যায়। যেমন,—চাকর-বাকর, বাসন-কোসন।

বাঙ্গালায় 'ট' এবং 'ফ' যোগে আর এক রকমের শব্দদ্বৈত হয়। যেমন,—ভাত টাত, মাছ ফাছ, মানুষ টানুষ, বক্তৃতা ফক্তৃতার (দিন আর নাই)। মনে রাখিতে হইবে তুচ্ছার্থে 'ফ'য়ের প্রয়োগ হয়।

বহুবচন-বাচক প্রত্যয় পরে বসিলে পূর্বে আর কোনও বহুবচন-বাচক শব্দ

বসিবে না। যেমন,—অনেকগুলি লোক, লোকগুলি। কিন্তু অনেক লোকগুলি অশুদ্ধ। সভায় গায়কগণ উপস্থিত ছিলেন অথবা সভায় অনেক গায়ক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যদি বলা হয়—সভায় অনেক গায়কগণ উপস্থিত ছিলেন, তাহা হইলে ভুল হইবে।

অনুশীলনী

১। একবচন শব্দকে কিরূপ বহুবচন কবা হয তাহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক উল্লেখ কব।

২। নিম্নলিখিত বহুবচন শব্দগুলিব মধ্যে অর্থেব কিরূপ বিভিন্নতা আছে ?

দুই দিন	দিন দুয়েক
লোকে (বলে)	লোকগুলি (বলে)
কয়েক হাঁড়ি ভাত	হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত
মুড়ি-টুড়ি (খাও)	মুড়ি-ফুড়ি (ভাল লাগে না)
চাকব দুইজন (পলাইযাছে)	চাকব-বাকর (পাওয়াই কঠিন)

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিব মধ্যে যে কয়টি বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদ আছে তাহাদেব বচন নির্ণয কব :

ক. যখন বর্গীর উপদ্রব ছিল তখন বর্গীর ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত। কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গীর অপেক্ষা ইংরাজীর ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশী ভয়ানক সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না।

খ. ছোটলোকের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদেব ছেলেদের শিক্ষা দেবার সংকল্প তোমার বিড়ম্বনা।

গ. বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নিহারিকাসমূহ যে যেদিক হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সে সেই দিকে চলিয়া গেল।

৬. পুরুষ

বাঙ্গালা ভাষায় তিন পুরুষ। আমি, আমরা—**উত্তম পুরুষ**। তুমি, তোমরা—**মধ্যম পুরুষ**। ইহা ব্যতীত আর সবই **প্রথম পুরুষ**। যেমন,—তুমি যে কথা বলিবে আমি তাহাই শুনিব। এই বাক্যে তুমি মধ্যম পুরুষ, আমি উত্তম পুরুষ এবং কথা এই বিশেষ্য পদ ও তাহা এই সর্বনাম পদ প্রথম পুরুষ।

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম শব্দের প্রথম পুরুষে দুই রূপ—সামান্য ও গুরু।

সামান্য	গুরু
সে	তিনি
উহা	উঁহা
যে	যিনি
ইহা	ইঁহা

মধ্যম পুরুষে সর্বনামের তিন রূপ—তুচ্ছ, সামান্য এবং গুরু। যেমন,—

তুচ্ছ	সামান্য	গুরু
তুই	তুমি	আপনি

উত্তম পুরুষে রূপভেদ নাই।

অনুশীলনী

১। সর্বনাম শব্দের মধ্যম পুরুষের কয় রূপ?

২। বাঙ্গালা ব্যাকরণে কয়টি পুরুষ?

৭. অব্যয়

লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিভেদে যে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয় না, তাহারই নাম অব্যয়। প্রয়োগ ও অর্থভেদে অব্যয় নানা শ্রেণীর।

সংযোজক অব্যয়—আর, কিন্তু, নচেৎ, কিংবা, তবু, যদিও।

সম্বোধন-সূচক অব্যয়—ওহে, ওগো, ওরে, হাঁগো, হে।

পদান্বয়ী অব্যয়—পর্যন্ত, অবধি, দ্বারা, বিনা, পিছু, নাগাত।

বিস্ময়বাচক অব্যয়—ও, ও বাবা, বাপরে, অ্যাঁ।

করুণাবাচক অব্যয়—আহা, আহা রে, মরি মরি, আহা হা, হায় হায়।

ঘৃণাবাচক অব্যয়—ছিছি, রাম রাম, দূর দূর, রামঃ।

প্রশংসাবাচক অব্যয়—বাঃ, বেশ, সাবাশ, বলিহারি, বেড়ে, বহুৎ আচ্ছা, ধন্যধন্য।

সম্মতিবাচক, অব্যয়—হাঁ, হ্যাঁ, আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে, তা বই কি, বটেই তো।

অসম্মতিবাচক অব্যয়—না, আদৌ না, কখনো না, না তো।

প্রশ্নবাচক অব্যয়—কি? নাকি? তো?

তুলনাবাচক অব্যয়—ন্যায়, মত, মতন।

এতদ্ব্যতীত বাক্যালংকারে কতকগুলি অব্যয়ের স্বার্থে ব্যবহার হয়। যেমন,—এক যে ছিল রাজা, "ছয় না মাসের শিশু গো হইল যখন", সে কে বটে হে! এই বাক্যগুলিতে যে, না, গো এবং হে শব্দ অব্যয়।

কোনও কোনও অব্যয় বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক 'না' এই অব্যয়টি কত রকম অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে নিম্নে তাহা দেখানো হইল।

১. বৈপরীত্য—নাপাজিমানে, নাচার, নাহক।

২. অসম্মতি—এ বিষয়ে না করিও না। নাকে হাঁ করা শক্ত।

৩. অনুরোধ—একটি গল্প বল না।

৪. আদেশ—দাও না।

৫. অথবা—যাবে, না, যাবে না।

৬. হাঁ—আজ আর যেও না, না, যেতেই হবে।

৭. অবধারণ—মনুষ্য কে? না, যে দয়ালু।

৮. নিষেধ—করিও না।

৯. পাদপূরণ—উত্তর্যা না গ্যাবো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।

তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্বত।

হাঁটিয়া না যাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল।

মুখেতে ফুটিয়া উঠে কনক চাঁপার ফুল।

১০। অনুকার—দুড়দাড়, ধনধন, ঢংঢং, শনশন, মড়মড়।

৮. উপসর্গ

প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অভি, অপি, উপ, আ,—এই কুড়িটি অব্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া উহার অর্থের পরিবর্তন ঘটায়ঃ এই অব্যয়গুলির নাম উপসর্গ। উহাদের মধ্যে 'অপি' এই উপসর্গটির ব্যবহার অতি বিরল।

যুজ্ ধাতুর অর্থ যোগ করা। কিন্তু প্র, বি, নি, অনু, উৎ প্রভৃতি উপসর্গ যোগে উহারই অর্থ হয়—(প্রয়োগ) ব্যবহার, (বিয়োগ) বিচ্ছেদ, (নিয়োগ) ভার অর্পণ, (অনুযোগ) নালিশ, (উদ্‌যোগ) উপক্রম, (অভিযোগ) দোষারোপ।

৮. ক. উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দ

প্রকার, প্রকাশ, প্রকোপ, প্রখ্যাত, প্রণাম, প্রচার, প্রতাপ, প্রণীত, প্রতারণা, প্রজ্ঞা, প্রজ্বলিত, প্রলয়, প্রভেদ, প্রহার। পরাজয়, পরাভব। অপকর্ম, অপকার। সংক্ষেপ, সংখ্যা, সংগ্রহ, সংশোধন, সংসার, সংস্কার, সংহত, সংহরণ, সম্মেলন। নিয়ত, নিগম, নিগ্রহ, নিদান, নিদারুণ, নিবিষ্ট, নিয়ম, নিয়োগ। অবকাশ, অবগত, অবদান, অবধারণ, অবগত, অবমান, অবরোধ, অবলেপ, অবলেহ, অবস্থা, অনুকরণ, অনুকূল, অনুভব, অনুগ, অনুজ, অনুগ্রহ, অনুবাদ, অনুমান, অনুরাগ, অনুরোধ, অনুশোচনা, অনুশীলন। নিরলম্ব, নিরর্থক, নিরশন, নির্যাতন। দুর্গ, দুর্গম, দুষ্প্রাপ্য। বিকট, বিক্ষেপ, বিক্ষোভ, বিচ্যুত। অধিকার,

অধিগত, অধিবাস, অধিষ্ঠান। সুগম, সুবিদিত, সুবোধ, সুযোগ, উচ্ছেদ। উচ্ছ্বাস, উৎকট, উৎকীর্ণ, উৎকর্ষ, উৎক্ষেপ, উৎসর্গ, উৎসাহ, উদ্‌গত, উদ্দীপন, উদ্ধার, উন্মত্ত। পরিখ্যাত, পরিগ্রহ, পরিচয়, পরিচর্য্যা, পরিচালক, পরিতোষ, পরিত্যাগ, পরিশ্রম, পরিদৃশ্যমান, পরিপূর্ণ, পরিহাস, পরিহার। প্রতিকার, প্রতিগ্রহ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা, প্রতিহারী। অভিহনন, অভিবাদন, অভিভাবক, অভিমত, অভিমান, অভিলাষ, অত্যয়, অত্যুক্তি। অতিরেক, অতিমান, অতিশয়। উপকরণ, উপকার, উপকৃত, উপগত, উপদিষ্ট, উপদেশ, উপলয়ন, উপনীত, উপবাস, উপহার। আকাঙ্ক্ষা, আচার, আধার, আবরণ, আবাস, আরূঢ়, আহৃত।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাহাকে বলে?

২। বিভিন্ন উপসর্গ যোগে আকার, সংঘাত, প্রণাম, বিহার, নিপাত, অবচ্ছেদ, অনুরাগ, পরিচয়,—এই শব্দগুলির কত রকম রূপ এবং কত রকম অর্থ হইতে পারে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের সাহায্যে প্রদর্শন কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পার্শ্বে উপযুক্ত উপসর্গ বসাও:

—হাস (ঠাট্টা)। —জ্ঞান (চিহ্ন)।

—জ্ঞেয় (যাহা কষ্টে জানা যায়)। —পন্ন (জাত)।

—সাধ্য (সহজে সাধন যোগ্য)। —ভঞ্জন (ঝড়)

—লভ (যাহা সহজে লাভ করা যায়)।

---

৯. কারক

ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহার নাম কারক, কারক ছয়টি। কর্তৃ-কারক, কর্ম-কারক, করণ-কারক, সম্প্রদান-কারক, অপাদান-কারক, অধিকরণ-কারক।

৯. ক. কর্তৃ-কারক বা কর্তা-কারক

যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহার নাম কর্তা।

রাম বনে গিয়াছিলেন। গোরু দুধ দেয়। প্রথম বাক্যে গিয়াছিলেন ক্রিয়ার কর্তা রাম এবং দ্বিতীয় বাক্যে দেয় ক্রিয়ার কর্তা গোরু। সুতরাং রাম ও গোরু কর্তৃ-কারক।

কোনো কোনো বাক্যে কর্তা উহ্য থাকে। যেমন—বাড়ী যাও। কবে এখানে আসিবে? এই দুইটি বাক্যে তুমি বা তোমরা উহ্য আছে। কর্তা ভিন্ন বাক্য কখনও সম্পূর্ণ হয় না।

৯. খ. কর্মকারক

যে পদ ক্রিয়ার বিষয় তাহাই কর্ম।

বিড়াল ইঁদুর ধবে, এই বাক্যে ধরে ক্রিয়াব বিষয় হইল ইঁদুব। বিড়াল কি ধবে?—ইঁদুব। সুতরাং ইঁদুর পদটি কর্ম-কাবক।

৯. গ. করণ-কারক

যে পদ ক্রিয়া সম্পাদনের সহায় বা উপায় তাহাই করণ।

মন দিয়া পড। আমাব দ্বাবা হইবে না। এটি পায়ে চলাব পথ। তুমি কি হাতে মাথা কাটিবে নাকি? এই বাক্যসমূহে মন দিযা, আমার দ্বারা, পায়ে এবং হাতে এই পদ কয়টি কবণ-কাবক। উহারা যথাক্রমে পড, হইবে, চলার এবং কাটিবে ক্রিয়াব সম্পাদন কবিবাব সহায।

৯. ঘ. সম্প্রদান-কারক

যে পদ ক্রিয়াব পাত্র বা উদ্দেশ্য বুঝায় তাহাই সম্প্রদান।

দবিদ্রকে ধন দাও। আমায় কিছু খাওযাইতে পাব? এই বাক্যগুলিতে দবিদ্রকে ও আমায এই দুইটি পদ সম্প্রদান-কাবক। কাবণ, ঐ দুইটি পদ যথাক্রমে দাও ও খাওয়াইতে ক্রিয়াব পাত্র।

৯. ঙ. অপাদান-কারক

যাহা হইতে ক্রিযাব কাজ সম্পাদিত হয তাহাই অপাদান।

মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে। ফুল হইতে ফল জন্মায়। কাহার কাছে একথা শুনিলে? সজ্জনেব নিকটে কোন বস্তু যাচ্ঞা কবিয়া যদি ব্যর্থকাম হইতে হয় তাহাতেও দুঃখ নাই।

উল্লিখিত বাক্যসমূহে মেঘ হইতে, ফুল হইতে, কাহাব কাছে, সজ্জনের নিকটে—এগুলি অপাদান-কাবক।

চলিত ভাষায ঠেঙে, থেকে, হ'তে প্রভৃতি যোগে অপাদান কাবক হয়।

লোকটা ভাবী কৃপণ, ওব ঠেঙে একটি পয়সাও আদায কবা যাবে না। বন থেকে বেবোল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। জল হ'তে বাষ্প আবাব বাষ্প হ'তে জল।

এস্থলে—ওর ঠেঙে, বন থেকে, বাষ্প হ'তে, জল হ'তে—এই পদগুলি অপাদান কাবক।

৯. চ. অধিকরণ-কারক

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে।

অধিকরণ প্রধানতঃ তিন প্রকার—আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ ও ভাবাধিকরণ।

তিলে তৈল আছে। বনে ব্যাঘ্র বাস করে। রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। হৃদয়ে সাহস অবলম্বন কর।

উল্লিখিত বাক্যগুলিতে তিলে, বনে, অযোধ্যায়, চন্দ্রে, হৃদয়ে—এই শব্দ কয়টি আধারাধিকরণ।

সন্ধ্যাকালে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। "এমন দিনে তারে বলা যায়।" আগামী কল্য যদি না আসিতে পার পরশ্ব অবশ্যই আসিও। "রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলির মধ্যে সন্ধ্যাকালে, দিনে, কল্য, পরশ্ব, রাতে, দিনে—এই পদগুলি কালাধিকরণের উদাহরণ।

সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে। হাসিতে মুক্তা ঝরে।

উপরের বাক্যগুলিতে 'সূর্যোদয়ে' ও 'হাসিতে' ভাবাধিকরণ।

৯. ছ. সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকে না বলিয়া সম্বন্ধ কারক নহে, সম্বন্ধ পদ।

আমার বই। তোমার ভাই। ফলের রস। ফুলের গন্ধ। চোখের জল। চাঁদের আলো।

উল্লিখিত উদাহরণে আমার, তোমার, ফলের, ফুলের, চোখের এবং চাঁদের এইগুলি সম্বন্ধ পদ। এই সমস্ত পদের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় ঘটে নাই।

৯. জ. সম্বোধন পদ

যে শব্দের দ্বারা আহ্বান সূচিত হয় তাহাকে সম্বোধন পদ বলা হয়।

মহারাজ, আদেশ করুন! "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" উদ্ধৃত বাক্য দুইটিতে মহারাজ ও বঙ্গ শব্দ সম্বোধন পদ।

অনুশীলনী

১। কারক কাহাকে বলে?

২। কারক এবং পদ—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। সম্বন্ধ ও সম্বোধন—ইহারা কারক নয় কেন?

৪। কয়েকটি স্বরচিত বাক্যের দ্বারা সম্প্রদান কারকের প্রয়োগ দেখাও

১০. বিভক্তি

১০. ক. প্রথমা

কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়।—আকাশ নীল। মানুষ চিরজীবী নয়।

অসমাপিকা ক্রিয়াব কর্তাতেও প্রথমা হয়।—সূর্য উঠিলে অন্ধকার দূব হইল। রোগী ঔষধ খাইয়া সুস্থ হইয়াছে।

কর্মবাচ্যে কর্মকাবকে সাধাবণতঃ প্রথমা হয়।—রামের হাতে বাবণ নিহত হন। আমাব দ্বাবা একাজ হইবে না।

১০. খ. দ্বিতীয়া

কর্তৃবাচ্যে কর্মকাবকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।—বাল্মীকি রামায়ণ রচনা কবেন। তুমি কি চাও?

সম্প্রদান-কাবকেও দ্বিতীয়া হয।—দবিদ্রকে অন্ন দান কব। গুরু শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন কবাইতেছেন।

কর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তায় কখনও কখনও দ্বিতীয়া হয়। কাল তোমাকে আসিতে হইবে।

১০. গ. তৃতীয়া

কবণকাবকে তৃতীযা বিভক্তি হয়।—বাক্যেব দ্বারা মনেব ভাব প্রকাশ করি। হাতে কাজ কব, মুখে হবি বল।

১০. ঘ. পঞ্চমী

অপাদান-কাবকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।—অগ্নি হইতে উত্তাপ বাহিব হয়। হৃদয় হইতে মালিন্য দূর কব। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গবীয়সী।

১০. ঙ ষষ্ঠী

সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয। ফুলের গন্ধ। আগুনেব শিখা। ঘরের কথা। হাতের কাজ।

১০. চ. সপ্তমী

অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।—মাঠে মাঠে ধান। গাছে গাছে ফল। বাবু বাড়ী নেই।

শব্দবিভক্তির সংখ্যা ছয়টি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী। কেহ কেহ চতুর্থী বিভক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

১১. বিভক্তির চিহ্ন

এ, তে, কে, য় প্রভৃতি বিভক্তি-চিহ্ন যোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারক সূচিত হয়। প্রত্যেক বিভক্তির পৃথক্ চিহ্ন নাই। অনেক স্থলে অন্য শব্দ যোগ করিয়াও কারক নিষ্পন্ন হয়।

১১. ক. প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন

সাধারণতঃ কর্তৃপদের সহিত কোন বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয় না।—মাঠে গোরু চরে। রাখাল বাঁশী বাজায়। ভগবান মঙ্গলময়। ছেলেরা খেলা করে, পক্ষিগণ উড়িয়া বেড়ায়। মাছিগুলা ভন ভন করিতেছে।

কর্তা অনির্দিষ্ট থাকিলে কিংবা করণ-বাচক বা অধিকরণ-বাচক হইলে এ, য়, তে, যে যোগ হয়।—লোকে বলে। গোরুতে ঘাস খায়। পাগলে কি না বলে। ম্যালেরিয়ায় দেশটা ছারখার করিয়া দিল। "হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে হাসিছে হেলার হাসি"।

সহযোগ বুঝাইলেও এ, য, তে, যোগ হয়।—তোমায় আমায় যাই চলো। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে। জমিদারের এমন প্রতাপ যে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

১১. খ দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে সাধারণতঃ কোন চিহ্ন যোগ হয় না। ফুল পাড়ি, কথা শুন, মুখ দোষ, ডাক্তার ডাক, ছেলেদের খাইতে দাও।

কর্মপদ সুনির্দ্দিষ্ট হইলে দ্বিতীয়ার কে যোগ হয়। আজ তিন দিন হইল গোরুটাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ডাক্তারকে ডাক। মনে রাখিতে হইবে "ডাক্তার ডাক" এবং "ডাক্তারকে ডাক" এই দুইটি বাক্যে অর্থের তারতম্য আছে। প্রথম বাক্যে যে কোনো ডাক্তারকে বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ একজন ডাক্তারকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

কর্মপদ ব্যক্তির নাম হইলে কে যোগ হয়। তাজমহল দেখিলেই শাজাহানকে মনে পড়ে।

অচেতন পদার্থ বা ক্ষুদ্র-প্রাণিবাচক শব্দে সাধারণতঃ কে যোগ হয় না। বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে এই সকল শব্দে একবচনে টা, টি, খানা, খানি

এবং বহুবচনে গুলি, গুলা প্রভৃতি যোগ করা হয়। বই পড়, বইটা পড়, বিড়াল ইঁদুর ধরে, বিড়াল ইঁদুরটাকে ধরিয়াছে, ভাতগুলি খাইয়া ফেল।

গৌণ কর্মে কে যোগ হয়। গুরু শিষ্যকে পড়াইতেছেন। মাতা শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছেন।

১১. গ. তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন

ব্যক্তি, বস্তু বা জন্তুবাচক শব্দের সহিত দ্বারা, সহিত, দিয়া, হইতে, কর্তৃক প্রভৃতির যোগ হয়। রামায়ণ কাব্য বাল্মীকি কর্তৃক রচিত। কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন কর। ছাত্রগণ কর্তৃক বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হইবে। লোক দিয়া কাজ করাও। সহিতের পূর্বে এবং অনেক স্থলে দ্বারার পূর্বে ষষ্ঠীর চিহ্ন বসে। প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। দেবতার অসাধ্য কাজও মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে।

ব্যক্তিবাচক শব্দে দিয়ার পূর্বে কে বসে। উকিলকে দিয়া চিঠি লিখাও। চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়াছি। কবিরাজকে দিয়া চিকিৎসা করাইব।

বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের পর এ, য, তে, য়ে প্রভৃতি যোগ হয়। হাতে গড়া, চোখে দেখা, পায়ে হাঁটা, ঘিয়ে ভাজা, টাকায় কি না হয়, কোন্ গাড়ীতে যাইবে?

১১. ঘ. চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন

দ্বিতীয়ার মত।

১১. ঙ. পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন

সাধারণতঃ হইতে, অপেক্ষা প্রভৃতি যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বৃক্ষ হইতে পতিত। যদু অপেক্ষা মধু অধিকতর বলবান্। ফুল হইতে ফল হয়। পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব অনেক।

চেয়ের পূর্বে এবং অনেক সময়ে অপেক্ষার পূর্বে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বসে। —বিদ্যার অপেক্ষা বুদ্ধির প্রয়োজন অধিক। ম্যালেরিয়ার চেয়ে কলেরা বেশী মারাত্মক।

১১. চ. ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন

ষষ্ঠী বিভক্তিতে র বা এর যোগ হয়।—পুষ্পের সৌরভ, দক্ষিণের বাতাস, চাঁদের আলো, পায়ের ধূলো, মাথার চুল, মাটির বাসন, কাজের লোক, দুঃখের সংসার, হাতের লক্ষ্মী, তিনের পাতা, একের নম্বর, মাস-ছয়েকের, ইংরাজদিগের, পাখীগুলির, মশাগুলার।

১১. ছ. সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন

সাধারণতঃ এ, য়, তে, য়ে যোগ হয়।—ঘরে আছি, মাথায় ব্যথা, বাড়ীতে লোকজন নাই, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, দুই চোখে জল, ফুলগুলিতে গন্ধ নাই, বনে বনে চন্দন নাই।

কখনও কখনও এতে বা য়েতে যোগ হয়।—সরিষার যেমন তেল আছে তেমনি তিলেতেও আছে, ঘিয়েতে ভাজা।

কালবাচক শব্দের পর কোথাও কোথাও বিভক্ত-চিহ্ন বসে না—আগামী কাল বাড়ী যাইবে। রবিবার স্কুল বন্ধ। আজ থাকিয়া যাও।

১২. বিভক্তির তালিকা

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	১. শব্দের মূল রূপ।	১. '-রা, এরা, -গুলা, -গুলি'।
	২. '-এ'। অ-কারান্ত এবং ও-কারান্ত শব্দের পরে ইহা 'য়'তে পরিণত হয়। যে অকারান্ত শব্দের শেষে অ উচ্চারিত হয় তাহার শেষেও এই 'এ'যতে পরিণত হয়।	২. 'সকল, সমূহ, -গণ, -বৃন্দ, -সমস্ত'।
	৩. '-তে'। ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের পর বসে।	৩. 'অনেক, বহু, সকল' প্রভৃতি বহুত্বসূচক বিশেষণ যোগ।
	৪. '-এতে'। ব্যঞ্জনান্ত অকারান্ত যাহার শেষে অ উচ্চারিত আকারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের পরে বসে।	৪. 'দুই, তিন' প্রভৃতি সংখ্যাবাচক বিশেষণযোগ।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	১. ব্যঞ্জনান্ত * শব্দের পর '-এর'। ২. স্বরান্ত শব্দের পর '-র'।	১. '-এদের, -দের, -দিগের -গুলির, -গুলার'। ২. '-সকলের, -সমূহের, -গণের, বৃন্দের' ইত্যাদি। ৩. শব্দের পূর্বে বহুত্ব বোধক বিশেষণ থাকিলে পরে শুধু '-এর, -র'।
দ্বিতীয়া	১. শব্দের মূল রূপ। ২. '-কে'। ৩. '-এর,-র'। 'রে, -এরে' সাধারণতঃ কবিতায়।	১. '-দিগকে, -দেরকে, -গুলাকে, -গুলিকে'। ২. '-সকলকে, -সমস্তকে, -গণকে' ইত্যাদি।
তৃতীয়া	১. '-এ' ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পর। ২. -'য়' স্বরান্ত শব্দের পর। ৩. '-এতে' ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পর। ৪. '-তে' স্বরান্ত শব্দের পর। ৫. 'দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, হইতে, হ'তে, যোগে।	১. দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠীর বহু-বচনে, যে সমস্ত পদ পাওয়া যায় তাহাদের সহিত 'দিয়া, দিয়ে, দ্বারা, কর্তৃক, হইতে হ'তে' যোগে।
চতুর্থী	১. দ্বিতীয়ার একবচনের বিভক্তি-চিহ্ন সমূহ। ২. 'এ, -য়, -য়ে'।	১. দ্বিতীয়ার বহুবচনের বিভক্তি-চিহ্ন সমূহ। ২. দ্বিতীয়ার বহুবচনের বিভক্তি-চিহ্নের সহিত '-এ, -য়, -তে, য়ে'।

* স্বরান্ত শব্দ হসন্ত উচ্চারিত হইলে '-এর' বসে। যেমন,—ফলের।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	১. বস্তুবাচক শব্দের মূলের সহিত এবং পুংলিঙ্গ বা স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত 'হইতে, হ'তে, থাকিয়া, থেকে, যোগে। ২. ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত 'কাছ হইতে, নিকট হ'তে, কাছ থেকে' প্রভৃতি যোগে। ৩. তুলনায় ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত 'অপেক্ষা, চেয়ে' যোগে।	(১) ষষ্ঠ্যন্ত বহুবচন পদের সহিত পঞ্চমীর একবচনে যে সমস্ত প্রত্যয় এবং অনু-সর্গের উল্লেখ হইয়াছে তাহাদের যোগে।
সপ্তমী	১. "-এ, ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে। ২. '-য়' স্বরান্ত শব্দের পরে। ৩. '-এতে' ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে। ৪. 'তে' স্বরান্ত শব্দের পরে।	(১) '-দিগে, -দিগেতে' যোগে। (২) '-গণে, -সকলে, -বৃন্দে' ইত্যাদি যোগে।

দিয়ে, চেয়ে, চাইতে, হ'তে থেকে প্রভৃতি অনুসর্গগুলি সাধারণতঃ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—শাঁখারীর করাত দুদিক দিয়ে কাটে। সাধু ভাষায় লিখিলে হইত,—শাঁখারীর করাত দুই দিক দিয়া কাটে।

১৩. বিশেষণ

যে পদ অন্য কোনো পদের গুণ, ভাব, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝায় তাহার নাম বিশেষণ।—সুবোধ বালক, শীতল জল, তরুণ বয়স, শত বৎসর, পঞ্চমী তিথি।

১৩. ক. নাম বিশেষণ

বিশেষণ পদের শ্রেণীভেদ আছে। যাহা কেবল বিশেষ্য পদের গুণ প্রভৃতি নির্দেশ করে তাহার নাম নাম-বিশেষণ। বিশেষণ বলিলে সাধারণতঃ নাম

বিশেষণকেই বুঝান হয়। উপরে উদ্ধৃত বিশেষণগুলি নাম-বিশেষণেরই উদাহরণ। সর্বনাম পদের বিশেষণও নাম-বিশেষণের অন্তর্গত।

১৩. খ. সংখ্যাবাচক ও পরিমাণবাচক বিশেষণ

যে বিশেষণ অন্য শব্দের সংখ্যা বা পরিমাণ প্রকাশ করে, তাহাকে সংখ্যা-বাচক বা পরিমাণবাচক বিশেষণ বলা হয়।—দুই পক্ষ, চারি বেদ, ছয় ঋতু, সপ্ত সমুদ্র, অনেক লোক, কয়েক দিন।

১৩. গ. ক্রমবাচক বিশেষণ

যে বিশেষণ অন্য শব্দের ক্রম প্রকাশ করে, তাহার নাম ক্রমবাচক বিশেষণ। —প্রথম ভাগ, সপ্তম শ্রেণী, অষ্টম অধ্যায়।

১৩. ঘ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশেষণ

বিশেষণ পদ সাধারণতঃ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে বসে। এই বিশেষণকে উদ্দেশ্য বিশেষণ বলা হয়।—অনন্ত আকাশ, অতল সমুদ্র।

বিশেষণ পদ যখন বিশেষ্যের পরে বসে তখন তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলা হয়।—আকাশ অনন্ত, সমুদ্র অতল।

১৩. ঙ. ক্রিয়া বিশেষণ

ক্রিয়ার কাজ যে পদের দ্বারা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়, তাহাই ক্রিয়াবিশেষণ। কখনো মিথ্যা কথা বলিও না, সদা সত্য কথা কহিবে। আস্তে আস্তে চল, কোথায় যাইতেছে?

১৩. চ. বিশেষণের বিশেষণ

যে পদ নাম-বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ বলা হয়। যেমন,—এত মিষ্ট গান। এমন সুন্দর মুখ। ভগবান পরম দয়ালু। এত জোরে হাঁটিতে পারিব না। অতি সত্বর এস্থান পরিত্যাগ কর।

১৩. ছ. বিশেষণ পদের লিঙ্গ ও বচন

বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ এবং যে বচন বিশেষণ পদেরও সেই লিঙ্গ এবং সেই বচন। লিঙ্গ ও বচন ভেদে বিশেষ্যের যেরূপ আকার পরিবর্তিত হয় বিশেষণের সাধারণতঃ সেরূপ হয় না। যেমন,—সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে, সুন্দর দৃশ্য। জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাহার বুদ্ধি খুব প্রখর।

সংস্কৃতের অনুসরণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ হয়।

তামসী নিশি। ভিখারিণী মেয়ে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি।

অনুশীলনী

১। বিশেষণ পদ কাহাকে বলে? উদ্দেশ্য বিশেষণ এবং বিধেয় বিশেষণ উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। ক্রিয়া-বিশেষণ কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের অন্তর্গত শূন্যস্থানগুলিতে যথাযোগ্য ক্রিয়া-বিশেষণ বসাও:

—কাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া—মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়া কেহ—ফিরিত না। সেকালে অনেক রমণী—মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিতেন।

৩। বাঙ্গলায় বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ হয় কি? যদি হয় তো কোন্ কোন্ স্থানে হয়—উদাহরণ দিয়া দেখাও।

১৪. ক্রিয়া

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য্য সূচিত হয় তাহাকে ক্রিয়াপদ কহে।

চাঁদ উঠিয়াছে। ফুলটি ছিঁড়িও না। বাঙ্গালী ভাত খায়। নদী বহিতেছে। কাল আসিবে।

উল্লিখিত বাক্যগুলিতে—উঠিয়াছে, ছিঁড়িও, খায়, বহিতেছে, আসিবে—এগুলি ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়ার মূলরূপকে ধাতু বলা হয়। উঠিয়াছে, ছিঁড়িও, খায়, বহিতেছে, আসিবে—এই ক্রিয়াপদগুলির মূলরূপ হইল—উঠ্, ছিড়, খা, বহ্, আস্; সুতরাং এগুলি যথাক্রমে উল্লিখিত ক্রিয়াপদগুলির ধাতু। শব্দের সহিত বিভক্তির যোগে যেমন পদ নিষ্পন্ন হয়, ধাতুর সহিত বিভক্তির যোগে তেমনি ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়।

১৪. ক. সকর্মক ক্রিয়া

ক্রিয়াপদকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—সকর্মক ও অকর্মক।

যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। কাঠ কাটি, তেল মাখ, হাত ধুইবে—এই তিনটি বাক্যে—কাটি, মাখ, ও ধুইবে, এই তিনটি ক্রিয়া সকর্মক। কাঠ, তেল এবং হাত এই তিনটি পদ যথাক্রমে উহাদের কর্ম।

১৪. খ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া

কোনো কোনো ক্রিয়াপদ আবার দুইটি কর্ম গ্রহণ করে। ইহাদিগকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। এই বাক্যে দাও ক্রিয়ার দুই কর্ম—ভিক্ষুককে ও ভিক্ষা। সুতরাং দাও ক্রিয়া দ্বিকর্মক।

১৪. গ. মুখ্য কর্ম ও গৌণ-কর্ম

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্মের মধ্যে যেটি প্রধান সেটির নাম মুখ্যকর্ম, যেটি অপ্রধান সেটির নাম গৌণকর্ম। উল্লিখিত বাক্যে ভিক্ষা মুখ্য এবং ভিক্ষুককে গৌণ কর্ম।

সম ধাতুজ কর্ম

ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে সেই কর্মকে সম ধাতুজ কর্ম বলে। যথা 'মরিব বীরের মৃত্যু সমরে ভাসিয়া'।

১৪. ঘ. অকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়াপদ কেবল কর্তাকে অবলম্বন করিয়াই ভাব প্রকাশ করে, কোনো কর্মের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, তাহার নাম অকর্মক ক্রিয়া। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, দিনে ঘুমাইও না, শিশুরা কাঁদে। এই তিনটি উদাহরণে—উঠিয়াছে, ঘুমাইও এবং কাঁদে—এই তিনটি অকর্মক ক্রিয়া।

১৪. ঙ. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়াকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় তাহা সমাপিকা ক্রিয়া। পাখী গান গায়, ফুল ফুটিয়াছে, সে হাসিতেছে—এই তিনটি বাক্যে—গায়, ফুটিয়াছে এবং হাসিতেছে, এই তিনটি ক্রিয়ার দ্বারা তিনটি বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উহারা সমাপিকা ক্রিয়া।

যে ক্রিয়াপদে বাক্যের সমাপ্তি হয় না, সমাপ্তির জন্য অন্য একটি ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়, তাহাই অসমাপিকা ক্রিয়া। সূর্য্য উঠিলে অন্ধকার থাকিবে না, কাল আসিয়া দেখিয়া যাইও। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে—উঠিলে, আসিয়া এবং দেখিয়া, এই তিনটি ক্রিয়া অসমাপিকা। শুদ্ধমাত্র ইহাদের দ্বারা বাক্যের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হইতেছে না, পরে সমাপিকা ক্রিয়া আছে বলিয়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

১৪. চ. ধাতুর গণ

রূপভেদ অনুসারে বাঙ্গলা ধাতুসমূহকে কুড়িটি গণে বিভক্ত করা যায়।

১. হ্-আদি গণ (হওয়া)
২. খা-আদি গণ (খাওয়া)
৩. দি-আদি গণ (দেওয়া)
৪. শু-আদি গণ (শোওয়া)
৫. কর্-আদি গণ (করা)
৬. কহ্-আদি গণ (কহা)
৭. কাট্-আদি গণ (কাটা)
৮. গাহ্-আদি গণ (গাওয়া)
৯. লিখ্-আদি গণ (লিখা)
১০. উঠ-আদি গণ (উঠা)
১১. লাফা-আদি গণ (লাফান)
১২. নাহা-আদি গণ (নাওয়া)
সাধুরূপ 'লাফা' ধাতুর অনুরূপ, চলিত রূপে পার্থক্য আছে।
১৩. ফিরা-আদি গণ (ফিরান)
১৪. ঘুরা-আদি গণ (ঘুরান)
১৫. ধোয়া-আদি গণ (ধোয়ান) " "
১৬. দৌড-আদি গণ (দৌড়ান) " "
১৭. চট্কা-আদি গণ (চট্কান) " "
১৮. বিগ্ড়া-আদি গণ (বিগ্ড়ান) " "
১৯ উল্টা আদি গণ (উল্টান) " "
২০. ছোব্লা-আদি গণ (ছোবলান) " "

ক্রিয়ার কাল ভেদ

ক্রিয়ার সময়কে কাল বলা হয়। এই কাল প্রধানতঃ তিন প্রকার—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ। এই তিন কালের আবার কয়েকটি বিভাগ আছে। বর্তমানের চার বিভাগ :—১. সাধারণ ২. ঘটমান ৩. পুরাঘটিত ৪. অনুজ্ঞা। অতীতেরও চার বিভাগ :—১. সাধারণ ২. নিত্যবৃত্ত ৩. ঘটমান ৪ পুরাঘটিত। ভবিষ্যতের দুই বিভাগ :—১. সাধারণ ২. অনুজ্ঞা।

কাল এবং পুরুষভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের বচনভেদ নাই। সাধু ভাষার ক্রিয়ার একপ্রকার রূপ, চলিত ভাষায়

ক্রিয়াবিভক্তি

সাধুরূপ

	পুরুষ	প্রথম	প্রথম ও মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	উত্তম
		সামান্য	গুরু	সামান্য	তুচ্ছ	
বর্ত্তমান	সাধারণ	এ	এন	অ	ইস	ই
	ঘটমান	ইতেছে	ইতেছেন	ইতেছ	ইতেছিস	ইতেছি
	পুরাঘটিত	ইয়াছে	ইয়াছেন	ইয়াছ	ইয়াছিস	ইয়াছি
	অনুজ্ঞা	উক	উন	অ	১	২
অতীত	সাধারণ	ইল	ইলেন	ইলে	ইলি	ইলাম
	নিত্যবৃত্ত	ইত	ইতেন	ইতে	ইতিস	ইতাম
	ঘটমান	ইতেছিল	ইতেছিলেন	ইতেছিলে	ইতেছিলি	ইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন	ইয়াছিলে	ইয়াছিলি	ইয়াছিলাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	ইবে	ইবেন	ইবে	ইবি	ইব
	অনুজ্ঞা	ইবে	ইবেন	ইও	ইস	২

১ ২ বিভক্তি যোগ হয় না। ২. উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা নাই।

ক্রিয়াবিভক্তি

চলিত রূপ

	পুরুষ	প্রথম সামান্য	প্রথম ও মধ্যম গুরু	মধ্যম সামান্য	মধ্যম তুচ্ছ	উত্তম
বর্তমান	সাধাবণ	এ	এন	অ	ইস	ই
	ঘটমান	ছে	ছেন	ছ	ছিস	ছি
	পুবাঘটিত	এছে	এছেন	এছ	এছিস	এছি
	অনুজ্ঞা	উক	উন	১	অ	২
অতীত	সাধাবণ	ল, লে	লেন	লে	লি	লাম
	নিত্যবৃত্ত	ত	তেন	তে	তিস	তাম
	ঘটমান	ছিল	ছিলেন	ছিলে	ছিলি	ছিলাম
	পুবাঘটিত	এছিল	এছিলেন	এছিলে	এছিলি	এছিলাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	বে	বেন	বে	বি	ব
	অনুজ্ঞা	বে	বেন	ও	ইস	২

১ বিভক্তি যোগ হয় না।

২ উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা নাই।

অনুশীলনী

১। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া কাহাকে বলে তাহা কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। চল্ (চলা), খা (খাওয়া) (খাওয়ান), বুন্ (বুনা) শু (শোওয়া), কিন্ (কেনা), দৌড়্ (দৌড়ান)—ভিন্ন ভিন্ন পুরুষে উল্লিখিত ধাতুগুলির কি কি রূপ হইবে তাহা দেখাও।

৪। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে যেগুলি চলিতরূপ সেগুলিকে সাধুতে এবং যেগুলি সাধুরূপ সেগুলিকে চলিত রূপে রূপান্তরিত কর :—

পাইল, খাচ্ছে, আসিতেছে, এল, বসিব, লইও, দিয়াছেন, ছুঁইতেছিল, ঠেলিয়া, ভরিবে, বহিয়া, গাহিতেছে, পিষিতেছিল, লিখিল, খুঁজিতেছি, ডুবিয়াছে, পাঠাইব, শাসাইলেন, তিষ্ঠাইবে, সাঁতরাইতেছে।

১৫. বাচ্য

বাচ্য চারি প্রকার :—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

১৫. ক. কর্তৃবাচ্য

যে স্থলে কর্তৃপদ ক্রিয়ার সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, তাহাকে কর্তৃবাচ্য বলে। কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা হয়।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। বায়ু বহিতেছে। দিন কাটিয়া গেল। উল্লিখিত বাক্যসমূহে চাঁদ, বায়ু এবং দিন কর্তা।

কর্তৃবাচ্যের বাক্যে ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্মে দ্বিতীয়া হয়।

আমি গান শুনি। উপন্যাস পড়। এই দুইটি বাক্যে গান এবং উপন্যাস শব্দ কর্ম, উহাদের দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

১৫. খ. কর্মবাচ্য

যে স্থলে কর্মপদটিই প্রধানভাবে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় সেস্থলে ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয়। কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্মে প্রথমা এবং কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

আমার দ্বারা গান শ্রুত হয়। তোমার দ্বারা উপন্যাস পঠিত হয়। এই দুইটি বাক্যের কর্ম গান ও উপন্যাসে প্রথমা এবং আমার দ্বারা ও তোমার দ্বারা-য় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

কর্তৃবাচ্যে দ্বিকর্মক ক্রিয়া থাকিলে কর্মবাচ্যে গৌণ কর্মকে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা পড়াই—ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা পড়ান হয়।

১৫. গ ভাববাচ্য

যে স্থলে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না এবং কর্তাও ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না, সেস্থলে ক্রিয়ার ভাববাচ্য হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে কর্তায় সাধারণতঃ ষষ্ঠী কোনো কোনো স্থলে দ্বিতীয়াও হইয়া থাকে।

তোমার কবে আসা হইল? আমায় কাল যাইতে হইবে। এই দুইটি উদাহরণের প্রথমটিতে কর্তায় ষষ্ঠী এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

১৫. ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য

যে স্থলে কর্মই কর্তার স্থান অধিকার করে, অথচ ক্রিয়াপদে কর্তৃবাচ্যের রূপ থাকে সেখানে কর্মকর্তৃবাচ্য হয়।

মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। শীত পায়। কাজটা দেখায় খারাপ। কথাটা শোনায় ভাল।

১৫. ঙ. বাচ্যপরিবর্তন

বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। (কর্তৃ)
বিষম সঙ্কটে পড়া গেল। (ভাব)

আমি বিশুদ্ধ ফলমূল আনিয়াছি। (কর্তৃ)
আমার দ্বারা বিশুদ্ধ ফলমূল আনীত হইয়াছে। (কর্ম)

মহাশয় কি কাজ করেন? (কর্তৃ)
মহাশয়ের কি কাজ করা হয়? (কর্ম)

কয়েকদিন থাকা হইবে তো? (ভাব)
কয়েকদিন থাকিবেন (থাকিবে) তো? (কর্তৃ)

রাজা শূদ্রক শুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শুনিলেন। (কর্তৃ)
রাজা শূদ্রকের দ্বারা শুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রুত হইল। (কর্ম)

আপনাদের এ কথা অবশ্যই জানা আছে। (কর্ম)
আপনারা একথা অবশ্যই জানেন। (কর্তৃ)

একথা আমাকে বলিতেই হইবে। (কর্ম)
একথা আমি বলিবই। (কর্তৃ)

অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। (কর্ম)
অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। (কর্তৃ)

কেবল আনন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্য রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের প্রথম দেখা গেল। (কর্ম)
কেবল……প্রথম দেখিলাম। (কর্তৃ)

ধরিয়া লওয়া গেল যে তুমি সাধু। (কর্তৃ)
ধরিয়া লইলাম যে তুমি সাধু। (কর্ম)

কোথা হইতে আসা হইল? (ভাব)
কোথা হইতে আসিলেন (আসিলে)? (কর্তৃ)

তুমি বুঝি কিছু খাও নাই? (কর্তৃ)
তোমার বুঝি কিছু খাওয়া হয় নাই? (কর্ম)

আমা হতে এ কাজ হইবে না। (কর্ম)
আমি এ কাজ পারিব না। (কর্তৃ)

আমার ভাত খাওয়া হইয়াছে। (কর্ম)
আমি ভাত খাইয়াছি। (কর্তৃ)

খাতাটি তাহাকে দাও। (কর্তৃ)
খাতাটি তাহাকে দেওয়া হোক। (কর্ম)

আপনি কখন খাইবেন? (কর্তৃ)
আপনার কখন খাওয়া হইবে? (কর্ম)

ডাক্তার ডাক। (কর্তৃ)
ডাক্তারকে ডাকা হোক। (কর্ম)

হরি রামকে প্রহার করিল। (কর্তৃ)
রাম কর্তৃক হরি প্রহৃত হইল। (কর্ম)

কোথায় যাইবে ? (কর্তৃ)

কোথায় যাওয়া হইবে ? (ভাব)

আমাকে হাঁটিতে হইবে। (ভাব)

আমি হাঁটিব। (কর্তৃ)

দিনে ঘুমাইতে নাই। (ভাব)

দিনে কেহ যেন না ঘুমায়। (কর্তৃ)

কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। (কর্তৃ)

কাগজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। (কর্মকর্তৃবাচ্য)

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বাচ্যান্তরিত কর :—

অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব হইল। দস্যুগণ তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন অপহরণ করিল। নির্জনে স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শ্রবণ করিলাম। স্বয়ং লক্ষ্মী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি বাজারে যাইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবে কি ? ট্রেন আসিতে বিলম্ব নাই। উহা আমি লইতে রাজী নাই। সত্য কথা বলিও। জেলে যাইতে ভয় পাইতেছ ? নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইব। দেশ স্বাধীন হইযাছে।

২। ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচ্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

(৩) কর্মকর্তৃবাচ্যের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

১৬. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি

উক্তিভেদে বাক্য সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ বা সরল উক্তি, এবং পরোক্ষ বা বক্রোক্তি।

বক্তার কথা যদি অবিকল উদ্ধৃত হয় তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা,—

হরিহর কহিল,—"আমার অবস্থাটা একবার শুনুন।" এস্থলে উদ্ধারচিহ্নের মধ্যগত বাক্যটি অপরোক্ষ উক্তি।

বক্তার বাক্যের ভাব যদি অন্য কেহ নিজের কথায় প্রকাশ করে, তাহা হইলে উহাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা,—

হরিহর (সন্ন্যাসীকে) তাহার অবস্থাটা শুনিতে অনুরোধ করিল।

১৬. ক. উক্তি-পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
ভরত কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "যখন অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।" —দীনেশচন্দ্র সেন	ভরত কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে, যখন অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইবে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না।
তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন,—"আমি অমুক স্থানের নবাবের পুত্র, আপনার কন্যার রূপগুণের কথা শুনিয়াছি; তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।" নবাব বলিলেন,—"সাচ্চা ফকীর না হইল আমার কন্যা দিব না।" —শিবনাথ শাস্ত্রী	তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন যে, তিনি অমুক স্থানের নবাবের পুত্র, তাঁহার কন্যার রূপগুণের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহার (কন্যার) পাণিগ্রহণ-প্রার্থী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। নবাব উত্তরে বলিলেন যে, সাচ্চা ফকীর না হইলে তাঁহার কন্যা দিবেন না।
ঈশ্বর বললে,—"ছেলেবেলায় এরা সব খেলা শিখত, আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা!" —প্রমথ চৌধুরী	ঈশ্বর বললে, যে, ছেলেবেলাও ওরা সব খেলা শিখত, সেও খেলার লোভে ওদের দলে জুটে গিয়েছিল। তার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লড়কি, কি সড়কিতে সেই হয়ে উঠল সকলের সেরা।
শীলভদ্র বলিলেন,—"আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি তখন অর্থ লইয়া কি করি!" —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শীলভদ্র বলিলেন, তিনি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছেন তখন অর্থ লইয়া কি করিবেন!
বিশ্বামিত্র বলিলেন,—"আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন, আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।" —অরবিন্দ ঘোষ	বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি (বিশ্বামিত্র) উহা মস্তকে ধারণ করিবেন।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
বেণী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—"সেই কথা বলতেই তো বলছি আকবর, কার লাঠিতে তুই জখম হলি।" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বেণী ক্রুদ্ধ হইয়া আকবরকে কহিল যে সে কাহার লাঠিতে জখম হইল, সে তো তাহাকে সেই কথাই বলিতে বলিতেছে।
সীতা কহিলেন,—"লক্ষ্মণ, কাহার দোষ দিব? সমস্ত আমারই অদৃষ্টের দোষ।" —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার	সীতা লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে কাহাকেও দোষ দিবার নাই, সমস্ত তাঁহারই অদৃষ্টের দোষ।
অতএব বলিলাম,—"সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন।" —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অতএব বলিলাম যে সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন।"

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উক্তি পরিবর্তন কর :—

১. আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম,—মিছু যদি গুলিখোর হয়, তো এমন পাকা লেঠেল হ'ল কি ক'রে?"

২. সীমার বলিল,—"ওহে আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার বক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব।"

৩. সন্ন্যাসী বলিলেন,—"একি মৃত্যুঞ্জয় যে, তোমার এ মতি হইল কেন?"

৪. নানকের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি লাভ করিলে?" পুত্র উত্তর দিলেন,—"বাবা, আমি ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিয়াছি। তোমার এমন লাভ হইয়াছে যাহা চিরদিন থাকিবে।"

৫. বিদ্যারসাগর বলিলেন যে বরং তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিতে রাজি আছেন, তবু অন্যায়ের প্রশ্রয় তিনি কখনও দিবেন না।

৬. রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেব কর্ম দিতে প্রতিশ্রুতি হইলে রামমোহন তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করেন যে, যখন তিনি (রামমোহন) কার্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে; এবং সামান্য আমলাদিগের মত তাঁহার প্রতি তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ব্যবহার করিবেন না।

৭. বাম আসিয়া কহিল,—"সুমিতার জন্ম ভাবিও না দিদি, উহাব সমস্ত ভার আজ হইতে আমিই লইব—আমাব এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।"

৮. জ্ঞানেন্দ্র সবিনয়ে বলিল,—"না, না, ওকথা বলবেন না, আমি আব এমন কি উপকার করলাম, এতো আমাব কর্তব্য মাত্র।"

৯. শৈল চীৎকার কবিয়া উঠিল "সে কখনও হবে না, ববং জেলে যাবে সেও ভালো, তবু ও জমিব ভাগ আমি বমেশকে দিতে পাবব না।"

১০. সে যখন কলিকাতা যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল তখন আমি তাহাকে এই বলিয়া সাবধান কবিয়া দিলাম যে কলিকাতা শহব জাযগা খুব ভাল নয়, খুব সাবধানে থাকিতে হইবে, নইলে পদে পদে ঠকিবার সম্ভাবনা।

১৭. পদ-পরিচয়

বাক্যেব অন্তর্গত সকল পদেব পবিচয় এবং তাহাদের পাবস্পাবিক সম্বন্ধ নির্ণযের নামই পদ-পবিচয।

বিশেষ্য পদের পরিচয়

কোন্ জাতীয় বিশেষ্য, কোন্ লিঙ্গ, কি বচন, কোন্ পুরুষ, কোন্ কাবক, এবং ক্রিযাব সহিত কি সম্বন্ধ তাহা উল্লেখ কবিতে হইবে।

সর্বনাম পদের পরিচয়

কোন্ শব্দেব পবিবর্তে বসিয়াছে কোন্ লিঙ্গ, কি বচন, কোন্ পুরুষ, কোন্ কাবক, এবং ক্রিয়াব সহিত কি সম্বন্ধ তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনামেব পবিচয় বিশেষণ পদেব ন্যায়।

বিশেষণ পদের পরিচয়

কোন্ শব্দেব বিশেষণ এবং কোন্ শ্রেণীর বিশেষণ? বিশেষণ যদি বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে বিশেষ্যের ন্যায় পদ-পবিচয দিতে হইবে। নাম-বিশেষণ হইলে যে শব্দেব বিশেষণ তাহার যে. লিঙ্গ ঐ বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ।

ক্রিয়া পদের পরিচয়

অকর্মক না সকর্মক, সকর্মক হইলে কর্মের উল্লেখ কব। দ্বিকর্মক হইলে মুখ্য ও গৌণ দুইটি কর্মের উল্লেখ কর। সমাপিকা না অসমাপিকা? কোন্ বাচ্য? কি কাল? কোন পুরুষ? কি বচন? কোন পদের সহিত কি সম্বন্ধ।

অব্যয়ের পরিচয়

কোন্ শ্রেণীর অব্যয়, অন্য শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে কিনা? থাকিলে কি সম্বন্ধ।

"তোমরা ঐ মণিমুক্তার মোহন মালা দূরে রাখ।"

তোমরা—সর্বনাম পদ, মনুষ্য-সাধারণের পরিবর্তে বসিয়াছে, উভয় লিঙ্গ, বহুবচন, মধ্যমপুরুষ (সামান্য), কর্তৃকারক, 'রাখ' এই সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা।

ঐ—সর্বনাম, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, 'মালা' এই বিশেষ্য পদটির বিশেষণ।

মণিমুক্তার—বিশেষ্যপদ, স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন, প্রথম পুরুষ, ষষ্ঠীর একবচন (রূপে একবচন হইলেও অর্থে বহুবচন) 'মালা'র সহিত সম্বন্ধ।

মোহন—বিশেষণ, 'মালা'র গুণ প্রকাশ করিতেছে।

মালা—বিশেষ্যপদ, বস্তুবাচক, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, প্রথম পুরুষ, কর্মকারক, 'রাখ' ক্রিয়ার কর্ম।

দূরে—ক্রিয়াবিশেষণ পদ, 'রাখ' ক্রিয়ার বিশেষণ, স্থানবাচক।

রাখ—ক্রিয়াপদ, সকর্মক, কর্ম—মালা, বর্তমান অনুজ্ঞা, কর্তা—তোমরা।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত প্রত্যেক পদের পরিচয় দাও:—

ক. রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন গন্ধর্বসেনের পুত্র।

খ. ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, ভূ-পৃষ্ঠের স্তর ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভূমিকম্প হয়।

গ. পণ্ডিতেরা সকলে মিলিয়া এক গণ্ডমূর্খের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

২। ক্রিয়া-বিশেষণ পদের পরিচয় দিতে হইলে কি কি উল্লেখ করিতে হয়?

১৮. সন্ধি

দুইটি শব্দের দ্রুত উচ্চারণের ফলে অনেক সময় প্রথম শব্দের শেষ বর্ণের সহিত পরবর্তী শব্দের আদি বর্ণ মিলিত হয়। এই মিলনের নাম সন্ধি। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে "স্বরসন্ধি" বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাহাকে "ব্যঞ্জনসন্ধি" বলা হয়। বিসর্গসন্ধিও ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত।

সন্ধিদ্বারা শব্দসংযোগ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাংলায় প্রচলিত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দেরই সাধারণতঃ সন্ধি হয়। তাহাও আবার সর্বত্র নয়।

১৮. ক. স্বরসন্ধি

১. অ আ+অ আ=আ

মৃগ+অঙ্ক=মৃগাঙ্ক — হিম+আলয়=হিমালয়
ভিক্ষা+অন্ন=ভিক্ষান্ন — বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়।

২. ই ঈ+ই ঈ=ঈ

ক্ষিতি+ইন্দ্র=ক্ষিতীন্দ্র — মুনি+ঈশ্বর=মুনীশ্বর
সতী+ইন্দ্র=সতীন্দ্র — শ্রী+ঈশ=শ্রীশ।

৩. উ ঊ+উ ঊ=ঊ

কটু+উক্তি=কটূক্তি — লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি।

৪. অ আ+ই ঈ=এ

নব+ইন্দ্র=নবেন্দ্র — দেব+ঈশ=দেবেশ
মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র — রমা+ঈশ=রমেশ।

৫. অ আ+উ ঊ=ও

চন্দ্র+উদয়=চন্দ্রোদয় — এক+ঊন=একোন
যথা+উচিত=যথোচিত — মহা+ঊর্মি=মহোর্মি।

৬. অ আ+ঋ=অর্

দেব+ঋষি=দেবর্ষি — মহা+ঋষি=মহর্ষি।

৭. অ আ+এ ঐ=ঐ

জন+এক=জনৈক — তথা+এব=তথৈব
মত+ঐক্য=মতৈক্য — মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য।

৮. অ আ+ও ঔ=ঔ

বন+ওষধি=বনৌষধি — মহা+ওষধি=মহৌষধি
পরম+ঔদার্য=পরমৌদার্য — মহা+ঔষধ=মহৌষধ।

৯. ই ঈ+ই ঈ ভিন্ন স্বর=য (ই, ঈ স্থানে)+পরবর্তী স্বর

আদি+অন্ত=আদ্যন্ত — অতি+আচার=অত্যাচার
নদী+অম্বু=নদ্যম্বু — প্রতি+উত্তর=প্রত্যুত্তর।

১০. উ ঊ+উ ঊ ভিন্ন স্বর=ব্ (উ ঊ স্থানে)+পরবর্ত্তী স্বর

মনু+অন্তর=মন্বন্তর অনু+ইত=অন্বিত

সু+আগত=স্বাগত অনু+এষণ=অন্বেষণ।

১১. ঋ+ঋ ভিন্ন স্বর=র্ (ঋ স্থানে) পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়

১২. এ+স্বরবর্ণ=অয্ (এ স্থানে) শে+অন=শয়ন

১৩. ঐ+স্বরবর্ণ=আয়্ (ঐ স্থানে) নৈ+অক=নায়ক

১৪. ও+স্বরবর্ণ=অব্ (ও স্থানে) ভো+অন—ভবন

১৫. ঔ+স্বরবর্ণ=আব (ঔ স্থানে) নৌ+ইক=নাবিক

১৮. ক সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম

বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ, স্ব+ঈর=স্বৈর, অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী, প্র+ঊঢ=প্রৌঢ, গো+অক্ষ=গবাক্ষ, কুল+অটা=কুলটা, সীমন্+অন্ত =সীমন্ত, শার+অঙ্গ=শারঙ্গ।

১৮. খ ব্যঞ্জনসন্ধি

১. বর্গের প্রথম বর্ণ+স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ ও য র ল ব হ= বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ।

দিক্+গজ=দিগ্‌গজ, জগৎ+বন্ধু=জগদ্বন্ধু, 'বাক্+বৈদগ্ধ্য=বাগ্-বৈদগ্ধ্য, জগৎ+ঈশ=জগদীশ, ষট্+আনন=ষডানন। 'ত' বর্ণের পর জ ঝ ড ঢ ল হ থাকিলে হয় না। (পরে দেখ)

২. বর্গের প্রথম বর্ণ+বর্গের পঞ্চম বর্ণ=বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ।

দিক+নাগ=দিঙ্‌নাগ, চিৎ+ময়=চিন্ময়, জগৎ+নাথ=জগন্নাথ।

৩. চ্ জ্+ন্=ন্ স্থানে ঞ।

যাচ্+না=যাচ্ঞা বাজ্+নী=বাজ্ঞী।

৪. ত্ দ্+চ্ ছ্ জ্ ঝ্=ত বা দ স্থানে যথাক্রমে চ চ্, জ্ জ্।

উৎ+চারণ=উচ্চারণ সৎ+জন=সজ্জন

কুৎ+ঝটিকা=কুজ্‌ঝটিকা উৎ+ছেদ=উচ্ছেদ।

৫. ত্ দ+ট্ ঠ্ ড্ ঢ্=ত্ বা দ্ স্থানে যথাক্রমে ট্ ট্ ড্ ড

উৎ+ডীন=উড্ডীন বৃহৎ+ঢক্কা=বৃহড্‌ঢক্কা।

৬. ত্ দ্+ল্=ত্ বা দ্ স্থানে ল্।

উৎ+লেখ=উল্লেখ উৎ+লাস=উল্লাস।

৭. ত্ দ্+শ্=ত্ বা দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্।
উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি।

৮. ত্ দ্+হ্=ত্ বা দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ।
উৎ+হার=উদ্ধার, উৎ+হত=উদ্ধত, জগৎ+হিত=জগদ্ধিত।

৯. ন্+শ্ ষ্ স্ হ্=ন্ স্থানে ং।
হিন্+সা=হিংসা, সিন্+হ=সিংহ, প্রশন্+সা=প্রশংসা।

১০. ম্+বর্গীয় বর্ণ=ম্ স্থানে ং অথবা বর্গের পঞ্চম বর্ণ।
সম্+কীর্ণ=সংকীর্ণ অহম্+কার=অহংকার, অহঙ্কার।

১১. ম্+য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্=ম্ স্থানে ং।
সম্+বাদ=সংবাদ, কিম্+বদন্তী=কিংবদন্তী, সম্+সার=সংসার।

১২. ষ্+ত্ থ্=ত্ থ্ স্থানে যথাক্রমে ট্ ঠ।
হৃষ্+ত=হৃষ্ট, কৃষ্+ত=কৃষ্ট।

১৩. উৎ+স্থান=উত্থান, উৎ+স্থিত=উত্থিত।

১৪. স্বরবর্ণ+ছ্=ছ্ স্থানে চ্ছ্ তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া।

১৫. অঃ+অ=ও ততঃ+অধিক=ততোধিক।

১৬. অঃ+অ ভিন্ন স্বর=অঃ স্থানে অ অত+এব=অতএব।

১৭. অঃ+বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্=অঃ স্থানে ও।
অধঃ+গমন=অধোগমন মনঃ+মোহন=মনোমোহন।
শিরঃ+ধার্য=শিরোধার্য মনঃ+হর=মনোহর।

১৮. অকারের পরবর্তী র জাত বিসর্গ+স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং য্ ল্ ব্ হ্=ঃ স্থানে অর্।
প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ পুনঃ+আগত=পুনরাগত
পুনঃ+বার=পুনর্বার অন্তঃ+ধান=অন্তর্ধান।

১৯. অঃ আঃ+ক্ খ্ প্ ফ্=ঃ স্থানে স।
পুরঃ+কার=পুরস্কার, বাচঃ+পতি=বাচস্পতি, তিরঃ+কৃত=তিরস্কৃত
যশঃ+কর=যশস্কর। ব্যতিক্রম—প্রাতঃকাল, অন্তঃকরণ।

২০. ইঃ উঃ+স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং য্ ল্ ব্ হ্ =বিসর্গ স্থানে র্।
নিঃ+নয়=নির্ণয়, নিঃ+আকার= বাকার, দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা
দুঃ+লভ=দুর্লভ, মুহুঃ+মুহুঃ=মুহুর্মুহুঃ।

২১. ইঃ উঃ + ক্ খ্ প্ ফ্ = ঃ স্থানে ষ্।

নিঃ + কাম = নিষ্কাম, নিঃ + ফল = নিষ্ফল, দুঃ + কুল = দুষ্কুল।

২২. ঃ + চ্ ছ = ঃ স্থানে শ্।

নিঃ + চল = নিশ্চল, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ নিঃ + চিত = নিশ্চিত।

২৩. ঃ + ট্ ঠ্ = ঃ স্থানে ষ্।

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার।

২৪. ঃ + ত্ থ্ + ঃ স্থানে স্ ইতঃ + ততঃ—ইতস্ততঃ।

২৫. ঃ + র্ = বিসর্গ লোপ, বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।

নিঃ + রব = নীরব চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ।

২৬. ঃ + স্থ = বিকল্পে বিসর্গ লোপ দুঃ + স্থ = দুঃস্থ, দুস্থ।

১৮. খ. ১. সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি, বন + পতি = বনস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, মনস্ + ঈষা = মনীষা, এক + দশ = একাদশ, বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র, হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র।

খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের অথবা বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি সাধারণতঃ হয় না।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কর :—

অনুমতি + অনুসারে, জাতি + অভিমান, যদি + অপি, জীবৎ + দশা, তৎ + জন্য, নিঃ + রন্ধ্র, নভঃ + তল, পূর্ণ + ছেদ, তিবঃ + কার।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে শুদ্ধ কবিয়া লিখ :—

ছন্দানুসারে, মনান্তর, যশেচ্ছা, বক্ষোপরি, কলেজাধ্যাক্ষ, গ্যাসালোক, মনাগুন, রাঙালু, আমাপেক্ষা, উপরোক্ত।

১৯. সমাস

পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট একাধিক পদের একপদীভাবকে সমাস বলে। সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার :—

অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব।

১৯ ক. অব্যয়ীভাব

যে সমাসে অব্যয়ের অর্থ প্রধান তাহাই অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাব সমাসে সাধারণতঃ পূর্বপদ অব্যয় হয়। সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

সামীপ্য—উপকূল (কূলের সমীপে), অনুগঙ্গ (গঙ্গার সমীপে), উপনগর (নগরের সমীপে)।

বীপ্সা—প্রতিদিন (দিন দিন), অনুক্ষণ (ক্ষণে ক্ষণে), ফিবছর (বছরে বছরে)।

অতিক্রম—যথাশক্তি (শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া), যথাসাধ্য।

পর্যন্ত—আজানু (জানু পর্যন্ত), আকর্ণ, আসমুদ্র, আপাদমস্তক, আমরণ, আজীবন, আবালবৃদ্ধবনিতা।

অভাব—নির্বিঘ্ন (বিঘ্নের অভাব), দুর্ভিক্ষ, নির্ঝঞ্ঝাট, নিষ্কলঙ্ক, নিরামিষ, অরাজকতা।

পশ্চাৎ—অনুগমন (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন), অনুসরণ, অনুলেখন, অনুজাত।
সাদৃশ্য—উপদ্বীপ (দ্বীপের সদৃশ)।

ক্ষুদ্রতা—উপগ্রহ (গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র), উপদেবতা, উপলক্ষণ, উপকথা।

১৯. খ. তৎপুরুষ

যে সমাসে পরবর্তী পদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাহার নাম তৎপুরুষ। তৎপুরুষ প্রধানতঃ ছয় প্রকার :—

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ।

সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি সাধারণতঃ লোপ পায়। পূর্বপদে যে বিভক্তি লোপ পায়, তাহারই নামানুসারে তৎপুরুষ নাম গ্রহণ করে। যেমন, (বিস্ময়কে আপন্ন) বিস্ময়াপন্ন—এই সমাসে পূর্বপদ বিস্ময়কে দ্বিতীয়া বিভক্তি। ঐ বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং উহা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

১৯. খ১ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

মিত্রভাবাপন্ন, ধর্মাগত, গঙ্গাপ্রাপ্ত, চিরশত্রু, অস্ফুট, দ্রুতগামী, মূর্ছাগত, চরণাশ্রিত, ক্ষণস্থায়ী, আঘাতপ্রাপ্ত, সংখ্যাতীত, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, বর্ষভোগ্য,

বয়ঃপ্রাপ্ত, অন্তর্গত, সংশয়াপন্ন, নিরয়গামী, রক্তপিপাসু, দেবাশ্রিত, লোকাতীত, তদ্‌গত, ব্যক্তিগত, বাসনমাজা, জলতোলা, মাটিকাটা, বথদেখা, কলাবেচা।

১৯. খ² তৃতীয়া তৎপুরুষ

জবাজীর্ণ, রোগশীর্ণ, পিতৃদত্ত, সর্পদষ্ট, ভক্তিযুক্ত, কষ্টসাধ্য, মনগড়া, বাতাহত, সমাচ্ছাদিত, শ্রমলব্ধ, ধনাঢ্য, রৌদ্রদগ্ধ, বসসিক্ত, স্নেহাতুরা, শোকাকুল, মধুমাখা, সোনাবাঁধানো, দাকাটা, বাদুড়চোষা, কালিমাখা, শ্রীযুক্ত, যাঁতাভাঙ্গা, হুনমাখা, পাতাছাওয়া, ঝাঁটাপেটা, ঢেঁকিছাটা, ঘানিপেষা, ছায়াশীতল, রক্তাক্ত, হস্তচালিত, স্নেহান্ধ, রূপোন্মাদ, বিদ্যাহীন, জনশূন্য, ত্রুটিপূর্ণ, গুণবিশিষ্ট, তৎপ্রণীত।

১৯. খ³ চতুর্থী তৎপুরুষ

দেবদত্ত, রাজদেয, মবণকাঠি, মালগুদাম, বিযেপাগলা, যূপকাষ্ঠ, দেবার্পিত মবাকান্না, মেয়েস্কুল, তেলধুতি (তেল মাখিবাব ধুতি)।

১৯. খ⁴ পঞ্চমী তৎপুরুষ

বৃন্তচ্যুত, বোগমুক্ত, সত্যভ্রষ্ট, বিলাতফেবৎ, ঋণমুক্ত, ব্যাঘ্রভীত, সিংহাসনচ্যুত, ঘবছাড়া, থলেঝাড়া, জেলখালাস, গাঁছাড়া, ঘবপালানো, শাপমুক্তি, অগ্নিভয়, মোহমুক্ত, বাজভয়, ব্রাহ্মণেতব।

১৯. খ⁵ ষষ্ঠী তৎপুরুষ

রাজপুত্র, বৃক্ষশাখা, নদীতীব, গুরুসেবা, চাবাগান, গঙ্গাজল, নবশ্রেষ্ঠ, কবিগুরু, শ্বশুববাড়ী, নবাধম, ধান্যক্ষেত্র, পুষ্পবন, আম্রশাখা, মাতৃস্নেহ, ঘোড়দৌড, বাঁদবনাচ, ফুলসাজি, পুকুবঘাট, মৌচাক, নাচঘব, বৃষ্টিপাত, ইংলণ্ডেশ্বব, সৎসঙ্গ, অতিথিসেবা, মাতুলালয়, জগদ্বন্ধু, ঠাকুবঝি, দেওবপো, বাজপুত্র, সাঁজবাতি, বামুনপাড়া, মালগাড়ী, ঠাকুবপো, নদীজল, কাপড়কল।

১৯. খ⁶ সপ্তমী তৎপুরুষ

পাপাসক্ত, জলমগ্ন, পরিহাসপটু, বনচব, গাছপাকা, রাতকানা, বণনিপুণ, অকালমৃত্যু, কার্যদক্ষ, অকালপক্ব, পিতৃভক্ত, পুঁথিগত, গোলাভবাধান, বাটাভবাপান, বাক্সবন্দী, পকেটজাত, ঝুড়িভবা, পাড়াবেড়ানী, সাঁঝঘুমানী, অশ্বারূঢ়, তালকানা।

১৯. খ⁷ নঞ্‌ তৎপুরুষ

ন (নঞ) অথবা নঞর্থ-বোধক অন্য কোনো অব্যয়কে পূর্বপদ করিয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার নাম নঞ-তৎপুরুষ।

ন-ভাব = অভাব, ন আচার = অনাচার। এইরূপ অনতিদূব, অনশন, অগণ্য, অনুদার, অনুন্নত, অসৎ, অচেতন, অসাধারণ, আঘাটা, আকাল, আকাঁড়া, অকেজো, গরহাজির, বেবন্দোবস্ত, গবমিল, অনাছিষ্টি, আলোনা, আকাচা, আভাঙ্গা।

১৯. খ[৮] উপপদ তৎপুরুষ

বিশেষ্যের সহিত কৃদন্ত শব্দেব সমাস হইলে তাহাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা—

জলচব (জলে চরে যে)। এইরূপ,—পঙ্কজ, দিবাকব, কুম্ভকাব, সূত্রধব, স্বর্ণকাব, ভুজগ, পাদপ, প্রভাকর, নিশাকব, মালাকাব, শাস্ত্রবিৎ, জলজ, অনুজ, বিহঙ্গম, ইন্দ্রজিৎ, মনোলোভা, বর্ণচোবা, বুকচেবা, হাতুড়িপেটা, কাবিকব, হালুইকব, বাজীকব, ফেলমাবা, পাশকবা, মডাখেকো, পাতচাটা, ধামাধরা, ঘবপোড়া, লুচিভাজা ইঁদুবমাবা, ছেলেধবা, মানুষখেকো।

বাঙ্গালায় অনেক উপপদ নিষ্পন্ন শব্দকে অনেক সময় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ প্রভৃতিব অন্তর্গত বলিয়া ধবা হয। কখনো কখনো একই শব্দকে বহুব্রীহি সমাসের উদাহবণস্বরূপেও উদ্ধৃত কবা হয়।

১৯. গ[১] কর্মধারয়

বিশেষণে বিশেষ্যে অথবা বিশেষণে যে সমাস হয়, তাহাকে কর্মধাবয সমাস বলে। কখনও কখনও বিশেষ্য বিশেষ্যেও কর্মধাবয় সমাস হয।

সজ্জন, পূর্ণচন্দ্র, পাণ্ডুলিপি, মহাপুরুষ, হবিহব (যে হবি, সেই হর)। দেবর্ষি, শীতোষ্ণ, জীবন্মৃত, হৃষ্টপুষ্ট, সুপ্তোত্থিত, দত্তাপহৃত, স্নাতানুলিপ্ত, ম্লানমুখ, নীলোৎপল, বক্তাশোক, মধুবচন, প্রিযসখা, সাধুপুরুষ, মহাবাণী, পক্ককেশ, নীলশাড়ী, মহর্ষি, সেজমামা, বডমামী, উডোজাহাজ, মেমসাহেব, কালসাপ, কাঁচকলা, মিঠেকড়া, আধফোটা, পণ্ডিতমশায, আধবোজা, টাটকাতোলা, গবমভাজা, সাডেপাঁচ, শীতোষ্ণ, নীললোহিত, গুরুদেব, ঠাকুবদাদা, পণ্ডিতজন, তমাললতা, ভূলোক, সেদিন, অলংকৃত, কদাচার, কাপুরুষ, পবান্ন, আগাছা, ঠাকুবদাদা, বাবেক, ওলকপি, ফুলবাতাসা, গাধাবোট, দাঁতকপাটি, মেয়েকান্না।

১৯. গ[২] মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসে মধ্যবর্তী কোনো পদ লোপ পায়, তাহাকে মধ্যপদলোপী কর্মধাবয় বলে।

সিংহাসন (সিংহ চিহ্নিত আসন), পলান্ন (পল অর্থাৎ মাংস মিশ্রিত অন্ন), ঐরূপ ব্যোমযান, বাষ্পযান, হাস্যবদন, খাইখবচ, ঘিভাত, মনিব্যাগ, যাদুঘর বিয়েপাগলা।

১৯. গ² উপমান কর্মধারয়

কর্মধারয় সমাসে প্রথম পদটি উপমান এবং দ্বিতীয় পদটি বিশেষণ হইলে উপমান কর্মধারয় হয়—কুসুমকোমল, কুলিশকঠোর, শশব্যস্ত, হস্তি-মূর্খ, ঘনশ্যাম, মিশকালো, সিঁদুররাঙা।

১৯. গ³ উপমিত কর্মধারয়

তুলনা বুঝাইতে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে যে সমাস তাহারই নাম উপমিত কর্মধারয়। এই সমাসে উভয় পদ বিশেষ্য হয়।

পুরুষসিংহ, চরণকমল, মুখচন্দ্র, করপল্লব, নৃসিংহ, নরপুঙ্গব, রাজর্ষি, ফুলকুমারী।

১৯. গ⁴ রূপক কর্মধারয়

অভেদ কল্পনা বুঝাইতে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যে সমাস তাহারই নাম রূপক কর্মধারয়। এই সমাসে উভয়-পদ বিশেষ্য হয়। কালচক্র, বিষাদসিন্ধু, পরাণপাখী, প্রেম-মদিরা, মনমাঝি, শোকানল।

১৯. ঘ. দ্বিগু

যে কর্মধারয়-জাতীয় সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয় এবং সমাহারাদি অর্থ বুঝায়, তাহার নাম দ্বিগু।

ত্রিভুবন, পঞ্চবটী, নবরত্ন, চতুষ্পদ, পঞ্চভূত, পঞ্চনদ, শতাব্দী, সপ্তাহ, তেমাথা, চৌরাস্তা, পাঁচফোড়ন, দশ-আনি, তেকাটা, দুমুখো।

১৯. ঙ. বহুব্রীহি

যে সমাস সমস্ত পদের অর্থ সমস্যমান পদসমূহের কোনোটিকেই না বুঝাইয়া অন্য পদার্থকে বুঝায়, তাহার নাম বহুব্রীহি।

দশানন (দশ আনন যাঁহার), পীতাম্বর, ত্রিলোচন, পঞ্চানন, কৃতবিদ্য, স্থিতপ্রজ্ঞ, ছিন্নশাখ, জিতেন্দ্রিয়, ভগ্নজানু, শীর্ণকলেবর, অনাদি, নির্ধন, অন্যমনস্ক, চন্দ্রমুখ, অদৃষ্টপূর্ব, নীলাম্বর, চন্দ্রশেখর, বীণাপাণি, অল্পায়ু, চন্দ্রচূড়, দিগম্বর, ষড়ানন, শূলপাণি, বজ্রদেহ, রক্তনেত্র, কালোবরণ, নদীমাতৃক, গৌরীভার্য, নষ্টমতি, বিশালাক্ষ, মকরাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুষ্পধন্বা, সুধন্বা, ঊর্ণনাভ, যুবজানি, লালপেড়ে, কানকাটা, ছয়নলা, তেহাতি, একচোখো, চিরণদাতী, হতভাগা, উঁচকপালী, অল্পেয়ে, মা-মরা, নিমুখো।

১৯. ঙ¹ কর্মব্যতিহার বহুব্রীহি

পরস্পর একই জাতীয় ক্রিয়া করিতেছে এইরূপ বুঝাইলে এই সমাস হয়,—কেশাকেশি, দণ্ডাদণ্ডি, মারামারি, চুলোচুলি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, গালাগালি, কাটাকাটি, কাটাকাটি।

১৯. চ. দ্বন্দ্ব

যে সমাসে সমস্ত পদেব অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের অর্থই সমানভাবে বুঝা যায় সেই সমাসের নাম দ্বন্দ্ব সমাস।

ইষ্টানিষ্ট, শুভাশুভ, দানধ্যান, অন্নবস্ত্র, বাধানিষেধ, নববানব, গোমহিব, মনপ্রাণ, পিতামাতা, রক্তমাংস, অন্নজল, আদানপ্রদান, শীতগ্রীষ্ম, ব্রাহ্মণচণ্ডাল, জনমানব, পিতাপুত্র, কুশীলব, দম্পতি, জায়াপতি, স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ধনমান, পথঘাট, দেনাপাওনা, ভাইবোন, হাসিকান্না, চালডাল, ডালপালা, হাত-পা, গোরুবাছুব, দোযাতকলম, উকিলমোক্তার, গাহাত, জামাকাপড।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিব মধ্যে কোন্‌টিতে কি সমাস হইয়াছে বল :—

লোকপিছু, তেহাতি চৌমাথা, হাতগড়া, রামদা, চতুষ্পদ, সোনামুখ, হাতভাঙ্গা, মেমসাহেব, ঘিভাত, ভাইফোঁটা, ভালমন্দ, দেশান্তব, পরচর্চা, কন্যাদান, করতল, অন্নকষ্ট, অর্থক্ষয়, আতুরাশ্রম, হাতযশ, পদতল।

২। সমাস কব :—

নীল অম্বব যাহাব, এক চোখ যাহাব, উড়ে যে জাহাজ, হাত দ্বাবা গড়া, দাযেব দ্বাবা কাটা, দুই মুখ যাহাব, কাচা যে কলা, দশ আনন যাহাব, হাত ও পা, বিযেব জন্য পাগলা, নবেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সিংহ চিহ্নিত আসন, চন্দ্র চূড়াতে যাঁহাব, বিঘ্নেব অভাব, কষ্ট দ্বাবা সাধ্য।

৩। সমাস, ব্যাসবাক্য, সমস্যমান পদ, সমাসান্ত পদ কাহাকে বলে? উদাহবণ দাও।

৪। সমাস সাধাবণতঃ কয়প্রকাব? প্রত্যেকটির একটি কবিয়া উদাহবণ দিযা বুঝাইযা দাও।

৫। উপমান ও উপমিত এই দুই প্রকাব সমাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উদাহবণ দ্বাবা বুঝাও।

৬। দ্বিগু, কর্মধাবয ও তৎপুরুষ সমাস কত প্রকাবের হইতে পারে? প্রত্যেক প্রকাবের একটি কবিয়া উদাহরণ দাও।

৭। বহুব্রীহি সমাস কত প্রকাবেব হইতে পাবে? উদাহবণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৮। কর্মধাবয় ও বহুব্রীহি সমাসেব মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উদাহরণ দ্বাবা বুঝাও।

২০. কৃৎপ্রত্যয়

ধাতুর উত্তর যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয়, সেগুলিকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। বাঙ্গালায় যে সকল কৃদন্ত শব্দ অবিকৃতভাবে সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে সেই সমস্ত শব্দের প্রত্যয়গুলিও খাঁটি সংস্কৃত। ঘঞ্, অল্, অচ্, অনট্, ক্তিন্, তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, ক্যপ্, ইন্, ণক্, তৃচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় সংস্কৃত এবং অ, আ, আন, অন্ত, ইয়া, উয়া, প্রভৃতি প্রত্যয় বাঙ্গলা।

২০. ক. সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ

বিশেষ্য		বিশেষণ	
পচ্ + ঘঞ্	পাক	কৃ + ণক্	কারক
আ — চর্ + ঘঞ্	আচার	দৃশ্ + ণক	দর্শক
ভুজ্ + ঘঞ্	ভোগ	হন্ + ণক	ঘাতক
লভ্ + ঘঞ্	লাভ	গৈ + ণক	গায়ক
জি + অচ্	জয়	অপ্ — রাধ্ + ইন্	অপরাধী
সম্ — চি + অচ্	সঞ্চয়	আ — গম্ + ইন্	আগামী
রু + অপ্	রব	ভুজ্ + ঘিনুণ্	ভোগী
স্তু + অপ্	স্তব	ত্যজ্ + ঘিনুণ্	ত্যাগী
শ্রু + অনট্	শ্রবণ	গুহ্ + ক্ত	গূঢ়
পত্ + অনট্	পতন	কৃ + তৃচ্	কর্ত্তা
গৈ + অনট্	গান	শ্রু + তৃচ্	শ্রোতা
অধি — ই + অনট্	অধ্যয়ন	ক্রী + তৃচ্	ক্রেতা
অনু — স্থা + অনট্	অনুষ্ঠান	গ্রহ্ + তৃচ্	গ্রহীতা
হন্ + সন্ + আ	জিঘাংসা	কুম্ভ — কৃ + অণ্	কুম্ভকার
পা + সন্ + আ	পিপাসা	প্রী + ক	প্রিয়
ভুজ্ + সন্ + আ	বুভুক্ষা	প্র — জ্ঞা + ক	প্রজ্ঞ
বি — ধা + কি	বিধি	দিবা — কৃ + ট	দিবাকর
জল — ধা + কি	জলধি	ভুজ — গম্ + খচ্	ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম্
গম্ + ক্তিন্	গতি	সরস্ — জন্ + ড	সরোজ
সৃজ্ + ক্তিন্	সৃষ্টি	কৃ + তব্য	কর্তব্য
ভজ্ + ক্তিন্	ভক্তি	দৃশ্ + অনীয়	দর্শনীয়
প্র — নম্ + ক্তিন্	প্রণতি	বচ্ + ণ্যৎ	বাক্য

বিশেষ্য		বিশেষণ	
শুচ্ + ঘঞ	শোক	স্থা + ক্ত	স্থিত
প্র—হৃ + ঘঞ্	প্রহার	শাস্ + অক	শাসক
প্র—সদ্ + ঘঞ	প্রসাদ	স্মৃ + অক	স্মারক
বি—সদ্ + ঘঞ	বিষাদ	পচ্ + অক	পাচক
নশ্ + ঘঞ্	নাশ	দা + তৃচ	দাতা
ভূ + ঘঞ্	ভাব	হন্ + তৃচ্	হন্তা
ভুজ্ + অনট্	ভোজন	দা + ক্ত	দত্ত
হৃ + অনট্	হরণ	দৃশ্ + ক্ত	দৃষ্ট
শী + অনট্	শয়ন	আ—রুহ্ + ক্ত	আরূঢ়
দা + অনট্	দান	উৎ—নম্ + ক্ত	উন্নত

২০. খ. বাঙ্গালা কৃতপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ

নি, আনি, উনি, উনী—হাঁপানি, কাঁদুনি, বকুনি, ধমকানি, খিঁচুনি, জ্বলুনি, ছটফটানি, লোকহাসানি, চাটনি, বিনুনি, কটকটানি, খাটুনি, শুনানি, উড়ানি, পাবানি, বাঁধুনি, ঘুমপাড়ানী (গান)।

অন—ভাঙ্গন, ঝাড়ন, চলন, বলন, গড়ন, ঢাকন, নাচন, কোঁদন, কাঁপন, দাদন।

আ—বলা (কথা), তাওয়া, দাওয়া (দাবী), খাওয়া, পাওয়া, নাওয়া, শোনা, দেখা, কেনা (দাম)।

আন—হেলান, ঠেসান, মানান, (মানানসই), যোগান, ঠকান (কি ঠকানটাই ঠকিয়েছে) চড়ান, তাড়ান, বানান।

আনো—চুলকানো, কামড়ানো, দাঁড়ানো, শোয়ানো, বসানো, কাঁদানো, পচানো, বাড়ানো, নাড়ানো।

না—পাওনা, দেনা, ওড়না, ঢাকনা, বাজনা, বান্না, বাটনা, দোলনা, খেলনা, ফেলনা, মাগনা, শুকনা।

আই—বাছাই, বাঁচাই, ছাঁটাই, কাটাই, বাঁধাই, লড়াই, চড়াই, চোবাই, উৎরাই।

ওয়া—বাঁচোয়া, চড়োয়া, ধরোয়া, সাঁজোয়া।

আড—জোগাড, খেলোয়াড।

আরি, আরী—পূজারী, ভিখারী, কাটারি।

ক—মোডক, চন্ডক, চটক।

অত—মানত, ফেরত।

তা—জানতা (সবজানতা), পডতা, ধরতা, ফেবতা।

তি—চুক্তি, ঘাটতি, গুনতি, পড়তি, উঠতি।

আডিয়া>আডে—জোগাড়িয়া>জোগাডে (মজুব), হাতাডিযা>হাতুডে।

উক—নিন্দুক, লাজুক।

অন্ত—ফুটন্ত, জীয়ন্ত, চলন্ত, বাডন্ত।

আট—জমাট, ভরাট।

উয়া—পড়ুয়া, পটুযা।

ইয়া>ইয়ে—বাজিযা>বাজিয়ে, নাচিয়া<নাচিয়ে।

টা—চাপ্টা, শুকটা।

উবী—ডুবুবী, ধুমুরী।

অত, তা, তি প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় দ্বাবা বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয় প্রকাবেব পদই পাওযা যায। যথা—ঠাকুবেব কাছে মানত আছে (বিশেষ্য)। বসত বাটী পর্যন্ত দেনাব দাযে বিক্রয় হইযা গেল (বিশেষণ)। গুনতিতে ভুল হইয়াছে (বিশেষ্য)। চলতি গাডীতে উঠিও না (বিশেষণ)।

২১. তদ্ধিত প্রত্যয়

শব্দের উত্তব যে সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হয, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয বলা হয়। ভাব, অপত্য, সম্বন্ধ, মাত্রা, প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যযের প্রয়োগ হয়। তল্ (তা), ষ্যঙ, (ত্ব, য), অণ, ইমন, ছ (ঈয), ঠক্ (ইক), অন্ প্রভৃতি প্রত্যয সংস্কৃত।

আই, ই, ঈ, গিবি, নি, আনি, ওয়ালা, দানি, দাব, পনা, ইয়া, উয়া প্রভৃতি প্রত্যয় বাঙ্গালা।

২১. ক. সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ

গুরু+তল	গুরুতা	ত্বদ্+ছ্	ত্বদীয
দীন+তল্	দীনতা	বাজন+ছ্	বাজকীয়
সাধু+ত্ব	সাধুত্ব	শবীব+ঠক্	শারীবিক
গম্ভীব+ষ্যঙ	গাম্ভীর্য	দুঃখ+ইতচ্	দুঃখিত
দরিদ্র+ষ্যঙ্	দারিদ্র্য	পীড়া+ইতচ্	পীড়িত
মহৎ+ইমন্	মহিমা	বুদ্ধি+মতুপ	বুদ্ধিমান

নৌ+ইক	নাবিক	জ্ঞান+মতুপ	জ্ঞানবান্
রঘু+অণ	রাঘব	গুন+ইন্	গুণী
মনু+অণ	মানব	মনস্+বিন্	মনস্বী
দিতি+ণ্য	দৈত্য	গুরু-তরপ্	গুরুতর
গর্গ+যঙ্	গার্গ্য	লঘু+ঈয়সুন্	লঘীয়ান্
অতিথি+ঞ্চেয়	আতিথেয়	দীর্ঘ+তমপ্	দীর্ঘতম
গো+যৎ	গব্য	বৃদ্ধ+ইষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
পৃথিবী+অণ্	পার্থিব	মাংস+ল	মাংসল
চণক+ষ্ণঙ্	চাণক্য	মৃত+কল্প	মৃতকল্প
রাম+ষ্ণায়ণ	রামায়ণ	শাস্ত্র+ঈয়	শাস্ত্রীয়
দেব+ত্ব	দেবত্ব	লোক+ষ্ণিক	লৌকিক
মনস্+ষ্ণিক	মানসিক	মথুর+ষ্ণ	মাথুর
সুমিত্রা+ইঞ্	সৌমিত্রি	শ্রী+মতুপ্	শ্রীমান্
যদু+ষ্ণ	যাদব	গঙ্গা+ঢক্	গাঙ্গেয়

২১. খ. বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আই—বড়াই, বামনাই, পোষ্টাই, কানাই, বলাই, মিঠাই, ছাটাই, বাদশাই, মোগলাই, নাবাই, জগাই, জনাই, গদাই।

ই—সাহেবি, নবাবি, গোলামি, মাষ্টারি, চাকরি, মারামারি, লাঠালাঠি, হাতাহাতি, মোড়লি, দালালি, ডাক্তারি, শয়তানি, চালাকি, বদমায়েসি, মোক্তারি, পণ্ডিতি, ওকালতি, ভালমানুষি॥

আনা—মুনসিআনা, বাবুআনা, মুরুব্বিয়ানা, গরিবিয়ানা, বিবিয়ানা।

না—জাবনা, পাখনা, দোলনা।

আনি—হিঁদুয়ানি।

ল—হাতল, কাঁকড়োল, আদল, পাতল, মাদল।

লা—আধলা, বাদলা, ছ্যাৎলা, চাকলা।

উলি—আধুলি, পিঠুলি।

আলা, ওলা, ওয়ালা—পাহারাওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, বাড়ীআলা বা বাড়ীওলা।

গিরি—বাবুগিরি, কুলিগিরি, মুটেগিরি, কেরানীগিরি।

দার—দোকানদার, চৌকিদার, বুটিদার, দানাদার, ভাগীদার, ঝালরদার, আঁচলদার, ফুলদার, কল্কাদার, মজাদার, জমিদার, অংশীদার।

দান, দানি—বাতিদান, ধূপদান বা ধূপদানি, পিকদান বা পিকদানি, আতরদান, কলমদান, ছাইদান, ফুলদানি, নস্যদানি।

পনা—গিন্নীপনা, ন্যাকাপনা, বেলেল্লাপনা।

অস—ডাঙ্গস, খোলস, মুখস।

চি—ধুনাচি, খাজাঞ্চি, মশালচি, ঘামাচি, ব্যাঙাচি, ডেকচি।

ঈ—গোলাপী, বেগনী, মাষ্টারী, হিসাবী, রাগী, দাগী, মারাঠী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, ফারসী, ইংরাজী, প্রণামী, দালালী।

মি, মো—পাগলামী,-মো, ছেলেমি,-মো, বুড়োমি,-মো, জ্যাঠামি,-মো।

বৃহদর্থে আ, ক্ষুদ্রার্থে ই—হাঁড়া, হাঁড়ি, পোটলা, পুঁটলি, বোঁচকা, বুঁচকি, ছোরা, ছুরি।

আলি—ঘটকালি, চতুরালি।

উরিয়া>উরে—হাটুরিয়া>হাটুরে, কাঠুরিয়া>কাঠুরে।

আরি-রি, আরী-রী—কাঁসারি-রী, শাঁখারি-রী, ভিখারি-রী।

তা, তি—রাঙতা, পানতা, নোনতা, তলতা, নামতা, চাকতি, আলতি।

ড, ড়া, ড়ি—চাপড়, ভাঙ্গড়, তুখড়, বাজড়া, গাছড়া, কাছড়া, কাঠড়া, পাতড়া, থাবড়া, বাগড়া. চামড়া, খাগড়া, হিজড়া, খেলোয়াড়, আঁবড়ি।

এই 'ড়' কখনও 'র' রূপেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—কাঠরা, টুকরা, ভাযরা, পেটরা, গেটরা।

আমি-ইতরামি, পাগলামি, জ্যাঠামি, বাঁদরামি, ফাজলামি, মাতলামি, ছ্যাবলামি, ঢঙ্গামি, নোংরামি।

আ—বোগা, মোটা।

খোর—নেশাখোর, ভাংখোর, গাঁজাখোর, ঘুষখোর, টাকাখোর, মদখোর, চাখোর, গুলিখোর, সুদখোর।

উ—চালু, ঢালু।

উয়া>ও—জলুয়া>জলো, রাতুয়া>রেতো, কোণুয়া>কুণো, মাঠুয়া>মেঠো, বনুয়া>বুনো।

আল—কাঙাল, দয়াল, আঁঠিয়াল>এঁঠেল, লাঠিয়াল>লেঠেল।

আলো—তেজালো, ধারালো, দাঁতালো, ঝাঁঝালো, রসালো।

লা—মেঘলা, একলা, পাতলা।

আড়িয়া>ড়ে—চাষাড়িয়া>চাষাড়ে।

কা—হোঁৎকা, হালকা।

সই—হাতসই, মাপসই, মানানসই, জলসই।

তবো—এমনতবো, কেমনতবো, যেমনতবো।

টিয়া>টে—রোগাটিয়া>রোগাটে, ঘোলাটিয়া>ঘোলাটে, ভাড়াটিয়া>ভাড়াটে, খ্যাপাটিয়া>খ্যাপাটে, তামাটিয়া>তামাটে।

পানা—চাঁদপানা, ছুঁচপানা, বুলোপানা, পেঁচাপানা, ছুঁচোপানা, ঢেঁকিপানা, মোটাপানা, রোগাপানা।

চে—লালচে, কালচে।

উআ>ও—মোদো, ভেতো, টেকো, দেঁতো, ঘেয়ো, হেঁপো, বেতো, হেটো।

ইআ>এ—সিঁদুরে, পাথুরে, বর্ধমেনে, শহুরে, চাটগেঁয়ে, পাড়াগেঁয়ে, চাকরে, খোসামুদে, খুনে, আমুদে, আদুরে, ফাগুনে, ভাদুরে।

আই—ঢাকাই, পাটনাই, খাগরাই।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ কোন্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে বল :

ভক্তিমান, পৌরাণিক, মান্য, শ্রদ্ধেয়, সৌমিত্রি, পৌত্র, দেবত্ব, সর্বজ্ঞ, দান, সাধুতা, ভৃত্য, ভর্তা, ত্যাজ্য, করণীয়, বধ্য, সুসাধ্য, জীবন্ত, পাওনা, বর্তিত, দালালি, যাচাই, চুলো, নেপালী, দুষ্টামি, শান্তিপুরে।

২। আ, আরি, ইয়া, উয়া, দার, গিরি, উক, তন্ত, আনি, উনি, লা, ওয়ালা, আই, নি গিরি—এই প্রত্যয়গুলি দ্বারা এক-একটি শব্দ গঠন করিয়া স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বারা বাক্য রচনা কর :

লেঠেল, সড়াকওয়ালা, অনুগত, ছিপছিপে, চড়াও, গুলিখোর, নজরবন্দী, টুকটুকে, লাঠালাঠি, পৌরুষ, বাহুল্য, বুনো, টেকো, ষণ্ডরে, বাদরামি, মানানসই, চাষাটে, নেশাখোর, পাথরা, কাঁকডোল, বাবুগিরি, চালু, পিকদান, গুণী, কুণো, জ্যাঠামি।

৪। এক একটি শব্দে প্রকাশ কর :

দানা আছে যাহাতে, যাহার জীবিকা পূজা করা, বিষ্ণুর ভক্ত, চাণক্যের পুত্র, কাজিলের ভাব, ঢাকায় উৎপন্ন, প্রণাম, হিসাবে, পাওয়া, কতকটা, খ্যাপা, চাঁদের মত, অংশ আছে যাহার, বিলাতে উৎপন্ন, দালালের কায, রস আছে যাহার, শরীর সম্বন্ধীয়, জমি আছে যাহার, বুটি আছে যাহাতে, ফুলের আধার, ঢেঁকির মত, ছোট নল, খনি হইতে উৎপন্ন, ধুনার আধার, রাঁধুনির কার্য্য, ছোট ডেক, টাক আছে যাহার, ঘা আছে যাহার, মাঠ সম্বন্ধীয়, দাম আছে যাহার, পাথরের মত, চাটগাঁয়ের অধিবাসী, খুন করিতে অভ্যস্ত, আদরে অভ্যস্ত, দোকান চালান জীবিকা যাহার, ঢাক বাজান জীবিকা যাহার, বাবুর ভাব, তেজ আছে যাহার, মিতার ভাব, শয়তানের ভাব, বড়র ভাব, মাংস আছে যাহাতে, প্রায় মৃত, শীত আছে যাহাতে, শিবের ভক্ত, শ্রী আছে যাঁহার, দেবের ভাব, যে আফিম খাইতে অভ্যস্ত।

২২. ণত্ববিধি

১. ট বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য ণ হয়।—কণ্টক, বণ্টন, লুণ্ঠন, গণ্ডার, গুণ্ঠন, বিষণ্ণ, কুণ্ড।

২. ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পর মূর্ধন্য ণ হয়।—ঋণ, স্বর্ণ, তৃণ, পূর্ণ, কৃষ্ণ, উষ্ণ।

৩. ঋ, র, ষ এর পর স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য ব হ্ এবং ং থাকিলেও তৎপরবর্তী ন ণ হয়।—দর্পণ, পাষাণ, শ্রবণ, বৃংহণ, কারণ, গ্রহণ, রুক্মিণী, কৃপণ, প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরায়ণ, উত্তরায়ণ, রামায়ণ, নারায়ণ, অগ্রণী, অক্ষৌহিণী।

৪. সমাস হইলে দ্বিতীয় পদের ন ণ হয় না।—দুর্নিরীক্ষ্য, বরানুগমন।

৫. প্র, পরা, পরি ও নির্ উপসর্গের পর ন ণ হয়।—পরায়ণ, প্রণাম, পরিণাম, প্রযাণ, নির্ণয়।

৬. ত বর্গের পূর্বে ন ণ হয় না।—অস্ত, পান্থ, বন্দনা, অন্ধ।

৭. পদের অন্তে ন হয়।—বুদ্ধিমান্, শ্রীমান্।

৮. কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ ণ হয়।—অণু, কঙ্কণ, কণা, বাণিজ্য, বিপণি, গণ, গুণ, তূণ, নিপুণ, পণ্য, পাণি, বেণু, বীণা, ফণা, শোণিত, স্থাণু।

২৩. ষত্ববিধি

১. অ আ ভিন্ন স্বর, ক এবং র এর পরবর্তী প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।—মুমূর্ষু, শ্রীচরণেষু, ভবিষ্যৎ, রুক্ষ, গোষ্পদ, জিগীষা। সাৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ষ হয় না।—ভূমিসাৎ।

২. ট ও ঠ-এর পূর্বে স মূর্ধন্য ষ হয়।—কষ্ট, মিষ্ট, শিষ্ট, নিষ্ঠা, কুষ্ঠ।

৩. অনু, অপি, সু প্রভৃতি কয়েকটি উপসর্গের পর কতকগুলি ধাতুর স ষ হয়।—সুষুপ্তি, প্রতিষ্ঠান, অভিষিক্ত।

৪. কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ ষ হয়।—আষাঢ়, ঔষধ, কর্ষণ, তুষার, দোষ, পাষাণ, পুরুষ, পৌষ, ভীষ্ম, শ্লেষ্মা, ষোড়শ, হর্ষ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান সংশোধন কর:

বিদ্বেশ, বিবরন, পরমানু, শ্লেস্মা, পৌশ, শোডষ, গুনী, পানি (হাত), বীনা (বাদ্যযন্ত্র), দুর্ণীতি, বরাণুগমণ।

২। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের অন্তর্গত যে সকল শব্দে কোন প্রকার অশুদ্ধি আছে সেগুলি সংশোধন কর :

গত্র বৃহস্পতিবার দিবশ তোমাব একখানি পত্র পাইয়া শকল ষমাচার শবিসেশ অবগত হইলাম। এতদিন শংবাদাদি না পাওয়ায় আমাদেব ভাবণার সীমা ছিল না। তাই শুবর্নপুরের পূর্ন সেণেব হাতে শনিবার তোমাকে একখানি চিঠি দিই। সে চিঠি পাইয়াছ কিণা জানি না।

আমাকে কলিকাতা যাইবাব জন্য অণুবোধ কবিয়াছ। কিন্তু কেমণ করিয়া যাই? বর্শাকাল। চাশ আবাদের সময। জমিতে যে দু মুঠা ধাণ হয় তাহাতেই বছবেব খবচ চলে। পবেব হাতে ভাব দিয়া গেলে একটি দাণাও ঘবে উঠিবে না। মণে কোন প্রকাব কষ্ট কবিও না। শ্রাবন মাষটা কাটিয়া যাক। ভাদ্র মাষের গোড়াব দিকে অবশ্যই যাইব। ইতি ষুভার্থী শ্রীমণীন্দ্রমোহণ বষু।

২৪. শব্দার্থ

সংস্কৃতেব আলঙ্কাবিকদেব মতে শব্দেব অর্থ তিন প্রকার,—**বাচ্য, লক্ষ্য** এবং **ব্যঙ্গ্য**।

২৪. ক. অভিধা

অভিধান, ব্যাকবণ প্রভৃতি হইতে শব্দেব যে মুখ্য অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই হইল **বাচ্য অর্থ**।

ভাবতবর্ষ বলিলেই বুঝি এশিয়া মহাদেশেব অন্তর্গত একটি দেশেব নাম করা হইল। ভাবতবর্ষ শব্দেব এই যে অর্থ ইহাই হইল বাচ্য। শব্দেব যে শক্তিব দ্বারা বাচ্য অর্থ প্রকাশিত হয় তাহাকে বলে **অভিধা**।

২৪. খ. লক্ষণা

যখন পড়ি—"হে ভাবত, ভুলিও না, তোমাব নাবীজাতিব আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী" তখন ভাবত শব্দেব আব এক অর্থ পাই। তখন ভাবত বলিতে দেশ বুঝি না। বুঝি সেই দেশেব অধিবাসী। ভাবতেব এই যে অর্থ ইহাই হইল **লক্ষ্যার্থ**। মুখ্য অর্থেব বাধা ঘটিলে যাহাব দ্বাবা মুখ্য অর্থেব সহিত অন্য অর্থের বোধ হয় তাহাব নাম **লক্ষণা**।

২৪. গ. ব্যঞ্জনা

এতদ্ব্যতীত শব্দের আর একপ্রকার শক্তি আছে তাহাব নাম **ব্যঞ্জনা**। ইহার দ্বাবা শব্দে মুখ্য বা লক্ষ্য অর্থ প্রকাশিত না হইয়া কোন একটি গূঢ় অর্থ প্রকাশ পায়। এই অর্থকে **ব্যঙ্গ্যার্থ** বলে : যেমন—অরণ্যে বোদন, অর্থ,—নিষ্ফল বিলাপ।

বাঙ্গালা বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইতে হইলে শব্দাদির লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থের জ্ঞান বিশেষরূপে অর্জন করা আবশ্যক। মাথা শব্দের বাচ্যার্থ হইল প্রাণীর অঙ্গবিশেষ। কিন্তু ইহার ব্যঙ্গ্যার্থ অনেক। নিম্নে কয়েকটি দেওয়া হইল:

লোকটার খুব মাথা—বুদ্ধি
তিনি গ্রামের মাথা—প্রধান ব্যক্তি
মাথা উঁচু করা—আত্মসম্মান দেখান
মাথা কাটা যাওয়া—অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া
গাছের মাথা—অগ্রভাগ
মাথা খাও—শপথ
মাথা খাওয়া—সর্বনাশ করা
মাথা খারাপ—মস্তিষ্কের বিকৃতি
মাথা গরম—উত্তেজনা, ক্রোধ
মাথা ঠাণ্ডা—ধীর, শান্ত
মাথা হেঁট—লজ্জায় মাথা নীচু
মাথায় মাথায়—সীমা পর্যন্ত'
চোখের মাথা খাওয়া—দেখিতে না পাওয়া

খা (খাওয়া) ধাতুর মুখ্য অর্থ ভক্ষণ করা, ইহার অন্যবিধ অর্থে অনেক প্রয়োগ আছে।

আদর, মার, ধমক খাওয়া—ভোগ করা, খাবি খাওয়া—অন্তঃশ্বাস
জল, তামাক খাওয়া,—পান করা   হাওয়া খাওয়া—সেবন করা·

ইহা ছাড়াও ঘুষ খাওয়া, ডিগবাজী খাওয়া, ঘুরপাক খাওয়া, হোঁচট খাওয়া প্রভৃতি স্থলে খাওয়া ধাতুর বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়।

কতকগুলি বিশিষ্টার্থক শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থ দেওয়া হইল:

ডুমুরের ফুল—নয়নের অগোচর বস্তু, যাহা দেখা যায় না। যেমন—আগে ত এ পথে যাওয়া আসা করিতে, আজকাল তো একেবারে ডুমুরের ফুল হইয়া উঠিয়াছে।

হাতের পাঁচ—তাস খেলার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য, যে বস্তু নিজের অধিকারের মধ্যেই আছে।

কলুর বলদ—কলুর বলদের চোখ ঢাকা থাকে বলিয়া সে নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারে না, সারাদিন চলিয়াও সে বাঁধা পথের বাইরে এক পা অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা হইতে 'পরবুদ্ধিপরিচালিত', 'নিষ্ফলকর্মরত'।

উত্তম মধ্যম—যথেষ্ট প্রহার। যেমন,—চোরকে আর পুলিসের হাতে দিয়া কি হইবে? বরং উত্তম মধ্যম দিয়া ছাড়িয়া দাও।

অকালকুষ্মাণ্ড—অকর্মণ্য, যাহাকে কোন কাজেই লাগানো যায় না।

রাঘব বোয়াল—সর্বগ্রাসী, অতিশয় অর্থগৃধ্নু।

অন্ধের যষ্টি বা নড়ি—অক্ষমের অবলম্বন।

ক অক্ষর গোমাংস—বর্ণজ্ঞানবিবর্জিত।

এঁচোড়ে পাকা—অকালপক্ক।
চোখে সরিষার ফুল দেখা—ধোঁয়া দেখা।
ডান হাতের ব্যাপার—ভোজন।
লম্বা দেওয়া—পলায়ন করা।
গদাই লস্করী চাল—মন্থর গতি।
শকুনি মামা—কুমন্ত্রী।
কানের পোকা বাহির করা—বিকট শব্দে বা চীৎকারে উত্ত্যক্ত করা।
ভাঁড়ে মা ভবানী—ভাণ্ডার শূন্য।
পিপুফিশু—অতিশয় অলস।
ননীর পুতুল—যে অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়।
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ—মন্দ বংশে সৎ প্রকৃতি ও সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান।
দুই নৌকায় পা দেওয়া—দুই বিপরীত বিষয়ে মন দিতে গিয়া বিপন্ন হওয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র—গলা ধাক্কা।
হাতটান—চুরির অভ্যাস।

নিম্নে আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থক বাক্য ও বাক্যাংশ দেওয়া হইল :

অকালে কিনা খায়।
অগস্ত্য যাত্রা।
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
অভাবে স্বভাব নষ্ট।
অল্প জলের মাছ।
আঁতে ঘা দেওয়া।
আদায় কাঁচকলায়।
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।
কথায় চিঁড়ে ভিজে না।
খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।
গরীবের ঘোড়া রোগ।
ঘরের শত্রু বিভীষণ।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা।
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।
ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর।
তিন নকলে আসল খাস্তা।
যাক্ প্রাণ, থাক মান।
পরের ধনে পোদ্দারি।
বসতে পেলে শুতে চায়।
বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর।
বিনা মেঘে বজ্রপাত।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।
মাছিমারা কেরানী।
যেচে মান কেঁদে সোহাগ।
ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

২৫. শব্দার্থ পরিবর্তন

শব্দের অর্থ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন প্রধানতঃ তিন প্রকার।

অর্থের সংকোচ। অর্থের বিস্তার। নূতন অর্থের আগম।

২৫. ক. অর্থের সংকোচ

করী—অর্থ হাতী।

কর আছে যাহার এই অর্থে করী শব্দের অনেক মানে হইতে পারিত, কারণ, কর শব্দের অনেক অর্থ। যথা,—হাত, শুঁড, কিরণ ইত্যাদি। বাঙ্গালায় যখন করী শব্দের ব্যবহার করি, তখন কর শব্দের শুঁড অর্থ টাই আমাদের মনে জাগে। অন্য অর্থের কথা মনে উদিতই হয় না।

হস্তী, হাতী, পক্ষী, পাখী, অন্ন, সরোজ প্রভৃতি শব্দও ঐরূপ। ইহাদের ব্যাপক অর্থ সংকুচিত হইয়াছে।

২৫. খ. অর্থের বিস্তার

পরশু—আগামী কল্যের পরদিন অর্থেই এই শব্দের ব্যবহার হওয়া উচিত; কারণ যে সংস্কৃত পরশ্বঃ শব্দ হইতে ইহা আসিয়াছে তাহার অর্থ আগামী কল্যের পরদিন। কিন্তু বাঙ্গালায় গতকালের পূর্বদিন অর্থেও পরশু শব্দের ব্যবহার হয়।

সন্দেশ—এ শব্দের অর্থ সংবাদ কিন্তু মিষ্টান্নবিশেষ অর্থেই ইহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

গাঙ—গঙ্গা শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইলেও বাঙ্গালায় ইহা নদী অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে একটি বিশেষ নদীকে না বুঝাইয়া নদীমাত্রকে বুঝাইতেছে বলিয়া গাঙ শব্দের অর্থে বিস্তার ঘটিয়াছে।

কালী—এই শব্দের অর্থ কালো রঙ্। কিন্তু এখন উহা যে কোন রঙের কালী বুঝায়। যেমন—লাল কালী, নীল কালী, সবুজ কালী।

গৌরচন্দ্রিকা—কীর্তন গানের পূর্বে চৈতন্যদেবের যে বন্দনা করা হয় তাহাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। তাহা হইতে এখন উহা যে কোন বিষয়ের অবতরণিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,—বেশী গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া যাহা বলিবার আছে বলিয়া ফেল।

তাহা হইলে দেখা গেল—পরশু, গাঙ, সন্দেহ প্রভৃতি পদে অর্থ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

২৫. গ. অর্থের উৎকর্ষ

মন্দির—এই শব্দের মূল অর্থ গৃহ কিন্তু প্রচলিত অর্থ হইতেছে 'দেবগৃহ'।

সম্ভ্রম—শব্দটির মূল অর্থ ভয় কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'মান্য'।

উপরের শব্দগুলির বুৎপত্তিগত অর্থ হইতে উৎকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ ইহাদের অর্থের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

২৫. ঘ. অর্থের অপকর্ষ

রাগ—মূল অর্থ অনুরাগ—প্রচলিত অর্থ ক্রোধ।

মহাজন—মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি। অনেক সময় সুদখোর এই অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

মহোৎসব—মোচ্ছব—মহা+উৎসব। মূল অর্থ শ্রেষ্ঠ উৎসব। প্রচলিত অর্থে বৈষ্ণবদের বিশেষ উৎসব।

রাগ—মহাজন, মহোৎসব ইত্যাদি শব্দের অর্থের অপকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

২৫. ঙ. নূতন অর্থের আগম

ঘাম—যে সংস্কৃত ঘর্ম শব্দ হইতে ঘাম শব্দের উৎপত্তি তাহার মূল অর্থ গরম। এখানে ঘাম শব্দের অর্থ স্বেদ।

কৃপণ—সংস্কৃতে এই শব্দের অর্থ কৃপার পাত্র। বাঙ্গালায় ইহার অর্থ ব্যয়কুণ্ঠ।

কেচ্ছা—আরবী কিস্‌সা শব্দের অর্থ কাহিনী, গল্প। বাঙ্গালায় ইহার অর্থ কুৎসা।

তিরস্কার—মূল অর্থ অদৃশ্য হওয়া। বর্তমান অর্থ ভৎর্সনা।

শব্দের অর্থ যে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে উল্লিখিত শব্দগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

২৬. ধ্বন্যাত্মক শব্দ

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। অর্থহীন কতকগুলি ধ্বনির সমবায়ে বাঙ্গালা ভাষা যে অর্থপূর্ণ অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে অভিধানে এখনও তাহাদের সকলের স্থান হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-পরিচয় পাইতে হইলে এই শব্দগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। 'পোকা কিলবিল করছে।' এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোন স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। 'খিটখিটে',

শব্দের প্রতিশব্দ ইংরাজীতে আছে, irritable, peevish, pettish,—কিন্তু 'খিটখিটে' শব্দের মতো এমন ভাব জোর নেই। নেশায় চুবচুব হওয়া, কটমট করে তাকানো, ধপাস করে পড়া, পা টনটন করা, গা ম্যাজম্যাজ করা, ঠিক এসব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। এই সকল শব্দকে ভাষা হইতে বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনাশক্তি অনেকটা পঙ্গু হইয়া পড়ে। নিম্নে কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল :

কচমচ	খ্যাকখ্যাক	টুপ	বকবক
কচাং	খ্যানখেনে	টুং	বোঁ
কটাস	গমগম	ঠক	বোঁ বোঁ
কড়কড়	গুমগুম	ঠকঠক	সোঁ সোঁ
কড়মড়	ঘ্যাঁচ	ঠকাস	ভক
কপাং	ঘ্যানঘ্যান	ঠুং	ভকভক
কলকল	কচকচ	ঠুনঠুন	ভাঁ
কুচকুচ	চট	ঢক	ভোঁভোঁ
কুট	চড়াস	ঢকঢক	মচ
কপ	চিঁচিঁ	তড়াক	মট
কুবকুব	চোঁ	তিড়িং	মটমট
কোঁ কোঁ	ছপাং	ধক	বিবি
ক্যাঁচক্যাঁচ	ছপাস	ধকধক	বৈবৈ
খক	ছ্যাঁকছ্যাঁক	ধড়াদ্ধড়	সাঁসাঁ
খকখক	ঝন	পট	সুটসুট
খড়গড়	ঝনাং	পটপট	সোঁ সোঁ
খপ	ঝনঝন	পুটপুট	হড়াং
খপাং	টক	ফট	হিহি
খপাস	টন	ফুস	হুহু
খলখল	টপ	ফিসফিস	হুস
খুসখুস	টং	ফোঁস	হুসহুস
খ্যাক	টকাস	বক	হুড়হুড়

ধ্বনির অনুসরণেই প্রথমতঃ ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয় এবং এরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাঙ্গালা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাতেও কিছু কিছু আছে। "যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া

থাকি।...ধ্বনির সহিত যে সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাঙ্গালার ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়।" যেমন—

কান **কট্‌কট** করে। পা **কনকন** করে। ভয়ে গা **ছমছম** করে। শূন্য হৃদয় **হুহু** করে। ভরা পুকুর **থৈ থৈ** করে। পোড়ো বাড়ী **হাঁ হাঁ** বা **খাঁ খাঁ** করে। শূন্য মাঠ **ধু ধু** করে।

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণকেও ধ্বনির দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন,—টকটকে, টুকটুকে, ডগডগে, ফুটফুটে, কুচকুচে, মিসমিসে।

২৭. শব্দদ্বৈত

বাঙ্গালা বাগ্‌ভঙ্গীর আলোচনায় শব্দদ্বৈতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পুনরাবৃত্তি প্রগাঢ়তা, দীর্ঘকালীনতা, নিরতবর্তিতা, বাহুল্য প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের দ্বিত্ব ঘটে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্যভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিবিধ বিচিত্র।"

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল:

পুনরাবৃত্তিবাচক:—বারে বারে, ঘরে ঘরে, পথে পথে, দিনে দিনে, পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়।

পরস্পরসংযোগবাচক:—মুখে মুখে, চোখে চোখে, গায়ে গায়ে, পায়ে পায়ে।

নিরতবর্তিতা-বাচক:—পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে।

দীর্ঘকালীনতা-বাচক:—বসিয়া বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, চলিতে চলিতে।

বাহুল্যবাচক:—ভাল ভাল, তাজা তাজা, কচি কচি, বড় বড়, লাল লাল, মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি।

আনুকম্প্যবাচক:—কাদা-কাদা, পড়ো-পড়ো, ভাসা-ভাসা, কাঁদো-কাঁদো, হাসি-হাসি।

দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বিতীয় শব্দ কখনও কখনও ঈষৎ বিকৃত আবার কখনও কখনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন,—

টাকাকড়ি, পাইপয়সা, হাঁড়িকুঁড়ি, ফলমূল, বাসনকোশন, কাপড়-চোপড়, ঘরদোর, গাড়ীঘোড়া, লোকলস্কর, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঠাট্টা-তামাসা, কেনাকাটা, খাটাখুটি, ওজুরপত্র, দড়াদড়ি, গোলাগুলি, বোঁচকাবুচকি, গালিগালাজ, চাকরিবাকরি, হাসি-খুসি।

ইত্যাদি অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণ স্থানে অনেক সময় ট আদেশ হয়:

যেমন—বাজারে 'মাছটাছ' কিছুই পাওয়া গেল না। অনুরূপ স্থলে ট এর পরিবর্তে ফ দিলে বিরক্তি বা অবজ্ঞা বুঝায়। যেমন—'সাবুফাবু' আর খাইতে পারি না।' 'ভূতফুতকে' ভয় করি না।

অনুশীলনী

১। বাচ্য অর্থ, লক্ষ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য অর্থ বলিতে কি বুঝ তাহা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

শব্দের যে শক্তির দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হয় সে শক্তির নাম কি?

২। নিম্নলিখিত শব্দ, শব্দসমষ্টি, বাক্য ও বাক্যাংশের বাচ্য অর্থ লিখ। উহাদের কোন লক্ষ্যার্থ অথবা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রচলিত থাকিলে তাহাও লিখ।

পঙ্কজ, চামার, জানকী, উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠ, আর্কফলা, আঁতে ঘা, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো, আজ নয় কাল (করিয়া তো বছর কাটিল), কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, না আচালে বিশ্বাস নাই, আঁচ, আগুন, আখ্যা, আক্কেল সেলামি, আকণ্ঠ, অসূর্যম্পশ্যা, ভারত (শুধুই ঘুমায়ে রয়) উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার (বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে) (এ যুদ্ধে রাশিয়ার হাত অনেকখানি), ঘরবাড়ী সব তোমার চাবিকাটিটি আমার।

৩। শব্দের অর্থ বিস্তার লাভ করে কিরূপে? অর্থবিস্তারের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৪। ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাহাকে বলে?

৫। কোন কোন অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের দ্বিত্ব ঘটে?

২৮. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

এমন অনেক শব্দ আছে, সেগুলির উচ্চারণ প্রায় একরকম, কিন্তু বানান এবং অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। এই সকল শব্দের বানান ও অর্থের পার্থক্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করা ও জানা প্রয়োজন।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অংশ	ভাগ	অংস	স্কন্ধ
অঙ্কন	আঁকা	অঙ্গন	উঠান
অর্ঘ	মূল্য	অর্ঘ্য	পূজার উপকরণ
অন্ত	শেষ	অন্ত্য	নিকৃষ্ট, শেষের
অণু	ক্ষুদ্রতম অংশ	অনু	পশ্চাৎ
অন্ন	ভাত	অন্য	অপর

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অজগর	সর্পবিশেষ	অজাগর	অনিদ্র
অনিল	বায়ু	অনীল	যাহা নীলবর্ণ নহে
অন্নপুষ্ট	অন্নদ্বারা পুষ্ট	অন্যপুষ্ট	অন্যের দ্বারা পুষ্ট, কোকিল
অবদান	মহৎকর্ম	অবধান	মনোনিবেশ
অবদ্য	নিন্দনীয়	অবধ্য	বধের অযোগ্য
অবিরাম	অনবরত	অভিরাম	সুন্দর
অবিহিত	অনুচিত	অভিহিত	কথিত
অভ্যাস	শিক্ষা	অভ্যাশ	সমীপ
অশক্ত	অসমর্থ	অসক্ত	আসক্তিহীন
অশন	ভোজন	অসন	ক্ষেপণ
অপচয়	ক্ষতি	অবচয়	চয়ন
আপণ	দোকান	আপন	নিজ
আবাস	বাসস্থান	আভাষ	সম্ভাষণ, ভূমিকা
		আভাস	ইঙ্গিত
আশা	ভরসা	আসা	আগমন
আষাঢ়	মাসবিশেষ	আসার	বৃষ্টি
আস্তিক	ঈশ্বরবিশ্বাসী	অস্তিক	জনৈক মুনি
উদ্যত	উন্মুখ, প্রবৃত্ত	উদ্ধত	দুর্বিনীত
উপাদান	উপকরণ	উপাধান	বালিশ
ওষধি	যে বৃক্ষ একবার ফল দান করিয়াই মরিয়া যায়	ঔষধি	ভেষজ উদ্ভিদ
কটি	কোমর	কোটি, কোটী	শতলক্ষ
কতক	কিছু	কথক	বক্তা
কমল	পদ্ম	কোমল	নরম
করা	ক্রিয়া	কড়া	কড়ি, শক্ত
কুজন	নিন্দিত ব্যক্তি	কূজন	পক্ষীর কাকলী
কুট	দুর্গ, পর্ব্বতশৃঙ্গ	কূট	জটিল
কুল	বংশ, সমূহ	কূল	তীর
কুশাসন	কুশনির্মিত আসন	কু-শাসন	নিন্দিত শাসন

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কৃত	সম্পাদিত	ক্রীত	যাহা ক্রয় করা হইয়াছে
কৃতি	কার্য, যত্ন	কৃতী	কৃতকর্মা, যশস্বী, পণ্ডিত
গিরিশ	মহাদেব	গিরীশ	শিব, পর্বতশ্রেষ্ঠ
গোলক	গোলা, বল	গোলোক	বৈকুণ্ঠ
চতুষ্পথ	চৌরাস্তা	চতুষ্পদ	পশু
চির	নিত্য	চীর	ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড
জড়	অচেতন	জ্বর	রোগবিশেষ
জব	বেগ	যব	শস্যবিশেষ
জাত	উৎপন্ন	যাত	গত, অতীত
জাম	ফলবিশেষ	যাম	প্রহর
জাল	পাশ	জ্বাল	অগ্নিশিখা
জালা	মাটির পাত্র	জ্বালা	যন্ত্রণা, অগ্নিশিখা
তত্ত্ব	মূল বিষয়	তথ্য	সংবাদ
তরণী	নৌকা	তরুণী	তরুণবয়স্কা
দার	স্ত্রী	দ্বার	দরজা
দারা	স্ত্রী	দ্বারা	দিয়া
দিন	দিবস	দীন	দরিদ্র
দিননাথ	সূর্য	দীননাথ	দরিদ্রের সাহায্যকারী
দীপ	প্রদীপ	দ্বীপ	চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভূভাগ
দ্বিপ	হাতী		
দূত	চর, আজ্ঞাবাহী	দ্যূত	পাশা
দেবত্ব	দেবতার ভাব	দেবত্র	দেবসেবার জন্য উৎসৃষ্ট সম্পত্তি
দেশ	ভূখণ্ড	দ্বেষ	ঈর্ষা, হিংসা
ধনী	ধনশালী	ধ্বনি	শব্দ
ধাতৃ	বিধাতা	ধাত্রী	মাতা, ধাই
নিরস্ত	ক্ষান্ত	নিরস্ত্র	অস্ত্রহীন
নিশিত	তীক্ষ্ণ	নিশীথ	মধ্যরাত্রি
নীর	জল	নীড়	পাখীর বাসা
পদ্য	ছন্দোবদ্ধ রচনা	পদ্ম	পুষ্পবিশেষ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
পরভৃৎ	কাক	পরভৃত	কোকিল
পক্ষ	মাসার্ধ	পক্ষ্ম	নেত্রলোম
পুং	নবক বিশেষ	পূত	পবিত্র
প্রকৃত	যথার্থ, সত্য	প্রাকৃত	স্বাভাবিক, লৌকিক
পরুষ	কর্কশ	পুরুষ	নর
প্রকার	রকম	প্রাকার	প্রাচীর
প্রসাদ	অনুগ্রহ	প্রাসাদ	অট্টালিকা
বন্ধ	বাঁধা, রুদ্ধ	বন্ধ্য	নিষ্ফল, নিঃসন্তান
বলি	যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তু	বলী	বলবান
বঙ্গ	বঙ্গদেশ	ব্যঙ্গ	বিদ্রূপ
বসন	কাপড়	ব্যসন	কুক্রিয়া
বাণ	তীর	বান	বন্যা
বিত্ত	ধন, অর্থ	বৃত্ত	গোল, মণ্ডল
বিনা	ব্যতীত	বীণা	তারবাদ্যযন্ত্রবিশেষ
বিশ	কুড়ি	বিস	মৃণাল
বিষ	গরল		
বিস্মিত	আশ্চর্যান্বিত	বিস্মৃত	স্মৃতি হইতে লুপ্ত
বৃন্ত	বোঁটা	বৃন্দ	গণ
ভাণ	রূপকনাট্য বিশেষ	ভান	ছল, দীপ্তি, শোভা
ভাষণ	কথন, উক্তি	ভাসন	দীপ্তি
মুখ	আনন	মূক	বোবা
যজ্ঞ	যাগ	যোগ্য	উপযুক্ত
যতি	সন্ন্যাসী	জ্যোতিঃ	প্রভা, দীপ্তি
রতি	অনুরাগ, মদনপত্নী	রথী	রথারোহী, যোদ্ধা
রিক্ত	শূন্য, নিঃস্ব	রিকৃথ	উত্তরাধিকারী সূত্রে লভ্য ধন
লক্ষ	শত সহস্র	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
লক্ষণ	চিহ্ন	লক্ষ্মণ	রামের ভ্রাতা

১, ছলে অর্থে ভাণ শব্দের প্রয়োগ অশুদ্ধ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
শঙ্কর	মহাদেব	সঙ্কর	বিভিন্ন পদার্থের মিলনে জাত
শপ্ত	অভিশাপগ্রস্ত	সপ্ত	সাত
শব	মৃতদেহ	সব	সকল
শম	শান্তি	সম	সমান
শয্যা	বিছানা	সজ্জা	সাজা
শর	তীর	স্বর	কণ্ঠ, ধ্বনি
শরণ	আশ্রয়	স্মরণ	স্মৃতি, চিন্তা
শ্রবণ	শোনা	স্রবণ	ক্ষরণ
সর্গ	সৃষ্টি, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ	স্বর্গ	দেবলোক
সত্ত্ব	অস্তিত্ব, সার	স্বত্ব	নিজত্ব
সবিতৃ	সূর্য	সবিত্রী	প্রসবিত্রী
সুত	পুত্র	সূত	সারথি
সুর	স্বর, দেব	সূর	সূর্য
		শূর	বীর
সূচী	তালিকা	শুচি	পবিত্র
সুকর	সহজসাধ্য	শূকর	বরাহ
স্কন্ধ	কাঁধ	স্কন্দ	কার্তিকেয়
সিত	শ্বেত	শীত	ঋতুবিশেষ

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :

দ্বিপ, চীর, তথ্য, গোলক, পদ্ম, ভান, ভাসন, স্কন্ধ, শুচি, শব, শরণ, লক্ষ্য, রিক্থ, শপ্ত, সম।

২। সংশোধন কর :

সর্বসত্ত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

পূর্ব গগনে দীননাথ উদিত হইলেন।

লক্ষ্মণ মিলাইয়া ওষধি দিলেই রোগ সারে।

তাহার পরনে একখানি চির।

আমি সজ্জায় শয়ন করিয়া আছি।

সর্গে দেবতাদের বাস।

স্বাস্থ্য বীণা সুখ কোথায়?

৩। অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর :

প্রাসাদ, প্রসাদ ; লক্ষ, লক্ষ্য ; মুক, মূখ ; গোলক, গোলোক ; শর, স্বর ; স্মরণ, শরণ ; অনু, অণু, কমল, কোমল ; করা, কড়া ; কৃত, ক্রীত, গিরিশ, গিরীশ , কুশাসন, কু-শাসন , কুজন, কূজন ; আস্তিক, অস্তাক ; আবাস, আভাস, আদি, আধি ; তরণী, তরুণী , দ্বারা, দারা ; নিশিত, নিশীথ।

২৮. ক. বিপরীতার্থক শব্দ

অগ্র	পশ্চাৎ	আদর	অনাদর
অধম	উত্তম	আদান	প্রদান
অধিক	অল্প	আদি	অন্ত
অনন্ত	সান্ত	আবাহন	বিসর্জ্জন
অন্তর	বাহির	আবির্ভাব	তিরোভাব
অনুকূল	প্রতিকূল	আয়	ব্যয়
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	আরম্ভ	শেষ
অনুরাগ	বিরাগ	আরোহণ	অবরোহণ
অন্ধকার	আলোক	আলস্য	পরিশ্রম
অলস	পরিশ্রমী	আশা	নৈরাশ্য
অসীম	সসীম	আস্তিক	নাস্তিক
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
আকুঞ্চন	প্রসারণ	ইতর	ভদ্র
আচার	অনাচার	ইষ্ট	অনিষ্ট
ইহলোক	পরলোক	গুরু	লঘু, শিষ্য
উচ্চ	নীচ	গৃহী	সন্ন্যাসী
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	গোপন	প্রকাশ
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট	ঘাত	প্রতিঘাত
উত্তম	অধম	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	জড়	চেতন
উত্থান	পতন	জয়	পরাজয়
উদয়	অস্ত	জাগরণ	সুপ্তি, নিদ্রা
উন্নতি	অবনতি	জীবন	মরণ
উন্মীলন	নিমীলন	জ্ঞানী	মূর্খ
উপকার	অপকার	তপ্ত	শীতল

উষ্ণ	শীতল	তরল	কঠিন
ঊর্ধ্ব	অধঃ	তরুণ	বৃদ্ধ
ঋজু	বক্র	তিক্ত	মধুর
ঐহিক	পারত্রিক	দক্ষিণ	বাম
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	দাতা	কৃপণ
কুটিল	সরল	দীর্ঘ	হ্রস্ব
কুৎসা	প্রশংসা	দুরন্ত	শান্ত
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	দুষ্কর	সুকর
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	দুঃখ	সুখ
কৃশ	স্থূল	দূর	নিকট
কৃষ্ণ	শুক্ল	ধনী	নির্ধন
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	নিত্য	অনিত্য
গুণ	দোষ	নির্মল	মলিন
নিরত	বিরত	ভারী	হালকা
নিরাকার	সাকার	ভাল	মন্দ
নিশ্চেষ্ট	সুচেষ্ট	ভূত	ভবিষ্যৎ
নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস	মিথ্যা	সত্য
পর	আপন	মিলন	বিরহ, বিচ্ছেদ
পরকীয়	স্বকীয়	মুখ্য	গৌণ
পরুষ	কোমল	মূর্খ	পণ্ডিত
পাপ	পুণ্য	যুক্ত	বিযুক্ত
প্রবল	দুর্বল	যোগ	বিয়োগ
প্রবীণ	নবীন	রাগ	বিরাগ
প্রভু	ভৃত্য	রাত্রি	দিন
প্রশংসা	নিন্দা	রোগী	নীরোগ
প্রসন্ন	বিষণ্ণ	লঘু	গুরু
বদ্ধ	মুক্ত	শত্রু	মিত্র
বন্ধুর	মসৃণ	শূন্য	পূর্ণ
বহু	অল্প	শ্রম	বিশ্রাম
বাদী	প্রতিবাদী	সঞ্চয়	ব্যয়
বিপদ্	সম্পদ্	সন্ধি	বিগ্রহ

বিষ	অমৃত	সমষ্টি	ব্যষ্টি
বিধি	নিষেধ	সুন্দর	কুৎসিত
বিরক্ত	অনুরক্ত	সুলভ	দুর্লভ
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	সুশীল	দুঃশীল
ব্যর্থ	সার্থক	সৃষ্টি	সংহার
ভয়	সাহস	সংযোগ	বিয়োগ
সংক্ষেপ	বাহুল্য	স্থূল	সূক্ষ্ম
স্থাবর	জঙ্গম	স্মৃতি	বিস্মৃতি
স্থির	চঞ্চল	হ্রাস	বৃদ্ধি

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

সূক্ষ্ম, চঞ্চল, হালকা, বিরহ, শুক, বিষ, ভবিষ্যৎ, আচার, ইতর, ইষ্ট, বিগ্রহ, সুখ, উন্মীলন, অনুরাগ, দাতা, লাভ, গুপ্ত, প্রাচীর, শোক, সৃষ্টি, অনুগ্রহ, পরলোক, জঙ্গম, আরোহণ, অন্ধকার, প্রসারণ, ভদ্র, শেষ, বিসর্জন, আরম্ভ, প্রদান, অনাদর, পরিশ্রমী, অন্তর, উত্তম, দিন, বিষণ্ণ, ব্যষ্টি, দুঃশীল, বিয়োগ, বিস্তৃত, প্রশংসা, বাম, সুকর, দান, নির্ধন, মলিন, উত্থান, উত্তমর্ণ, উর্দ্ধ, ঐহিক, কৃষ্ণ, গুণ, কৃশ, করুণ ও কঠিন।

২৯. একপদীকরণ

যাহা বলা হয় নাই—অনুক্ত
যাহা চাটিয়া খাইতে হয়—লেহ্য
যাহার মমতা নাই—নির্মম
যাহার দয়া নাই—নির্দয়
যাহার আসক্তি নাই—অনাসক্ত
যাহার মূল্য হয় না—অমূল্য
যে স্ত্রীর সন্তান হয় না—বন্ধ্যা
যাহার পুত্র নাই—অপুত্রক
এক দিকে দৃষ্টি যাহার—একচোখো
বিদেশে বাস করে যে—প্রবাসী
যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে—আস্তিক
যাহার অভিমান নাই—নিরভিমান
যাহার মৃত্যু আসন্ন—মুমূর্ষু
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—ভঙ্গুর
যাহার হুঁশ নাই—বেহুঁশ
যে অন্য কর্ম করে না—অনন্যকর্মা
যিনি স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত—স্মার্ত
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন—যুধিষ্ঠির
যে অগ্রে জন্মিয়াছে—অগ্রজ
যাহার স্ত্রী মৃত—মৃতদার, বিপত্নীক

যাহা মর্ম ভেদ করে—মর্মভেদী
উপস্থিত বুদ্ধি—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
জানু পর্যন্ত লম্বমান—আজানুলম্বিত
ইহকালে জাত—ঐহিক
পরলোক সম্বন্ধীয়—পারলৌকিক
ভিক্ষার অভাব—দুর্ভিক্ষ
জয় করিবার ইচ্ছা—জিগীষা
বিদেশ হইতে আগত—বৈদেশিক
আহার করিবার যোগ্য—আহার্য
কণ্ঠ পর্যন্ত—আকণ্ঠ
হনন করিবার ইচ্ছা—জিঘাংসা
জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা
পূর্বজন্মের কথা জানে যে—জাতিস্মর
পান করিবার ইচ্ছা—পিপাসা
মরিবার ইচ্ছা—মুমূর্ষা
পর্বতের কন্যা—পার্বতী
দশরথের পুত্র—দাশরথি
স্ত্রীর সহিত—সস্ত্রীক
পুত্রের সহিত—সপুত্রক
কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত—আকর্ণ বিস্তৃত
সকলের অপেক্ষা প্রিয়—প্রিয়তম
দুইয়ের মধ্যে একটি—অন্যতম
শাস্ত্র সম্বন্ধীয়—শাস্ত্রীয়
মন সম্বন্ধীয়—মানসিক

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না—নাস্তিক
শরীর সম্বন্ধীয়—শারীরিক
করুণা আছে যাঁহার—কারুণিক
দয়া আছে যাঁহার—দয়ালু
স্তন্য পান করে যে—স্তন্যপায়ী
যাহার আয়ু দীর্ঘ—দীর্ঘায়ু
যশ আছে যাহার—যশস্বী
বুদ্ধি আছে যাহার—বুদ্ধিমান
ধার আছে যাহার—ধারালো
যে কথার দুইটি অর্থ—দ্ব্যর্থ
যাহা সহজে পরিপাক হয় না—দুষ্পাচ্য
যাহার ঋণ নাই—অঋণী
পদপ্রক্ষালনের জন্য যে জল—পাদ্য
যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে—অযৌক্তিক
লোক সম্বন্ধীয়—লৌকিক
বিশ্বাসের অযোগ্য—অবিশ্বাস্য
যাহা অবশ্যই ঘটিবে—অবশ্যম্ভাবী
যাহা সহজে পাওয়া যায়—সুলভ
যাহা দিতে পারা যায় না—অদেয়
যাহা সরোবরে জন্মায়—সরোজ, সরসিজ
যাহা পঙ্কে জন্মায়—পঙ্কজ
যাহা শোনা চলে না—অশ্রাব্য
যাহার গন্ধ নাই—নির্গন্ধ
যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—চূষ্য

পাঁচ রকমের জিনিস মিশান আছে যাহাতে—পাঁচমিশালী
যে দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকে—দীর্ঘজীবী
যেখানে অতি কষ্টে যাওয়া যায়—দুর্গম
যে পিতাকে হত্যা করে—পিতৃহন্তা
শক্তি অতিক্রম না করিয়া—যথাশক্তি
রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই—রাতারাতি
যে আপনাকে হত্যা করে—আত্মঘাতী

যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ততদিন—আজীবন

যিনি ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন—ইন্দ্রজিৎ

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে—কৃতজ্ঞ

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না —কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ

যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য

যাহা বাক্যের অতীত—অনির্বচনীয়

যাহা বলা উচিত নয়—অকথ্য, অবক্তব্য

যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কৃতার্থম্মন্য

যাহার নাম কেহ জানে না—অজ্ঞাতনামা

যাহার শত্রু জন্মায় নাই—অজাতশত্রু

যাহার অন্য বিষয়ে মন নাই—অনন্যমনা

যাহা অধিক দীর্ঘ নহে—অনতিদীর্ঘ, নাতিদীর্ঘ

আতপ হইতে ত্রাণ করে যাহা—আতপত্র

পৃথার পুত্র—পার্থ

যাহা অধিক শীতলও নহে অধিক উষ্ণও নহে —নাতিশীতোষ্ণ

যাহা আটপ্রহর (সর্বদা) পরা যায়—আটপৌরে

যে সকল বস্তুই ভক্ষণ করে— সর্বভুক্

যে ব্যক্তি সব জানে (বলিয়া মনে করে)— সবজান্তা

যাহার শ্রদ্ধা দূর হইয়াছে—বীতশ্রদ্ধ

অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা—অনুসন্ধিৎসা

পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত—আপাদমস্তক

সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—আসমুদ্রহিমাচল

শিরে ধারণ করিবার যোগ্য—শিরোধার্য

পান করিবার যোগ্য—পেয়, পানীয়

ভক্ষণ করিবার যোগ্য— ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়

চারিটি রাস্তার সংযোগস্থল—চৌরাস্তা

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যাহার—প্রত্যুৎপন্নমতি

যশ লাভ করিবার ইচ্ছা—যশোলিপ্সা

যে হিসাব করিয়া চলে না— বেহিসাবী

যে আপনার বর্ণ গোপন করে—বর্ণচোরা

যাহা পূর্বে ছিল এখন নাই—ভূতপূর্ব

অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মায়—পরগাছা
যাহা উড়িয়া যাইতেছে—উড্ডীয়মান
যাহা চর্বণ করিয়া খাইতে হয়—চর্ব্য
যাহা পান করিয়া খাইতে হয়—পেয়
যাহার কোন উপায় নাই—নিরুপায়
যাহার স্পৃহা দূর হইয়াছে—বীতস্পৃহ, বিগতস্পৃহ
যাহার কামনা দূর হইয়াছে—বীতকাম
যে ইন্দ্রীয় জয় করিয়াছে—জিতেন্দ্রিয়
যে নারী সূর্য দেখে নাই—অসূর্যম্পশ্যা
কোন্‌টা দিক্ আর কোন্‌টা বিদিক্ এ জ্ঞান যাহার নাই—
দিগ বিদিক্-জ্ঞানশূন্য
যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না, এখন ভস্ম হইয়াছে—ভস্মীভূত
যে জামাই শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে—ঘরজামাই
যাহার অন্য উপায় নাই—অনন্যোপায়
যে নারীর সন্তান হয় না—বন্ধ্যা
যে নারীর একটিমাত্র সন্তান হইয়া আর হয় না—কাকবন্ধ্যা
যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত—বৈয়াকরণ
যিনি ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত—নৈয়ায়িক
যিনি সাহিত্যের চর্চা করেন—সাহিত্যিক
যিনি বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ—বৈজ্ঞানিক
যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই—অশ্রুতপূর্ব
যাহা পূর্বে কখন চিন্তা করা হয় নাই—অচিন্তিতপূর্ব
যাহা পূর্বে কখনও জানা যায় নাই—অজ্ঞাতপূর্ব
যে ভূমিতে ভাল ফসল জন্মায় না—অনুর্বর
যাহা উচ্চারণ করা কঠিন—দুরুচ্চার্য
যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কার্য করে—অবিমৃষ্যকারী
যাহা সম্পন্ন করিতে অনেক ব্যয় হয়—ব্যয়বহুল
যাহার বুদ্ধি পরিণত হয় নাই—অপরিণতবুদ্ধি
যাহা চিরদিন স্মরণ করিবার যোগ্য—চিরস্মরণীয়
যাহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিবার যোগ্য—প্রাতঃস্মরণীয়
যাহা সহজে অপনীত হয় না—দুরপনেয়

ভিতরে সার নাই যাহার—অন্তঃসারশূন্য
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে তাহাই যিনি দেন—ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
যিনি শক্তির উপাসনা করেন—শাক্ত
যাহা বালকেরই সাজে—বালকোচিত
ভদ্রলোক যেরূপ ব্যবহার করেন—ভদ্রোচিত
কি কর্তব্য যাহা নিরূপণে অক্ষম—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
যাহা ক্ষণকাল মাত্র থাকে—ক্ষণকালস্থায়ী
যাহা গগন স্পর্শ করিয়া আছে—গগনস্পর্শী
উপকার করিবার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা
কোথাও নিম্ন কোথাও উচ্চ—বন্ধুর
যাহা সহজে আরোগ্য হয় না—দুরারোগ্য
যে মৎস্য মাংস আহার করে না—নিরামিষাশী
যাহারা এক মাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সহোদর
যাহা অন্যের পক্ষে সুলভ নহে—অনন্যসুলভ
যে পরিণাম চিন্তা করে না—অপরিণামদর্শী
যাহার বয়স পরিণত হয় নাই—অপরিণতবয়স্ক
বালকের অহিত—বালাই
নিতান্ত দগ্ধ হয় জীব যে সময়ে—নিদাঘ
যাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে—সহিষ্ণু
যে স্ত্রীর পতিবিয়োগ হইয়াছে—বিধবা
যে স্ত্রীর স্বামী ও পুত্র নাই—অবীরা

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলিকে একপদে পরিণত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর।

যাঁহার সকল অত্যাচার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। যাহা কষ্টে হজম করা যায় (এমন খাদ্য)। যিনি ক্রোধ দূর করিয়াছেন (এমন সন্ন্যাসী)। যাঁহারা শিবের উপাসক তাঁহারা। যাহার হুঁশ নাই। যে মদ খায়। যে খুন করিয়াছে (এমন আসামী)। যে জাল করে। যে ব্যক্তির শখ আছে। যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। যিনি সর্বস্থানেই গমন করেন। ধন

লাভ করিবার ইচ্ছা আছে যাহার। যে উচিত ব্যয় করে। দুই বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর প্রিয়। যাহা উচ্চারণ করা উচিত নয়। যাহা দেখিবার উপযুক্ত। কল্পনা হইতে উদ্ভূত। যে নারীর পতিপুত্র কেহই নাই (অবীরা)। মূর্ধা হইতে উৎপন্ন। যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহারা নিশাকালে বিচরণ করে। লাঠিতে লাঠিতে মারামারি। গোড়া হইতে। যে ঘুমাইতেছে (ঘুমন্ত)। যাহা চলিতেছে (চলন্ত)। যাহা কম্পিত হইতেছে (কম্পমান)। যাহা দেখা যাইতেছে (দৃশ্যমান)। যাহারা বিবাদ করিতেছে (বিবদমান)। যাহা দীপ্তি পাইতেছে (দীপ্যমান)। যে শুইয়া আছে (শয়ান)। যে বসিয়া আছে (আসীন)। যাহা ডুবিতেছে (ডুবন্ত)। যাহা ভাসিতেছে। যাহা ধূম উদ্গিরণ করিতেছে। যাহা শব্দ করিতেছে (শব্দায়মান)। যাহার দেহ বল্মীকের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল সেই ঋষি। চণকের পুত্র। জনকের কন্যা। দুহিতার পুত্র। বিমাতার পুত্র। দ্রুপদের কন্যা। বেদান্তশাস্ত্রে পণ্ডিত। বুদ্ধের উপাসক। ব্রহ্মের উপাসক। যাহা স্থির করা হইয়াছে। যাহা রাশি করা হইয়াছে (রাশীকৃত)। যিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত। যাহার বুদ্ধি কুশের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ (কুশাগ্রধী)। যে দুই হাতেই কাজ করিতে পটু (সব্যসাচী)।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে সম্প্রসারিত কর :—

বৈষ্ণব, অনুরব, পরাৎপর, অজ্ঞান, মানব, বাস্তব, জ্যেষ্ঠ, বীতরাগ, দুর্মতি, মন্দীভূত, আমূল, আগাগোড়া, হাতাহাতি, পূর্বাপর, চাঁদমুখ, রাজকুলতিলক, চন্দ্রবংশাবতংস, মধ্যাহ্ন, হিতৈষী, প্রত্যুৎপন্নমতি, অবিমৃষ্যকারী, হুতাশন, সৌর, চান্দ্র, পাক্ষিক, কৌরব, পাণ্ডব, ধৃতরাষ্ট্র, মায়াতুর, সৌমিত্রি, হাভাতে, দোহাতী, চশমখোর, (যাহার চক্ষুলজ্জা নাই), মিশ্ কালো, নাবালক, সাবালক, নেশাখোর, সুদখোর, সিঁদেল, বেসামাল, মায়াকান্না, সমসাময়িক, নমস্য, বহুদর্শী, অনাঘ্রাতপূর্ব, মন্বন্তর, যুগান্তর, মুষ্টিমেয়, পরশ্রীকাতর, সর্বজনীন, অগ্রাহ্য, প্রিয়ংবদা, ধারাবাহিক, বরাহূত, অনাহূত, ভুক্তোচ্ছিষ্ট, সহধর্মিণী, সগোত্র, অরিন্দম, দুরারোহ, আসন্নপ্রসবা, অজ্ঞাতকুলশীল, সুগ্রীব, (সুন্দর গ্রীবা যাহার), শুচিস্মিতা, ছিন্নমস্তা, অকিঞ্চন, অকুতোভয়, আকস্মিক, অশিক্ষিতপটু (শিক্ষা না করিয়াই যে পটুতা লাভ করে), উদ্বেল, (যাহা বেলাভূমি অতিক্রম করে), অপৌরুষেয় (যাহা মানুষের কৃত নয়), উন্মুখ, উদ্গ্রীব, নবোঢ়া, উচ্ছৃঙ্খল, প্রোষিতভর্তৃকা, (যাহার পতি বিদেশে আছে), উড্ডীয়মান, জাতিস্মর, চলচ্চিত্র, হৃতসর্বস্ব, যাবজ্জীবন।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখ :—

মলয়ে জন্ম যাহার তাহার দ্বারা শীতল হইয়াছে যে বঙ্গভূমি সেই বঙ্গভূমিই আমার স্বদেশ। পিতামাতা এমন দেবতা যাঁহাদের চক্ষু দিয়া দেখা যায়। যে পতঙ্গের ছয়টি পা আছে সেই পতঙ্গ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে মধু আহরণ করিয়া বেড়ায়। শরৎকালের ইন্দুর ন্যায় আনন যাহার, নগরসমূহের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে আনন্দ দান করেন যিনি, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

৩০ প্রতিশব্দ

কোনো শব্দের পরিবর্তে একই অর্থব্যঞ্জক অন্য যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহাদিগকে উক্ত শব্দের প্রতিশব্দ বলে। এই প্রতিশব্দ এক বা একাধিক হইয়া থাকে। প্রতিশব্দ জানা থাকলে যেখানে যে শব্দটি ব্যবহার করিলে রচনা শ্রুতিমধুর ও সুন্দর হয়, সেইখানে সেই শব্দটি লাগাইতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত প্রতিশব্দ জানা থাকিলে বাক্যের অর্থ বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের প্রতিশব্দ দেওয়া হইল :

অগ্নি—বহ্নি, হুতাশন, বৈশ্বানর, বিভাবসু, অনল, সর্বশুচি, সর্বভুক্, পাবক, আগুন, ঊর্ধ্বশিখ, জাতবেদাঃ।

অসুর—দৈত্য, দানব, দনুজ, দেবারি।

অতিথি—অভ্যাগত, আগন্তুক।

অন্ধকার—আঁধার, তিমির, তমিস্র, তমঃ।

অমৃত—অমিয়, পীযূষ, সুধা।

অর্থ—বিভব, বিত্ত, ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ।

অশ্ব—তুরঙ্গম, বাজী, হয়, ঘোটক, তুরগ, তুরঙ্গ।

আকাশ—গগন, ব্যোম, শূন্য, নভস্থল, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, খ, অম্বর, নভঃ।

ইচ্ছা—কামনা, বাসনা, সাধ, অভিলাষ, অভিপ্রায়, অভিরুচি, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা।

ঈশ্বর—বিধাতা, বিধি, বিভু, ভগবান, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর ত্রিলোকেশ্বর।

উদর—জঠর, গর্ভ, পেট।

কপাল—ললাট, ভাল।

কর্ণ—শ্রবণ, শ্রুতি, কান, শ্রোত্র।

কেশ—চিকুর, কুন্তল, অলক, চুল, শিরোরুহ।

কিরণ—রশ্মি, দীপ্তি, কর, বিভা, অংশু, ময়ূখ, জ্যোতি।

কন্যা—তনয়া, নন্দিনী, সুতা, দুহিতা।

ক্রোড—অঙ্ক, কোল।

গঙ্গা—ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, ত্রিপথগামিনী, ভোগবতী, ত্রিদশেশ্বরী।

গাল—গণ্ড, কপোল।

গৃহ—ঘর, নিলয়, আগার, ভবন, ধাম, আলয়, আবাস, নিকেতন, বাটী, বাড়ী, সদন, বিহার।

চর্ম—ত্বক্‌, অজিন, চামড়া।

চন্দ্র—চাঁদ, ইন্দু, বিধু, সুধাংশু, সুধাকর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, শশধর, চন্দ্রমা, সোম, হিমাংশু, শীতাংশু, হিমকর, সোম, সিতাংশু, দ্বিজরাজ, নিশাকর, কলানিধি।

জল—নীর, বারি, সলিল, উদক, অম্বু, জীবন, তোয়।

জ্যোৎস্না—কৌমুদী, চন্দ্রকর, চন্দ্রিকা।

তট—কূল, তীর, তটভূমি, সৈকত, পুলিন।

তরঙ্গ—ঊর্মি, বীচি, হিল্লোল, লহরী, ঢেউ।

দিন—দিবা, দিবস, বাসর।

ধনু—শরাসন, চাপ, কার্মুক, কোদণ্ড।

নদী—তটিনী, স্রোতস্বিনী, প্রবাহিণী, সরিৎ, তরঙ্গিণী, নিম্নগা, অপগা।

নারী—স্ত্রী, কামিনী, মহিলা, বনিতা, রমণী, অঙ্গনা, বামা, ললনা।

পতি—স্বামী, ভর্তা, বর।

পত্নী—দার, জায়া, সহধর্মিণী, ভার্যা।

পদ্ম—শতদল, কমল, উৎপল, অরবিন্দ, পঙ্কজ, সরোজ, সরোরুহ, সরসিজ।

পর্বত—গিরি, শৈল, নগ, ভূধর, অচল, পাহাড়।

পৃথিবী—বসুমতী, বসুন্ধরা, অবনী, ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, মেদিনী, ক্ষিতি, ভূ, মহী, পৃথ্বী, সর্বংসহা।

মাতা—জননী, প্রসূতি, ধাত্রী, অম্বা, গর্ভধারিণী, মা।

মনুষ্য—মানব, নর, মনুজ, লোক।

মিত্র—বন্ধু, সখা, সুহৃদ্‌, সহচর।

মৃত্যু—পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ, মহাযাত্রা, মহানিদ্রা, মহাপ্রয়াণ, বিনাশ, নিধন, মরণ, দেহত্যাগ, প্রাণত্যাগ, তিরোভাব।

মেঘ—জলদ, জলধর, জীমূত, অভ্র, ঘন, বারিদ।

যম—শমন, ধর্মরাজ, কৃতান্ত, কাল।

রাত্রি—নিশা, যামিনী, রজনী, বিভাবরী, নিশীথিনী, সর্ব্বরী, তমস্বিনী, ত্রিযামা।

শৃগাল—জম্বুক, শিবা, শিয়াল।

সর্প—ফণী, ভুজঙ্গ, বিষধর, আশীবিষ, নাগ।

সমুদ্র—সাগর, পারাবার, সিন্ধু, জলধি, রত্নাকর, বারিধি, অব্ধি, অম্বুধি।

সিংহ—কেশরী, পশুরাজ, মৃগপতি।

সূর্য—ভাস্বর, রবি, প্রভাকর, দিবাকর, তপন, বিবস্বান, মার্তণ্ড, লোক-প্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, তপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, অরুণ, ভানু, দিনমণি, মিহির।

স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, হেম, হিরণ্য, কনক।

হরিণ—মৃগ, কুরঙ্গ, কুরঙ্গম।

হাতী—করী, বারণ, মাতঙ্গ, গজ, হস্তী, কুঞ্জর, দ্বিরদ, মাতঙ্গম, দ্বিপ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অন্ততঃ তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ :—

মেঘ, সূর্য, চন্দ্র, স্বর্ণ, মৃত্যু, পদ্ম, তরঙ্গ, গঙ্গা, সাগর, চর্ম, জল, মাতা, মিত্র।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

অলক, অরবিন্দ, অচল, সখা, অশ্ব, শরাসন, বর, ভূধর, ভবন, নন্দিনী।

৩১. ভিন্নার্থক শব্দ

এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি এইরূপ শব্দের নিদর্শন দেওয়া গেল :

অম্বর (আকাশ)—হিমালয়ের অম্বরচুম্বী শিখরগুলি মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

" (বস্ত্র)—সূর্যদেব যেন রক্তাম্বর পরিধান করিয়া পূর্বাচলে আসিয়া দেখা দিলেন।

অম্বর (জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী)—অম্বররাজ সম্রাট মানসিংহ ছিলেন রাণা প্রতাপের প্রধান শত্রু।

অপেক্ষা (চাইতে)—এ জগতে বন্ধু অপেক্ষা প্রিয় আর কে?

" (প্রতীক্ষা)—রামের জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি।

অভ্র (আকাশ, মেঘ)—অভ্রভেদী দেবালয় নির্মাণ করিলেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

অভ্র (খনিজদ্রব্য বিশেষ)—গিরিডিতে অনেকগুলি অভ্রের খনি আছে।

অর্থ (ধন)—এ দেশের অধিকাংশ লোকই অর্থাভাবে কষ্ট পায়।
" (মানে)—তোমার কথার অর্থ আমার নিকট পরিষ্কার হয় নাই।
" (উদ্দেশ্য)—কিন্তু তোমার এই হঠাৎ বিরাগী হওয়ার অর্থ কী ?
অচল (উপায়হীন)—অর্থাভাবে সংসার তো অচল হইয়া উঠিয়াছে।
" (অব্যবহার্য)—আধুনিক সাহিত্যে রোমান্টিসিজ্‌ম্ কি অচল ?
" (পর্বত)—রামের চরিত্র ছিল হিমাচলের মতই বিরাট।

অঙ্ক (ক্রোড়)—মায়ের অঙ্কেই আমার সারা শিশুকাল কাটিয়াছে।
" (গণিত)—অঙ্কে আমি তো একেবারেই কাঁচা।
" (নাটকের পরিচ্ছেদ)—নাটকটি পঞ্চাঙ্ক।

আলাপ (পরিচয়)—কবির সঙ্গে আমার আলাপ ছিল।
" (কথোপকথন)—এ বিষয়ে তোমার সহিত আলাপ করিতে হইবে।
" (সুরসাধনা)—এসরাজে এখন বেহাগের আলাপ চলিতেছে।
উত্তর (জবাব)—তোমার ওকথার উত্তর আমি দিব না।
" (দিক্‌বিশেষ)—হিমালয় ভারতের উত্তরে।
" (পরবর্তী)—উত্তরকালে শিশুরাই তো পিতা হইবে।
" (অসাধারণ)—মহাত্মা গান্ধী একজন লোকোত্তর পুরুষ।
" (বিরাট রাজার পুত্র)—উত্তরের সারথি হইলেন অর্জুন।
কপাল (অদৃষ্ট)—কপালে কী যে আছে ভগবানই জানেন।
" (ললাট)—কপালে এঁকে দাও রক্ততিলক।
" (মড়ার খুলি)—কাপালিকের হাতে নরকপাল, তাহাতে সুরা।

কলা (চন্দ্রের অংশ)—আজ পূর্ণিমা, চাঁদের ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে।
" (কদলী, রম্ভা)—কলা একটি সুস্বাদু ফল।
" (সঙ্গীতাদি সুকুমার বিদ্যা)—চিত্রকলায় আমি বিশেষ উৎসাহী।

কর (হাত)—সাহেব করমর্দন করিয়া হাসিতে লাগিল।
" (খাজনা)—রাজাকে করপ্রদান করা প্রজার কর্তব্য।

কর (কিরণ)—"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর"।

কাণ্ড (ব্যাপার)—এ বাড়ীতে দেখছি ভূতুড়ে কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে।
" (গাছের গুঁড়ি)—বৃক্ষের এমন বিরাট কাণ্ড কখনও দেখা যায় না।
" (সাধারণ)—এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করিবে তাহা তো আমার অগোচর ছিল।
" (অধ্যায়)—রামায়ণ সাতকাণ্ডে বিভক্ত।

কাল (কল্য)—আমি কাল তোমাদের বাড়ী যাইতে পারিব না।
" (সময়)—কাল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না।

গতি (আশ্রয়)—হে ঈশ্বর, তুমিই অগতির গতি।
" (গমন)—তাহার কথা শুনিবামাত্র আমার গতি রুদ্ধ হইল।

গাল (গণ্ড)—অমন গালে হাত দিয়া কী ভাবিতেছ ?
" (কল্পিত)—ও সমস্তই গালগল্প—উহার মধ্যে সত্য খুঁজিও না।
" (গালি)—বিন্দুর মা চীৎকার করিয়া চোরকে গাল দিতে লাগিল।

চাপ (ধনুক)—"চাপ ধরি কুম্ভকর্ণ ছুটিলা সবেগে।"
" (জমাট)—রক্ত চাপ হইয়া গিয়াছে।
চাপ (ভার)—মোটেই সময় নাই, কাজের বড় চাপ পড়িয়াছে।
" (ঠাসাঠাসি)—যাত্রীর চাপে গাড়ীতে ওঠা দায়।

চাল (চাউল)—দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত, চালের দাম আগুন।
" (দেমাক)—উহার চাল আমি ভাঙিয়া দিব।
" (কৌশল)—আচ্ছা চাল চালিয়াছে।
" (ছাদ)—খড়ের চাল ফুটা হইয়া গিয়াছে।
" (ব্যবহার)—পুরানো চাল আর চলিবে না।
" (চলন)—গরুটার চাল খারাপ হয়ে গেছে।
ছল (প্রসঙ্গ)—আমি তোমাকে ঠাট্টার ছলে ওকথা বলেছিলাম।
" (ছলনা)—ছলে, বলে, কৌশলে কাজ হাসিল করিতে হইবে।

" (খুঁৎ)—সব কাজে অত ছল ধরিতে গেলে চলে না।

জাল (নকল)—এ নোটটি জাল, এ চলিবে না।
" (ফাঁদ)—জালে প্রচুর মাছ উঠিয়াছে।
দণ্ড (শাস্তি)– যেমন কুকর্ম করিবে, তেমনি দণ্ড ভোগ করিতে হইবে
" (যষ্টি)—এক দণ্ডধারী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
" (সময় বিভাগ)—তুমি কি এক দণ্ড স্থির হইয়া বসিবে না ?

ধর্ম (কর্তব্য কর্ম)—ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম।
" (স্বভাব)—অগ্নির ধর্মই হইতেছে দহন।
" (পুণ্যকর্ম)—ধর্ম না করিলে স্বর্গলাভ হইবে কিরূপে ?
" (যম)—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

ধারা (আচরণ)—বংশের ধারা বজায় রাখা উচিত।
" (প্রবাহ)—"যে নদী মরুপথে হারাল ধারা।"
" (বর্ষণ)—"সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা।"
" (প্রকার)—এমন ধারা ব্যবহার তোমার কাছে আশা করতে পারি নি।
" (আইনের বিভাগ)—১৪৪ ধারা শহরে এখনও বলবৎ আছে।

নাম (খ্যাতি)—বাপের নাম ডুবিয়েছ—এমন কুপুত্র !
" (আখ্যা)—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
প্রকৃতি (নিসর্গ)—রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি।
" (স্বভাব)—লোকটি এতদিনে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

পাত্র (আধার)—"আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।"
" (নাটকের চরিত্র)—নাটকের পাত্রপাত্রীগুলি সব যেন কলের পুতুল।
" (বর)—বাজারে পাত্র এতই দুর্মূল্য যে দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

পাকা (ইটের তৈরী)—এমন পাকা বাড়ী তুমি ছেড়ে দিলে ?
" (খাঁটি)—পাকা সোনার দর আমি জানি না।

পাকা (স্থায়ী)—এ রং পাকা।
„ (সাদা)—চল্লিশ না পেরোতেই পাকাচুলে মাথা ভরে গেল যে।
„ (পুরাপুরি)—পাকা চারটি বছর লাগবে পাশ করতে।
„ (অভিজ্ঞ)—পাকা লোকের কাছে পরামর্শ নাও।

বর্ণ (রং)—নীলবর্ণের আকাশ দেখিতেছ, কিন্তু আকাশের বর্ণ নাই।
„ (অক্ষর)—তোমার কথার একবর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।
„ (জাতি)—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ লইয়া হিন্দু সমাজ।

বাত (বায়ু)—প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বহু ক্ষতি হইয়াছে।
„ (রোগবিশেষ)—বাতে লোকটি একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।

বাস (গন্ধ)—"থেকে থেকে ফুলের বাসে।
কী কথা যে মনে আসে।"
„ (আবাস)—সেই ঘন অরণ্যের মধ্যে হিংস্র পশুদের বাস।
„ (বস্ত্র)—পরনে পীতবাস, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ।

বিহার (ক্রীড়া)—এ বনে দেবকন্যারা বিহার করেন।
„ (ভ্রমণ)—পশুপক্ষিগণ এখানে নির্ভয়ে বিহার করে।
„ (বৌদ্ধ মঠ)—বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বিহারে বাস করিতেন।
„ (প্রদেশবিশেষ)—বিহারে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জলিয়া উঠিয়াছিল।

বিধি (বিধাতা)—"বিধির বিধান কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান ?"
„ (বিধান)—শাস্ত্রের বিধি মানিয়া চলিতে হইবে।
ভার (বোঝা)—"এ মণিহার লাগে বিষম ভার।"
„ (দায়িত্ব)—এ কাজের ভার যে কেহ লইবে না তাহা জানিতাম।
„ (বিষণ্ণ)—মেয়ে আমার মুখ ভার করে বসে আছে, পুতুল কিনতে ভুলে যাব।
„ (কঠিন)—তোমার মতলব বোঝা ভার।

ভূত (প্রেত)—ভূতের ভয়ে অমন সুন্দর বাড়ীটা ছেড়ে দিলে ?

ভূত (প্রাণী)—সর্বভূতে ভগবানেব অধিষ্ঠান।
„ (অতীত)—ভূত-ভবিষ্যৎ সব আমি বলে দিতে পারি।
„ (ক্ষিতি, অপ্, আদি, উপাদান)—পঞ্চভূত হইতে এই দেহেব উৎপত্তি, পঞ্চভূতেই ইহার বিলয়।

মতি (মাণিক্য)—বাজকন্যাব গলায় গজমতির হাব।
„ (মন)—কী কবে তোমাব এমন দুর্মতি হল ?
মর্ম (হৃদয়)—তোমাব দয়া আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি কবেছি।
„ (মানে)—অধ্যাপকেব কথার মর্ম বুঝিতে পাবিলাম না।

মালা (মাল্য)—তোমাব গলায় বনফুলেব মালা।
„ (সমূহ)—পবতশিখবে মেঘমালাব লীলা।

মুখ (বদন)—"উঠ শিশু মুখ ধোও, পব নিজ বেশ।"
„ (মান)—দেখো, মুখ বাখতে পাববে তো ?
„ (বচন)—মুখে বড়াই কবে কী লাভ, কাজ কব।
„ (গঞ্জনা)—তোমাব মুখেব জালায় আব তো বাড়ীতে টেঁকা যায় না।

বাগ (ক্রোধ)—বাগে আমাব সবাঙ্গ জলে যাচ্ছে।
„ (অনুবাগ)—শ্রীবাধিকাব বাগে পুলকিত অঙ্গ।
„ (সঙ্গীতেব অঙ্গ)—ভাবতীয সংগীতশাস্ত্রে ছয় বাগ ও ছত্রিশ বাগিণীব উল্লেখ আছে।
„ (বর্ণ)—পূবাচল নবাকণবাগে বঞ্জিত হইযা উঠিল।

লোক (মানুষ)—লোকটি আমাব বড প্রিয়।
„ (ভুবন)—লোকে লোকান্তবে এই অপূব বার্তা প্রচাবিত হোক।
লোক (জনসাধারণ)—পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে তুমি সর্বদাই সংকুচিত।
„ (ভৃত্য, কর্মচাবী)—বাযবাড়ীতে বহু লোকজন খাটে।

সঙ্গতি (ধন)—মেয়ের বিযে দেবে এমন সঙ্গতি তাব নেই।
„ (সামঞ্জস্য)—তোমার কথায় আর কাজে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

সুর (সঙ্গীতের স্বর)—"তুমি যে সুরের আগুন জালিয়ে দিলে মোর প্রাণে।"

,, (দেবতা)—সুর আর অসুরে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে উঠল।

,, (মত)—কি হে, হঠাৎ সুর যে বদ্‌লে গেল ?

হাত (অঙ্গবিশেষ)—যতদিন দুটো হাত আছে, ততদিন ভয় কাকে ?

,, (আধিপত্য)—যেখানে আমার হাত নেই, সেখানে কিছু করতে বলো না আমাকে।

,, (অধিকার করা)—বড় বড় লোকগুলোকেই তো হাত করে ফেলেছি—কাজ হাসিল করতে কতক্ষণ ?

হাল (লাঙ্গল)—হালের গরুগুলো পর্যন্ত বেচে দিতে হল।

,, (নৌকার অঙ্গবিশেষ)—মাঝি হাল ধরে বসে আছে।

,, (দায়িত্ব)—বিপদ আসবে কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না।

,, (অল্পদিনের মধ্যে)—হালে দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অন্ততঃ দুই প্রকার অর্থ বাহির করিয়া বাক্য রচনা কর :—

মুখ, অঙ্ক, আলাপ, উত্তর, গতি, চাল, ছল, ধারা, ভূত, মালা, বর্ণ, নাম, বিচার, সঙ্গতি, রাগ, সুর, পাকা।

---

৩১. ক. ভিন্নার্থক শব্দ (ক্রিয়া)

আনা (উপার্জন করা)—তা মাসে অন্ততঃ পঁচিশ টাকা আনি।

,, (আনয়ন করা)—কলমটা আন তো।

আসা (অভ্যাস থাকা, যোগানো)—বক্তৃতা করা আমার ঠিক আসে না।

,, (লাভ হওয়া)—সে টাকা পেলে আমার কী আসে যায়।

,, (রোজগার হওয়া)—ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা আসে।

,, (আগমন করা)—আজ শিক্ষক মহাশয় আসবেন না।

ওড়ানো (উড্ডীন করা)—ছেলেটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

,, (বেপরোয়া খরচ করা)—হাতে কাঁচা পয়সা পেয়ে খুব ওড়াচ্ছে। ?

গাওয়া (গান করা)—মেয়েটি গায় মন্দ না।

গাওয়া (প্রচার করা)—বন্ধুর গুণ আর গেয়ো না।
,, (বলে রাখা)—এখন থেকে গেয়ে রাখছি, শেষে দোষ দিও না।

চটা (রাগ করা)—আহা অত অল্পেতেই চট কেন ?
,, (বিবর্ণ হওয়া)—রংটা চটে গেল।

চষা (চাষ করা)—চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরে মাঠের মাটি চষে।
,, (বারংবার যাতায়াত করা)—সারা কলকাতা শহরটা চষে ফেল্‌লাম, অথচ একটা বাড়ী পেলাম না।

চলা (গমন করা)—আজ তবে আমি চল্‌লাম, নমস্কার।
,, (কাজ করা)—ঘড়িটা তো ঠিক চলছে না।
চল (ফলপ্রসূ হওয়া)—ওসব ভণ্ডামো আর চলবে না।
,, (প্রচলন থাকা)—ফ্যাশান আজকাল চলে না।
,, (ব্যয় নির্বাহ হওয়া)—এই টাকায় এত বড় পরিবার চলে কী ক'রে ?

চরা (বিচরণ করা)—মাঠে গরু চরে।
,, (ঘুঘু চরা = জনশূন্য হওয়া)—তোমার ভিটেয় একদিন ঘুঘু চরবে—এ আমি বলে রাখছি।

চাটা (লেহন করা)—ছোট ছেলেরা হাত চাটে।
,, (পা চাটা = তোষামোদ করা)—তোমার মত লোকের পা চাটা আমার স্বভাব নয়।

ঢোকা (প্রবেশ করা)—শেয়ালটা গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল।
,, (মাথায় ঢোকা = বোধগম্য হওয়া)—এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকল না ?
,, (যোগদান করা)—বিনয় আজকাল ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছে।
নাচা (নৃত্য করা)—ময়ূরটা কী চমৎকার নাচ্‌ছে।
,, (কাঁপা)—আমার ডান চোখ নাচছে।
,, (উত্তেজিত হওয়া)—যার তার কথায় অত নেচে ওঠা ভাল নয়।

বলা (বাক্য উচ্চারণ করা)—সত্যি কথাটা বলেই ফেল না।
,, (জানানো)—তোমাকে আমি বলে রাখলুম আগে থেকে।
,, (নিমন্ত্রণ করা)—কী হে বিয়ে করলে, আমাদের তো বললেও না।
,, (সাবধান করা)—কাজটা করলে, কিন্তু সুবিধে হবে না বলে দিচ্ছি।

মারা (প্রহার করা)—আহা, ছেলেটাকে অমন মারছ কেন?
,, (কৌশলে হস্তগত করা)—বন্ধুর টাকাগুলো অমন ক'রে মেরে দেওয়া তোমার উচিত হল না কিন্তু।
,, (চাল মারা = অহংকার করা)—তোমার চাল মারা আমি বন্ধ করে দেব।
,, (ডুব মারা = আত্মগোপন করা)—চুরি করেই চোর তো ডুব মারলে।

সরা (দূরে যাওয়া)—সরে যাও, সরে যাও, মহারাজ আসছেন।
,, (নিঃসৃত হওয়া)—মুখে যে এখন কথা সরছে না।
,, (সরিয়ে ফেলা = চুরি করা)—জিনিসপত্রগুলো কে যে কোথায় সরিয়ে ফেললে!

পড়া (পতিত হওয়া)—বাড়ীটা পুরানো হয়েছিলো, তাই পড়ে গেল।
,, (পেটে পড়া = খাওয়া)—আজ সারাদিন তার পেটে কিছুই পড়ে নি।
,, (কমা)—'বেলা যে পড়ে এলো, জল্‌কে চল।'
,, (খরচ হওয়া) বাড়ীটা তৈরী করতে অনেক টাকা পড়েছে।
,, (খসা)—মাথার চুলগুলো এই বয়সেই যে সব পড়ে গেলো?
,, (জন্মিয়াছে)—কলতলায় ছেৎলা পড়েছে।
,, (অভাব হওয়া)—আজকাল একটু টানাটানি পড়েছে।

লাগা (স্পৃষ্ট হওয়া)—জামায় এ কী লেগেছে?
,, (নিবিষ্ট হওয়া)—পড়ায় কি ছেলের কখনও মন লাগে।
,, (আঘাত দেওয়া)—তার কথাগুলো সত্যিই গায়ে লাগে।
,, (ভাল লাগা = মনোমত হওয়া)—গান আমার ভাল লাগে।
,, (ভয় লাগা = ভীত হওয়া)—ভূতের গল্প বল্‌লে ভয় লাগে।
,, (ধুম লাগা = ঘটা হওয়া)—রায়বাড়ীতে পুজোর ধুম লেগেছে।
(নিযুক্ত হওয়া = পশ্চাদনুসরণ করা)—আমার পিছনে পুলিশ লেগেছিলো।

খাওয়া (ডুবিয়া জল খাওয়া = গোপনে কিছু করা)—লোকে বলে রাম ডুবে ডুবে জল খায়।

,, (ঘুষ খাওয়া = উৎকোচ গ্রহণ করা)—তাঁকে আমি ভালো বলেই জানতাম, কিন্তু শুনলাম তিনি ঘুষ খান।

,, (হোঁচট খাওয়া = পায়ে চোট লাগা)—হোঁচট খেয়ে পাটা একেবারে কেটে গেছে।

,, (মাথা খাওয়া = নষ্ট করা)—কুসংসর্গই তোমার মাথাটি খেয়েছে।

,, (হিম্‌সিম্ খাওয়া = নাকাল হওয়া)—কাজটা কি কম কঠিন, একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হয়।

ধরা (ধৃত করা)—চোরটাকে ধরা গেল না, পালাল।

,, (আরম্ভ করা)—ধর হে একটা গান ধর।

,, (ব্যথা হওয়া)—আমার মাথাটা আজ বড্ড ধরেছে।

,, (গোঁ ধরা = একগুঁয়ে হওয়া)—অমন গোঁ ধরে বসে থাকলে কোন কাজ হবে না।

,, (থামা)—বৃষ্টিটা ধরেছে, এই বেলা বেরিয়ে পড়া যাক।

,, (লাগা)—ইস্, বইটায় উই ধরেছে।

,, (লগ্ন হওয়া)—গামছাটায় ময়লা ধরেছে, কাচতে হবে।

রাখা (স্থাপন করা)—মিষ্টির হাঁড়িটা ওইখানে রাখো।

,, (দেওয়া)—আপনার ছেলের কি নাম রেখেছেন?

,, (অবলম্বন করা)—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি?

,, (মুখ রাখা = সম্মান রক্ষা করা)—এমন কাণ্ড করে বস্‌লে যে এখন মুখ রাখা দায়।

,, (নজর রাখা = দৃষ্টি দেওয়া)—জিনিসপত্রের দিকে একটু নজর রেখো, এখানে বড্ড চোরের ভয়।

,, (মন রাখা = সন্তুষ্ট করা —সকলের মন রাখতে গেলে কারো মনই রাখা যায় না।

বিশিষ্টার্থে নানাস্থলে দা ধাতুর ব্যবহার হয়। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতে অর্থ সহজেই বুঝা যাইবে তাই সকল অর্থ দেওয়া হইল না।

দেওয়া (দান করা)—আমার টাকাটা শীঘ্র দাও।

দেওয়া—আমার শরীরের উপর চোখ দিয়ো না।
" —আমার কথায় কি তুমি কান দেবে না?
" —গাঁয়ের মোড়লই ঝগড়াটা শেষে মিটিয়ে দিলে।
" —অঙ্কটা মিলিয়ে দাও দেখি।
" —যে কোন ছুতো করে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়াই তোমার কাজ।
" —আর একটা টান দাও সুতাটায়।
" —তোমার যত ইচ্ছে গাল দাও, আমার কোন ক্ষতি হবে না।
" —আমি বিশেষ ক'রে এই কথাটাতেই জোর দিতে চাই।
" —মন তো একেবারে ভেঙ্গে গেছে, এ আর জোড়া দেওয়া যাবে না।
" —ছাতাটা ছিঁড়ে গেছে, তালি দিতে হবে।
" —ছেড়ে দাও বেচারিকে ওর কোন দোষ নেই।
" —ঘরটা একটু ঝাঁট দাও, বড্ড নোংরা হয়েছে।
" —তোমার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম।
" —জানিনা, ভগবান এ দুঃখীকে আর কত কষ্ট দেবেন।
" —'কে আমারে ডাক দিয়েছে।'
" —অত তাড়া দিলে কাজ হয় না।
" —তোমার সমস্ত প্রগল্‌ভতা আমি কমিয়ে দিতে চাই।
" —বইটা ভি. পি. করেই পাঠিয়ে দাও।
" —আজ দেখিয়ে দাও জগতের কোন জাতির চেয়ে হীন নও তোমরা।
" —কুকুরকে নাই দিলে সে ঘাড়ে চড়ে বসে।
" —তোমাকে এই সুযোগে আমি কিছু পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো।
" —অস্ত্রে শান দাও বন্ধু, দেশের দুর্দিন এসেছে।
" —সুড়্‌সুড়ি দিয়ে হাসাবে না কি?
" —ভীরুর মত শেষকালে লম্বা দিলে, এমন কাপুরুষ।

যাওয়া—এতো তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?
" —জাহান্নামে যাও—যেখানে ইচ্ছে যাও—আমি আর দেখতে যাচ্ছি না।
" —ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে।
" —বেশী কথা বলেই দেশটা উৎসন্ন গেলো।
" —কাজ করতে করতে মরে গেলাম।
" —যা পাই, তাতেই সংসার অতি কষ্টে চলে যায়।

যাওয়া—এমন করে বললাম, একেবারে গলে গেলো লোকটা।
" —এমন মাবব, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে !

করা—গোলমাল ক'রো না, এখন কাজ করছি।
" —আর রাত ক'রো না, এবার বাড়ী ফেরো।
" —সম্পত্তিটা যেমন কবেই হোক হাত করতে হবে।
" —ভয় ক'বো না, আমি তোমাব কোন ক্ষতি কববো না।
" —সমস্ত দেশ প্রেমের দ্বাবা জয় কবাই অশোকেব ব্রত হইল।
" —ধার করলে, কিন্তু সুদবে কীসে ?
" —'মনে কব শেষের সেদিন কি ভযঙ্কব।'
" —কবিতাটা মুখস্থ কবা চাই।
" —কিছু ভাল কব, লোকে নাম কববে।
" —অসুখ কবেছে, আজ আমি বেবোতে পাব্‌বো না।
" —যেন খাঁটি হই, যেন ভান না কবি।
" —অসুখেব ছুতো ক'বে পালালে চল্‌বে না।
" —তোমাব পেট থেকে কথা বাব কবা মুশ্‌কিল।
" —তোমায় ঢিট কবতে কতক্ষণ ?

করা—জিদ কবলে সব কাজই কবা যায়।
" —গুণ্ডাদেব সায়েস্তা না করলে সমাজেব কল্যাণ নেই।
" —এতো ব্যস্ত কব কেন, ধীরে সুস্থে কাজ কবতে দাও।
" —একটা গান কব, শুনি।
" —কাপালিকেবা সুবাপান কবে।
" —খোকাকে চান কবাতে হবে।
" —দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মাথাটা হালকা কব দেখি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি অন্ততঃ তিন প্রকার অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

মারা, করা, চটা, চষা, ওড়া, পড়া, দেওয়া, সারা।

২। অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইয়া দাও :—

(ক) চাল মারা, টাকা মারা, ডুব মারা

(খ) দায়ে পড়া, টানাটানি পড়া, ছ্যাৎলা পড়া

(গ) মুখ রাখা, মান রাখা, জ্ঞান রাখা

(ঘ) লক্ষ্য দেওয়া, চোখ দেওয়া, কান দেওয়া, নাই দেওয়া

(ঙ) রাত করা, ভর করা, চান করা, জিদ করা, সাবেস্তা করা।

---

৩২. শব্দাশুদ্ধি

৩২. ক. বানানগত অশুদ্ধি

যে সমস্ত শব্দেব বানানে প্রায়ই ভুল হয় তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া হইল। প্রত্যেক অশুদ্ধ শব্দেব পাশে শুদ্ধ রূপও দেওয়া হইল।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অজাগব	অজগব (সর্প)	ইপ্সিত	ঈপ্সিত
অত্যাধিক	অত্যধিক	উচিৎ	উচিত
অত্যাচারিত	অত্যাচবিত	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস.
অদ্ভূত	অদ্ভুত	উজ্জল	উজ্জ্বল
অনুমত্যানুসাবে	অনুমত্যনুসাবে	উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তবিন্দ্রিয়	উৎপাৎ	উৎপাত
অন্তর্ধ্যান	অন্তর্দ্ধান	ঔষধি	ঔষধ (বোগনাশক দ্রব্য) ওষধি (যে গাছ একবাব ফল দিয়া মরিয়া যায়)
অপবাহ্ন	অপরাহ্ণ		
অমাবশ্যা	অমাবস্যা		
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	কজ্জ্বল	কজ্জল
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু
আপত্য	আপত্তি	কল্যাণীয়েসু	কল্যাণীয়েষু
আয়ত্ব	আয়ত্ত	কুৎসিৎ	কুৎসিত
আশীষ	আশিস্	কুতুহল	কুতূহল
আষাড	আষাঢ়	কৌতুহল	কৌতূহল
আহ্ণিক	আহ্নিক	কৌতুক	কৌতুক
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	ক্ষিন্ন	খিন্ন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গগণ	গগন	পরিস্কার	পরিষ্কার
গৃহীতা	গ্রহীতা	পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
গ্রস্থ	গ্রস্ত (রোগগ্রস্ত)	পুরস্কার	পুরস্কার
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
চামরী	চমরী	পৈত্রিক	পৈতৃক
চিরঞ্জীবেষু	চিরঞ্জীবিষু	প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
জাগরুক	জাগরূক	প্রতিভু	প্রতিভূ
জ্বালা	জ্বালা	প্রত্যুতঃ	প্রত্যুত
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	প্রনাশ	প্রণাশ
জাম্বুবান	জাম্ববান	প্রভূ	প্রভু
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	প্রসুতি	প্রসূতি
জ্যোতীশ	জ্যোতিরীশ বা যতীশ	ফেণ	ফেন
		বনস্পতি	বনস্পতি
দক্ষিন	দক্ষিণ	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
ধ্রুবাদৃষ্ট	ধ্রুবদৃষ্ট	বহ্নি	বহ্ণি
ধ্রুবাবস্থা	ধ্রুববস্থা	বাডবা	বডবা
নির্ভিক	নির্ভীক	বিদুষক	বিদূষক
নিরাপদেষু	নিরাপৎসু	বিদ্যুতাগ্নি	বিদ্যুদগ্নি
নৈরাশ:	নিরাশ	বিদ্যুতালোক	বিদ্যুদালোক
পক্ক	পঙ্ক	বিষন্ন	বিষণ্ণ
পরাহ্ন	পরাহ্ণ	বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি
পরিনাম	পরিণাম	ব্যাবসায়	ব্যবসায়
পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	শরত	শরৎ
ভাণ	ভান (ছল)	সততঃ	সতত
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী	সত্তজাত	সদ্যোজাত
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ণ	সদ্যোদ্ভিন্ন	সদ্য উদ্ভিন্ন
মনমোহন	মনোমোহন	সন্মত	সম্মত
মাহাত্ত্ব	মাহাত্ম্য	সন্মান	সম্মান
মুঞ্জুরী	মঞ্জরী	সাক্ষাত	সাক্ষাৎ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মুহুর্ত	মুহূর্ত	সাবিত্রীসমানেষু	সাবিত্রীসমানাসু
মৃণ্ময়	মৃন্ময়	সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
যদ্যাপি	যদ্যপি	স্তুপ	স্তূপ
যশগান	যশোগান	স্ফূরণ	স্ফুরণ
রসায়ণ	রসায়ন	স্ফুর্ত	স্ফূর্ত
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	স্বরস্বতী	সরস্বতী

৩২. খ ব্যাকরণগত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	নিরপরাধী	নিরপরাধ
আয়ত্বাধীন	আয়ত্ত	পার্বতীয়	পার্বত্য
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	মহত্বপকার	মহোপকার
উদ্বেলিত	উদ্বেল	মহিমারব	মহিমরব
একত্রিত	একত্র	যদ্যপিও	যদ্যপি
ঐক্যতান	ঐকতান	সচেষ্টিত	সচেষ্ট
কেবলমাত্র	কেবল	সশঙ্কিত	সশঙ্ক
দারিদ্রতা	দারিদ্র, দারিদ্র্য	সাবধানপূর্বক	সাবধানে
দোষণীয়	দূষণীয়	সৌজন্যতা	সৌজন্য

৩২. গ ব্যাকরণদুষ্ট অথচ অতি প্রচলিত শব্দ

ব্যাকরণদুষ্ট এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি বাঙ্গালায় বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনাতেও সেগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। ঐরূপ কতকগুলি শব্দ এখানে দেওয়া হইল।

অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত	শুদ্ধ	অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত	শুদ্ধ
* অনুবাদিত	অনূদিত	পাশ্চাত্য	পাশ্চাত্ত্য
অর্দ্ধাঙ্গিনী	অর্দ্ধাঙ্গী	বিস্তরিত	বিস্তীর্ণ, বিস্তারিত
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	বিদ্যুৎবেগে	বিদ্যুদ্বেগে
আহরিত	আহৃত	বিশেষত্ব	বিশেষ, বিশিষ্টতা
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	মহারথী	মহারথ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	মুহ্যমান	মোহ্যমান
কাম্যা	কাম্য	মৌনতা	মৌন (বিশেষ্য)

* অণু-বদ্+ণিচ+ক্ত=অনুবাদিত

অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত	শুদ্ধ	অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত	শুদ্ধ
কিম্বা	কিংবা	মৌন	মৌনী (বিশেষ্য)
কিয়ৎপরিমাণ	কিয়ৎ	শবৎচন্দ্র *	শরচ্চন্দ্র
চলৎশক্তি (চলচ্ছক্তি)	চলনশক্তি	সকাতবে	কাতরভাবে
চক্ষুজল	চক্ষুর্জল	সততা	সাধুতা
চক্ষুরোগ	চক্ষূরোগ	সক্ষম	ক্ষম
চয়িত	চিত, চায়িত	সম্ভব	সম্ভবপব
চাকচিক্য	চাকৃচিক্য	সাধ্যাতীত	সাধনাতীত
নিন্দুক	নিন্দক	সাবধানী	সাবধান
নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	সৃজন	সর্জন, সৃষ্টি

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

বাক্য-প্রকরণ

১. বাক্য বিশ্লেষণ

১. ক. উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যেব দুইটি অংশ,—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহাব সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাহাব নাম উদ্দেশ্য এবং ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয তাহা বিধেয়

উদ্দেশ্য	বিধেয়
রাত্রি	পোহাইল।
সূর্য	পূর্বদিকে উদিত হয।
প্রতিদিন ব্যাযাম করা	স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর
প্রচলিত হিন্দুধর্ম এবং বেদেব সনাতন ধর্ম	এক নহে।

২. বাক্যের প্রকার-ভেদ

বাক্য তিন প্রকাব—সরল, জটিল ও যৌগিক।

২. ক. সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে তাহার নাম সবল বাক্য। যথা,—

মৌমাছি | মধু খায়। পাখীবা | আকাশে উড়ে | ফুল | ফুটিযাছে।

---

* সুপদ্ম-মতে 'শরৎচন্দ্র' শব্দও শুদ্ধ।

২. খ. জটিল বাক্য

একটি প্রধান এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যের সহযোগে যে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহারই নাম মিশ্র বা জটিল বাক্য।

মানুষ যে অমর নয় | তাহা কে না জানে? যদি পার | কাল একবার আসিও। এই দুইটি বাক্যে 'তাহা কে না জানে' এবং 'কাল একবার আসিও' —এই দুইটি অংশ প্রধান; অবশিষ্ট দুইটি অংশ অপ্রধান।

জটিল বাক্য রচনা করিতে হইলে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া অপেক্ষাসূচক সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ অথবা অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন,—

যে সে, যিনি তিনি, যাহা তাহা, যাহাকে তাহাকে, যেখানে সেখানে, যদি তবে (তাহা হইলে), যেহেতু অতএব (কাজেই) ইত্যাদি।

উপরে যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রথমটিতে আছে 'যে' ও 'তাহা', এই দুইটি পরস্পরাপেক্ষা সর্বনাম। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে একটি মাত্র অব্যয় 'যদি' আছে, 'তবে' বা 'তাহা হইলে' অথবা ঐরূপ অর্থবোধক আর কোনো শব্দ নাই। মূল কথা এই যে, শ্রুতিমাধুর্যের জন্য অনেক সময় বাক্যের অন্তর্গত কোনো কোনো শব্দ উহ্য রাখা হয়, কিন্তু শব্দ উহ্য থাকিলেও তাহার অর্থ গোপন থাকে না। এখানেও তাহাই হইয়াছে। অনেক জটিল বাক্যেই এরূপ হইয়া থাকে।

২. গ. যৌগিক বাক্য

একাধিক পরস্পর-নিরপেক্ষ সরল বা জটিল বাক্য দ্বারা একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হইলে উহাকে যৌগিক বাক্য বলা হয়। যৌগিক বাক্যে সাধারণতঃ এবং ও, সুতরাং, কিন্তু প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

ভাব সাধারণ মানুষের | কিন্তু | রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। ভারতের ইতিহাস ধর্মের | আর | ইউরোপের ইতিহাস রাষ্ট্রের।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি বাক্য দুইটি করিয়া পরস্পর-নিরপেক্ষ বাক্য-দ্বারা গঠিত। ঐ বাক্যগুলি যথাক্রমে 'কিন্তু' ও 'আর' এই দুইটি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। কোনো কোনো স্থলে এই অব্যয় উহ্য থাকে। যথা,—

পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গীর তরবারি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার সাড়া দিল না।

৩. বাক্যের রূপপরিবর্তন

এক প্রকারের বাক্যকে প্রয়োজন হইলে অন্য প্রকারে পরিবর্তন করা যায়।—যেমন,—

জটিল বাক্য : আমরা যে রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় দুইটি মহাকাব্যের অধিকারী সেজন্য আমরা গর্ব বোধ করি।

যৌগিক বাক্য : আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় দুইটি মহাকাব্যের অধিকারী এবং এই কারণে আমরা গর্ব বোধ করি।

সরল বাক্য : রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় দুইটি মহাকাব্যের অধিকারিত্ব হেতু আমরা গর্ব বোধ করি।

৩. ক সরল বাক্যকে জটিল এবং যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

৩. ক সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তিত করিতে হইলে, ঐ সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনো একটি পদকে একটি অপ্রধান বাক্যে পরিণত করিতে হইবে। যেমন,—

সরল বাক্য : বসুন্ধরা বীরেরই ভোগ্যা।

জটিল বাক্য : যে বীর, বসুন্ধরা তাহারই ভোগ্যা।

সরল বাক্য : নির্বোধের কথায় কান দিয়ো না।

জটিল বাক্য : যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার কথায় কান দিয়ো না।

সরল বাক্য : বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে আমার একটি নিবেদন আছে।

জটিল বাক্য : বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান শিক্ষক, তাহার নিকটে আমার একটি নিবেদন আছে।

৩. ক. ২ সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তিত করিতে হইলে সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্যের অংশকে পূর্ণবাক্যে পরিণত করিতে হইবে। যেমন,—

সরল বাক্য : লেখাপড়া না করিলে ভবিষ্যতে দুঃখ পাইবে।

যৌগিক বাক্য : লেখাপড়া কর, নতুবা ভবিষ্যতে দুঃখ পাইবে।

সরল বাক্য : অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যৌগিক বাক্য : তিনি অসুস্থ ছিলেন, তথাপি তিনি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৩. খ. জটিল বাক্যকে সরল ও যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

৩ খ. জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে অপ্রধান বাক্যটিকে একপদে পরিণত করিতে হইবে। যেমন—

জটিল বাক্য ঃ আমার অদৃষ্ট খারাপ তাই বারংবার কষ্ট পাইতেছি।

সরল বাক্য ঃ দুরদৃষ্টবশতঃ বারংবার কষ্ট পাইতেছি।

জটিল বাক্য ঃ যে নিজে যেমন, সে অন্যকেও তেমনি ভাবে।

সরল বাক্য ঃ প্রত্যেকেই অন্যকে আত্মবৎ ভাবে।

৩. খ. ২ জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করিতে হইলে অর্থসংগতি বজায় রাখিয়া অপেক্ষাসূচক অব্যযের স্থলে সংযোজক অব্যয় বসানো আবশ্যক হয়। যেমন,—

জটিল বাক্য ঃ সে যদি বা আসে তুমি কিছুতেই আসিবে না।

যৌগিক বাক্য ঃ সে আসিতেও পাবে কিন্তু তুমি কিছুতেই আসিবে না।

জটিল বাক্য ঃ তুমি যদি কথা না দাও তো আমার চিন্তার অবধি থাকিবে না।

যৌগিক বাক্য ঃ তুমি কথা দাও নতুবা আমার চিন্তার অবধি থাকিবে না।

৩. গ. যৌগিক বাক্যকে সরল ও জটিল বাক্যে পরিবর্তন

৩. গ. ১ যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে একটি পূর্ণ বাক্যকে অন্য বাক্যের অঙ্গরূপে পরিবর্তিত করিতে হইবে। যেমন,—

যৌগিক বাক্য ঃ দোয়াত আছে বটে কিন্তু কালি নাই।

সরল বাক্য ঃ দোয়াত থাকিলেও কালি নাই।

যৌগিক বাক্য ঃ বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন, তবু তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীর খুব প্রিয়।

সরল বাক্য ঃ বিদ্যাপতি বাঙ্গালী না হইলেও তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীর খুব প্রিয়।

৩. গ. ২ যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে দুইটি প্রধান বাক্যের একটিকে গৌণ বাক্যে পরিবর্তিত করিতে হইবে। যেমন—

যৌগিক বাক্য ঃ আমিও ষ্টেশনে পৌছিলাম আর গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

জটিল বাক্য ঃ যেমন আমি ষ্টেশনে পৌছিলাম অমনি গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যৌগিক বাক্য ঃ সত্যকথা বল কিন্তু অপ্রিয় সত্যকথা বলিও না।

জটিল বাক্য ঃ যে সত্যকথা অপ্রিয় সেরূপ সত্যকথা বলিও না।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে যৌগিক বা জটিল বাক্যে পরিণত কর :

ক. আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষে অনেক নূতন ধরণের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবেই এইসব নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম।

খ. এ বিশ্বে অনেক স্থান আছে। অনেক স্থানে অনেক পদার্থ আছে। প্রত্যেক পদার্থই কোন-না-কোন কাজ করিতেছে। কোন পদার্থই কর্মহীন নয়।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শ্রেণী নির্দেশ কর এবং ঐ বাক্যগুলিকে এক বা একাধিক অন্যপ্রকারের বাক্যে পরিবর্তিত কর।

ক. উচ্ছৃঙ্খল মানুষ কখনও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারে না।

খ. প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য।

গ. কতকগুলি রস আছে, যাহা মানুষের প্রয়োজনকে অনেকদূর পর্যন্ত ছাপাইয়া উৎসারিত হইয়া উঠে।

ঘ. বাঙ্গালার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে যে রামায়ণ কথা লিখিয়াছিলেন, হয়তো বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই—কিন্তু বাঙ্গালার নিজস্ব কোমল হৃদয় ভাবে মণ্ডিত হইয়া ইহা বাঙ্গালী-সমাজে চিরস্থায়ী সমাদর লাভ করিয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একটি সরল বাক্যে পরিণত কর :

কলিকাতা বাংলা দেশের রাজধানী। ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিক্ষাক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। ইহা সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্রও বটে। এই সকল কারণে কলিকাতা অঞ্চলে যে ভাষা লোকে কথোপকথনকালে ব্যবহার করে সেই ভাষা বাঙ্গালার সমস্ত জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৪. বাক্য-বিবর্ধন

বাক্যের অন্তর্গত উদ্দেশ্য বা বিধেয় এক পদও হইতে পারে আবার একাধিক পদের সমষ্টিও হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সহিত উপযুক্ত বিশেষণ প্রভৃতি যোগ করিয়া উহাদিগকে বিবর্ধিত করা যায়। এইভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র বাক্যকেও অতিশয় দীর্ঘ করা যাইতে পারে।

(১) চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে।

প্রাণশূন্য চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে।

বারিশূন্য সরোবরের ন্যায় প্রাণশূন্য ··পতিত রহিয়াছে।

পল্লবশূন্য তরুর ন্যায়, বারিশূন্য ··পতিত রহিয়াছে।

পুষ্পশূন্য উদ্যানের ন্যায়, পল্লবশূন্য ··পতিত রহিয়াছে।

পুষ্পশূন্য উদ্যানের ন্যায়, পল্লবশূন্য তরুর ন্যায় বারিশূন্য সরোবরের ন্যায় প্রাণশূন্য চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে।

(২) কুশলবার্তা বল।

পিতার কুশলবার্তা বল।

শ্রান্তিপরিহারপূর্বক পিতার কুশলবার্তা বল।

আসন পরিগ্রহ দ্বারা শ্রান্তিপরিহারপূর্বক পিতার কুশলবার্তা বল।

(৩) আমি যাহা ভাবিয়াছি তাহা চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে।

আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি তাহা....থাকিবে।

আমি যাহা......তাহা চিরদিন সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

আমি যাহা......চিরদিন সজীব সংসারের......থাকিবে।

আমি যাহা......চিরদিন মানুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের... থাকিবে।

সমস্তই যাইবে কেবল আমি যাহা .....থাকিবে।

আমার বাড়ী-ঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীর-মন, আমার সুখ-দুঃখের সামগ্রী সমস্তই .....থাকিবে।

আমার বাড়ী-ঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীর-মন, আমার সুখ-দুঃখের সামগ্রী সমস্তই যাইবে, কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি তাহা চিরদিন মানুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ কর:

১. বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে, এই কারণেই যে আমি আক্ষেপ করিতেছি তাহা নহে।

২. মারাঠা ও শিখের অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, শিখ একদা একটি বৃহৎ ভাবের আহ্বানে একত্র হইয়াছিল।

৩. প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবই কাব্যের প্রাণ।

৪. যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বিবর্ধিত কর:

১. মেঘমণ্ডল আকাশ আচ্ছন্ন করিল। ২ঃ তাঁহাদের কর্তব্য গুরুতর। ৩. যাইবে না কি?

৫. রচনাশৈলী ও অশুদ্ধি-সংশোধন

ভাষা চলিতই হউক, আর সাধুই হউক উহা সুমার্জিত, প্রাঞ্জল, সাবলীল এবং সার্থক হওয়া চাই। শ্রুতিকটুতা, ব্যাকরণদুষ্টতা, অপ্রযুক্ততা, নিরর্থকতা,

গ্রাম্যতা, পুনরুক্তি, অলংকার-বাহুল্য, এক রীতির সহিত অন্য রীতির সংমিশ্রণ—এইগুলি রচনার দোষ। যাঁহার রচনায় এই সকল দোষ যত অল্প তাঁহার রচনা তত সুমার্জিত বলিয়া গণ্য হয়। রচনাশৈলী সুন্দর করিতে হইলে এই দোষসমূহ যথাসম্ভব বর্জন করিতে হইবে। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

ভাগীরথীর অপর পারে নিয়ে যেয়ে সীতাকে জন্মের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া লক্ষণ অগাধ ও পার নাই যাহার এমন শোক-সাগরে উড্ডীয়ন হইলেন।

উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে শব্দগত, ভাষাগত, ভঙ্গীগত এবং অর্থগত নানাবিধ দোষ আছে। সংশোধন করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে।

ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া সীতাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে ইহা ভাবিয়া লক্ষ্মণ অগাধ ও অপার শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি সংশোধন করিয়া লিখ :

ক. তখন আষাঢ় মাস। বাগানে কুন্দকুসুমগুলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিকাশ করিতেছিল, বৃষ্টিধারায় দলগুলি আর্দ্র হওয়াতে মনে হইতেছিল কোন সুন্দরী স্বীয় মুখখানি শীতল জলে ধুইয়া যেন উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আকাশের গায় মেঘগুলি কখনও পশুমুণ্ডের ন্যায়, কখনও বা শুভ্র ফুলমাল্যের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সমিরচালিত হইয়া উপবিষ্ট হইতেছিল। অদূর গঙ্গাতরঙ্গ ঢেউসহকারে বেগে ছুটিতেছিল ও সন্ধ্যা-বায়ু দুলিতে দুলিতে পবনের সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছিল। [ক. বি. ১৯৩১]

খ. তাহার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। তাহার মুখে সে উজ্জ্বল হাসি নাই। বিষয়-সম্পত্তি সব উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সে এতই ঋণ-গ্রস্থ যে সংসারের নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। কাহারও সহিত তাহার ঐক্যতা নাই। এ অবস্থায় কল্য সে নির্দোষী ইহা বলিতে পারি না। তাহার দুর্ণাম রটিয়াছে অনেক। তাহার সম্মুখে যাইতে সলজ্জিত বোধ করি। সেও সশঙ্কিতচিত্তে দিন যাপন করে। [ক. বি. ১৯৩৩]

গ. সে দৌড়াতে দৌড়াতে উছট খাইয়া পড়িয়া গেল, আকস্মিকভাবে একটি খানার ভিতরে। এই পতিতের ফলে ভাঙ্গিয়া গেল তাহার একখানি পা এবং সাত মাস শয্যাসায়ী হইয়া রহিল। পূর্বে যে সকল বন্ধু-সমুদয় তাহার কাতরের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিত, তাহাদের দীর্ঘশ্বাস, "আহা" "উহু" শুনিলে মনে স্বাভাবিক হইতে যে তাহারা সত্যই তাহাকে খুব ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা এই পতনঘটিত দুরাবস্থার সময় অর্থের কমতি পড়াতে কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। [ক. বি. ১৯৩৫]

ঘ. সে খাবার স্থানে উপস্থিত ও উপবেশনমাত্রই গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া গেল।

[ক. বি. ১৯৩৯]

ঙ. ধনী কি নির্ধনী নগরবাসীগণ মাত্রই তাহার অত্যাচারে সদাসর্বদা সশঙ্কিত থাকিত।

[ক. বি. ১৯৩৩]

চ. সবিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে আপনার ঔষধ ব্যভার করিয়া আমি আরাম হইয়াছি।

[ক. বি. ১৯৩৮]

ছ. নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখতে লাগিলাম। চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ আঁধার করে তুলিয়াছিল যে আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া জীবনের নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

জ. পরিক্ষার পর পড়িতে পারা যায় না। তার চেয়ে একটু পুস্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্য-লাভ করা ভাল। সকলে বিদ্বান হইবে এমন কোন কথা নাই। সৌজন্যতাই বেশী আবশ্যকীয় নয় কি?

[ক. বি. ১৯৩৫]

ঝ. আমি তোমার জন্য বড়ই সুচিন্তিত আছি। পত্র-পাঠ তোমার মঙ্গল চাই। গত পরশু দিন শ্যামলালের চিঠি পাইব, তখন তাহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিব। সে যাহা লিখিবে, তুমি যথাসময়ে তাহা অবিদিত থাকিবে। সে নিতান্ত দীর্ঘসূত্র—ঠিক সময়ে কাজ না করায় শেষে চোখে একেবারে হলুদের ফুল দেখে। যদ্যপি রামবাবু আমার ছোট ছেলেটিকে একটা বিষয় কর্ম করিয়া দিবেন বলিয়াছেন কিন্তু আজকাল যে দিন পড়িয়াছে তাহাতে তাঁহার কথায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরসা করিতে পারি না। তুমি প্রত্যুত্তর দিতে গৌণ করিও না।

[ক. বি. ১৯৩৩]

৬. অনুক্তপদ পূরণ

বাক্যের অন্তর্গত কোনো পদের স্থান শূন্য থাকিলে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা ঐ শূন্য স্থান পূরণ করিতে হইবে। শব্দের প্রয়োগকালে প্রদত্ত বাক্যের ভাষা, অর্থ এবং রচনাশৈলীর দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যথা,—

মহাপুরুষেরা সামসাময়িক ও——কালের উপর যে প্রভাব——যান, তাহার দ্বারাই——মহত্ব পরিমিত হইয়া থাকে।

এই বাক্যটির মধ্যে যে পদগুলির স্থান শূন্য আছে সেগুলি কি হইতে পারে? অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় প্রথম পদটি 'কালের' শব্দের বিশেষণ দ্বিতীয় পদটি একটি অসমাপিকা ক্রিয়া। তৃতীয় পদটি 'মহত্ব' শব্দের বিশেষণ হইতে পারে, আবার সম্বন্ধ পদও হইতে পারে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সম্বন্ধ পদই অধিকতর সংগত বলিয়া মনে হয়। পদগুলি যথাক্রমে এই :—'পরবর্তী' 'রাখিয়া' এবং 'তাঁহাদের'।

অনুশীলনী

১। নিম্নে প্রদত্ত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে যে স্থানগুলি শূন্য আছে সেগুলি উপযুক্ত শব্দের দ্বারা পূর্ণ কর :

ক. হাজারিবাগ——যাইতে হইবে, এই——ডাকগাড়ী—করিয়া, রাত্রি দেড়——সময় রাণীগঞ্জ হইতে——করিলাম। প্রাতে বরাকর——পূর্বপারে——থামিল। দেখিলাম সকলেই হাঁটিয়া——হইতেছে।

খ. তুমি—আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতে, এখনও কি সেইরূপ—কর? তোমার—দেখিয়া আমার কিন্তু—পায়। তুমি সত্য বল ত আমার সংবাদ শুনিয়া তোমার মনে কি ভাবের—— হইয়াছিল।

গ. মধ্যাহ্নে রোদে দৌড়াদৌড়ি করিলে—হইতে পারে—সুতরাং—খেলাধূলা না করিয়া অপরাহ্নেই—উচিত। শরীর—ভাল—থাকে, তখন শ্রম—কখনও উচিত—।

ঘ. নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ—অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে —আছে. কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া—হইতেছে। দুই ভাই যখন বনের মধ্যে—করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা—করিতে লাগিল।

ঙ. তোমার—আমি কথায়—উঠিতে পারিব না। তোমার হৃদয়ে যদি একটুকুও—থাকিত, তবে তুমি এই পাখীটাকে—করিতে পারিতে না।

চ. তাহার কথার উপর তুমি—স্থাপন করিলে কেন? সে চিরকাল—ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর এরূপ—কাজের ভার দেওয়া তোমার—হয় নাই। এখন যদি শেষ মুহূর্তে তাহাকে না—যায় তবে বল, কাহাকে দিয়া—সমাধা করিব? এইভাবে একজন— প্রকৃতির লোকের কথায় নির্ভর করিয়া তুমি—কাজ করিয়াছ।

ছ. তোমার—পালন করিতে আমি কবে—হইয়াছি? তুমি আমার প্রতি যে সকল— আনয়ন করিয়াছ, তাহা সর্বৈব—। তুমি আমাকে—রূপে জানিয়াও যে এরূপ—ধারণা করিতে পারিয়াছ, ইহা বড়ই—বিষয়।

জ. সন্ধ্যার ছায়া সেই—উপত্যকায়—হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপরাহ্ণ —পাইলেন। প্রতাপ বলিলেন, ভাই আজ পরাজয়ের দিন নহে আজি—দিন, যেন আমার পূর্বের —বিস্মৃত হই, ভাইয়ে ভাইয়ে—হইয়া স্বদেশ—করিব,—বিদেশীয় শত্রুকে—করিব না।

৭. ভাবার্থ লিখন

কোনো গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতার ভাবার্থ লিখিতে হইলে উদ্ধৃত রচনাটি দুই তিন বার ভাল করিয়া পড়িয়া লেখকের বক্তব্য বিষয়টি বুঝিয়া লইতে হইবে। সাধারণ রচনায় বিষয়বস্তুকে মনোজ্ঞ ও সহজবোধ্য করিবার জন্য বহুবিধ অলংকারের আশ্রয় লওয়া হয়। অনেক সময় একই ভাবের কথা একাধিকবার

উক্ত হয়। এই সকল অলংকার-বাহুল্য এবং পুনরুক্তি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া রচনার মূল ভাবটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাবার্থ-লিখন নির্দোষ হইবে। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

৭. ক. গোলাপ ফুটিয়া আছে গাছে গন্ধ তার বাতাসে ছড়ায়,
অলিকুল তারে ঘিরি ঘিরি চারিদিকে গুঞ্জরি বেড়ায়।
বিকশিত পুষ্পটির মাঝে ক্ষুদ্র কীট করিয়া প্রবেশ,
দলগুলি কাটি একে একে ক্ষণেকেই করিল নিঃশেষ।
অলি বলে, "শোন ভাই কীট, ক্ষতি কি করিল তব ফুল?
কুটি কুটি করি তারে ছিঁড়ি কেন মিছে করিলে নির্মূল?
কীট বলে, "কিবা ছিল ওতে, হল কিবা রাগের কারণ?
পাতারে ছিঁড়িয়া ফেলি যবে করনি তো কখনো বারণ।"
অলি বলে, "পাতা আর ফুল দুয়ে কি সমান কভু হয়?
নাহি গন্ধ নাহি মধু তাতে, পুষ্প যে সুগন্ধ মধুময়।"
কীট বলে, "নাহি খাই মধু, নাহি পাই ফুলেব আঘ্রাণ,
আমার বিচার এই খাটি—পত্র-পুষ্প উভয়ে সমান।"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ হইবে :

গুণী ভিন্ন গুণের সমাদর করিতে পারে না। মধুমক্ষিকা মধু খাইয়া জীবন-ধারণ করে তাই সে ফুলেব মর্ম জানে। কিন্তু কীটেব নিকটে মধুব কোনো আদর নাই। সেইজন্য তাহাব কাছে ফুল ও পাতা উভযেরই মুল্য সমান।

৭. খ. পৃঃ ১১৭ Matric Selections স্থূলকথা etc.

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির ভাবার্থ লিখ :

ক. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে,
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো ;
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

খ. দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী!
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি—সেই সন্ধ্যাস্নান
সেই গোচারণ; সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্ম-মাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই—শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন। (ক. বি. ১৯২৯)

গ. বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

ঘ. পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গী নকল করে, নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুক "বাজে" হ'লি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙ্গে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার ক'দিন বাঁচে?

ঙ. দেশবন্ধুর মৃত্যুতে

পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা-রে,
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে!
ওরে বাঙ্‌লার কিশোর-কিশোরী তোদের এ শোক সহে না আর।
তোরাই যে তাঁর মমতার ফুল; নয়নের মণি ছিলি রে তাঁর!

তোদেরই বুকের দরদ জুড়াতে করেছেন যিনি অটল পণ,
শাশ্বত যাঁর প্রতিষ্ঠা-বেদী, অন্তরে মধু-বৃন্দাবন,
সর্বশ্রেষ্ঠ তর্পণ তাঁর, হও আগুয়ান্ অহিংসায়,
তাঁরি বাঞ্ছিত স্বরাজের পথে, প্রণমিয়া দেব-দেবীর পায়।
সেই এক ঠাঁই ভেদ জ্ঞান নাই—খ্রীষ্টান হিন্দু মুসলমান—
চোখের জলের যুক্ত-বেণীতে করগো সকলে মুক্তি-স্নান !
হে ব্যথা-হরণ নিখিল-শরণ, দাও শোকাতুর শান্তিজল,
মুছাও নয়ন, ঘুচাও বেদন, দাও সান্ত্বনা, দাও গো বল ॥

(ক. বি. ১৯৩২)

চ. কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের প'রে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্রের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।

(ক. বি. ১৯৩৬)

ছ. কুকরি কাঁদে—ওগো পূর্ণ চাঁদ,
পণ্ডিতের কথা শুনি গণি পরমাদ।
তুমি নাকি একদিন রবে না ত্রিদিবে,
মহাপ্রলয়ের কালে যাবে না কি নিবে।
হায় হায় সুধাকর হায় নিশাপতি,
তা হইলে আমাদের কী হইবে গতি।
চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া,
তোমার কতটা আয়ু এস শুধাইয়া।

জ. বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।

দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথায় ঘাম পায়েতে বহাস ?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

খ. আলো কি কোথাও আছে ? তাহা নাহি জানে হিয়া মোর,
শুধু জানে চারিদিকে অন্ধকারে বহে অশ্রুলোর,—
দারিদ্র্য যাতনারাশি, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনা,
বঞ্চিতের ক্ষুব্ধ রোষ, অন্যায়ের পুঞ্জ আবর্জনা
জন্মিয়াছে যুগে যুগে। এই মৃত্যু নরকের মাঝে
স্বরগ আনিতে হবে, যে স্বপন-স্বরগ বিরাজে
সকল জাগ্রত স্বপ্নে। সেই স্বর্গ কভু কি আসিবে ?
তিমির রজনী শেষে পূর্বাচলে অরুণ জাগিবে ?

৮. সংক্ষিপ্তসার বা সারাংশ-লিখন

রচনার সংক্ষিপ্তসার বা সারাংশ লিখিতে হইলে লেখকের বর্ণনীয় বিষয়টিকে অল্প কথায় ব্যক্ত করা চাই। বর্ণনার অপ্রধান অংশ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া প্রধান বিষয়টি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেই সংক্ষিপ্তসার সার্থক হইবে।

বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'স্যর আশুতোষ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এবং তাহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল।

স্যর আশুতোষ

প্রবন্ধ ঃ এ জগতে সকল ক্ষেত্রেই অধিকারিভেদ আছে। মানুষের গুণাগুণের খাঁটি বিচার করিতে গেলেও অধিকারী অনধিকারীর কথা ভাবিতে হয়। নির্মল চিত্ত ব্যতীত কোন বিষয়েই সত্য দেখিবার অধিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রেরণায় আশুতোষের ভজনা করিতে যাইতেন, তাঁহারা আশুতোষের সত্য পরিচয় কখনও লাভ করেন নাই। অন্য পক্ষে, যাঁহারা কেবল আশুতোষের বাহিরের কর্ম দেখিয়াই তাঁহার অন্তরের ধর্মাধর্মের বিচার করিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহার প্রতি কখনও সুবিচার করিতে পারেন নাই। বাহিরের কর্মে সচরাচর কর্মীকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। কর্মের নিজের একটা বিধান আছে। কর্মীকে এই বিধান মানিয়া চলিতে হয়। কর্মের খাতিরে কর্মীকে অনেক সময়ে আপনাকে চাপিয়া রাখিতে হয়।

অনেক সময়ে নিজের স্বধর্মকে উপেক্ষা করিয়া কর্মীকে পরধর্মের অনুসরণ করিতে হয়। কর্ম-দ্বারা কর্মীর কখনই খাঁটি বিচার হয় না। আশুতোষের কর্মের দ্বারা তাঁহার বিচার করিলে চলিবে না; তাঁহার নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারাই তাঁহার বাহিরের কর্মজীবনের ভাল-মন্দের ওজন করিতে হইবে। যাঁহারা আশুতোষের চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনও প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্মের ভাল-মন্দের সত্য বিচার কখনও করিতে পারিবেন না।

এ সংসারে যে মানুষই দশ জনের অপেক্ষা মাথা উঁচু করিয়া উঠে, সে-ই, একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অকৃত্রিম অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা লাভ করে, সেইরূপ আবার বহুতর লোকের অন্তরে অকারণ অসূয়াও জাগাইয়া দেয়। এই অসূয়াতেও বহুলোকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া আশুতোষের চরিত্রের সত্য বিচার করিতে দেয় নাই। আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে আমিও তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিতাম, পরিচয়-লাভের পরে সে-ভাবে দেখি নাই।

বাহির হইতে আশুতোষকে অত্যন্ত দাম্ভিক ভাবিতাম। নিকটে যাইয়া একবারও কোন প্রকারে এই দাম্ভিকতার পরিচয় পাই নাই। ফলতঃ তাঁহার আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় তাঁহাকে প্রায় সর্বদাই অতিশয় ডিমোক্রাটিক (democratic) বলিয়া মনে হইয়াছে। ইংরাজী কথাটার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই। আপনার পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় যে নিজেকে আর দশ জন হইতে পৃথক্ করিয়া ও উঁচু করিয়া ধরিবার চেষ্টা না করে, তাহাকে ইংরাজীতে আমরা democratic কহি। এই লক্ষণটা আশুতোষের মধ্যে সর্বদাই প্রকাশ পাইত বলিয়া মনে হইয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদ আশুতোষের অত্যন্ত সাদাসিদে ছিল। জজিয়তি করিতে যাইয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের জজেদের পোষাক পরিতে হইত বটে, কিন্তু পারতপক্ষে বোধ হয় তিনি কখনও দেশের লোকের সভাসমিতিতে যাইবার সময়ে এই রাজ-বেশ ধারণ করিতেন না।

সচরাচর মানুষ আপনার ঐশ্বর্য-বিস্তার করিয়াই নিজেকে চারিদিকের সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে। আশুতোষের মধ্যে ঐশ্বর্য-বিস্তারের এই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। তিনি দেশের দশ জন হইতে আপনাকে পৃথক রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই আপনার মানসিক মতবাদে অত্যন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আচার-আচরণে এবং ধর্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানির গণ্ডী ছাড়িয়া যান নাই। ইহার

মূলে তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা, আমা স্নমনে হয়, গভীর স্বাজাত্যাভিমানই বেশী বিদ্যমান ছিল। আশুতোষ আর দশ জন বাঙ্গালী গৃহস্থের মতন বাড়ীতে সচরাচর খালি গায়ে থাকিতেন। শুনিয়াছি, বড় বড় সাহেব-স্থবা দেখা করিতে আসিলেও তিনি কখনও আপনার স্বজাতির এই বিবস্ত্র বর্বরতাকে ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে দেশবিদেশে বেড়াইবার সময়ে, তিনি কখনও বাঙ্গালীর মামুলী পোষাক ছাড়িয়া ইংরেজ দরবারের প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই।

আশুতোষ বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধনা ও সভ্যতাকে কতটা যে ভালবাসিতেন, বাঁকিপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যাইয়া তাহার পরিচয় পাই। প্রথম যখন তাঁহাকে সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব হয়, সত্য বলিতে কি, তখন কথাটা ভাল লাগে নাই। আশুতোষের এই পদের কোন যোগ্যতা আছে বলিয়া কল্পনা করি নাই। কিন্তু তাঁহার অভিভাষণ শুনিয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। আশুতোষ, বাঙ্গালা লেখক না হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গভীর অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন, এই অভিভাষণে তাহার প্রথম পরিচয় পাই। বাঙ্গালা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া, বাঙ্গালার মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আশুতোষের প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে এই আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই বাসনার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিপরীক্ষাতে আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সাধনাকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রাণে যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ সকলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আশা করিয়াছিলাম, রাজকর্ম হইতে অবসর পাইয়া আশুতোষ আপনার অসাধারণ শক্তি এবং মনীষাকে এদিকে প্রয়োগ করিবেন। সে আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু ইহাতে আশুতোষের গভীর স্বাজাত্যাভিমানের মূল্য বা মর্যাদার হ্রাস হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার: যে কোনো কাজে যে কোনো লোকের অধিকার থাকিতে পারে না। মানুষের চরিত্র বিচার করিতে হইলেও উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। যাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য আশুতোষের ভজনা করিতেন তাঁহারা এই মহাপুরুষের সত্য পরিচয় পান নাই। আবার যাঁহারা শুধু তাঁহার বাহিরের কাজ দেখিয়া

হৃদয়ের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। কর্মের দ্বারা কর্মীর খাঁটি বিচার হয় না। কারণ, কর্মীকে অনেক সময় নিজেকে চাপিয়া কর্ম করিতে হয়। বাহির হইতে আশুতোষকে দেখিয়া দাম্ভিক মনে হইত বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, আশুতোষের চরিত্রে দাম্ভিকতার লেশমাত্র ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় তিনি নিজেকে সর্বসাধারণ হইতে পৃথক্ করিয়া ধরিবার চেষ্টা কখনও করেন নাই। তাঁহার মনে স্বাজাত্যাভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই তিনি উদারমতাবলম্বী ব্যক্তি হইয়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচার-ব্যবহারে এবং ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানে সর্বদা খাঁটি হিন্দুয়ানি বজায় রাখিয়াছিলেন।

আশুতোষ বাঙ্গালাকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিতেন। বাঙ্গালার ভাষা, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার সাধনা, বাঙ্গালার সংস্কৃতি—এ-সকলের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত গদ্যাংশগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখ :

ক. আমাদের কথা এই, তুমি যদি কিছু নূতন কথা বলিতে পার, তবে লিখ। যদি কোন নূতন আলোক, নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব তোমার আয়ত্ত থাকে, তবে লিপিবদ্ধ কর। যদি তুমি জগতে কোনো সত্য প্রচারে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে লেখক নাম-ধারণে ধন্য ও কৃতার্থ হও। নহিলে কেবলই শখ মিটাইবার, নাম কিনিবার ও বাহবা পাইবার লোভ, আর বোকা ভুলাইয়া দুই পয়সা উপার্জনের মতলবে সাহিত্যের পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিও না। যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, বুকে বল বাড়ে, পরকে আপনার করা যায়, জগতের ও জীবনের অনেক দুঃখ ভুলিয়া থাকা যায়, সে জিনিসটা লইয়া ন-কড়া ছ-কড়া করিও না। ইহাতে যে তুমি একা মজিবে তাহা নহে—তোমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অভাগাও মজিবে।

খ. এ শ্মশানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙ্গালী এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শংকরাচার্য বল, ঈশা বল, রুশো বল, রামমোহন বল, কিন্তু এমন সাম্যসংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব একদর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটক লেখক, একই মূল্য বহন করে।

গ. বহু দেশ, নদ নদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ যে অযোধ্যার মত মনে হয় না। নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠ-নিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্যস্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলা-শব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। রাজপথ চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত কপাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। এ তো অযোধ্যা নহে,—এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।

ঘ. রামায়ণের কোনো চরিত্রকে যদি আদর্শ চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরত চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময়েই রুক্ষ এবং দুর্বিনীত হইয়াছে। কিন্তু ভারত চরিত্রে কোনো খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিয়াছে। কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের জননী।

ঙ. সাধারণ জনসঙ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে উৎসন্নের পথে অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হস্তে। সরল বিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং বিপদ—এই দুয়ের হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা। যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ বিপদ উভয়েই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্তব্য যে কত গুরুতর তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চ. অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপের শিখা ছোটো। সেই এতবড়ো অন্ধকারের চেয়ে এতটুকু শিখার উপরে আমি বেশী আস্থা রাখি। দুর্গতি চিরস্থায়ী হতে পারে এ-কথা আমি কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারি নে—সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানশক্তি তাকে ভিতরে বাইরে কেবলই আঘাত করছে; আমরা যে যতোই ছোটো হই, সেই জ্ঞানের বলে প্রাণের বলে দাঁড়াব, দাঁড়িয়ে যদি মরি তবু এক-কথা নিশ্চয় মনে রেখে মরব যে আমাদেরই দলের জিত হবে—দেশের জড়তাকেই সকলের চেয়ে বড় এবং প্রবল মনে করে তারই উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকব না। আমি বার বার বলছি একথা এক মুহূর্তের জন্যে স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে করো না যে আমাদের এই দেশ মুক্ত হবেই; অজ্ঞানতাকে চিরদিন জড়িয়ে থাকবে না এবং ইংরেজ তাকে আপনার বাণিজ্যতরীর পিছনে চিরকাল শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। এই কথা মনে দৃঢ় রেখে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

৯. ভাবার্থ সম্প্রসারণ

কোনো রচনার মূল ভাবটিকে সম্প্রসারিত করার নামই ভাবার্থ-সম্প্রসারণ। ইহা ভাবার্থ-লিখনের ঠিক বিপরীত। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হইল।

ক. আলো বলে, অন্ধকার তুই বড় কালো।

অন্ধকার বলে ভাই তাই তুমি আলো॥ [ক. বি. ১৯২৬]

সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, ভালয়-মন্দে, আলোয়-অন্ধকারে জড়াইয়াই এই পৃথিবী। সুখ যেখানে আছে, হয় তাহার অগ্রে নয় তাহার পশ্চাতে দুঃখ আছেই। দুঃখের বেদনা যে অনুভব করে নাই সুখের উন্মাদনা সে উপলব্ধি করিতে পারে না। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখকে বুঝিতে পারি। আলোকে আমাদের চিনিতে বিলম্ব হয় না, কারণ অন্ধকার আমাদের পরিচিত। জগতের জীবনস্বরূপ এই যে আলো—কোথাও কোনো দিন যদি ইহার অভাব না ঘটিত, তাহা হইলে ইহা মানুষের কাছে এত আদর পাইত না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পদার্থ সম্বন্ধেই এই কথা খাটে—অভাব আছে বলিয়াই অস্তিত্বের বোধ। অভাব না থাকিলে 'অস্তি' 'নাস্তি'র ভেদাভেদের কথাই উঠিত না।

খ. শ্মশানের মত এমন সাম্যবাদের প্রচারক আর নাই।

ধনী, দরিদ্র, বলী, দুবল, পণ্ডিত, মূর্খ, ধর্মাত্মা, পাপী সকলেই এক ভগবানের সন্তান। বাহিরের যত বৈষম্যই থাক না কেন, ইহারা সকলেই তাঁহার অংশভুক্ত, সকলেই মানুষ এবং ইহাই তাহাদের আসল পরিচয়। এই মতটি যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারাই সাম্যবাদী।

পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ মানুষই সাম্যবাদী। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, খ্রীষ্ট, প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সকলেই সাম্যবাদের প্রচারক। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে শ্মশান যেমন সাম্যবাদ প্রচার করে, এমন আর কিছুই নয়। শ্মশান সকলকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে তাহার নিকট সবই সমান। ধনী, দরিদ্র, পুণ্যাত্মা, পাপী, ভালো মন্দ, সুন্দর, কুৎসিত, সবল দুর্বল, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ সকলেই তার চক্ষে সমান।

বাস্তবিক শ্মশানে সকলেরই এক পরিণতি। চিতায় পুড়িয়া সবই সমান-ভাবে ছাই হইয়া যায়। সকল বৈষম্য ঐখানে গিয়া এক হইয়া যায়। কবি-অকবি, রসিক অরসিক, বীর-কাপুরুষ মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। শ্মশান আমাদের সকল বৈষম্যের প্রাচীরকে চূর্ণ করিয়া আমাদিগকে এক করিয়া দেয়, সকল অসামঞ্জস্য বিদূরিত করিয়া মহামিলন সাধন করে।

গ. "চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর গড়া হবে দেবালয়।
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে ইঁট পাথরের জয়।

ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণী তাঁহার প্রিয় সন্তান। প্রতিটি জীবের মধ্যে তাঁহার অংশ বিরাজমান। ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইলে, তাঁহাকে ভালোবাসিতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে ভালো বাসিতে হইবেই। ইহাই ঈশ্বরোপাসনার সহজ ও সরল পন্থা। কিন্তু মূঢ় মানব তাহা বুঝিল না। সে জীবপ্রেমের পদ ত্যাগ করিয়া সর্বজীবের প্রতি বিমুখ হইয়া ইষ্টক প্রস্তর স্তূপীকৃত করিয়া দেবতার মন্দির নির্মাণ করিল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে মন্দিরে আবার সকলের প্রবেশাধিকার রহিল না। মূঢ় মানব জানে না যে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে বঞ্চিত করিয়া মন্দিরে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। সে মন্দিরে কখনও দেবতা থাকিতে পারে না। মানুষের এই মিথ্যা মোহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া জীবপ্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছেন। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ এই বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভগবানের সৃষ্ট জীবকে দয়া কর, সেবা কর, তাহা হইলেই ভগবানের সেবা করা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। ঋষি রবীন্দ্রনাথও বহুরূপে বহুবার এই কথাই বলিয়াছেন। সৃষ্টির সকল জীবকে ভালোবাসিতে পারিলে তবেই স্রষ্টার উপাসনা সার্থক হইবে ইহাই রবীন্দ্রদর্শনের মর্মকথা। এই সমস্ত মহাপুরুষগণের বাণীকে, অন্তরে গ্রহণ করিয়া জীবপ্রেমের মধ্য দিয়াই মানুষকে ঈশ্বরসেবার পথ বাছিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বর ইহাই চান। তাঁহার সন্তানকে সেবা করিলেই তিনি তুষ্ট, জীবের সেবাতেই তাঁহার সেবা। ইষ্টক-প্রস্তরের অভ্রভেদী চূড়া নির্মাণ করিয়া মানুষ ঈশ্বরের মহিমা নয়, আপনারই অহংকার ঘোষণা করে। সে মন্দিরে দেবতা বাস করেন না, উহাতে মোহান্ধ মানুষের অহমিকারই প্রতিষ্ঠা হয়।

ঘ. কত বড় আমি—কহে নকল হীরাটি,
তাইতো সন্দেহ করি—নহ ঠিক খাঁটি।

প্রকৃত গুণী যে, সে কখনোই অহংকার করিয়া বেড়ায় না। আপনার গুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইলেও সে নীরব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রকৃত গুণী বিনয়ী ও নিরহংকার হয়। কিন্তু যাহার গুণের লেশমাত্র নাই সে অহংকারে ফাটিয়া পড়ে। আপনাকে জাহির করিবার জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত নাই।

আপনার মাহাত্ম্য কীর্তনে তাহার উৎসাহের সীমা নাই। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে, যাহার অর্থ এই যে, অল্প জলে শফরীর কত না আস্ফালন, কিন্তু অগাধ সলিলে রোহিত নীরব। যাহার গভীরতা যত অধিক সে তত নীরব। ইংরাজীতেও একটি প্রবাদ আছে—শূন্য পাত্রের অধিক শব্দ। যাহাব মধ্যে কিছু নাই সেই বেশী প্রগল্ভ। পরিপূর্ণতার মধ্যে প্রগল্ভতার স্থান নাই। সুতরাং অহংকারেব বাড়াবাড়ি দেখিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় 'যে কে নকল এবং কে খাঁটি।

ঙ. কেরোসিন শিখা বলে মাটিব প্রদীপে,
"ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে"।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেবোসিন শিখা বলে, "এস মোর দাদা"।

প্রায সকল লোকেই দরিদ্র, হীন ও নিম্নস্তরেব লোকেব সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখিতে নারাজ, এমন কি তাহাদের সহিত বাক্যালাপ কবিতেও ঘৃণাবোধ করে। কিন্তু মজাব বিষয় এই যে, নিজে উচ্চস্তরেব লোকেব সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইবার ও ঘনিষ্ঠ হইবাব জন্য ব্যগ্র। এমনও দেখা যায যে, কোনও ব্যক্তি পরমাত্মীয দরিদ্রকে নিজেব লোক বলিয়া স্বীকার কবিতে কুণ্ঠাবোধ করে ও পরিচয় দিতে লজ্জা পায কিন্তু অপব পক্ষে সম্পর্কবিহীন ধনী অথবা খ্যাতনামা লোকেব সঙ্গে কোনও একটা সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবাব জন্য ব্যস্ত হইযা পড়ে। বস্তুতঃ স্বার্থপর, অনুদাব ও হীনমনা ব্যক্তিগণই এইরূপ প্রবৃত্তির বশবর্তী এবং এইরূপ প্রকৃতিব মানুষই জগতে বেশী।

চ. নদীব এপাব কহে ছাড়িযা নিশ্বাস,
"ওপারেতে সর্বসুখ আমাব বিশ্বাস।"
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, "যাহা কিছু সুখ সকলি এপারে।"

মানুষ কখনও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। ইহার মূলগত কারণটি তাহাব চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। সন্তোষ—যাহা সুখের প্রধানতম উপাদান—তাহাই মনুষ্যচরিত্রে সাধারণতঃ নাই বলিলেই চলে। লোকে যাহা পায় তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অনেক বেশী পাইলেও তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং যাহা পায় না তাহারই জন্য হাহাকার করিতে থাকে। মানুষের কামনা অগ্নিব মত—তাহার ক্ষুধা চিরদিনই অতৃপ্ত। যাহা আমাদের আছে, যাহা আমরা ভোগ করিতেছি তাহা আমাদিগকে তুষ্ট করে না, যাহা পরিচিত তাহা আমাদের

চিত্তকে তৃপ্ত করিতে পারে না—অপ্রাপ্ত, অপরিচিতের জন্য আমাদের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহার একটু কারণ আছে। মানুষের স্বভাব এই যে অপরিচিত অনাগত অথবা অনাস্বাদিতের প্রতি তাহার একটা আকর্ষণ আছে। তাই সে অনেক পাইয়াও তৃপ্ত নয়। এইখানেই ইতর জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। ইতর জীবগণের মধ্যে চিন্তার অভাব—তাহারা যাহা পায় তাহাতেই তুষ্ট হইয়া থাকে—বেশী কিছু ভাবিবার অবকাশ অথবা সামর্থ্য তাহাদের নাই। কিন্তু মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন অপরিচিত অনাস্বাদিতকে কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অভিনব রূপ দেয় এবং পরিচিত বাস্তবের শত শত উপকরণকেও তুচ্ছ ভাবে। তাই বিলাসিতার দুর্লভ উপকরণের মধ্যে থাকিয়াও ধনী ভাবে দরিদ্রের জীবন কত সুন্দর ও মধুময়—বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদের মাঝখানে বাস করিয়াও আমরা ভাবিতেছি সুদূর অতীত যুগের কথা। সেই কালিদাসের কালে ফিরিয়া যাইতে পারিলে আমরা যেন বাঁচিয়া যাই। কিন্তু কালিদাসের কালে থাকিয়াও যে আমরা সন্তুষ্ট হইব না একথা সুনিশ্চিত। কারণ সুখ কোন কালবিশেষে নাই—উহা আছে আমাদের কল্পনায়।

চ. জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে জীবনের খেলা
যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।

আমরা জগতে জন্মগ্রহণ করি—আয়ু অনুসারে বৎসরগুলি কাটাইয়া দিয়া অবশেষে আবার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। আমাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে। আর আমরা ভাবি সকলই শেষ হইয়া গেল। মৃত্যুই যে জীবনের শেষ, ইহার মধ্যেই যে প্রাণের পরম পরিসমাপ্তি সে সম্বন্ধে আমাদের সংশয় থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। মৃত্যুই জীবনের পরিণতি—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুতঃ জীবন একটি অখণ্ড বস্তু, ইহার প্রবাহ অবিরাম চলিয়াছে। মৃত্যু কখনও ইহার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে না। ইহার মধ্য দিয়া জীবন এক নূতন রূপ লাভ করে মাত্র। জীবনের দুইটি দিক জন্ম আর মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যুর সমবায়েই জীবনের প্রবাহ অব্যাহত ও চিরনূতন রহিয়াছে। জন্ম মৃত্যুর নৃত্যের তালেই জীবন ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে।

জ. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

খারাপ লোকের সংস্পর্শে আসিলে খারাপ হইয়া যাইতে হয়—কুসংসর্গে চরিত্র কলুষিত হইয়া যায়—একথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। পণ্ডিতেরা

সর্বদাই অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতে উপদেশ দেন। কিন্তু এই উপদেশ সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ আমার চরিত্রে যদি দৃঢ়তা থাকে, আমার মধ্যে যদি প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকে তবে কোনো সংসর্গই আমাকে অধঃপতিত করিতে পারিবে না। দৃঢ়চিত্ত দোষস্পর্শলেশহীন প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে অসৎসঙ্গ কখনোই খারাপ করিতে পারে না। এই শ্রেণীব লোকেরাই উত্তম। প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া ইঁহারা সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই মেলা-মেশা করেন অনায়াসে—কলঙ্কিতের মধ্যে বাস করিয়াও ইঁহারা অকলঙ্ক। হংস যেমন জলে ডুবিয়াও সিক্ত হয না—ইঁহাবাও ঠিক তেমনি নির্লিপ্তভাবে সবত্র বিচরণ করেন। এই শ্রেণীর উত্তমগণের জন্য পূর্বোক্ত উপদেশ প্রযোজ্য নয়। ঐ উপদেশ তাহাদেরই জন্য যাহারা মধ্যম শ্রেণীব অর্থাৎ যাহাবা দুর্বলচিত্ত, আত্মবিশ্বাসহীন, ভীরু ও সন্ত্রস্ত। অধমের সঙ্গে মিশিলে তাহাদেব প্রভাব এড়াইবাব ক্ষমতা ইহাদেব নাই। তাই ইহারা সবদাই অধম হইতে দূবে দূবে থাকে—উহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা কবে—উত্তমেব মত নির্ভীক ভাবে অধমের সহিত মিশিয়া নিজেকে অটল রাখিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই।

ঝ. কে লইবে মোর কায, কহে সন্ধ্যাববি।
শুনিয়া জগৎ বহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমাব যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

সংসারে একটি জিনিস লক্ষ্য কবিয়া একটু অবাক হইতে হয়। যাহাদের অনেক আছে, যাহাদের ভাণ্ডার ধনধান্যে পরিপূর্ণ, বিত্ত যাহাদের স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, কোনরূপ কর্তব্যের আহ্বানে তাহারাই সাড়া দিতে চায না। কখনো কোনো দানেব প্রয়োজন হইলে, জনসেবার জন্য ডাক আসিলে তাহারা কোন উৎসাহ প্রকাশ কবে না। কিন্তু যাহাদেব কিছুমাত্র নাই যাহাবা নিতান্তই স্বল্পবিত্ত, দরিদ্র পবোপকারেব আহ্বানে তাহাবই সাড়া দেয় সর্বাগ্রে। ডাক আসিবামাত্র তাহারা কমতৎপর হইয়া উঠে। বাহিবের সংগতিকে তাহারা বড় করিয়া দেখে না অন্তবের উৎসাহ ও প্রেরণাই তাহাদেরই সম্বল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতাটি মনে পড়ে। দুর্ভিক্ষের কবল হইতে আর্ত-নরনারীকে বক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধ করুণ প্রার্থনা জানাইলে শ্রেষ্ঠিগণ নিরুত্তর হইয়া মাথা হেঁট করিল—কিন্তু একপ্রান্ত হইতে এক ভিখারিণী তাঁহার প্রার্থনায় সাড়া দিল।

এ. যে নদী হারায়ে চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তাবে জীর্ণ লোকাচার।

যে জাতি জীবিত, সচল প্রাণশক্তিতে পূর্ণ তাহাকে কোন কিছুই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—সে আপনার তেজে আপনি চলিতে থাকে। প্রাণবান্ জাতির চলমান্ জীবন প্রবাহে কোনও বাধা নাই। সেখানে মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত এবং সার্থকতার পথে ধাবমান্। মানুষ সেখানে আপন সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সকল সুযোগ লাভ করে। কিন্তু মৃত জাতির অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতির যখন মৃত্যু ঘটে, তখন নানারূপ বিধি নিষেধ বিচিত্র অর্থহীন লোকাচারের সৃষ্টি হয়—জাতির চবণে শৃঙ্খল পড়িতে থাকে নানাদিক হইতে। জাতির মন্দীভূত জীবনপ্রবাহ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতব ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে অনড, অচল হইয়া যায়। জীর্ণ সংস্কার তাহাকে অচলায়তনেব মধ্যে রুদ্ধ কবিয়া রাখে। যাহা জীবন্ত তাহা সচল, তাহা মুক্ত, তাহা গতিশীল। যাহা মৃত, তাহা অচল, বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ ও রুদ্ধগতি।

অনুশীলনী

১। ভাবার্থ সম্প্রসাবণ কর :—

ক. জীবনে যত পুজা হল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥ [ক. বি. ১৯৩৫]

খ. চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। [ক. বি. ১৯৩৫]

গ. আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে।

না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ, আলোক, তনু, মন, প্রাণ—
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানের যোগ্য করে,
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে।

মোরে চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ
নীচতার অনুরোধ,
তার ব্রত সত্য রক্ষ, সত্যানুসন্ধান,
চাহে না নিজের ইষ্ট,
অতুল কর্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হলে কম্পমান,
জীবন-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয় নিশান
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ। [ক. বি. ১৯৩৭]

ঙ. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

চ. যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

ছ. আলো সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা করার অপেক্ষা সামান্য একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইলে বক্তব্য বিষয় বেশী পরিষ্কার হইবে। [ক. বি. ১৯৩১]

জ. যে তোরে পাগল বলে,
তারে তুই বলিসনে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে,
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আসবে রে তোর পিছু পিছু।
আজকে আপন মানের ভারে
থাক্ সে বসে গদির 'পরে
কালকে প্রেমে আসবে নেমে,
করবে সে তার মাথা নীচু॥ [ক. বি. ১৯৩১]

ঝ. সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর।

খেলিছে তরঙ্গমালা—শিরে যেন পুষ্পরাশি
সমুদ্র-মন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি। (ক. বি. ১৯৩৬)

ঞ. আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্য মূল্য নয়।
যদ্যপি বল্কল পর, থাক উপবাসী,
হয়ো না হয়ো না তবু পরের প্রত্যাশী। (ক. বি. ১৯৩৬)

ট. বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা॥

ঠ. কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,—
আমরা কুটুম্ব দাঁহে, ভুলে গেলি কিরে।
থলি বলে—কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে,
আমার যা আছে, গেলে তোমার ঝুলিতে। (ক. বি. ১৯৩৪)

ড. রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী। (ক. বি, ১৯৩৪)

ঢ. সুখ দুঃখ করি বলে নিন্দা শুনি স্বীয়,
কি করিলে হব আমি সকলের প্রিয়?
বধি কহে, ছাড় তবে এ সৌর সমাজ,
দু'চারি জনেরে লয়ে কর ক্ষুদ্র কাজ।

ণ. জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।

ত ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ,—তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মত নিত্যকাল দোলে।

থ. স্বপ্ন কহে—আমি মুক্ত। নিয়মের পিছু
নাহি চলি। সত্য কহে—তাই তুমি মিছে।
স্বপ্ন কয়—তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে।
সত্য কয়—তাই মোরে সত্য সবে বলে।

ম. ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ,—
কে শেষে হইল জয়ী ?—মৃদু সমীরণ।

ধ. চন্দ্র কহে বিশ্বে আলো দিয়াছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তা আছে মোর গায়ে।

ন প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে—ভালো আছ ভাই ?

প. 'যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে'—এই বাক্যটি স্মরণ করিয়া তোমার নিকটে যে সুবিধা উপস্থিত, তাহা প্রত্যাখ্যান করিও না। (ক বি ১৯৩১)

১০. বাগ্‌ভঙ্গী

ইংরাজীতে স্টাইল (style) এবং ইডিয়ম (idiom) এই দুইটি শব্দের ব্যবহার আছে। এই ইংরাজী শব্দ দুইটির বাঙ্গালা অর্থ সাধারণতঃ পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যখন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন ইংরাজী শব্দের দ্বারাই কাজ চালানো হইয়া থাকে। কতকগুলি ইংরাজী শব্দ নিত্য ব্যবহারের ফলে ভাষায়, বিশেষতঃ কথোপকথনের ভাষায়, এমন সুপ্রচলিত হইয়া যায়, যে, তাহাদের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ একরূপ শুনিতেই পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ 'স্কুল' কথাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এমন কি বাড়ীর দাস দাসী পর্যন্ত কেহই বিদ্যালয় বলে না, বলে 'স্কুল' বা 'ইস্কুল'। স্টাইল এবং ইডিয়মের সেই দশা।

এই শব্দ দুইটির বাঙ্গালা রূপ বাঙ্গালীর মধ্যে সুপ্রচলিত না হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, বাঙ্গালায় এই দুই শব্দের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ নাই। ব্যাকরণেরও একটা পরিভাষা আছে। কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতি শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই অর্থের কখনো ব্যতিক্রম হয় না। ব্যাকরণে 'পুরুষ' অধ্যায়ে উত্তম শব্দের প্রয়োগ আছে সেখানে উত্তম শব্দের একটিমাত্র অর্থ। 'আমি' এই সর্বনামটি কোন্ পুরুষ ? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহই বলিবে না—আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা উৎকৃষ্ট পুরুষ। অন্যত্র উত্তম শব্দের যত মানেই থাকুক না কেন, ব্যাকরণে তাহার অর্থ এক।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে স্টাইল শব্দের প্রতিশব্দরূপে রচনা-পদ্ধতি, রচনা-রীতি, রচনাশৈলী প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দেখা যায়। একটি ব্যাকরণে দেখিলাম স্টাইলের বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে শুদ্ধমাত্র রীতি কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার ইডিয়ম শব্দের প্রতিশব্দরূপেও বাগ্‌বিধি, ভাষার রীতি, বাক্যরীতি প্রভৃতি শব্দ বা শব্দসমষ্টির ব্যবহার আছে। কোনো কোনো বাঙ্গালা ব্যাকরণে বাঙ্গালা নাম না দিয়া 'idiom' শব্দ দ্বারাই বাঙ্গালা ব্যাকরণের সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর মুখে ঐ দুই শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যদি না শুনি তাহা হইলে দোষ দিব কাহার ?

আমাদের প্রস্তাব রচনাশৈলী শব্দটি স্টাইলের প্রতিশব্দ হিসাবে প্রচলিত হউক। বর্তমানে স্টাইল অর্থে এই শব্দটি সাহিত্যিকগণ প্রায়ই প্রয়োগ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অর্থটিও পরিস্ফুট হয়। রবীন্দ্রনাথ স্টাইল অর্থে রচনাশৈলী শব্দটি অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ স্টাইল এবং ইডিয়ম উভয়েই এক এক প্রকারের রীতি। স্টাইল হইল কোনো রচনার বিশেষ প্রকারের ভঙ্গী। স্টাইল কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। ইহার দ্বারা সমগ্র রচনার প্রকাশভঙ্গীর কথাই বলা হয়। কিন্তু ভাষার মধ্যে শব্দাদির প্রয়োগে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহাই হইল ইডিয়মের দৃষ্টান্তস্থল। 'কলুর বলদ', 'ডুমুরের ফুল', 'ভাতে মারা', 'কোণ-ঠাসা', 'মান্ধাতার আমল', 'পেটে খেলে পিঠে সয়', 'বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' প্রভৃতি বাক্য বা বাক্যাংশ ইডিয়মের উদাহরণ। এই কারণে ইডিয়মের প্রতিশব্দ বাক্-শৈলী বা 'বাগ্‌ভঙ্গী' হইলে সংগত হয়। তবে বাক্ শব্দের সহিত 'শৈলী' শব্দের অপেক্ষা 'ভঙ্গী' শব্দটাই অধিকতর প্রয়োজ্য বলিয়া মনে হয়। এইজন্য ইডিয়মের প্রতিশব্দরূপে 'বাগ্‌ভঙ্গী' এই কথাটিই ব্যবহৃত হইল।

প্রয়োগই হইল বাগ্‌ভঙ্গীর প্রাণ। এক একটি শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ ভাষায় বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রয়োগের শিক্ষার জন্য সুলিখিত সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে, আদর্শ লেখকগণের রচনার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। শব্দার্থ পরিচ্ছেদে কয়েকটি বিশিষ্টার্থক বাক্য ও বাক্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এখানে আরও কয়েকটি দেওয়া হইল।

সোনায় সোহাগা।
সাতখুন মাপ।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া।
অরণ্যে রোদন।
তেলে বেগুনে।
পোয়া বারো।
ধরাকে সরা জ্ঞান।
হাল ছেড়ে দেওয়া।
কাটা ঘায়ে নুনেব ছিটে।
গোবর গণেশ।
হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।
গোঁফ খেজুরে।
ভিজে বেড়াল।
তাল সামলানো।
জিলাপীব প্যাঁচ।
গোকুলেব ষাঁড়।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিব।
গভীর জলেব মাছ।
ঘবে বসে উজিব মারা।
মাটিব মানুষ।
দিনে ডাকাতি।
ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
পাকা ধানে মই।
কাজেব বেলায় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজি।
ভস্মে ঘি ঢালা।
তিলকে তাল করা।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
কিলিয়ে কাঁটাল পাকানো।
পান্তা ভাতে ঘি।

গণেশ উল্টানো।
বাড়া ভাতে ছাই।
হরি ঘোষের গোয়াল।
কর্তা ভজা।
বিড়াল তপস্বী।
ভূতের বেগার খাটা।
পাঁচভূতেব কাণ্ড।
ঠুঁটো জগন্নাথ।
কথায় কথা বাড়ে।
আমড়া কাঠেব ঢেঁকি।
আর কি নেড়া বেলতলা যায়।
উলু বনে মুক্তো ছড়ানো।
উন বর্ষাব দুনো শীত।
আক্কেল সেলামী।
আগে দর্শনধারী, শেষে গুণ বিচাবি।
আঠাব মাসে বৎসর।
নিজেব কোলে ঝোল সবাই টানে।
এক ক্ষুবে মুড়ানো।
এক পা জলে, এক পা স্থলে।
এক মাঘে শীত যায না।
কনেব ঘবের মাসী, ববেব ঘবের পিসী।
উলুবনে কীর্তন।
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
কত ধানে কত চাল।
কানু ছাড়া কীর্তন নাই।
কারও ঘব পোড়ে, কেউ আগুন পোহায়।
কালনেমিব লঙ্কাভাগ।
কীল খেয়ে কীল চুবি করা।
কড়ি নেবে গুণে, পথ চলবে জেনে।
কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুটলি বাঁধে।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।
খাল কেটে কুমীর আনা।
গড্ডালিকা প্রবাহ।
গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।
উঠতে না উঠতেই এক কাঁদি।
গাছের খায়, তলারও কুড়ায়।
কার কপালে কে বা খায়।
গোদা পায়ের লাথি।
গোদের উপর বিষ ফোড়া।
গোবরে পদ্ম ফুল।
ইঁটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।
একে মনসা, তাতে ধুনোর গন্ধ।
অ্যাঙ্ যায়, ব্যাঙ্ যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই।
কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে।
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
আপরুচি খানা, পররুচি পরনা।
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।
আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
ইস্তক জুতো সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ।
উপরোধে ঢেঁকি গেলা।
এক আঁচড়ে চেনা।
এক দোর বন্ধ, হাজার দোর খোলা।
একুল ওকুল দুকুল গেল।
ওঝার ঘাড়ে বোঝা।
তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতায় পাতায়।
কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না।
কাঁঠালের আমসত্ব।
কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।
কান টানলে মাথা আপনি আসে।
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
কানা পুতের নানা রোগ।
কুঁড়ে ঘরে বাস, খাটপালঙ্কের আশ।
সোনার পাথরবাটি।
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
কেউটে ধরতে না পারলে হেলে ধরব।
কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।
খোশ খবরের ঝুটোও ভাল।
গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।
ঘোড়া থাকলে চাবুকের ভাবনা।
চাপ পড়লেই বাপ।
চোখ বুজলেই অন্ধকার।
শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।
ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।
জল দিয়ে জল বার করা।
ঢাল নাই, তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার।
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
নুন খাই যার, গুণ গাই তার।
বাড়াভাতে গিন্নিপণা।
লেবু কচলালে তেতো হয়।
পড়শীর মুখ, না আরশীর মুখ।
পুরুষের দশ দশা, কখনো হাতী, কখনো মশা।
পাঁচ ফুলে সাজি ভরা।

তোর শিল তোর নোড়া,
তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া।
দশের লাঠি একের বোঝা।
দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।
দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?
দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।
ধান ভানতে শিবের গীত।
ন-মণ তেলও পুড়বে না,
রাধাও নাচবে না।
নাও পর গাড়ী, গাড়ী পর নাও।
নাচতে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানা।
অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।
অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি।
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।
লাগে কড়ি, দেবে গৌরী সেন।
যার ধন তার নয়, নিপোয় মারে দই।
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
পাথরে পাঁচ কিল।
পিঠ করেছি কুলো, কাণে দিয়েছি তুলো।
পীরের কাছে মামদোবাজি।
পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধোয়।
বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
বড় গাছেই ঝড় লাগে।
বড় মাছের কাঁটাও ভাল।
বাঁশবনে ডোম কানা।
বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।
যার কর্ম তার সাজে,
অন্য লোকে লাঠি বাজে।
কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ
সবুরে মেওয়া ফলে।
কয়লা না ছাড়ে ময়লা।
যত গর্জে, তত বর্ষে না।
পেটে খেলে পিঠে সয়।
আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর।
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
যেখানে বাঘের ভয়,
সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

১১. প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন রকমের। বাঙ্গালার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই রচনা দুষ্ট হইবে। 'নিজের চরকায় তেল দাও, এটি হইল একটি প্রয়োগসিদ্ধ বাক্য। নিজের কাজে মন দাও—এই অর্থেই ইহার ব্যবহার। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার জন্য যদি কেহ বলেন, নিজের যন্ত্রে তেল দাও, তাহা হইলে বাগ্‌ভঙ্গী সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। বিশেষ অর্থে বিশেষ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। জল শব্দের বিশেষণ জলুয়া বা জোলো। জোলো শব্দের অর্থে জলমিশ্রিত বা তরল। যেমন—জোলো,

দুধ, জোলো হাওয়া। কোন কোন আধুনিক লেখকের রচনায় 'জোলো পাখী' এরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি। এখানে "জোলো" শব্দকে জলচর অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ প্রয়োগ রীতিসম্মত নহে।

পদের অযথাবিন্যাসের ফলেও বাগ্‌ভঙ্গী দোষযুক্ত হয়। 'ভাইবোন', 'গাছ-পাথর', 'আকাশপাতাল', 'চালচলন', 'সীতারাম', 'বরকনে', 'দেওরভাজ' প্রভৃতি দৃষ্টান্তে শব্দের যে ক্রম আছে, তাহাই রীতিসিদ্ধ। 'তাব বয়সেব গাছপাথর নাই'—এই বাক্যটিকে যদি কেহ পবিবর্তিত কবিয়া লিখেন, 'তার বয়সের পাথরগাছ নাই, তাহা হইলে অর্থগ্রহণে বাধা তো হয়ই, শুনিতেও খারাপ লাগে।

ভাষাকে সরস ও সুমার্জিত করিতে হইলে সবপ্রকাবের অসংগতি বর্জন করিতে হইবে। সাধাবণতঃ এই সকল অসংগতি দৃষ্ট হয়ঃ

১. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ। যেমন,—"যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবাব জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহাব হইত, তবে সেই মেকি বাংলাব ফাঁকি আজ পর্যন্ত ধরা পডিত না।"—এই বাক্যেব সবটুকু ঠিক বাখিয়া যদি কেবল 'পড়িত' শব্দেব স্থানে 'পডত' কবা হয় তাহা হইলেই ভাষাব বিশুদ্ধি নষ্ট হয়।

২. বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেব সহিত দেশজ কথাব যথেচ্ছ সংমিশ্রণ। যেমন,—শবপোডা, মডাদাহ, ভিখ্‌যাচ্‌ঞা কবা, কর্ণ মলিয়া দেওয়া।

৩. অলংকাব প্রয়োগে অনবধানতা। যেমন,—'জ্ঞানাঞ্জন শলাকাব স্পর্শে যিনি অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত কবেন সেই গুরুদেবের চবণকমলে নমস্কার। বাক্যটি শুনিতে ভাল হইলেও বিশুদ্ধ হয় নাই। কাবণ অঞ্জন'লাকার দ্বারা অন্ধকার দূর করা যায় না। হয় বলিতে হইবে 'জ্ঞানপ্রদীপেব দ্বাবা অজ্ঞান-অন্ধকাব দূবীভূত কবেন, নতুবা বলিতে৹ হইবে 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকাস্পর্শে চক্ষু উন্মীলিত করেন।"

অক্ষম এবং অনবহিত লেখকের রচনায় এইরূপ অসংগতি বহুল পবিমাণে দৃষ্ট হয়। সতর্কতার সহিত সেগুলি পরিহার করিতে হইবে।

প্রবেশিকা ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার

ব্যাকরণের প্রশ্নাবলী

[কঃ বিঃ ১৯৪৫]

(১) যে-কোন তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কব :

ঈ, ঐ, উ, চ; ফ; শ।

(২) বিশিষ্ট উদাহবণ দিয়া যে-কোনো তিনটিব ব্যাখ্যা কর :

উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম, নাম ধাতু; প্রযোজক ক্রিয়া; তদ্ধিত প্রত্যয়; রূপক সমাস।

(৩) নিম্নলিখিত-যে কোনো তিনটি বাক্যকে সরল বাক্যে পবিণত কর :

(ক) যাহা কবিবাব কবিযাছি। (খ) বেলা থাকিতে আসিও, নতুবা দেখা হইবে না। (গ) যে-বইখানি আমি কিনিযাছি, তাহা আব কোথাও পাওয়া যাইবে না। (ঘ) মাব আব ধব, যে কোনো কথা শুনিবে না। (ঙ) তিনি ক্রুদ্ধ হন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ ক্রোধ থাকে না। (চ) সে দোষ কবে নাই, তথাপি তাহাব শাস্তি হইল।

(৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলিব যে-কোনো দুইটি লইয়া প্রত্যেকটির অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি বাক্য বচনা কব :

দোহাবা, বাতকানা, বগচটা, নেই-আঁকড়া, হাড়হাবাতে।

(৫) অনুক্ত পূবণ কর: তুমি——গিয়া গুরুজনদিগেব——কবিবে; সপত্নীদিগেব——প্রিয়সখী ব্যবহার——, সৌভাগ্য গর্বে——হইবে না। মহিলাবা এইরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিতা, বিপরীত-কারিণীরা কুলেব——।

(কঃ বিঃ ১৯৪৬)

(১) নিম্নলিখিত বর্ণগুলিব মধ্যে যে-কোনো তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর, এবং ইহাদেব উচ্চারণ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখ :

এ; ও; চ; ঞ; জ্ঞ।

(২) উদাহরণ দিয়া নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যে-কোনো তিনটির ব্যাখ্যা কর :

হসন্ত; লুপ্ত অ-কার; য়-শ্রুতি; বিপ্রকর্ষ।

(৩) যে-কোনো তিনটি পদের সন্ধি বিচ্ছেদ কর: উল্লেখ, উত্তমর্ণ; হিতৈষী, মনান্তর; প্রাতরাশ; গবাক্ষ।

(৪) যে-কোনো তিনটি পদের সমাস ভাঙ্গিয়া লিখ এবং সমাসের নামোল্লেখ কর:

অগ্নিভয়, বাজাবাদশা, ভ্রাতুষ্পুত্র; ভিক্ষান্ন, তেমাথা, ডাক্তারসাহেব।

(৫) অনুক্ত পূরণ কর: সাধু—চলিতে—এ পৃথিবীতে—সময়ে নিন্দা—হইতে হয় এবং—রূপ কষ্টে—হয়। যাঁহারা মানুষ—ভগবানকে—ভয় করেন, তাহারা—আমাদিগের মধ্যে পাগল—পরিচিত হন।

(৬) শুদ্ধ করিয়া লিখ:

তাঁহার জন্মবার্ষিক উপলক্ষে তিনি বহু ব্যয়ে একটি সাংঘাতিক ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সময় সংক্ষেপ বলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্বে আমার যাইবার সাবকাশ হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহার পার্শ্বে ছুটিলাম।

৭) নিম্নলিখিত সুভাষিতের মধ্যে যে-কোনো দুইটির অন্তর্নিহিত ভাব বিবৃত কর:

দশচক্রে ভগবান ভূত, ভিক্ষার চা'ল কাঁড়া আর আকাঁড়া, দশের লাঠি একের বোঝা, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহেন।

[ক: বি: ১৯৪৭]

(১) নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যে-কোনো দুইটির অর্থ নিরূপণ কর, এবং যে যে বর্ণের ঐরূপ সংজ্ঞা হইতে পাবে, সেগুলির উল্লেখ কর:

কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ, দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ, অনুনাসিক বর্ণ; অন্তঃস্থ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ।

(২) তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ—ইহাদের প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বাক্য গঠন কর।

(৩) বিশিষ্ট উদাহরণ দিয়া যে-কোনো দুইটির ব্যাখ্যা কর:

যৌগিক শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ, উপপদ সমাস; গৌণকর্ম, নামধাতু।

(৪) নিম্নলিখিত শব্দসমূহ হইতে যে-কোনো তিনটি গুচ্ছ বাছিয়া লও এবং ঐ শব্দগুলির অর্থগত প্রভেদ বুঝাইয়া দাও:

আহ্নিক—আঙ্গিক, অবদান—অবধান, নিদান—নিধান; বর্শা—বর্ষা; সত্ব—স্বত্ব, দেয়—ধ্যেয়।

(৫) নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলির যে-কোনো তিনটির অর্থ বুঝাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :

সাত-সতেরো ; বড মুখ , ঠোঁট কাটা , চিনির বলদ ; পোয়া-বারো ; ডুমুরের ফুল।

(৬) নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্য বা বাক্যাংশগুলির যে-কোনো ছয়টিকে গ্রহণ কর এবং প্রত্যেকটিকে একপদে সংহত কর :

যাহার মমতা নাই , যিনি শত্রুকে বধ করিয়াছেন , যাহা পূর্বে কখনো দেখা যায় নাই , যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে , যাহার ভাতের অভাব আছে , যাহা উডিয়া যাইতেছে , খেলায় যে পটু , কাঠের দ্বারা নির্মিত , পা হইতে মাথা পর্যন্ত , বন্দোবস্তের অভাব।

[কঃ বিঃ ১৯৪৮]

(১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে যে-কোনো ছয়টির সূত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—নীরব, অন্যোন্য, তদ্ধিত, মহৌষধি, ঢাকেশ্বরী, চরণামৃত, নিজস্ব, আচ্ছন্ন উচ্ছ্বাস।

(২) কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

(৩) বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে বলে ? নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে-কোনো দুইটির বিধেয় সম্প্রসারিত কর :

(ক) শরৎ আজ বক্তৃতা করিবেন। (খ) 'দাও ফিরে সে অরণ্য।' (গ) কৃষক ধান কাটিতেছে। (ঘ) 'মনসা মংগল' অভিনীত হইবে। (ঙ) রাজবাড়ীর মঠ বন্ধ হইয়াছে।

(৪) বাজ, দার, আরী, ইষ্ট-প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ দিয়া বাক্য রচনা কর। ইহাদের মধ্যে যে-কোনো তিনটি প্রত্যয় দিয়া তিনটি বাক্য রচনা করিলে চলিবে।

(৫) ণিজন্ত ও সনন্ত ধাতু কি করিয়া নিষ্পন্ন হয় ? উভয়ের মধ্যে অর্থে বা রূপে কোনো পার্থক্য আছে কি ? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

[কঃ বিঃ ১৯৪৯]

(১) বিভক্তি কাহাকে বলে ? 'ঈশ্বর তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার দিবেন।' এই বাক্যে কোথায় কোথায় বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দাও।

(২) 'গরম দুধ অনেক উৎকট রোগে সুপথ্য'—এই বাক্যটিতে বিশেষণ পদ কোন কোনটি, তাহা দেখাইয়া দাও। তুলনা বুঝাইতে গেলে কি কি বিভক্তি হয়, তাহার দুইটির উল্লেখ কর।

(৩) 'পনা', 'আনি', 'আলি', 'খোর'—এই চারিটির মধ্যে যে-কোন তিনটি প্রত্যয় দিয়া তিনটি শব্দ রচনা কর, এবং বাক্য রচনা করিয়া রচিত শব্দগুলির প্রয়োগ দেখাও।

(৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলিব যে-কোনো তিনটিব স্ত্রীপ্রত্যয়ে নিষ্পন্ন রূপ লেখ, এবং তাহা দিয়া বাক্য রচনা কব :

অভাগা, সোহাগ, জেঠা, বাঘ, মহারাজা।

(৫) বহুব্রীহি সমাস কাহাকে বলে? সমানাধিকবণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহিব পার্থক্যটি বাক্য রচনা কবিয়া বুঝাইয়া দাও।

বেচাল, অন্তর্জলি, জলবাদা, ফুলবাবু—ইহাদের কোনটির কি সমাস হইয়াছে, তাহা বল।

[কঃ বিঃ ১৯৫০]

(১) উদাহরণ সহ যে-কোনো চাবিটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কব: স্পর্শ বর্ণ, মৌলিক ও যৌগিক শব্দ, সমীকবণ, অলুক সমাস।

(২) তদ্ধিত প্রত্যয় কাহাকে বলে? একটি সংস্কৃত, দুইটি বাংলা এবং একটি বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়েব দ্বাবা সবসমেত চারিটি শব্দ গঠন কব, এবং সেই চাবিটি শব্দ অবলম্বনে চারিটি বাক্য বচনা কব।

(৩) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত মোটা-হরফে-লেখা শব্দগুলির মধ্যে ছয়টির ব্যাকবণগত বৈশিষ্ট্যের সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ক) তার কথা শুনে মনটা একেবারে **বিষিয়ে** গেল। (খ) যেখানে **বাঘের** ভয়, সেইখানেই রাত হয়। (গ) বৈশাখ মাসে আম **পাকে**। (ঘ) গোলমাল না কবে **বসে** পড। (ঙ) সে তখন ঘুমে **অঘোর**। (চ) **পড়ন্ত** বেলায একবার এসো।' (ছ) ঈশ্বরীরে **জিজ্ঞাসিল** ঈশ্বরী পাটনী। (জ) রাস্তায় তার সঙ্গে **চোখোচোখি** হ'য়ে গেল। (ঝ) নাই মামার **চেয়ে** কানামামা ভাল।

(৪) 'এ' বিভক্তি বাংলা কোন কোন কারকে প্রযুক্ত হয়? প্রত্যেকটিরই দুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

(৫) যে-কোনো চারিটি বাক্য সংশোধনের কারণ নির্দেশ পূর্বক শুদ্ধ করিয়া লিখ :

(ক) ফুটে ফুল আমাদের কানন প্রাংগণে। (খ) তোমাতে এত ভয় কিসের, তুমি কি আমার শিরচ্ছেদ করিবে? (গ) আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে না পারিলেই শেষে দুঃখ পাইতে হয়। (ঘ) যদিও তিনি সক্ষম, কিন্তু তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। (ঙ) দীর্ঘসূত্র লোক কাজের চাপ পড়িলে চোখে হলুদের ফুল দেখে। (চ) আমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিসমূহ লোপ হইয়াছে। (ছ) নিরপরাধীকে শাস্তি দিয়া কাহার কি লাভ হইবে, জানি না? (জ) যে ব্যক্তি পরের মুখের খাদ্য কাড়িয়া লয়, সে পশ্বাধম।

(৬) 'কাঁচা' ও 'মুখ' এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকটির চারিটি বিশিষ্ট বা রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া সর্বসমেত আটটি বাক্য রচনা কর।

[কঃ বিঃ ১৯৫১]

(১) উদাহরণ-সহ যে-কোনো চারিটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর : যৌগিক স্বর ; অর্দ্ধতৎসম শব্দ , অনুক্ত কর্তা, সামীপ্যাধিকরণ ; প্রয়োজক ক্রিয়া ; কৃৎ প্রত্যয় ; দ্বিগু সমাস , আদেশ।

(২) সংক্ষেপে সূত্র উল্লেখ পূর্বক যে-কোনো চারিটির সন্ধি বিশ্লেষণ কর : অন্বেষণ , বিদ্যুল্লেখা, নীরক্ত চতুষ্কোণ, উন্নতি, গায়ক, উচ্ছৃঙ্খল।

(৩) যে-কোনো চারিটির ব্যাসবাক্য উল্লেখপূর্বক সমাস নির্ধারণ কর : লাঠিখেলা, চোখেদেখা, বরযাত্রী, হরবোজ, গরমিল, রাঙামূলো, চোখাচোখি।

(৪) যুক্তিসহ যে-কোনো পাঁচটিকে প্রয়োজনস্থলে শুদ্ধ কর অথবা সমর্থন কর : মৃণ্ময়, চর্বচোষ্য, বিশুদ্ধিতা, ভাগ্যমন্ত, সকৃতজ্ঞ, আহরিত, সাধ্যায়ত্ত, মহিমাময়, ছাত্রগণেরা।

(৫) চারিটি সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত এবং ছয়টি বাঙলা উপসর্গযুক্ত শব্দের উল্লেখ কর।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোনো পাঁচটি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ধারণ কর : ঢুলী, ধেনো, বাঁশরী, হাঘরে, বাত্তিক, ঘরামি, সাপুড়ে, দীঘল।

(৭) নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে যথাযথ ছেদচিহ্ন ব্যবহার কর :

'ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল এই তো চাই কিন্তু আস্তে ভাই ব্যাটারা ভারী পাজী আমি ঝাউ বনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে নৌকা এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না আর টের পেলেই বা কি ধরা কি

সুখের কথা ; দেখ্ শ্রীকান্ত কিছু ভয় নেই ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেললো বলে আর পালাবার যো নেই তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হল।'

[সেঃ বোঃ ১৯৫২]

(১) উদাহরণসহ যে-কোনো চারিটি সম্বন্ধে টীকা লেখ :

মহাপ্রাণ বর্ণ, তদ্ভব শব্দ, অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় অব্যয়, কর্মকর্তৃবাচ্য, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, বিদেশী তদ্ধিত, ক্রিয়াবিশেষণ।

অথবা

কৃৎপ্রত্যয় কাহাকে বলে ? দুইটি সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ দুইটি বাংলা কৃদন্ত শব্দ দ্বারা মোট চারিটি বাক্য গঠন কর।

(২) (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত বাক্যগুলির অন্তর্গত চিহ্নিত শব্দগুলির যে-কোনো তিনটির কারক নির্ণয় কর এবং অবশিষ্ট বাক্যগুলির মধ্যে চিহ্নিত যে কোনো চারিটির সমাস (ব্যাসবাক্য সহ) নির্ণয় কর :

(ক) **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। (খ) ছোটমুখে বড় **কথা** ভাল শোনায় না। (গ) **অন্ধজনে** দেহ আলো। (ঘ) **হালে** পানি পাওয়া যাচ্ছে না। (ঙ) **ঘর** পালিয়ে কোথায় গেছিলে ? (চ) চরকার ঘর্ ঘর্ বস্তির **ঘর ঘর**। (ছ) তোমার দেখছি **জোরবরাত**। (জ) এমন **লোক-দেখান** কাজ না করা ভাল। (ঝ) **কলেছাঁটা** চাল খেয়েই তো অসুখ করেছে। (ঞ) **বেগতিক** দেখে লোকটা পালিয়ে গেল। (ট) আজ সেই **স্মৃতিমন্দিরের** দ্বার খোলা হবে। (ঠ) আয় রে পাখী **লেজঝোলা**। (ড) **গায়ে-পড়া** মানুষ আমার ভাল লাগে না।

অথবা

যুক্তি দেখাইয়া যে-কোন ছয়টিকে শুদ্ধ কর :

সবাঙ্গীন, পরিস্কার, স্থায়ীত্ব, মহত্ব, এতদাঞ্চল, ঐক্যমত্য, নিঃস্বার্থপর, বাগেশ্বরী, প্রজ্জলিত, সমৃদ্ধশালী, মাধুরিমা।

(৩) নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে এবং যৌগিক বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :

(ক) পরিশ্রমী ব্যক্তি জীবনে কখনও দুঃখলাভ করে না।

(খ) জ্ঞানী বলিয়াই তিনি বিনয়ী ছিলেন।

(গ) অনেক দেশ ঘুরিয়া নিজের জন্মভূমিতে ফিরিলাম।

(ঘ) লজ্জাবশতঃ লোকটি কথা বলিতে পারিল না।

(ঙ) তাঁহার ধনের অভাব নাই, কিন্তু কাহাকেও কিছু দান করেন না।

(চ) আর লাভের আশা নাই, একেবারে বাড়ী ফিরিতে হইল।

(ছ) তিনি সত্যের পূজারী, এইজন্য তিনি জগতে সর্বত্র আদৃত।

(জ) হয় কাজ কর, না হয় সরিয়া পড।

অথবা

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত কর :

বিপিন ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, "বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছ? আজ বৌঠান আমাকে না হ'ক দশটা বাজে কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।"

হেমাঙ্গিনী শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "বৌঠান কাজের কথা কবে বলেন? আজকেই কি শুধু বাজে কথা শুনিয়েছেন?"

বিপিন বলিলেন, "আজ তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। কবে তোমার এই স্বভাব যাবে?"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "আমার স্বভাব যাবে মরণ হ'লে, তার আগে নয়। মা, আমার কোলে ছেলেপিলে আছে, মাথার উপর ভগবান আছেন।"

[সেঃ পোঃ ১৯৫৩]

(১) উদাহরণসহ যে-কোনো পাঁচটির সম্বন্ধে যাহা জান তাহা সংক্ষেপে লেখ :—তালব্য বর্ণ, তৎসম শব্দ, বর্ণাগম, বাঙলা উপসর্গ, ভাববাচ্য, অনুক্ত কর্তা, ণিজন্ত ক্রিয়া, দ্বিগু সমাস, রূপক কর্মধারয় সমাস।

অথবা

বাঙলা শব্দকে পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের যে নিয়মগুলি রহিয়াছে, যথোপযুক্ত উদাহরণসহ তাহার যে কোনো পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ কর।

(২) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত চিহ্নিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো ছয়টি সম্বন্ধে ব্যাকরণগত টীকা লেখ :

(ক) আত্মত্যাগের বহু আদর্শ এখনও **জাজ্বল্যমান**। (খ) **পাথরের** বাটিটি ভাঙ্গিয়া গেল। (গ) তোর যা ইচ্ছে **কর্ গে'**। (ঘ) খেলতে এসে কেন **হাতাহাতি** করছ? (ঙ) লোকটা **নাকেমুখে** কথা বলে।

(চ) আমি থাকিলে লোকটাকে জুতিয়ে লম্বা করে দিতুম। (ছ) মরি মরি! নদীতীর, আজ কি শোভাই ধারণ করিয়াছে। (জ) তর্কে বিরত থাকাই ভাল। (ঝ) ঝমঝম্। (ঞ) বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে দেশ পচে গেল।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো ছয়টি শব্দে কি অর্থে কি প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ কর :

বৈচিত্র্য, দাশরথি, জমিদার, শুশ্রূষা, চলতি, বার্ষিক, জ্যাঠামো, মেয়েলি, বড়াই, ঘরোয়া।

(৩) নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থবোধক বাক্যাংশের ভিতর হইতে যে-কোনো তিনটির অর্থ বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের অবলম্বনে তিনটি বাক্য রচনা কর : শিমূল ফুল, বর্ণচোরা, সুখের পায়রা, মাটির মানুষ, বাদুর দশা, জিলিপির পেঁচ।

অথবা

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

তখন ক্ষীণ চন্দ্র———যায় যায়। চারিদিক———হইয়া আসিতেছে। ———সাড়া শব্দ নাই।———প্রাঙ্গণে চারিদিকে ভিত্তির———পড়িয়াছে। ক্রমে সেটুকুও———গেল।

[সেঃ বোঃ ১৯৫৪]

(১) অধিকরণ কারক কাহাকে বলে? অধিকরণ কারকের মধ্যে প্রধান তিনটি প্রকারের উদাহরণসহ উল্লেখ কর। উদাহরণ দ্বারা অধিকরণ কারকে এই দুইটি বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া দাও :

(ক) অধিকরণে—শূন্য বিভক্তি ; (খ) অধিকরণে—'তে' বিভক্তি।

অথবা

বহুব্রীহি সমাস কাহাকে বলে? বহুব্রীহি সমাসের নিম্নলিখিত প্রকারগুলির মধ্যে যে-কোনো চারিটি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও :

(ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, (খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, (গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি, (ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, (ঙ) নঞর্থক বহুব্রীহি, (চ) অলুক্ বহুব্রীহি।

(২) উদাহরণসহ যে-কোন চারিটি বুঝাইয়া দাও :

অল্পপ্রাণ বর্ণ ; 'এ'-কারের বিশুদ্ধ এবং বিকৃত বা বিবৃত উচ্চারণ ; তদ্ভব শব্দ ; বিসর্গ সন্ধি ; সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ; শব্দের দ্বিত্বদ্বারা বহুবচন ; অনন্বয়ী অব্যয়।

অথবা

'আছ্' বা 'শো' ধাতুর সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় প্রথম পুরুষ একবচনে নিম্নলিখিত কালের রূপ দাও :

(ক) ঘটমান বর্তমান, (খ) পুরাঘটিত বর্তমান, (গ) নিত্যবৃত্ত অতীত, (ঘ) পুবাঘটিত অতীত।

(৩) নিম্নলিখিত চিঠিখানি শুদ্ধ করিয়া লেখ :

স্নেহের জ্যোতীন্দ্র,

তোমার পত্র পাইযাছি। তোমার পিতৃদেবের স্বাস্থ ভাল থাকিতেছে না, এবং বিশেষ শুশ্রূষার প্রয়োজন লিখিয়াছ ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়েব মধ্যে যে শোকানল প্রজ্জলিত রহিয়াছে তাহাতে বাহিবেব চিকিৎসায় আরগ্য লাভ করিবেন কি ? আশা করি তোমার সদ্যজাত শিশুটি ভাল আছে। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীফণীভূষণ দে।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো সাতটিকে অবলম্বন করিয়া সাতটি বাক্য রচনা কব :

আবিল, উপযোগিতা, কবুল, জীর্ণভিত্তি, দিলদরিয়া, দ্বিধাগ্রস্ত, নিরবকাশ, বাগ্জাল, যাযাবব, মুখর, ভঙ্গুব।

[সেঃ বোঃ স্পেশাল ১৯৫৪]

(১) দৃষ্টান্তসহ যে-কোনো পাঁচটির লক্ষণ নির্ণয় কর :

নামধাতু ; রূঢ়শব্দ ; ণিজন্তক্রিয়া ; স্বর-সঙ্গতি ; বিপ্রকর্ষ ; ভাববাচ্য ; যৌগিক-ক্রিয়া ; তদ্ভব শব্দ।

অথবা

'সমস্ত পদ' বলিতে কি বুঝ ? 'ব্যাসবাক্য' বা 'বিগ্রহবাক্য' কাহাকে বলে ? ব্যাসবাক্যসহ নিম্নলিখিত যে-কোনো ছয়টি শব্দের সমাস নির্ণয় কর :

জন্মান্ধ, জনপিছু; মিশ-কালো; কোলকুঁজো; আগাগোড়া; ডাকমাশুল; চালাকচতুর; গ্রামান্তর; ধামাধরা; পিছপা।

(২) নিম্নলিখিত যে-কোনো পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর:

সন্ধি; স্থাবর; সমষ্টি, ব্যর্থ; শূন্য; আবির্ভাব, আরোহণ, অগ্রজ; রাগ।

অথবা

নিম্নলিখিত যে-কোনো পাঁচটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

প্রাতরাশ; মনোহর, উত্তমর্ণ; প্রৌঢ়; নীরব; গবাক্ষ; সংস্কৃত, আশ্চর্য্য; উচ্ছ্বাস।

(৩) সাধিত শব্দ কাহাকে বলে। কৃৎ ও তদ্ধিতের পার্থক্য নিরূপণ কর। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত তিনটি খাঁটি বাঙলা শব্দের উল্লেখ কর।

অথবা

বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত বাক্য তিনটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ প্রসারিত কর:

(ক) বাগানে ফুল ফুটিয়াছে।

(খ) রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

(গ) জন্মভূমির তুল্য স্থান আর নাই।

[সেঃ বোঃ কম্পার্টমেণ্টাল ১৯৫৪]

(১) নিম্নরেখ পদগুলির মধ্যে যে-কোনো ছয়টির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিচার কর:

(ক) **রক্তমাংসের** শরীরে আর কত সয়। (খ) **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। (গ) এ যেন **গঙ্গাজলে** গঙ্গাপূজা। (ঘ) **আসছে রবিবার** আমি তোমাদের ওখানে যাবো। (ঙ) চরকার ঘর্ঘর্ পল্লীর **ঘরঘর**। (চ) সে বেশ এক **ঘুম** ঘুমিয়ে নিলে। (ছ) তার বিশাল সম্পত্তি এখন **পাঁচভূতে লুটেপুটে** খাচ্ছে। (জ) যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানেই রাত হয়।

অথবা

নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে-কোনো ছয়টি দিয়া ছয়টি শব্দ গঠন কর এবং শব্দগুলি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে প্রয়োগ কর:

—পনা,—বাজ,—দার,—সই,—গিরি,—আলি, তর (তরো) প্রকার অর্থে,—তা, মৎ (মতুপ্)।

(২) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে অশুদ্ধি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া লিখ :

সকলেরই মাতাপিতাকে ভক্তি করা উচিত। তাঁহারা আমাদের যেরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী সেরূপ আর কেহই নহে। তাঁহাদের স্নেহ-মমতার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ব্যতীত আমাদেব কোন উদ্দেশ্যই ফলবতী হইতে পারে না। আমাদেব সর্বাঙ্গীন উন্নতিব জন্য তাঁহারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মগুলির মধ্যে যে-কোনো ছয়টিকে সন্ধি-বদ্ধ কর :

স্রোতঃ + বেগ, মনঃ + কষ্ট, শিবঃ + উপবি; মনঃ + তুষ্টি; তড়িৎ + আলোক, পবি + উৎসুক, গো + এষণা; জ্যোতিঃ + বত্ন; লীলা + উচ্ছল; মরু + উদ্যান; তরু + ছায়া।

(৩) ব্যাসবাক্যসহ যে-কোনো পাঁচটিব সমাস নির্ণয় কব :

তেলধুতি, ত্রিভুবন, কোলাকুলি, মধুপ, কাপুরুষ; ঘবমুখো; হাট-বাজার, মনমাঝি, দশগজা।

অথবা

নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলিব মধ্যে যে-কোনো পাঁচটি দিয়া পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কব :

কথাব কথা, মুখবাধা, জলে ফেলা, আকাশ থেকে পড়া, অরণ্যে রোদন; বালিব বাঁধ, মগেব মুল্লুক, চোখেব বালি, ভবাডুবি হওয়া।

[সেঃ বোঃ ১৯৫৫]

(১) উদাহবণসহ যে-কোনো পাঁচটিব সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—উষ্মবর্ণ; স্ববভক্তি, তৎসম শব্দ, অনুক্ত কর্তা, গৌণকর্ম, যোগরূঢ় শব্দ, ণিজন্ত ধাতু, কর্মকর্তৃবাচ্য, অলুক সমাস, নিত্যবৃত্ত অতীত।

(২) কর্মধাবয় সমাস কাহাকে বলে? উপমান কর্মধাবয়, উপমিত কর্মধাবয় ও রূপক কর্মধাবয়েব প্রভেদ উদাহবণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

অথবা

কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের পার্থক্য দৃষ্টান্তেব সাহায্যে বুঝাইয়া দাও, এবং নিম্নলিখিত যে-কোন ছয়টি শব্দের গঠনে কোন প্রত্যয় কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখ কর :

একলা ; মিতালি ; লাঠিয়াল ; দয়ালু ; চলন্ত ; মিশুক ; ভণ্ডামি ; মুন্সীয়ানা ; তামাটে ; দুরন্তপনা ।

(৩) নিম্নলিখিত যে-কোন সাতটি শব্দ শুদ্ধ করিয়া লেখ এবং সংশোধনের যুক্তি দেখাও :

উৎকর্ষতা, আবশ্যকীয়, কল্যাণীয়াষু, মনযোগ,
নিরপরাধী, অনুবাদিত, মহত্ব, মৃণ্ময়,
অপরাহ্ন, অচিন্তনীয় ।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন সাতটি বিশিষ্টার্থক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থ লেখ এবং উহাদের সাহায্যে একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :

অরণ্যে রোদন, কুপমণ্ডুক, উত্তম-মধ্যম, তীর্থের কাক,
দক্ষযজ্ঞ, পুকুরচুরি, শাঁখের করাত শিরে সংক্রান্তি,
বক ধার্মিক, চিনির বলদ ।

[সেঃ বোঃ ১৯৫৬]

(১) উদাহরণসহ যে-কোন ছয়টির ব্যাখ্যা কর :

সর্বনামজাত বিশেষণ, পঞ্চমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি, অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী, কর্মে ষষ্ঠী, তৃতীয়ার অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি, সমধাতুজ কর্ম, নামধাতু, ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা, অতীতকালের অর্থে বর্তমান কাল, নিন্দনীয় অর্থে উপসর্গ, খাঁটি বাঙলা সন্ধি, তদ্ভব শব্দ ।

(২) নিম্নে উল্লিখিত বাক্যগুলিতে অধোরেখাঙ্কিত যে-কোন চারিটির ব্যাসবাক্য দিয়া সমাসের নাম উল্লেখ কর :

(ক) আমি নিত্য করিতেছি **যথাসত্য** বাণী। (খ) দুজনায় **মল্লাভর্ক** শক্তি কার বেশী। (গ) ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল। (ঘ) **দর্শকজন** মুদিল নয়ন সভা হল নিস্তব্ধ। (ঙ) ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল **প্রলয়-লোলুপ** রসনা। (চ) **গেরুয়াবসন** সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পারে। (ছ) সহসা **ভূতলে** পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি প্রভুর **চরণপদ্ম** 'পরে।

অথবা

নিম্নে উল্লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে কোন চারিটিতে অধোরেখাঙ্কিত পদগুলির স্থানে সেই অর্থে একটি মাত্র কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত পদ বসাও :

(ক) ভাদ্রমাসের **শেষদিনে** বিশ্বকর্মা পূজা হয়। (খ) ভারতবর্ষে **দেখিবার কিছুর** অভাব নাই। (গ) পত্রিকাখানি **ছয়মাস অন্তর বাহির হয়।** (ঘ) মেয়েটি **গৃহের ব্যবস্থা** বেশ জানে। (ঙ) তোমার কাছে (নদী) **পার হইবার পয়সা** আছে? (চ) মহাপুরুষেরা সর্বদা **স্মরণের যোগ্য।** (ছ) মূর্তিটি **মাটির তৈয়ারি।**

(৩) একটি কবিয়া পদ বসাইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

আমার—সামনে—রাস্তা।—দিয়া বোঝাই লইয়া—গাড়ী চলে,—মেয়ে—আটি—কবিয়া—যায়,—কলহাস্তে—ফিরে।

অথবা

নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন পাঁচটি বাক্যের বাচ্যান্তর কর:

(ক) বাবুর সহিত দেখা হইবে না। (খ) কি করিতেছ? (গ) তোমার কি চাই? (ঘ) লোকটিকে সভায় আনা হইল। (ঙ) উহারা রাগ করিয়াছে। (চ) আমার বই ফিবাইয়া দাও। (ছ) ঘরে প্রদীপ জ্বালাই নাই।

[সেঃ বোঃ ১৯৫৭]

১। সমাস কত প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক সমাসের এক একটি উদাহরণ দাও।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটিব ব্যুৎপত্তি নিরূপণ কর:

দাশবথি; পাণ্ডিত্য; সাধুতা; গরিষ্ঠ; কর্তব্য; পিপাসা; বিনষ্ট; উপকারী।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোন চারিটির লিঙ্গান্তর কর:

অনুগামিনী, নিরপরাধ; কর্তা; গায়ক; ভাগ্যবান; চাকর; বিদ্বান; ঘোড়া।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোন চারিটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

নীরোগ; বিচ্ছেদ; মনোভব; অভ্যুদয়; স্বচ্ছ; চলচ্ছক্তি; যাবজ্জীবন।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির অশুদ্ধি সংশোধন কর:

পৌরহিত্য; লজ্জাস্কর; দুরাবস্থা; জ্ঞানীগণ; ষষ্ঠদশ; বাহুল্যতা; আকাংখা; ব্যবহার।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ গঠন কর :

উন্নতি , সাকার , ব্যর্থ , শান্ত ; আমিষ , তিরোভাব ; উন্মীলন।

৪। নিম্নলিখিত সদৃশ শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন তিনটি শব্দ-যুগল বাছিয়া লও এবং তাহাদের ভিতরকার শব্দগুলির অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর :

(ক) গিরীশ, গিরিশ। (খ) গোলক, গোলোক। (গ) কৃতি, কৃতী। (ঘ)। স্বত্ব, সত্ত্ব।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন ছয়টি শব্দ বাছিয়া লও এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর :

বস্তু ; ঝগড়া ; সন্ধ্যা , চন্দ্র , কুলীন ; বোকা , মহৎ , গম্ভীর।

[সেঃ বোঃ ১৯৫৮]

১। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় কাহাকে বলে ? উদাহরণসহ চারিটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয় ও চারিটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের উল্লেখ কর।

অথবা

উদাহরণসহ যে কোন পাঁচটির ব্যাখ্যা কর—

মহাপ্রাণ বর্ণ, প্রযোজক কর্তা, গৌণ কর্ম, যৌগিক ক্রিয়া, কালাধিকরণ, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, অলুক সমাস, কর্ম-কর্তৃবাচ্য।

২। নিম্নের যে কোন পাঁচটি শব্দের সন্ধি বিশ্লেষ কর—

প্রতীক্ষা, স্বাগত, উচ্ছ্বাস, ধনুষ্টঙ্কার, নীবক্ত, অন্বেষণ, উল্লেখ, উচ্ছন্ন।

৩। নিম্নের বাক্যগুলিতে স্থূলাক্ষর শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির কারক নির্ণয় কর—

পণ্ডিতে শাস্ত্র পড়ে, **ব্যায়ামে** স্বাস্থ্য ভাল থাকে , ছাত্ররা **ফুটবল** খেলে ; যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় , **বিপদে** মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা , **তাঁতের** তৈরী কাপড় দেখিতে সুন্দর, পুণ্যার্থীরা **কাশী** যায় ; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

অথবা

নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি হইতে যে কোনও পাঁচটির বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ দেখাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর—

সোনায় সোহাগা, আক্কেল সেলামি, তেলে বেগুনে, ভূতের বেগার, গায়ের ঝাল, পাকা ধানে মই, ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, আকাশের চাঁদ।

৪। যে কোন পাঁচটির প্রত্যেকটিকে এক পদে পরিণত কর—

যে গলায় কাপড় দিয়াছে, যে অগ্রে জন্মিয়াছে, যাহাতে মজা আছে; যে জীবিত থাকিয়াও মৃত, যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে, যাহার ভাতের অভাব আছে, যাহা সহজে ভাঙ্গে, যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই।

অথবা

নিম্নোদ্ধৃত অংশের অশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর—

এ কথা সত্য যে আমাদের বহু কুসংস্কার আছে। সমাজ দেহে ইহাদের কদর্জ অবস্থিতি. এই গুলিকে কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। অবশ্য ইহাতে জাতির প্রাণশক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্যিকতা নষ্ট হইবে না। আসলে ধর্মের মূল তত্বগুলি এখনও অক্ষতই রহিয়াছে এবং যতই জাতিদেহের ঐ অবাঞ্চিত কলঙ্ক-কলিমা বিদুরিত হইবে, ততই এই তত্বগুলি প্রোজ্বল হইয়া উঠিবে।

বঙ্গভারতী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবন্ধাবলী

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

বাঙ্গালার গৃহপালিত পশুপক্ষী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪)

[সূচনা—কয়েকটি গৃহপালিত জন্তুর নাম—কি ভাবে পালিত হয়—গোরু, কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, গাধা,—হাঁস, ময়না, টিয়া, ইত্যাদি—উপসংহার।]

বিধাতার সৃষ্টি জীবজন্তুর মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের বুদ্ধির সহিত কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। স্মরণাতীতকাল হইতেই মানুষ বনের পশুকে আপনার গৃহে আনিয়া পোষ মানাইয়াছে, তাহাকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লইতেছে। কিন্তু সকল পশু-পক্ষীই যে মানুষের আয়ত্ত হইয়াছে, তাহা নয়। মানুষ হয়তো সকলকেই নিজের ঘরে টানিয়া আনিতে চায়ও নাই। তাহার কাজের জন্য যাহাকে যাহাকে প্রয়োজন, শুধু সেইগুলিকেই সে 'ঘরের মানুষ' করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের গার্হস্থ্য-জীবন কয়েকটি বিশেষ পশু-পক্ষীর প্রতিপালন ব্যতিরেকে যেন সম্পূর্ণই হয় না। গোরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া এই কয়টি পশু ও পাখীদের মধ্যে হাঁস অনেক বাঙ্গালীই পুষিয়া থাকেন। আবার অনেকে সখ করিয়া হরিণ পোষেন। টিয়া, ময়না, শালিক, কাকাতুয়াও কেহ কেহ পুষিয়া থাকেন। রজকেরা বস্ত্রাদি বহনের জন্য গাধাও পুষিয়া থাকে। কচিৎ কেহ কেহ ময়ূরও পোষেন।

গৃহপালিত জন্তুগুলি মোটামুটি সকলেই বেশ শান্তশিষ্ট। নিরীহ না হইলে মানুষ কি করিয়া নিজের ঘরে বনের পশু-পক্ষী পুষিতে পারিত? ইহারা বড় একটা মানুষের অনিষ্ট করে না। মানুষের খাদ্যাবশিষ্ট ইহারা খায়। মানুষ খাদ্য প্রস্তুত করিতে গিয়া উহার যে যে অংশ ফেলিয়া দেয়, প্রধানতঃ তাহা খাইয়াই গৃহপালিত জন্তুগুলি প্রাণ বাঁচায়। ইহাদের

জন্য পৃথক্ আয়োজন প্রায়ই করিতে হয় না। মানুষের সহিত বহুদিনের সংসর্গের জন্যই তাহারা এই প্রকার শান্তশিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে নচেৎ ইহাদের যে-সব সগোত্রগণ বনে বাস করে, তাহারা মোটেই ইহাদের মত নিরীহ নয়, বরং হিংস্র ও উগ্রপ্রকৃতির।

মানুষ ভাত খায়, সেই ভাতের মাড়টুকু গৃহপালিত গোরুকে দেয়, গোরু উহা পরিতৃপ্তির সহিত পান করে। তরকারিটুকু মানুষ নিজে খায়, উহার খোসাগুলি গোরুকে ধরিয়া দেয়, গোরু উহা পরমানন্দে ভোজন করে। ধানের গাছ হইতে ধানগুলি ছাড়াইয়া লইলে যে খড়গুলি পড়িয়া থাকে, মানুষের সেই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তুটিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশে গোরুর সংবৎসরের খাদ্য। তাহা ছাড়া বনে, জঙ্গলে, পথে, ঘাটে, মাঠে যে ঘাস-পাতা জন্মিয়া থাকে, তাহা খাইয়াই গোরু প্রাণ বাঁচায়। অথচ গোরু প্রতিদানে মানুষকে যাহা দেয়, তাহা অমূল্য। গোরুকে বাদ দিয়া মানুষের চলেই না। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই গো-দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। সংসারের অধিকাংশ উপাদেয় খাদ্যই দুধ, ঘি, ছানা, মাখন বা ক্ষীর সহযোগে প্রস্তুত হয়। গোবরেও মানুষের কতই উপকার হয়। মৃত গোরুর চামড়ায় জুতা হয়, ব্যাগ হয়; হাড়ে কলম, ছুরির বাঁট, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

কুকুরের মত বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত প্রাণী পৃথিবীতে আর নাই বলিলেই চলে। কুকুর পাহারাওয়ালার মত রাত জাগিয়া বাড়ী পাহারা দেয়। পাতাটি নড়িয়া উঠিলেই—কান-খাড়া করিয়া বীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জন করিতে থাকে। কিন্তু এই অমূল্য সেবার পরিবর্তে কুকুর যে আমাদের নিকট হইতে খুব বেশী কিছু পাইয়া থাকে তাহা নয়। ইহারা বড়ই সন্তুষ্ট-চিত্ত প্রাণী। চাণক্য পণ্ডিত ইহাদিকে 'বহ্বাশী' ও 'স্বল্প-সন্তুষ্ট' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সরমা-নাম্নী কোনও স্বর্গ-বিহারিণীর সন্তান বলিয়া হিন্দুরা ইহাদিগকে কৌলীন্যের মর্যাদা দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সারমেয়দের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা অপরিসীম। ইহারা অস্পৃশ্য। গোরু, বিড়াল প্রভৃতির সহিত তুলনায় হিন্দুর ঘরে ইহাদের স্থান অতি নিম্নে। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে হয়। সহরে আজকাল কুকুরের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদার ব্যবহার করা হয়। তবে এই প্রবৃত্তিটা

অনেকটা পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের কুক্কুর-প্রীতির অনুকরণ হইতে শহরবাসীরা লাভ করিয়াছেন।

বিড়াল ইঁদুর মারে বলিয়া বাঙ্গালীর ঘরে তাহার খাতির আছে। কুকুরের অপেক্ষা তাহার সামাজিক পদবী বোধ হয় একটু উচ্চে। সে বিনা-অনুমতিতে হিন্দুর পাকশালায় গমনাগমন করিয়া থাকে। শিশুদিগকে বিড়াল ভালবাসে। কারণ তাহারা বয়োধর্মে আহারে বসিলে যতটা খায়, তাহার অধিক ফেলিয়া দেয়। এই ফেলিয়া দেওয়া অংশটিতে বিড়ালের কায়েমী স্বত্ব। তবে খোকাবাবুদের অসাবধানতার সুযোগ লইয়া সে তাহাদের পাত হইতে মাছ-ভাজা লইয়াও পালায়। সেটা অবশ্য অনধিকার-চর্চা।

ঘোড়া খুব কম লোকই রাখেন। তবে পল্লীগ্রামে ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি যে সব লোককে দূরে হাঁটিয়া যাইতে হয়, তাঁহারা বাহন হিসাবে ঘোড়া পুষিয়া থাকেন। সাইকেল বা দ্বিচক্রযানের প্রচলন হওয়াতে, ঘোড়ার ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে, কারণ সাইকেল ঘাস খায় না। তবে যে সব স্থলে ভাল রাস্তা নাই, সেখানে ঘাস খাওয়াইবার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘোড়া পুষিতে হয়। ঘোড়ার দৌড় একটা প্রাচীন আমোদ। অনেক স্থানে এখনও ঘোড়-দৌড় হইয়া থাকে। তা-ছাড়া ঘোড়া গাড়ী টানে। শহরে মোটরের আমদানি হওয়াতে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন কমিয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে ঘোড়া দিয়া লাঙ্গল দেওয়া হয়, ঘানি টানান হয়।

রজক সম্প্রদায় ভিন্ন বোধ হয় আর কেহ গাধা বাড়ীতে রাখেন না। গাধা দেখিতে ঘোড়ারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, তবে ঘোড়ার লাবণ্য গাধার নাই। তা ছাড়া গাধার সংগীত-জ্ঞান সম্বন্ধে একটা দুর্নাম আছে। ইহারা দেখিতে ছোট, তবে সে অনুপাতে যথেষ্ট ভার বহন করিতে পারে।

পক্ষিগণের স্বাভাবিক ধর্ম-অনুসারে হাঁস ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্ব হইতে শাবক বাহির হয়। কিন্তু হংস-বংশ বৃদ্ধির অপেক্ষা মানুষের হংস-ডিম্ব ভোজনের দিকে দৃষ্টি অনেক অধিক। এই ডিমের জন্য বাঙ্গালীর ঘরে হাঁসের আদর আছে। হাঁস ধান, চাল, ভাত, মুড়ি খায়; পুকুরে বা নদীতে নামিয়া সাঁতার কাটে, গুগ্‌লি ধরিয়া খায়। শুধু ডিমই নয়, স্বয়ং হাঁসই আবার অনেক স্থলে ভক্ষিত হইয়া থাকে।

শালিক, ময়না ও কাকাতুয়াকে শিখাইলে, উহারা নানা কথা বলিতে শিখে, এজন্য অনেকে যত্ন করিয়া ঐ সব প্রাণীকে পুষিয়া থাকেন। দেখিতে সুন্দর বলিয়া অনেকে টিয়াপাখীও পোষেন, তবে উহার কথা তেমন স্পষ্ট নয়।

মানুষ নিজের প্রয়োজন ও আনন্দের জন্য এই স্বাধীন স্বচ্ছন্দচারী নিরীহ বনের পশু-পক্ষীকে আপনার ঘরে বন্দী করিয়াছে। আজ তাহারা সম্পূর্ণরূপে মানুষের মুখাপেক্ষী। ইহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করিয়া সযত্ন ও সহৃদয় ব্যবহার করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

গো-পালন

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮)

[কেন প্রিয়—ঐ প্রসঙ্গে সুকৌশলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্ণনা—প্রকৃতির বর্ণনা—গো-পালন ভারতীয়দের একটি সুপ্রাচীন ধর্ম—বাঙ্গালীর গৃহধর্মে গো-পালনের উপযোগিতা—আহার—আমাদের দেশে গো-পালনের বর্তমান অবস্থা—উপসংহার।]

শুধু আমার নয়, বাঙ্গালার বোধ হয় প্রত্যেক ছেলেরই গোরু জন্তুটিকে ভাল লাগে। এই ভাল-লাগাটা যে একেবারে নিঃস্বার্থ, তাহা বলা যায় না। কারণ, গোরু আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। সে বাঁচিয়া থাকিতেও আমাদের কল্যাণ করে, মরিয়াও করে। যাহার দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধন হয়, বোধ হয় তাহাই আমাদের কাছে সুন্দর বোধ হয়। ইহাই সৌন্দর্য-তত্ত্বের গোড়ার কথা। কাজেই গোরুর চেহারাও আমাদের কাছে সুন্দর। তাহার গভীর কালো চোখের সজল দৃষ্টি সুন্দর। সুস্থ সুপুষ্ট গাভী নয়নের তৃপ্তিজনক। বিশাল উদর, সুদীর্ঘ পুচ্ছ, বাঁকানো দু'খানি শিঙ, ছোট লোমে ঢাকা দেহ—সবই সুন্দর।

গোরুকে ভালবাসার আর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, গোরু নিরীহ। যে সব জানোয়ারকে প্রয়োজনের অনুরোধে মানুষ বন হইতে ঘরে আনিয়া পুষিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গোরুই বোধ হয় তাহার সব চেয়ে 'আপনার' হইয়াছে। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে, 'শৃঙ্গী হইতে দশ-হস্ত দূরে থাকিবে', কিন্তু গাভীর বাঁকা শিঙের ভয় বড় কেহ রাখে না। আর হাটে-বাজারে

হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে বৃষ দাঁড়াইয়া পচা বেগুন, শাক-শব্জি চোখ বুজিয়া পরম আরামে চিবাইতেছে। ছোট ছেলেটা পর্যন্ত তাহার গা ঘেঁষিয়া চলিয়াছে, হয়তো দুই-এক ঘা মারিয়াও যাইতেছে। কিন্তু বৃষের সেই ভীষণ শৃঙ্গ একটুও নড়িতেছে না, চোখে বিন্দুমাত্র ক্রোধের উদয় হইতেছে না। এমন দৃশ্য অতি সাধারণ। ফলতঃ গৃহপালিত জন্তুগুলির মধ্যে গোরুর মত কোনো জন্তুই এতটা 'ঘরের মানুষ' হইতে পারে নাই। গোরুর শৃঙ্গে মানুষের কিছু ভয় থাকিলেও উহার দাঁত হইতে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। উহার মাত্র এক পাটি দাঁত। উহা দিয়া ঘাস খাওয়া চলে, কিন্তু মানুষ তো রক্ত মাংসের জীব।

আরও কারণ আছে। মানুষ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মানুষ—প্রাচীন যুগ হইতেই গোরুর সহিত একত্র বাস করিতেছে। এমন দিন ছিল, যখন গোরুই ভারতের একমাত্র সম্পদ্ ছিল,—ভারতবাসীরা সবাই ছিল রাখাল। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রাখাল। এজন্য প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়গণের চক্ষে গোরু পবিত্র। হিন্দুর চোখে গাভী ভগবতী। তাহার প্রতি রোমকূপে একজন করিয়া দেবতা বাস করেন। গোরুর গায়ে পাদস্পর্শ করিতে নাই, গোরুর দড়ি মাড়াইতে নাই, গো-বধ মহাপাপ। গো-দান শ্রেষ্ঠ দান। গো-শালা পবিত্র। গোময় ও গোমূত্র স্পর্শে সমস্ত অপবিত্রতা দূরে যায়। দুগ্ধ শুধু স্বাস্থ্যকর নয়,—দেবভোগ্য ও পবিত্র বস্তু। দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত, দধি প্রভৃতি আহার্য যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি পবিত্র পূজোপকরণ। গো-চারণ-ভূমিতে মল মূত্রাদি নিক্ষেপ করিতে নাই। এই প্রকার কত যে সংস্কার ও অনুশাসন গোজাতির অনুকূলে হিন্দু সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু গো-সেবা করিয়া আসিতেছে, তাই এগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর গৃহস্থের ঘর-কন্না গো-পালন নহিলে সম্পূর্ণ হয় না। 'ধবলী'-'কালী', 'কেলে সোনা', 'রাঙা', 'মঙ্গলা', 'আহ্লাদী' গোরুর এই সমস্ত নামকরণের মধ্যে বাঙ্গালী-হৃদয়ের অনেকটা স্নেহ সঞ্চারিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছোটখাট একটা পরিবার দুই-একটি গাভী প্রতিপালন করিয়াই জীবিকা অর্জন করিতে পারে। গোরুর দুধ বিক্রয় করিয়া, দুই-পয়সা উপার্জন করা চলে। 'দুধ-ভাতে'র চেয়ে অধিকতর উপাদেয় খাদ্য বাঙ্গালী কল্পনা করিতে পারে না। দুধ হইতে দধি, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহা

অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যায়। সুতরাং গরিব গৃহস্থ দুই-একটি গাভী পুষিয়াই দিন গুজরান করিতে পারে।

আবার, বলদ-গোরু তো আরও কতই কাজে লাগে। বলদ লাঙ্গল টানে, গাড়ী টানে, ঘানি টানে, মোট বয়, আরও নানা কাজ করে। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে বলদ একেবারে অপরিহার্য। এখনও ভারতের কৃষিক্ষেত্রে গোময়ই সর্বপ্রধান সার।

অথচ এই গো-পালন কতই সহজ। বনের পাতা, মাঠের ঘাস খাইয়া গোরু প্রাণ বাঁচায়। গৃহস্থেরা ভাত রাঁধিয়া যে মাড়টুকু ফেলিয়া দেয়, উহা গোরুকে ধরিয়া দিলে সে পরম পরিতৃপ্তির সহিত পান করে। মাঠে ধান জন্মিলে, ধান ছাড়াইয়া যে খড়গুলি পড়িয়া থাকে, উহাই প্রকৃতপক্ষে গোরুর সংবৎসরের খাদ্য। ডালের ভূষি, তৈল-বীজের খইল প্রভৃতি গোরুর প্রিয় খাদ্য। অথচ এগুলি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-খাদ্যের একটা উপজাত বা by-product মাত্র।

গোরু মরিয়াও আমাদের কত উপকার করে। তাহার চামড়া দিয়া আমরা পায়ে পরিবার জুতা প্রস্তুত করি, ব্যাগ, বাক্স, বইয়ের মলাট, গাদির আবরণ, ঘোড়ার জিন, আরও কত কি প্রস্তুত করি। গোরুর হাড় ও শিঙে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হয়,—যেমন বোতাম, ছড়ি, ছুরির বাঁট, চিরুনি ইত্যাদি। হাড় পোড়াইয়া উহার কয়লা (bone-charcoal) দিয়া চিনি, লবণ প্রভৃতি পরিষ্কার করা হয়।

এমন পরম কল্যাণকর জীবকে পালন করায় লাভ আছে, কিন্তু বাঙ্গালী আজ সব দিক্ দিয়াই সর্বনাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই বাঙ্গালায় আজ গো-জাতির দুর্দশার সীমা নাই। সুন্দর সুপুষ্ট গাভী চোখে পড়ে না বলিলেই হয়। পল্লীগ্রামে জমিদারেরা সমস্ত জমিই প্রজাবিলি করিয়া দেন। পূর্বের মত আর নিষ্কর গোচর ভূমি পড়িয়া থাকে না। গৃহস্থেরাও গোরুগুলির স্বাস্থ্যের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষিত সম্প্রদায় গো-পালনকে রীতিমত একটা বিভীষিকার মত মনে করেন। প্রতি বৎসর বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে লক্ষ লক্ষ গোরু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

সুখের বিষয় গো-জাতির বর্তমান দুরবস্থার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গো-জাতির উন্নতি বিধানকল্পে তাঁহারা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

কুকুর

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭)

[সূচনা—কুকুরের আকৃতি—কুকুরের প্রকৃতি ও গুণাবলী—আমাদের সমাজে ও ইউরোপীয় সমাজে কুকুরের আদরের তারতম্য।]

কুকুর জন্তুটি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের গৃহস্থালীতে কুকুর নানারূপে সাহায্য করিয়া থাকে। তাই, সকল দেশেই কুকুরের আদর আছে,—তবে কোথাও কম, কোথাও বেশী।

কুকুরের চেহারাটি সাধারণভাবে বর্ণনা করা কঠিন,—কারণ কুকুর এক রকমের নয়। দেশ ও জলবায়ু-ভেদে কুকুরের আকৃতির ও প্রকৃতির অনেক বৈষম্য হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কুকুর বেশ বড় হয়, আবার শৈশব হইতে উপযুক্ত খাদ্য ও যত্নের অভাবে অনেক কুকুর তেমন বাড়িতে পারে না। বুলডগ, গ্রে-হাউণ্ড, ব্লাডহাউণ্ড, সেণ্টবার্নার্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড্‌, অ্যালসেশিয়ান, স্পেনিয়েল, টেরিয়ার প্রভৃতি নানাজাতীয় বিদেশী কুকুরের মধ্যে কোনো কোনোটি খুব বড়। কোন কুকুরের রং দুধের মত সাদা, কেহ বা গভীর কালো, কেহ পাঁশুটে, কেহ হলদে। তবে নীল বা গভীর লাল বর্ণের কুকুর দেখা যায় না। সাদায়-কালোয় বা কালোয়-হলদেয় মেশানো কুকুরও আছে। কোন কুকুরের মুখ গোল, কাহারও মুখ ছুঁচলো, কাহারও মুখ চ্যাপটা। কাহারও গায়ের লোম খুব ছোট, কাহারও লোম খুব বড়।

কুকুরের আকৃতিতে পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতিতে কিন্তু ইহাদের ন্যূনাধিক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। গুণের তারতম্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকগুলি গুণ ইহাদের প্রকৃতিতে এমন বদ্ধমূল যে ইহাই ইহাদের একজাতীয়ত্ব সপ্রমাণ করে। আমাদের দেশের চাণক্য পণ্ডিত কুকুর সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক।

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥

কুকুরের ছয়টি গুণ,—ইহাদের কাছে মানুষও এই গুণগুলি শিখিতে পারে। ইহারা খাইতে পারে খুব বেশী,—কিন্তু যত অল্পই পাক, তাহাতেই খুশী হইবে। ইহাদের নিদ্রা খুব গাঢ়; কিন্তু অল্প একটু শব্দ শুনিলেই ইহারা জাগিয়া উঠে। তাহা ছাড়া ইহারা প্রভুভক্ত ও বীর। যে কয়টি গুণের কথা বলা হইল, তাহা

হইতেই বুঝা যায়, কুকুর একটি বাঞ্ছনীয় ভৃত্য। এমন ভৃত্য কে কোথায় পাইবে, যে খাইবে কম, অথচ বীরত্বের সহিত, ভক্তির সহিত, প্রভুর সেবায় সর্বদা সজাগ হইয়া থাকিবে? 'প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ' বলিয়া কুকুরকে যে প্রশংসা চাণক্য করিয়াছেন, ইহা সত্যই সার্থক। কুকুরের প্রভুভক্তির তুলনা হয় না। প্রভুর কার্যে সে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আর, ইহাই তো বীরত্ব।

দেশ-বিদেশে কুকুরের প্রভুভক্তি সম্বন্ধে কতই সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। প্রভু ভুল করিয়া টাকার থলি পথে ফেলিয়া গেলেন। কুকুর গিয়া বারবার তাঁহার পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। প্রভু ভাবিলেন, কুকুরটা ক্ষেপিয়াছে। তিনি তাহাকে গুলি করিলেন। তারপর কিছুদূরে গিয়া টাকার থলির কথা মনে পড়িল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রভুভক্ত কুকুর মৃতপ্রায় অবস্থায়ও সেই টাকার থলি আগ্‌লাইয়া শুইয়া আছে। এমন প্রভুভক্ত কয়জন মানুষ-ভৃত্যের মধ্যে পাওয়া যায়? এমন কত গল্পই কুকুরের প্রভুভক্তির সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। শুধু ভক্তি নয়, বুদ্ধিও কুকুরের প্রচুর আছে। কত কুকুর বুদ্ধিবলে প্রভুর প্রাণরক্ষা করিয়াছে, চোর-ডাকাত ধরিয়াছে।

কুকুরের স্মৃতিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। অপূর্ব স্মৃতিশক্তির বলে সে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে অপরাধীকে সনাক্ত করিয়া দিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে অতি দূরে নির্বাসিত হইয়াও, শুধু পথ শুঁকিয়া শুঁকিয়া কুকুর আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

কুকুরের গায়ের লোমগুলি তাহার শীত নিবারণ করে,—লোমগুলি কোমল ও চিক্কণ। ইহার ধারালো দাঁত ও নখ আছে। কুকুর খুব দ্রুত দৌড়াইতে পারে। কুকুর মাংসাশী জীব। কিন্তু দেশী কুকুর ভাত-ডালও খায়। কুকুর দুধও খায়। কুকুরকে অনেক সময় শুক্‌না হাড় চিবাইতে দেখা যায়। মাছ-মাংস ইহার প্রিয় খাদ্য।

কুকুরী একসঙ্গে প্রায় চার-পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চাগুলিকে সে নিরাপদে রাখিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে,—মুখে করিয়া এক জায়গা হইতে অন্যত্র লইয়া যায়। প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত এইরূপ পালন করিবার পর বাচ্চাগুলি বড় হইয়া উঠে। তখন ইহারা নিজেরাই আহার অন্বেষণ করিতে পারে—প্রভুর কার্যে যোগদান করিয়া তাঁহার আদর ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবিকা অর্জন করিতে পারে।

আমাদের দেশে কিন্তু কুকুরের তেমন আদর নাই। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশে কুকুরের আদর দেখিলে আমরা অবাক হইয়া যাই। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা কুকুরকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, কুকুর তাঁহাদের নিকট অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। গৃহস্থের শয়নাগারে বা পাকশালায় প্রবেশ করিবার অধিকার ইহাদের নাই। শুধু তাহাই নয়, কোনো ভোজ্য দ্রব্য ইহাদের স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্রদোষে পরিত্যক্ত হয়। দেব-পূজার উপকরণগুলি ইহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখা হয়। সুতরাং বুঝা যায়, আমাদের সংসারে কুকুরের আদর খুব বেশী নয়। কুকুরকে আহার-দানেও অনেক গৃহস্থ পরাঙ্মুখ। কুকুরের বাসের জন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট ঘর নাই,—উঠানের কোণে বা ঘরের দাওয়ায় শুইয়া কোনমতে রাত কাটাইয়া দেয়, দিনের বেলায় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক সময়ে খাদ্যাভাবে কুকুর অনেক নোংরা জিনিস খায়। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে কুকুরের কি আদর! তাহারা গৃহস্বামীর কোলে বসে, ঘাড়ের উপর উঠে, চেয়ারের উপর শুইয়া থাকে। ইহাতে গৃহস্বামী একটুও বিরক্ত হন না, বরং আরও যেন পুলকিত হইয়া উঠেন। কুকুরের সময় মত পুষ্টিকর আহারের কত আয়োজন। গায়ে পরিবার জামা, থাকিবার ঘর, শুইবার বিছানা, বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য চাকর—সবই আছে। আমাদের দেশের এক গরীব শ্রমজীবী ইউরোপীয় সমাজে কুকুরের আদর দেখিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, এবার মরিয়া যেন আমি সাহেবের কুকুর হই।"

———

প্রবন্ধ সঙ্কেত

অশ্ব—সূচনা। কোন্ দেশে দৃষ্ট হয়?—প্রকৃতি: অশ্বজাতীয় অন্যান্য প্রাণীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য।—অশ্বের প্রকারভেদ।—প্রকৃতি: কত বৎসর জীবিত থাকে, কি খায়, ঘোটকী প্রতিবারে কয়টি শাবক প্রসব করে, প্রভুভক্তি।—উপকারিতা: দেশভেদে অশ্বের বিভিন্ন ব্যবহার।

বিড়াল—সূচনা।—আকার ও অবয়ব: বর্ণ, নখর, থাবা, চক্ষু।—প্রকৃতি: খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি। বিড়ালকে ষষ্ঠীর বাহন বলা হয় কেন?—বাঘের মাসী বিড়ালকে কেন বলা হয়? উপকারিতা: মানুষের কি কাজে লাগে।

ব্যাঘ্র—সূচনা—কোন্ দেশে দৃষ্ট হয়: দক্ষিণ এশিয়া, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার অরণ্য বাঘের জন্মস্থান, সুন্দরবনের বাঘ—রয়াল বেঙ্গল টাইগার—জাতি ও আকৃতি: বিড়াল-জাতীয়, আয়তনে বিড়াল অপেক্ষা অনেক বড়, কিন্তু অবয়বসমূহের সাদৃশ্য আছে।—প্রকৃতি: স্বভাব অনেক বিষয়ে বিড়ালের মত, খাদ্য, হিংস্র, অকারণেও প্রাণিহত্যা করে। প্রতিবারে কয়টি শাবক প্রসব করে। ব্যাঘ্রীর সন্তান বাৎসল্য। সিংহের সহিত আকৃতি ও প্রকৃতির তুলনা। অতিশয় বলবান্। সংস্কৃত ভাষায় 'নরশার্দ্দূল', 'পুরুষব্যাঘ্র' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, এই সকল শব্দের প্রয়োগ হইতে কি ধারণা হয়?—বাঘ ধরা হয় কিরূপে: ফাঁদ পাতিয়া খাঁচার মধ্যে ছাগল বা মেষশিশু রাখিয়া, পাতায় আঠা মাখাইয়া, তীর, বর্শা বা বন্দুক দিয়া। পূর্বকালে রাজারা মৃগয়া উপলক্ষ্যে বাঘ শিকার করিতেন।—উপকারিতা:—নখ ও জিহ্বার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। ব্যাঘ্রচর্মের ব্যবহার। শিক্ষা দিলে নানাবিধ ক্রীড়া শিক্ষা করে।—উপসংহার: একটি গল্প।

হরিণ—সূচনা।—কোন্ কোন্ দেশে দৃষ্ট হয়?—আকৃতি: চক্ষু, শৃঙ্গ, গাত্রচর্ম; পা সরু কিন্তু দৃঢ়। হরিণের চক্ষুর সহিত সুন্দরী রমণীর চক্ষুর তুলনা ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়।—প্রকৃতি: নিরীহ, শান্ত, দ্রুতগামী, বন্য কিন্তু পোষ মানে, চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকে। প্রতিবারে একটি করিয়া শাবক প্রসব করে।—খাদ্য: ঘাস, গাছের পাতা। উপকারিতা: মৃগ মাংস মানুষের খাদ্য. প্রাচীনকালে ইহা পবিত্র খাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। চর্মে পাদুকা প্রভৃতি নির্মিত হয়, মৃগ-চর্ম পূজার্চনায় আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। মৃগনাভী।—মেরুপ্রদেশে বল্গা হরিণ গাড়ী টানে।—উপসংহার।

ভল্লুক—সূচনা।—কোন্ কোন্ দেশে দৃষ্ট হয়: হিমপ্রধান দেশের জঙ্গলেই বেশী দেখা যায়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও থাকে। আকৃতি: গাত্রচর্ম লোমবহুল, নানাবর্ণের হইয়া থাকে; দন্ত, নখর, চক্ষু প্রভৃতির বর্ণনা। প্রকৃতি: হিংস্রস্বভাব, শ্রবণশক্তি ভীষণ, স্বর কর্কশ, পর্বত-গুহায় এবং গভীর অরণ্যে বাস করে, শীতকালে বেশী বাহির হয় না, পোষ মানে, গাছে উঠিতে পারে। আগুনকে ভয় করে। জনপ্রবাদ এই যে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না, ঐ বিষয়ে প্রচলিত কাহিনী। —খাদ্য: ফলমূল, মধু মাংস, উইচারা প্রভৃতি।—উপসংহার।

অনুশীলনী

১। সর্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

২। কাক ও কোকিল সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ।

৩। নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি অবলম্বন করিয়া মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর:—

জাতি: পতঙ্গ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অণুজপ্রাণী। আকৃতি: দেহের তিন ভাগ, তিন জোড়া পা, দুই জোড়া ডানা, মুখে শুঁড়, পিছনে হুল। বাসস্থান: পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে। প্রকৃতি:—মধুসঞ্চয়, মধুরক্ষণ, শ্রমবিভাগ। মৌচাক—ভিন্ন ভিন্ন কোষ, কোষসমূহ মোমের দ্বারা নির্মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

উপসংহার—মৌমাছির কাছে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

৪। নিম্ন প্রদত্ত সঙ্কেতগুলির সাহায্যে কুম্ভীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ:—

জাতি: জলজন্তু, গিরগিটিজাতীয়। আকৃতি: লম্বায় দশ-পনর হাত, চর্ম কর্কশ, চারি পা, পুরু জিহ্বা, তীক্ষ্ণ দাঁত। বাসস্থান: ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ। প্রকৃতি: বলবান্ মাংসাশী, সাঁতার কাটিতে পটু, ডিম পাড়ে। উপকারিতা—চামড়ায় জুতা হয়।

———

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

মহাপুরুষপ্রসঙ্গ

জীবনী পাঠের উপকারিতা

প্রত্যেক দেশেই মহাপুরুষদের জীবনচরিত উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের মর্যাদালাভ করিয়া থাকে। মহাপুরুষদের জীবন অতি বিচিত্র। তাঁহাদের জীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী একদিকে যেমন অতি মনোরম, অপরদিকে উহাতে নানাপ্রকার নীতিশিক্ষার অবকাশ রহিয়াছে। মহাপুরুষগণ কিভাবে ধীরে ধীরে উন্নতির সমুচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া থাকেন, উন্নতির পথে কি প্রকৃতির নিকট হইতে, কি মনুষ্য সমাজে কার্য-কলাপ হইতে, তাঁহারা কত প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। আমরা বুঝিতে পারি, সংসারে উন্নতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ইহা রণক্ষেত্রের ন্যায় শত্রুসঙ্কুল। কাহাকেও আর পাঁচজন হইতে একটু বড় হইতে দেখিলেই সমাজের কতকগুলি লোক নিতান্ত অকারণে তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তাঁহারা শুদ্ধ মাত্র পরশ্রীকাতরতার জন্যই তাঁহার প্রতি কার্যে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিবরণ জানা থাকিলে আমরা নিজেদের জীবনে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি।

মনে রাখিতে হইবে, মহত্ত্বের বীজ প্রত্যেকটি মানবের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যেই বড় হইবার শক্তি সুপ্ত থাকে। এই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, ইহাই মানবের জীবনের সর্বপ্রধান সাধনা। জীবনচরিত পাঠ করিলে আমাদের ভিতরকার এই সুপ্ত মহত্ত্ব যেন আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই ভাবে জীবনকে বৃহত্তর করিয়া তুলিবার জন্য আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করি। আমরা দেখিতে পাই, যিনি একদিন সকল দিক্ দিয়া বড় মহান্ হইয়া দেশবরেণ্য হইয়াছেন, তিনি একদিন আমাদের মতই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলি আমরাও অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহাদের জীবনেও দুই-একটি স্খলন-পতন-ত্রুটি দেখা

গিয়াছে। ইহা আমাদেব মনে আশার সঞ্চার করে। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অপরেব নিকট অধিকাংশ স্থলে অগোচব হইলেও, আমরা তাহা জানি। জানি বলিয়াই,—আমরা নিজেদেব নিতান্ত দুর্বল বলিয়া মনে কবি, এবং আমরা যে কোন দিন বড় হইতে পাবিব, সেরূপ আশা করা নিতান্ত দুঃসাহসেব ব্যাপার বলিয়া মনে করি। কিন্তু যখন দেখি, মহান্ পুরুষদেরও মধ্যে একটি বিচ্যুতি আছে, যখন মহত্ত্বের পথে চলিতে গিয়া তাঁহাদের দুই একবাব পদস্খলন ঘটিয়াছে; যখন দেখি,—চিত্তবলের সাহায্যে অধ্যবসায় গুণে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাথমিক দুর্বলতাগুলিকে পরাজিত করিয়া উত্তরকালে মহত্ত্বের অধিকাবী হইয়াছেন, দেশবরেণ্য হইয়াছেন, তখন আমাদেরও মনে আশার সঞ্চাব হয়। আমবাও চেষ্টা করিলে ধীরে ধীবে বড হইতে পারি, এইরূপ চেতনা লাভ কবি।

মহাপুরুষদেব জীবনী পাঠের আবও উপযোগিতা রহিয়াছে। এক একটি মহাপুরুষ একটি যুগ ও একটি জাতিব প্রতিভূ-স্বরূপ। বস্তুতঃ মহাপুরুষগণের চবিত্রে যুগধর্মগুলি ও জাতীয ভাবগুলির পূর্ণ প্রকটন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মানুষও সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইতে পাবে না। মানুষেব কার্তি ও ভাবগুলি কোন ক্ষেত্রেও একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপাব নহে। তাঁহার মধ্যে যে সমস্ত ভাবেব স্ফুবণ হয়, তাহা সাধাবণভাবে যুগ ও জাতিব সম্পত্তি। অতীতকাল হইতে আবম্ভ করিয়া তৎকাল পর্যন্ত এইসব ভাবে রূপ-সৃষ্টির আয়োজন চলিতে থাকে। দেশের আকাশে-বাতাসে তাহা যেন ভাসিয়া বেড়ায়। সে যেন কোনও বিশিষ্ট মানবেব কীর্তির মধ্যে রূপ-পরিগ্রহেব সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। মহাপুরুষের চবিত্রেব মধ্যে এই সুযোগের সন্ধান পাইয়া, তাঁহার কীর্তিকে আশ্রয় কবিয়া, আত্মপ্রকাশ কবে। তাই জীবন-চরিত্রে শুধু একটি ব্যক্তিব ইতিহাস নয়, উহা একটি যুগ ও একটি জাতিব ইতিহাস। জীবনচবিত পাঠ কবিলে আমরা এই ঐতিহাসিক জ্ঞানেব অধিকারী হইয়া থাকি।

সাহিত্যের দিক দিয়া জীবনচরিত্রেব একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। উহাতে মহাপুরুষদের কীর্তির বিবরণ আছে। কিন্তু মহাপুরুষদের অন্তরের যথার্থ পরিচয় কি জীবনচরিতে পাওয়া যায়? তাহাদেব জীবনের অন্তর্গূঢ় আনন্দ বেদনার পবিচয় সাধাবণ জীবন-চবিত্রের মধ্যে পাওয়ার আশা

সুদূর-পরাহত। এইজন্য অনেক মনীষী জীবন-চরিত্রের খুব একটা বড় রকমের সাহিত্যিক মূল্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ কবি ও শিল্পীর জীবন-চরিত সম্পর্কে এই প্রকার সন্দেহের অবকাশ অধিক। কবি ও শিল্পীর কীর্তির পশ্চাতে থাকে একটা অলৌকিক, আকস্মিক আত্মচেতনা,—একটা আয়োজন-নিরপেক্ষ স্বর্গীয় আবেগ। জীবনের খুঁটি-নাটি বিবরণের মধ্যে এই আকস্মিক ভাবাবেগের সন্ধান পাওয়া যায় না। জীবন-চরিত লেখক মহাপুরুষের শুধু বাহিরের পরিচয় পান। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য-কলাপ, আলাপ-আলোচনা, তাঁহার সাংসারিক লাভ-ক্ষতি, পারিবারিক বিপর্যয় এই সমস্ত ব্যাপার যাহার সন্ধান বাহিরের লোকে বাহির হইতে পাইতে পারে,—জীবন-চরিতে শুধু এই সমস্তের বিবরণ পাওয়া যায়। কি বাহিরের কাজকর্মে কাহারও, বিশেষ করিয়া—শিল্পীর অন্তরের পরিচয় মিলে না। তাই এই সব ক্ষেত্রে জীবন চরিত অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ (Objective বা Realistic) হইয়া উঠে, ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective বা Idealistic) হইতে পারে না। মহাপুরুষের গভীরতর জীবনের প্রতিবিম্ব, তাঁহার সত্যকার সুখ-দুঃখের ছবি পাওয়া যায় না। এই জন্যই জীবন-চরিতের সাহিত্যিক মর্যাদা সম্পর্কে এই প্রকার সংশয়ের কথা উঠিয়া থাকে।

কিন্তু আত্মচরিত (বা auto-biography) সম্পর্কে এই কথা খাটে না। মহাপুরুষদের আত্মচরিত অপূর্ব সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইহাতে মহাপুরুষদের গভীরতর জীবনের ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective) চিত্র আমরা পাইয়া থাকি। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি, সুখদুঃখের গভীরতর অনুভূতিগুলি, মহত্তর ও বিশালতর চিন্তা ও আবেগগুলি মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ভাষায় জীবনের সমগ্র রূপ লইয়া আত্মজীবন-চরিতে অপূর্ব প্রকাশ লাভ করে। তখন ইহা সাহিত্যিক গুণে উপাদেয় হইয়া উঠে। অপরের রচিত জীবন-চরিত অপেক্ষা মহাপুরুষের আত্মজীবন-চরিত পাঠকের অধিকতর প্রত্যয় আকর্ষণ করে বলিয়া, উহা অপেক্ষাকৃত অধিক সুখপাঠ্য হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু কৃত মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত, মন্মথনাথ ঘোষ রচিত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত, চণ্ডীচরণ সেন কৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ

জীবনচরিত হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আত্মচরিত হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসমাপ্ত আত্মচরিত, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', প্রভৃতি গ্রন্থ অতি উপাদেয়।

জীবন-চরিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নির ন্যায়, জীবনের অগ্নিকে চিরকালের জন্য বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সর্বকাল ও সর্বদেশের চিত্তে একটি বিশেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ছড়াইয়া দিতে চায়। মনুষ্য সভ্যতার একটি সর্বপ্রধান লক্ষণ যে বীর পূজার (Hero-worship) প্রবৃত্তি তাহাই জীবন-চরিতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই জীবনী রচনার প্রবৃত্তি প্রচেষ্টা কখনই একেবারে নিরর্থক হইয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(কলিঃ বিশ্বঃ বিঃ ১৯৩২, ৩৫)

ভূমিকা—বাল্যজীবন—শিক্ষাকাল—কর্মজীবন—জাতীয়তাবোধ—কীর্তিসমূহ—উপসংহার।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন-কথা আমার বড় ভাল লাগে। তিনিই আমার আদর্শ মানুষ। অখ্যাত, অজ্ঞাত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই মত শত বাধা-বিঘ্ন সদর্পে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার মধ্যে যে গৌরব, যে বীরত্ব আছে তাহা আমার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি যদি ঐরূপ হইতে পারিতাম, তবে সংসারে আর কিছুই চাহিতাম না। আমি ধন্য হইয়া যাইতাম।

প্রায় সওয়া-শত বৎসর পূর্বে (১২২৭ সালে) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে যে সিংহশিশুর জন্ম হয়, তাঁহার কীর্তি যে একদা সমগ্র বঙ্গদেশকে পরিব্যাপ্ত করিবে, তাহা সেদিন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? দুঃস্থ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কতই দুঃখ-কষ্টে তাঁহাকে নয় বৎসরেরটি করিয়া দিলেন। সেই নয় বৎসরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র যেদিন মায়ের পদধূলিমাত্র সম্বল করিয়া পিতার সহিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেন, সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে

"মা আমি আসিয়াছি"—তিনিই আবহমানকালের সত্যকার বাঙ্গালী। বাঙ্গালী-হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা এইরূপ বীরত্বের সহিতেই চিরদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিদ্যাসাগর সেই দ্বিধাহীন, শঙ্কাহীন সরল বীর বাঙ্গালী। তাঁহার এই বাঙ্গালাত্বের গর্ব আমার কাছে অত্যন্ত লোভনীয় বলিয়া বোধ হয়।

বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যে সব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তাঁহার গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই বাঙ্গালায় লেখা। যে কয়খান সংস্কৃত গ্রন্থ আছে তাহাও বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য রচিত। যে বিরাট পাণ্ডিত্যের একমাত্র সাক্ষী হইয়া তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' নাম বাঙ্গালী হৃদয়ে চিরদিন অমর হইয়া আছে, সেই পাণ্ডিত্যকে তিনি তাঁহার গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে জাহির করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার যে গুণের জন্য মুগ্ধ বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে 'দয়ার সাগর' নামটি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেই সীমাহীন করুণা ও অপার মঙ্গলেচ্ছাই তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে চিরদিন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবে।

মহাত্মা গান্ধী

(কলি বিশ্বঃ বিঃ ১৯২৮)

[সূচনা—জন্ম—বাল্যজীবন—কর্মজীবন—দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম—ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম—মহাত্মাজীর নীতি—সাম্য ও প্রেম—উপসংহার।]

গুজরাটের কাথিয়াবাড প্রদেশে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে এক সম্ভ্রান্ত বণিক্-বংশে এই মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। কাথিয়াবাড শহরেই গান্ধীজী ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন। তারপর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি জটিল মোকদ্দমার জন্য ইনি

দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালে, ও ট্রান্সভালে তিনি আফ্রিকা-প্রবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া অত্যন্ত মর্মপীড়িত হন। ইনি যখন নেটালের সুপ্রীমকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে থাকেন সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে এশিয়াবাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নেটাল রাজসরকার এক আইন পাশ করেন। গান্ধীজী ঐ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের দুর্দশার কথা জ্ঞাপন করেন। পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বুঅর-যুদ্ধের সময় তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া সংঘবদ্ধভাবে সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে আবার ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করেন। তারপর আবার তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া গিয়া ট্রান্সভালে অ্যাটর্ণির কার্য করিতে থাকেন। নেটালের সুপ্রসিদ্ধ 'Indian Opinion' পত্রিকা ইহারই প্রতিষ্ঠিত।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী আবার ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তখন আমেদাবাদে একটি সত্যাগ্রহ-আশ্রম স্থাপিত করেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য তিনি ভারতের বিশিষ্ট স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর বিহারে চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবদের সহিত স্থানীয় লোকদের বিবাদভঞ্জন, কায়রায় দুর্ভিক্ষ-নিবারণ, মহাযুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহ, আমেদাবাদ ধর্মঘটের মীমাংসা প্রভৃতি কার্যের জন্য গান্ধীজীর নাম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃতিলাভ করে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ভারতে 'অসহযোগ' আন্দোলন প্রবর্তিত করিলেন। তাহার পর হইতে ভারতের সুবিপুল স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিমান্ নেতৃরূপে মহাত্মা গান্ধী যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই অতি বিরল।

এই স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি একখানি অস্ত্রও ব্যবহার করেন নাই, হিংসার লেশমাত্র তাঁহার হৃদয়ে ছিল না, শুধু মানুষের ন্যায় বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারই তিনি দাবি করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিনব যুদ্ধে সৈন্য-সামন্তের অভাব কখনও হয় নাই। যখনই তিনি আহ্বান করিয়াছেন, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া অসংখ্য নর-নারী ক্ষুদ্র স্বার্থ

ও সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। এমন সুবিপুল ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর খুব কম নেতারই দেখা গিয়াছে।

এই বিরাট ব্যক্তিত্বের উৎসটি কোথায়? মহাত্মা গান্ধী কোথায় এত শক্তি পাইলেন, যাহার প্রভাবে সমগ্র ভারতের অসংখ্য নরনারী সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল? এই ব্যক্তিত্বের অন্তরালে রহিয়াছে তাঁহার অপরিসীম চরিত্র-বল। সত্যই তাঁহার একমাত্র আদর্শ। প্রেম ও অহিংসাই তাঁহার অস্ত্র। সরলতা, অকপট নিষ্ঠা ও অসাধারণ আত্মত্যাগই তাঁহার বল। এই যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি বিজয়ী বীরের জয়মাল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও অকপট প্রেম দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রনেতা ত দূরের কথা, ধর্মপ্রচারক সাধু ব্যক্তিরাও তাঁহার চরিত্রের নির্মলতা ও উদার প্রেম অনুকরণ করিতে চাহিতেছেন। আজ সমগ্র পৃথিবী তাঁহার অসাধারণত্ব স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার জয়গান করিতেছে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া এই সরল অনাড়ম্বর মানুষটি সকলের অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে যে সকলেরই মত মিলিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু তবু তাঁহার মহৎ চরিত্রের নিকট বিশ্ববাসীর মস্তক শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবনত হইয়াছে। সরল, শান্ত, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ। পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহে পড়িয়া ভারত সেই পবিত্র আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে দেখিয়া তিনি সেই শান্ত, সমাহিত, আশ্রম-জীবনের মাধুর্য আবার নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। 'খদ্দর' এই সরল পবিত্র অনাড়ম্বর জীবনের প্রতীক। ভারতকে এই খদ্দর উপকরণবহুল তামসিক জীবনের গ্লানি হইতে মুক্তি দান করিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

সাম্য ও প্রেম মহাত্মাজীর মূলমন্ত্র। সমস্ত অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য ভুলিয়া ভারতের উচ্চ-নীচ সমস্ত জাতিকে বক্ষে বক্ষে মিলিত হইতে হইবে, ক্ষুদ্র বলিয়া নীচ বলিয়া আর কাহাকেও ঘৃণা করা চলিবে না। নিজেদের মধ্যে এই সব বৈষম্য ও বিরোধই ভারতের পরাধীনতার দুঃখ বাড়াইয়া দিয়াছে, ইহাই মহাত্মা গান্ধী সত্য বলিয়া জানিয়াছেন। এই সত্য প্রচার করিবার জন্যই তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনে বহু দুঃখ ও দুর্ভোগ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে এই পরম সত্য হইতে

তিলমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই মহাপুরুষকে ভারতবর্ষ বিধাতার আশীর্বাদের মতই লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য নিতান্ত প্রয়োজনের সময়ই তাঁহাকে হারাইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মহাত্মারই দান। আমাদের শুভবুদ্ধি যেন আমাদিগকে সেই দানের যোগ্য করিয়া তুলে—এই প্রার্থনা করি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[জন্ম ও বাল্য-শিক্ষা—উচ্চ-শিক্ষা—কর্ম জীবন—বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি—বাঙ্গালা ভাষার সমাদর—বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনার ব্যবস্থা—ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবং তাঁহার মাতা জগত্তারিণী দেবী একজন আদর্শ রমণী ছিলেন। মাতা-পিতার অতন্দ্রিত যত্ন ও সতর্কতার মধ্যে আশুতোষের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আশুতোষ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন। তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন এবং গণিতে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে এম, এ, পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে গণিতে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

আশুতোষ বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের ওকালতি আরম্ভ করেন। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। জজ হিসাবে সর্বত্র তাঁহার সুনাম ছিল। তাঁহার বিচারে সূক্ষ্মদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও অধ্যবসায়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

হাইকোর্টের জজের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ বহু শ্রমসাধ্য কর্ম করিয়াও আশুতোষ দেশের কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রাণে

বিধাতা যেরূপ জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেমের অসাধারণ প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার বাহুতেও সেইরূপ বিরাট কর্মশক্তি দিয়াছিলেন। সার আশুতোষের চরিত্র নৈতিক সম্পদে ভূষিত ছিল। এই নৈতিক চরিত্রবলের জন্য তিনি দেশের সর্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। কি সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের বিচারাসনে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে সর্বত্রই তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইত। এই স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না, তাঁহার অপ্রতিহত তেজের নিকট সকলেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিত। শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ-গণের সহিত ব্যবহারেও তিনি কখনো সঙ্কীর্ণ স্বার্থের লোভে মস্তক অবনত করেন নাই। বস্তুতঃ এই তেজোদৃপ্ত পুরুষসিংহের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার নির্ভীকতা। এইজন্য তিনি 'বাংলার বাঘ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আশুতোষ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রতিভা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে একান্তভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম। আশুতোষ পঁচিশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য পদে মনোনীত হয় এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ দিবস (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে মে) পর্যন্ত এই সদস্যপদের অধিকারী ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একাধিকবার ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকল্পে যখন আইন প্রণীত হয় তখন তাহার জন্য যে সমিতি গঠিত হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে সেই সমিতির সভ্য মনোনীত হন। এই আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল নূতন বিধি প্রস্তুত হয় তাহাও আশুতোষেরই নেতৃত্বে হইয়াছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলারের দায়িত্বপূর্ণ কার্য অসামান্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। এই সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত হয়, তখন আশুতোষের সাহস ও কর্মনৈপুণ্যে সকলে বিস্মিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে বাঙ্গালাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য অনাদৃত ছিল। কলিকাতায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল তখন বাঙ্গালা সাহিত্য একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ব্যবস্থা উঠিয়া যায়।

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নববিধি প্রবর্তিত হইল তাহাতে বি, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনার সহিত যাহাতে ছাত্রগণ পরিচয় লাভ করিতে পারে তজ্জন্য কতকগুলি গ্রন্থ আদর্শরূপে নির্দিষ্ট হইত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া ছাত্রগণের পক্ষে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিগণের সুললিত কাব্যগাথার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান করিল। এ সকলই আশুতোষের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গভাষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন বঙ্গবাসী চিরদিন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

এম, এ, পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাও আশুতোষের অন্যতম কীর্তি। ইহার পূর্বে দেশীয় ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ভারতের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত কলেজেই বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নানা বিভাগে যাহাতে বঙ্গভাষার সম্পদ বর্ধিত হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বঙ্গভাষার ভাগ্যে এরূপ শুভ যুগ আর কখনও আসে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত লোকশিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে বঙ্গভাষার সাহায্যেই করিতে হইবে, অন্য কোন পন্থাই নাই। এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষের অঙ্গুলিনির্দেশ অনুসরণ করিয়া বর্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গলা সাহিত্যকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। একদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বেতদ্বীপের সরস্বতীর পার্শ্বে বাঙ্গালার শ্বেতশতদলবাসিনী বীণাপাণির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছিলেন, অপরদিকে সাহিত্য সম্মিলন ও অন্যান্য সভার দ্বার দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে আপন অটল আসন স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ ভাবগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার অদম্য কর্মশক্তি ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষে এইরূপ এক জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় সাহিত্যগুলিকে উন্নীত করা, দেশীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ প্রদান করা—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে মারাঠী, গুজরাটী, অসমীয়া, ওড়িয়া, উর্দু প্রভৃতি ভাষার অধ্যাপনা প্রবর্তনের দ্বারা আশুতোষ তাঁহার উদ্দেশ্য কতটা সফলতার পথে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রকাশ করিবে।

যীশুখ্রীষ্ট

[সূচনা—জন্ম—জ্ঞানলাভ—ধর্মপ্রচার—জনসাধারণের বিরুদ্ধতা—মৃত্যু—উপসংহার।]

এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আরব দেশ। এই আরব দেশের উত্তরে প্যালেস্তাইন নামে একটি রাজ্য আছে। এই রাজ্যের অন্তর্গত বেথলেহাম প্রদেশে ইহুদী বংশে মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।

যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় এমন উদারচেতা, ক্ষমাশীল এবং ধর্মাত্মা মহাপুরুষ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের করুণায় তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

তিনি বলিতেন, মানুষমাত্রই সেই পরমেশ্বরের সন্তান। পিতা যেমন সন্তানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যগণকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। মানুষ যদি মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে অথবা অন্য কোন মন্দ কাজ করে, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। পুত্রকন্যার মন্দ আচরণ দেখিলে পিতার মনে যেমন দুঃখ হয়, মানুষের দুর্ব্যবহার দেখিলে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের হৃদয়েও তেমনি বেদনা জাগে।

যীশুখ্রীষ্ট কেমন করিয়া এই সব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। বিদ্যাশিক্ষার সুযোগও তাঁহার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। পণ্ডিতগণ যে ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করেন যীশুখ্রীষ্ট সেভাবে জ্ঞানলাভ করেন নাই। তাঁহার সুকোমল হৃদয়টি ছিল মমতার আধার। সেই হৃদয়ের অনুভূতি দিয়াই তিনি মানুষ এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। তাহার আপন হৃদয়ের অনুভূতির সাহায্যেই তিনি যে জ্ঞানালোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সমগ্র বিশ্বের নরনারী আজও সেই আলোকের সহায়তায় নিজেদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিতেছে।

যীশুখ্রীষ্ট ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সে সময় ইহুদীগণের মধ্যে ধর্মের নামে নানাবিধ অধর্মের অনুষ্ঠান হইত। যীশুখ্রীষ্ট প্রকৃত ধর্মের সাহায্যে অধর্ম দূর করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যাহারা সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া নানা দেবতার পূজা করে তাহারা পাপী।

দেশের জনসাধারণ যীশুর এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল না। তখন ইহুদীদের রাজা ছিলেন হিরোদ। হিরোদও যীশুর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দেশের রাজা, প্রজা সকলেই তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যীশু কাহারও কোন কথা গ্রাহ্য করিলেন না। নানা অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিয়া তিনি অটল রহিলেন।

এত বিরোধিতা সত্ত্বেও যীশু নূতন ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্তি, উদার ব্যবহার এবং ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া কেহ

কেহ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া অনেকেই মোহিত হইল। ধীরে ধীরে দুইজন একজন করিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। কিছুকাল মধ্যে তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যের সংখ্যা হইল বার।

যীশুর প্রতি লোকের অনুরাগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া রাজা হিরোদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। অন্য কোন উপায়ে তাঁহার শক্তি বিলোপ করা সম্ভব নয় দেখিয়া তিনি প্রচলিত ধর্মের বিরোধী হইবার অপরাধে যীশুর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। যীশুর ভক্তগণ এই সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইল। রাজদণ্ডের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে হিরোদের জিদ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি যীশুর বারজন ভক্তের মধ্যে একজনকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়া স্ববশে আনিলেন এবং তাহারই সাহায্যে যীশুকে ধৃত করিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

মৃত্যু-দ্বারে দাঁড়াইয়াও এই মহাপুরুষ নিজের দুঃখের কথা একটিবারও উচ্চারণ করেন নাই। অধার্মিকের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিলেন, তবু তিনি একটি মুহূর্তের জন্যও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"পিতঃ! যাহারা আমাকে হত্যা করিতেছে তাহারা অবোধ। তাহাদিগকে তুমি ক্ষমা করিও।"

অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা ভুলিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিতে পারে, এমন ক্ষমাশীল লোক জগতে কয়জন জন্মগ্রহণ করে?

প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল যীশুখ্রীষ্ট ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম আজ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মহারাজ অশোক

(কলিঃ বিশ্বঃ বিঃ ১৯৩১)

[সূচনা—বাল্যজীবন—রাজ্যলাভ—রাজ্যবিস্তার—ধর্মবিস্তার—কীর্তিকলাপ—চরিত্র—উপসংহার।]

বাইশ শত বৎসরের অধিক হইল, মহারাজ অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার ভারতের ইতিহাস অতীতের গাঢ় অন্ধকারে বিলুপ্ত। ভারতবর্ষের তখন এক অতি গৌরবময় দিন ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার নিদর্শন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত না থাকায়, আজ আমরা সেই অতীত গৌরবের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না। যে কারণেই হউক তখনকার দিনে ইতিহাস লিখিবার রেওয়াজ ছিল না। তাই সেই সুদীর্ঘ যুগটি যেন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে মহারাজ অশোকের কীর্তি সুতীব্র জ্যোতিতে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

অশোক মৌর্যবংশীয় রাজা বিন্দুসারের পুত্র, স্বনামধন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র। তাঁহার বাল্যজীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিংবদন্তী আছে, তিনি নাকি বাল্যকালে বড় দুরন্ত ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিল। সেই বিবাদে জয়লাভ করিয়া অবশেষে প্রিয়দর্শী অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০ অব্দে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজ্যলাভ করিবার জন্য নাকি অশোক তাঁহার ভাইদের পরাজিত ও দুই-এক জনকে নিহত করিয়াছিলেন।

রাজা হইয়া রাজ্যবিস্তারের দিকে প্রিয়দর্শী অশোকের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। রাজ্যলাভের পর আট বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর তিনি বৈতরণী নদী লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। কলিঙ্গবাসীরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে অশোকের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া দলে দলে আসিয়া যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিল, কিন্তু অশোকের বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিল না। অবশেষে অশোকই জয়ী হইলেন।

কিন্তু এই যুদ্ধে যে রক্তস্রোত বহিল, তাহা দেখিয়া অশোকের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবনে আর যুদ্ধ করিব না।" এই প্রতিজ্ঞা তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই আমরা প্রকৃত অশোককে দেখিতে পাই। উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইহার পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করিয়া জনসাধারণের চিত্তোন্নতি-বিধান করাই মহারাজ অশোক জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিসে মানুষ হিংসা ভুলিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে, সদাচারনিষ্ঠ হইবে, ইহাই হইল তাঁহার প্রধান চিন্তা। তিনি নিজে ভারতের সকল বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখিয়া আসিলেন। ব্যাপকভাবে যাহাতে ভগবান বুদ্ধের বাণী দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়, অশোক তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু যে ভারতবর্ষেই তাঁহার এই প্রচেষ্টা সীমবদ্ধ ছিল, তাহা নয়। এশিয়ার পশ্চিমাংশে, গ্রীসে, মিশরে, সিংহলে এবং আরও অনেক স্থানে তিনি প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। শুনা যায় অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-কল্পে সিংহলে গিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে 'ধর্ম-মহামাত্র' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইলেন, ইঁহারা নগরে নগরে গমন করিয়া অধিবাসিবৃন্দকে শীল ও আচার সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মানুমোদিত উপদেশ দিতে লাগিলেন। পর্বতগাত্রে এবং উচ্চস্তম্ভে ধর্মোপদেশসমূহ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উৎকীর্ণ হইল। মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে, জীবে দয়া করিতে, সত্য কথা কহিতে, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে অশোক উপদেশ দিতেন। জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে ধর্মভাব জাগরূক হয় প্রিয়দর্শী অশোক সেজন্য সমারোহপূর্বক ধর্মোৎসব ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন।

শুধু ধর্মপ্রচার করিয়াই অশোক ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাজা। তাই তিনি পরিহিত-সাধনে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুকরা যাহাতে প্রচুর ভিক্ষালাভ করিতে পারে, অশোক তাহার সুব্যবস্থা করেন। পথিকগণের সুবিধার জন্য প্রশস্ত রাজপথসমূহ প্রস্তুত করান। রাজপথের দুইধারে বৃক্ষরাজি রোপন করান। মাঝে মাঝে সুগভীর কূপ খনন করাইয়া দেন।

অশোকের সময় যে ভাস্কর্য-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাঁহার নির্মিত স্তম্ভগুলিই উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরধর্ম-সহিষ্ণুতারও সীমা ছিল না। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁহার নিকট সদয় ব্যবহার লাভ করিত, অশোক তাহাদের সুখ-দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র ঔদাসান্য প্রদর্শন করিতেন না।

অশোক যে একজন কত বড় রাজা ছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। সাধারণতঃ রাজারা আমাদের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে পারিলেই যথেষ্ট করিলেন মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহাই বা কয়জনে পারে? কিন্তু যে মহানুভব রাজা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও নিজে সন্ন্যাসীর ন্যায় ভোগ-বিমুখ জীবন-যাপন করিতেন, এবং অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের শুধু সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান নয়, আত্মার শান্তি বিধান করিবার ভারও যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কত বড় মানুষ ছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আজও যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসংখ্য লোক বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করিয়া অহিংসা মন্ত্রের সাধনা করিতেছে, প্রিয়দর্শী অশোকের পুণ্য প্রচেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ। এই মহাভিক্ষু তপোব্রত নরপতি অতুল রাজবিভব ও ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া রাজার কঠোর কর্তব্যটিই শুধু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে মহারাজ অশোক পরলোক গমন করেন।

প্রবন্ধ-সঙ্কেত

রকফেলার—জন্ম—১৮২৯ খৃঃ অঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউইয়র্ক ষ্টেট, পুরা নাম জন ডেভিডসন রকফেলার। বাল্যজীবন—সামান্য জমিজমা হইতে যে ফসল পাওয়া যাইত তাহাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত না, ষোল বৎসর বয়সে সপ্তাহে চার শিলিং বেতনে খাতা-পত্র লিখিবার কাজ গ্রহণ। চাকরিতে অসন্তোষ, চাকরি পরিত্যাগ, স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের চেষ্টা। ব্যবসায়—কাঠের ভেলা সস্তায় কিনিয়া বিক্রয় করাতে ১০০ ডলার লাভ, ব্যবসায়-জীবনের সূত্রপাত, নানাবিধ জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করিয়া একুশ বছর বয়সের মধ্যে দশ হাজার ডলার সঞ্চয়, ঐ অর্থ লইয়া কোন লাভপ্রদ ব্যবসায়ে খাটাইবার ইচ্ছা, খনিজ তৈল পরিষ্কার করিবার জন্য কারখানা স্থাপন। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম Standard Oil Company of New York—SOCONY. চরিত্র—দানবীর, মানব সমাজের উন্নতিকল্পে প্রচুর দান করিয়াছেন, নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত, তাঁহার জীবন নিরলস অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ইতিহাস। 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' এই নীতিবাক্যটি তাঁহার জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

বুদ্ধদেব—সূচনা—প্রকৃত মহাপুরুষ যাঁহাকে বলে, তাঁহারা কখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, বুদ্ধদেব একজন মহাপুরুষ। জন্ম—পিতা শাক্যরাজ শুদ্ধোদন, মাতা মহামায়া, শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তু নগরে জন্ম, শৈশবের নাম সিদ্ধার্থ, বিমাতা গৌতমীর হস্তে প্রতিপালন। কৈশোরে ও যৌবনে—চিন্তাশীলতা, মৃগয়া প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে বিতৃষ্ণা, সংসারে বিরাগ, জীবের দুঃখে করুণা, দেবদত্ত ও হংসের কাহিনী। বিরাগ ও গৃহত্যাগ—পুত্রের ঔদাসীন্য দেখিয়া পিতা বিবাহ দিলেন, পত্নীর নাম গোপা। ছন্দকের সহিত রাজধানী পরিভ্রমণ, বৃদ্ধ, পীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের দেখিয়া দুঃখ অনুভব, মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য সঙ্কল্প, গৃহত্যাগ। বোধিলাভ ও ধর্মপ্রচার—দীর্ঘকাল তপস্যার পর বোধি অর্থাৎ জ্ঞান লাভ, বোধিলাভ করেন বলিয়া নাম হইল বুদ্ধ, যেখানে সিদ্ধিলাভ করেন সেই স্থানটির নাম বুদ্ধগয়া, ইহা গয়ার নিকটবর্তী, বোধিবৃক্ষ, কাশীর উপকণ্ঠে সারনাথে পাঁচজন শিষ্যকে দীক্ষা দান, এই স্থানে অশোক স্তূপ, পরে অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে, এশিয়ার বহু দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। দেহত্যাগ।—পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্মপ্রচারের পর আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে দেহত্যাগ।

স্বামী বিবেকানন্দ—সূচনা—তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ একজন কর্মযোগীর আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়াছিল, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ধর্ম বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—জন্ম ও বংশবিবরণ—১৮৬২ খৃঃ অব্দে শিমুলিয়ার দত্ত-বংশে জন্ম, নাম নরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের নাম। প্রথম জীবন :—ছাত্রজীবনে কোনরূপ অসামান্যতা ছিল না, ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে বি, এ, পাশ করেন, দর্শন-শাস্ত্রে অনুরাগ, ছাত্রজীবনে নাস্তিকতা

হিন্দুসমাজের জড়বাদের প্রভাব, নরেন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। কেশবচন্দ্রের প্রভাব, ধর্মজ্ঞানের সহিত জাতীয়তাবোধ, অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের জন্য আকুলতা, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ। সাধনা:—পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষা, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া হিমালয়ে তপস্যা, সিদ্ধিলাভ, বুঝিলেন সর্বভূতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জীবের সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেবা হয়, বলিলেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

পওহারি বাবার সহিত সাক্ষাৎ, জীবনে পওহারি বাবার প্রভাব।

কর্মজীবন, ১৯৩০ খৃঃ অব্দে চিকাগো সহরে 'পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন' বা ধর্মমহামণ্ডপে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা, ইউরোপ পরিভ্রমণ, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান নরনারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। ধর্মমত, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়, অধ্যাত্ম আদর্শের সহিত জাতীয়তাবাদ—গ্রন্থাবলী—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইত্যাদি। নব যুগের সূচনা। ভারতবর্ষের নব জাগরণ, যুবকগণের আত্মবর্জন ও সেবাব্রত-গ্রহণ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি স্থাপন, জনসাধারণের সেবা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—সূচনা:—পৃথিবীতে যখনই ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটে, পরমহংসদেবের আবির্ভাব। জন্ম:—হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুর গ্রাম, ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতা চন্দ্রমণি দেবী। পিতামাতার প্রদত্ত নাম গদাধর। শৈশব—লেখাপড়ায় কৃতিত্বের অভাব, সঙ্গীতে অনুরাগ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের উপাখ্যান শ্রবণ। যৌবন:—কলিকাতায় আগমন, দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে পৌরোহিত্য গ্রহণ। কালীপূজা করিতে মধ্যে মধ্যে ভাবাবেগে সংজ্ঞা হারাইতেন। ভগবৎ সাধনা, অনন্যসাধারণ ভক্ত, তন্ময়তা, ঈশ্বরের [illegible]। ধর্মমত—সর্বধর্মে উদার, আচারে ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়ামি ছিল না। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচয়, ধর্মব্যাখ্যান। বিবেকানন্দ—প্রিয়তম শিষ্য, বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের ইতিহাস। বিবেকানন্দের প্রচারকার্য রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন। দেহত্যাগ:—১৮৮৬ খৃঃ অঃ, ১৬ই আগষ্ট ৫১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ।

স্বর্ণকুমারী দেবী—১৮৫৬ খৃঃ অঃ ২৮শে আগষ্ট। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবাহ:—দশ এগার বৎসর বয়সে বিবাহ। স্বামী—জানকীনাথ ঘোষাল। শিক্ষা:—বিবাহের পূর্বে পিতার গৃহে শিক্ষা হয়, বিবাহের পর বোম্বাইয়ে মেজ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট কিছুকাল অবস্থান, ঐ সময়ে ইংরাজী শিক্ষা। সাহিত্য-সাধনা—বাঙ্গালী নারীদের মধ্যে সাহিত্য সাধনায় অগ্রণী। মিবার রাজা, বিদ্রোহ, স্নেহলতা, কবিতা ও গান, দেব কৌতুক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনের

ভার গ্রহণ। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় পত্রিকার সর্বাঙ্গীন উন্নতি। পত্রিকা-সম্পাদনে কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলার সাহায্য। সাহিত্য সাধনার পুরস্কার :—তাঁহার সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য, দেশব্যাপী খ্যাতি, জগত্তারিণী পদক প্রাপ্তি, ১৩১৬ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হন।

অনুশীলনী

১। আকবর ও আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

২। ভারতবর্ষের কোন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকের জীবন কথা, অবলম্বন করিয়া একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

(নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব)

৩। ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে কোন বিখ্যাত বীরপুরুষের জীবনী লিখ।

(রাণা প্রতাপ, ঈশা খাঁ, শিবাজী, শেরশাহ)

৪। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনব আবিষ্কারের দ্বারা মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এমন কোন বৈজ্ঞানিক মনীষার জীবনী বিবৃত কর।

(মার্কনি, এডিসন, জগদীশচন্দ্র বসু, [illegible], ফ্যারাডে)

৫। দেশসেবার জন্য সকল সুখ, সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া অকাতরে অসীম দুঃখ বরণ করিয়াছেন এমন কোন ভারতীয় মহাপুরুষের কার্য ও কথা অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু।)

———

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

পৌরাণিক চরিত্র

ভীষ্ম

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬)

[সূচনা—জন্ম—কীর্তিকলাপ—পিতৃভক্ত—সত্যনিষ্ঠা—কর্তব্যজ্ঞান—দেহত্যাগ।]

প্রাচীন মহাকাব্যে ভীষ্মের চরিত্র মহাসাগরের মত ;—যেমনি উদার, তেমনি অতলস্পর্শ। ভীষ্মের চরিত্র অতি জটিল,—তাহা যেন কি একটা বিরাট রহস্যের যবনিকার দ্বারা চিরদিনের মত আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অনেকে ভীষ্মের সমগ্র কার্যকলাপ সমর্থন করেন না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে সমর্থন করেন, আর যাঁহারা করেন না সকলেই তাঁহার চরিত্রের একটি অনির্দেশ্য উদার গাম্ভীর্যের নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করেন এই বিরাট ব্যক্তিত্ব, মহাপুরুষের লক্ষণ। ভীষ্ম সর্বদেশের ও সর্বকালের মহাপুরুষগণের সগোত্র।

অষ্টবসুগণের অন্যতম বসু শাপভ্রষ্ট হইয়া গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর পুত্র হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই অলৌকিক জন্মবৃত্তান্তের সম্মান ভীষ্ম নিজের সমগ্র জীবনে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তিনি কখনও কোন ক্ষুদ্র কাজ করেন নাই। বাল্যকালে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রবিদ্যায় তিনি সুনিপুণ হইলেন। তাঁহার বীরত্ব তখনকার ভারতে সর্বসাধারণের নিকট একটি পরম বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাঁহার গুরু ভুবনবিজয়ী পরশুরামকেও তিনি শৌর্যবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক শৌর্য কোন মানুষকেই কোন দিন মহনীয় করিয়া তুলিতে পারে নাই। ভীষ্মের অসাধারণত্ব তাঁহার ত্যাগে। তিনি পিতার তৃপ্তিহেতু দাস-রাজের কন্যা সত্যবতীকে আনিবার জন্য নিজে জীবনের সমস্ত ঐহিক সুখ ত্যাগ করিলেন,—রাজৈশ্বর্যের লোভ ত্যাগ করিলেন, দাম্পত্য জীবনের সুখও তিনি এক কথায় পরিত্যাগ করিলেন। এই বিরাট ত্যাগেই দেবব্রত ভীষ্মের দেবত্ব। তিনি নিজের সুখ-সম্ভোগ-লালসা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিয়া চিরজীবন শুধু কর্ম করিবার জন্যই বাঁচিয়া রহিলেন। মহাভারতের

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম কর্মের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সমগ্র মহাভারতে যদি উহার কোন সত্য আদর্শ থাকে, তবে সে ভীষ্মের চরিত্রে। ভীষ্মের চরিত্রেই নিষ্কাম কর্মের বাণী যথার্থ মূর্তি লাভ করিয়াছিল। সত্যবতীর গর্ভজাত বিচিত্রবীর্যের রাজ-সিংহাসনের রক্ষী হইয়াই তিনি জীবন কাটাইয়া দিলেন। বিচিত্রবীর্যের রাজ্যৈশ্বর্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন। বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের তুমুল বিরোধ বাধিল।

বিরোধ-ব্যাপারে ভীষ্মের কার্যকলাপ লইয়াই নানা রকম জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভীষ্ম বরাবর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা ছিল পাপী। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডুর ভ্রাতাদের ইহারা অশেষরূপে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে। ভীষ্ম মনে মনে পাণ্ডবগণের উপর প্রীত ছিলেন। তিনি কৌরবগণের কার্যকলাপ একটুও সমর্থন করিতেন না, বরং কখনও কখনও তাহাদের অন্যায় আচরণের ক্ষীণ প্রতিবাদও করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ মহাভারতে আছে। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? ভীষ্ম কার্যতঃ পাণ্ডবগণের স্বপক্ষে বিশেষ কিছুই করেন নাই; দরিদ্র এবং নিরুপায় বিদুর পাণ্ডবদের যতটুকু সাহায্য করিয়াছিলেন, ভীষ্ম তাহাও করেন নাই। অধিকন্তু তিনি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। যিনি আজীবন ত্যাগ ও সত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অন্যায় জানিয়াও কৌরবপক্ষ অবলম্বন করার মধ্যে কেমন যেন একটা অসঙ্গতি থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বাহির হইতে করা যায় না। যুগধর্ম ন্যায়-অন্যায়ের প্রকৃত মাপকাঠি। সেই যুগ হয়ত এমন ছিল, যখন ভীষ্মের কার্যই ছিল সকল ন্যায়ধর্মের অনুমত। ভীষ্ম তদ্বিপরীত কার্য করিলেই হয়ত পাপাচারী, কৃতঘ্ন বলিয়া নিন্দিত হইতেন শুধু যে নিন্দার ভয় তাহা নয়। তিনি নিজেও হয়ত যুগধর্মের প্রভাবে ঐ প্রকার আচরণকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে হইবে সেই ধর্মকে মানিতে গিয়া তাঁহাকে কতখানি ত্যাগ করিতে হইয়াছে। অন্তরের স্বাভাবিক স্নেহ-প্রবৃত্তিকে কতখানি নিপীড়িত করিয়া তিনি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন পাণ্ডবগণের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাই বিবেচ্য। যুগাদর্শ যাহা থাকে থাকুক, উহার জন্য দেশাচার ও শাস্ত্রকারেরাই দায়ী।

কিন্তু মানুষের চরিত্র বিচারকালে শুধু দেখিতে হইবে সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া কে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিল। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া বিচার করিলেই ভীষ্ম-চরিত্রের সমুন্নত মহিমা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাঁহার পূর্ব জীবনের দেবোচিত ত্যাগ ও সত্যের সাধনা যে পরবর্তী জীবনেও অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত ছিল ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মুখেই শান্তিপর্বের অপূর্ব কাহিনীগুলি বিবৃত হইয়াছে। এই শরশয্যা যেন তাঁহার সমগ্র জীবনের একখানি চিত্র। শুধু যে অর্জ্জুনের দ্বারা বাণাহত হইয়াও তিনি সেই অপূর্ব শয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন, তাহা নয়। এই সংসার তাঁহার জীবনে চিরদিনই শরশয্যার মতই পরীক্ষা-কণ্টকময় ছিল। ভীষ্মের ন্যায় জ্ঞানী যে প্রাচীন ভারতে খুব কমই ছিলেন, ইহা শান্তিপর্বে তাহার আলোচিত ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বেশ বুঝা যায়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষির ন্যায় এই চিরকুমার জ্ঞানী পুরুষ প্রাচীন ক্ষত্রিয়-সমাজের ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন। তিনি সমগ্র মহাভারতের মেরুদণ্ড-স্বরূপে উহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটিকে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান ছিলেন,—তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন মহাভারতের মধ্যে একটা বিরাট অবসান ঘটিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার করিয়াই যেন ভারতের এই উজ্জ্বল প্রদীপটি চিরতরে নির্বাপিত হইল।

রামচন্দ্র

[সূচনা—মহামানবত্ব—পিতৃভক্তি—বনবাস—আদর্শ স্বামী—রাজা—সর্বগুণের সমন্বয়—উপসংহার]

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের কান্ত-কোমল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্র বীরত্ব ও মহিমার প্রতিমূর্তি,—তিনি মহেন্দ্রধ্বজ-সঙ্কাশ উন্নতদেহ, পরিঘতুল্য তাঁহার বাহু।

এই মহামহিম মূর্তিখানির মধ্যে ঋষি-কবি সীমাহীন গুণরাশির প্রাণ প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। তিনি স্বদোষ ও পরদোষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক, স্বজন ও স্বধর্মের রক্ষয়িতা নিত্য-সংযমী। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, অথচ ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হইয়া উঠেন। এই চরিত্র-মহিমার মধ্যে প্রীতির কমনীয়তা সঞ্চারিত হওয়ার বিচিত্র মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অভিষেকের পরিপূর্ণ উৎসবের মধ্যে রামচন্দ্র যখন কৈকেয়ীর মুখ হইতে নিষ্ঠুর বনবাসাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, তখন, তাঁহার মনে যে হতাশার দুঃখ আসে নাই, তাহা নয়। রামচন্দ্র তেমন সুখ-দুঃখ-বিরহিত যোগী ছিলেন না। তিনি আশা-নিরাশার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ মানব ছিলেন। এই হৃদয়ের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য তাঁহার চরিত্র সাধারণ মনুষের কাছে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। চিরকালের মানুষ রামচন্দ্রের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পাইতেছে। জীবনের সুখ দুঃখ উত্থান-পতনের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব রামের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বনবাসাজ্ঞা শ্রবণে রামের স্বভাবতঃ যে দুঃখ ঘনীভূত হইয়াছিল, অপরিসীম ধৈর্য ও সংযমের সহিত তিনি তাহাকে দমন করিয়াছিলেন।

পিতা তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী তাঁহার প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের অপ্রিয়কারী হন নাই,—তাঁহাদের প্রতি একটিও বিরক্তিসূচক বা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

রামচন্দ্র অসাধারণ সংযমী ছিলেন, কিন্তু যোগী ছিলেন না। ইহাই রাম-চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি মানুষের সুখ দুঃখকে ছাড়াইয়া পরিপূর্ণ দেবতা হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই অপরিসীম ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রাণের কমনীয়তা মাঝে মাঝে ক্ষণিকের দুর্বলতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক এই হৃদয়দৌর্বল্যই মানব-হৃদয়ের চরম ঐশ্বর্য। এই হৃদয়াবেগই মানুষকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। রামচরিত্রের উত্তুঙ্গ পর্বতমধ্যে এই হৃদয়াবেগের স্রোতস্বিনী ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়াছে। তাই মানুষ রামের সঙ্গে চিরদিন সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু ও পর্বতের ন্যায় মহিমান্বিত বিরাট পুরুষ রাজ্যাভিষেক-উৎসবের মধ্যে নিদারুণ বনবাসাজ্ঞা পাইয়া জননী কৌশল্যার কাছে জলভারাক্রান্ত নয়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আবার প্রথম রজনীর দুঃসহ বনবাস ক্লেশে

ব্যথিত হইয়া পিতা দশরথ ও মাতা কৈকেয়ীর আচরণে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। মাঝে মাঝে এইরূপ হৃদয়াবেগ প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিক্ষোভ কখনও স্থায়ী হয় নাই। ইহাকে পরাজিত করিয়া তিনি সংযমকেই নিজের জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সীতার প্রতি সীমাহীন প্রেম থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া তিনি এই সংযমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন।

তবে এই সমস্ত হৃদয়দৌর্বল্যের কি কোন সার্থকতাই নাই? নিশ্চয়ই আছে। ইহারা দেখিয়াছে, রামচরিত্রে কতখানি সংযম ও ত্যাগ রহিয়াছে; মাঝে মাঝে এই হৃদয়াবেগ তাঁহার সংযমের গভীরতা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই আলোকে রামচরিত্রের যাবতীয় দুর্বলতার বিচার করিতে হইবে। যোগী যিনি তিনি সংসারে বীতস্পৃহ। সংসারের প্রতি তাঁহার হৃদয়-বৃত্তি সম্পূর্ণ বিমুখ, কিন্তু রামচন্দ্র পারিবারিক জীবনের মূর্তিমান আদর্শ। ইঁহাকে সংসারে বিমুখ করিয়া চিত্রিত করিতে বাল্মীকি চাহেন নাই। তাই মানবোচিত সুখ-দুঃখে তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়াছেন।

সংসারের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ কত বড় হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্যই রাম-চরিত্রের সৃষ্টি। দেবতার দেবত্ব দেখাইতে হইলে অলৌকিক গুণসম্পন্ন স্বর্গবাসী কোনও অদিতিনন্দনের কাহিনী বলিলেই চলিত। কিন্তু দেবত্ব প্রদর্শন ঋষি কবির অভিপ্রায় ছিল না—মানুষের মনুষ্যত্ব কতদূর স্ফূর্ত হইতে পারে তাহাই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। রাম-চরিত্রে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

ভরত

[সূচনা—আদর্শ চরিত্র—দুঃখ-বরণ—ভ্রাতৃভক্তি—স্বার্থত্যাগ—উপসংহার]

ভরত রামায়ণের একটি আদর্শ চরিত্র, এমন কি, রামায়ণের একমাত্র আদর্শ চরিত্র সর্বদোষ-রিক্ত ও সর্বগুণোপেত। ভরতের চিত্রটি অতি করুণ। কাব্য-বিধাতা ভরতকে দুর্ভাগ্যের জয়টীকা পরাইয়াই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে চতুর্দশ বৎসর রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে বনে ফিরিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাদের অনেককে শোক, সন্তাপ ও বিড়ম্বনা সহিতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আনন্দও ছিল। ভরতের এই চতুর্দশ বৎসরকাল যেরূপে কাটিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে, রামচন্দ্রের বনবাস জীবনও অনেকাংশে সুখকর বলিয়া মনে হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর ভরত অতিমাত্র বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া কৃচ্ছ্রকর্মা তপস্বীর মত জটাবল্কল ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। যে দোষ তাঁহার নিজের নয়, তাহার গ্লানিটুকু সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে মানুষের চিত্তে যে গভীর সন্তাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে, ভরতের প্রতি করুণায় পাঠকমাত্রেরই চিত্ত বিগলিত হয়।

কৈকেয়ীর প্রার্থনায় রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের শোকে বৃদ্ধ রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সব অঘটনের জন্য ভরত একটুও অপরাধী ছিলেন না। তাঁহাদের জন্য ভরতের হৃদয়ে আর কাহারও অপেক্ষা কম সন্তাপ জন্মে নাই। অথচ রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে, মাতা কৌশল্যা, নিষাদপতি গুহক, এমন কি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজের নিকটেও তিনি সন্দেহ-ভাজন হইয়াছিলেন। দশরথ তাঁহার চরিত্র জানিয়াও তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন, এবং নিজের ঔর্ধ্ব দৈহিক ক্রিয়ার অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এমন কি যে সব দূত তাঁহাকে আনিবার জন্য কেকয়-রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাও ভরতের কুশল-প্রশ্নের ব্যঙ্গ-মিশ্রিত উত্তর দিয়া বলিয়াছিল—

"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।"

যেন ভরত, দশরথ এবং সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের কুশল ইচ্ছা করেন না। ঘর ও পর সর্বত্র, নিরপরাধ ত্যাগবীর শুধু সন্দেহ ও নিন্দাবাদ লাভ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল, যাহাতে ভরতের উপর অনেকটা সন্দেহ আসিতেই পারে। ভরত এই সব অঘটনের সময় রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু মাতুলালয়ে থাকিয়াই যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃভক্তির স্রোতে এই সমস্ত সন্দেহ ও গ্লানি মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। মহাপুরুষগণের চরিত্রই এইরূপ চরিত্র মাহাত্ম্যের স্পর্শে সমস্ত সাংসারিক জটিলতা পরাজিত হয়। ভরতও নিজের চরিত্রগুণে সমস্ত সন্দেহ ও গ্লানির নাগপাশকে ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি যেমন সীমাহীন, তাঁহার উদার ক্ষমাও তেমনি একটা শ্লাঘার বস্তু। শত্রুঘ্ন উত্তেজিত হইয়া মন্থরাকে প্রহার ও কৈকেয়ীর প্রতি তর্জন করিতে থাকিলে, অপরিসীম ক্ষমার আধার ভরত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তারপর ভরত জটাবল্কল ধারণ করিয়া শোকাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে চলিলেন। অযোধ্যার রাজপরিবার ও প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে ভাগীরথী তীরে তৃণশয়নে যেখানে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া ভরত সেই দীন শয্যার তৃণপুঞ্জ দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্রের আশ্রমে যখন তিনি উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হীন মলিন বেশ দেখিয়া রামচন্দ্রের চোখে জল আসিল, রামচন্দ্র তাঁহাকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। কিন্তু ভরতের অতিমাত্র নির্বন্ধেও তিনি অযোধ্যায় ফিরিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া রাজতপস্বী ভরত রাজ্যে ফিরিলেন। কিন্তু অযোধ্যার রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার রুচি হইল না। নন্দীগ্রামে নূতন রাজ্যপাট বসিল। সেখানে ভরত তপস্বীর মত কৃচ্ছ্রসাধনপূর্বক রামচন্দ্রের পাদুকাতলে উপবেশন করিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্য-শাসন করিলেন।

এমন ভ্রাতৃভক্তির চিত্র জগতের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। রামায়ণের আর সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই কিছু না কিছু-ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু ভরতের চরিত্র সমস্ত নিষ্কলঙ্ক। শৃঙ্গবের পতি গুহক যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।

অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥"

প্রবন্ধ সঙ্কেত

যুধিষ্ঠির—সূচনা :—মহাভারতের উল্লেখ, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ধর্মশীলতা—যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞান প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে, ধর্মের জন্য স্বার্থত্যাগ, বকরূপী ধর্মের প্রশ্ন এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তর। বীরত্ব :—ভীমার্জুনের সহিত তুলনা, শারীরিক বলপ্রয়োগে উদাসীনতা তাই বলিয়া ভীরু নহেন, সত্য, ন্যায় এবং ধর্মকে বাহুবলের উপরে স্থান দিতেন। সহিষ্ণুতা :—বিপদে ধৈর্য, উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও বুদ্ধির স্থিরতা, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর অবমানার কালে অসীম ধৈর্যের পরিচয়। ক্ষমা :—ক্ষমা দেবধর্ম, দুর্যোধন শক্রতাচারণ করিলেও বারংবার ক্ষমা করেন, গন্ধর্বগণের হাতে দুর্যোধন সপরিবারে বন্দী হইলে যুধিষ্ঠিরই ভ্রাতৃগণের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। সত্যবাদিতা :—বাক্যে, ব্যবহারে এবং সর্বতোভাবে সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। একদিন মাত্র মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' কোন্ সময়ে এবং কি উপলক্ষে এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত :—জীবনে এই প্রথম এবং শেষ কলঙ্ক, ইহার ফলে নরকদর্শন।

অর্জুন—সূচনা :—মহাভারতের উল্লেখ, পঞ্চপাণ্ডবের তৃতীয়, বীরশ্রেষ্ঠ। বীরত্ব :—মহাভারতের অন্যান্য বীরের বিশেষতঃ কর্ণের সহিত তুলনা, যুধিষ্ঠির ও ভীমের সহিত তুলনা। ক্ষাত্রধর্ম :—ক্ষত্রিয়ের প্রতীক, আজীবন সংগ্রাম, কর্তব্য পালনের জন্য স্বার্থত্যাগ। ভ্রাতৃভক্তি :—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভক্তি, সেবকের ন্যায় জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর অবমাননার সময় যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে ধৈর্য্য রক্ষা। কোমলতা :—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে আত্মীয়বধে অনিচ্ছা, অনিচ্ছার মূলে ভয় ছিল না—ছিল স্বজন-বাৎসল্য। মানবত্ব :—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—তিনের অপূর্ব সমাবেশ, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই উপদেশের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করেন। উপসংহার :—আদর্শ চরিত্র।

সীতা—সূচনা :—রামায়ণের উল্লেখ, জনকের কন্যা, রামের পত্নী, সীতা নামের তাৎপর্য। সতীত্ব :—স্বামীর প্রতি অখণ্ড প্রেম, সুখ-দুঃখে সঙ্গিনী, রাজপুরীর সুখ-বিলাস উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহিত বনগমন, অসহ্য দুঃখ-ভোগ, অগ্নি-পরীক্ষা, নির্বাসন, পাতাল-প্রবেশ।—তেজস্বিতা :—রামচন্দ্র বনবাসকালে সীতাকে সঙ্গে লইতে অসম্মত হইলে সীতা বলিয়াছিলেন, "নিজের স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায় এরূপ নারী-প্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?" রাবণকে সীতা যে ভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও অপূর্ব তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।—সহিষ্ণুতা :—আজীবন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।—উপসংহার :—হিন্দুর গৃহে সতীত্বের অবিনশ্বর আদর্শ।

শ্রীকৃষ্ণ—সূচনা :—শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভগবানের অবতার? কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বা অবতার বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন শ্রীকৃষ্ণ মহামানব। ভারতের সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের স্থান। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব।—জন্ম :—পিতা-মাতার পরিচয়। মাতার বন্দী অবস্থায় জন্ম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগের অন্তর্নিহিত অর্থ। রাজশক্তির অত্যাচার, ধর্ম বিপন্ন এই অবস্থায় তাঁহার আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।—বাল্যলীলা :—যশোদার স্নেহ এবং ব্রজের রাখাল বালকগণের সাহচর্য, গোষ্ঠলীলা, বাল গোপাল পূজার মধ্যে হিন্দুর দেবতাকে সন্তানরূপে চিন্তা।—কৈশোর :—বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা। পূতনাবধ, কালিয় দমন প্রভৃতি। কর্মজীবন :—কংসবধ, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে যোগদান এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন।—গীতার বাণী :—অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। কাজ করিবার অধিকারই শুধু মানুষের আছে, কর্মফল সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অধিকার তাহার নাই।—উপসংহার :—মহামানব শ্রীকৃষ্ণ।

—চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

পল্লী-জীবন ও নাগরিক জীবন

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯)

[সূচনা—পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য—নাগরিক ও পল্লী-জীবনের সুবিধা-অসুবিধার তুলনা।]

পর্বতের সঙ্গে যেমন সমতলক্ষেত্রের তুলনা হয় না, সাদা রঙের সঙ্গে যেমন লাল রঙের তুলনা করা যায় না, পল্লী-জীবনের সঙ্গে নাগরিক জীবনের তুলনাও তেমনই হয় না। কারণ এই উভয় স্থানের জীবনযাত্রার ধারা দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী। সহরে সকল সুবিধা আছে, পল্লীতে তাহা নাই, ইহা অতি সরল সত্য কথা, ইহার সম্বন্ধে কোন বিতর্ক চলে না। কিন্তু তবু কেহ কেহ পল্লী-জীবন প্রাণ দিয়া ভালবাসে, এমন লোকও দেখা যায় যাঁহারা সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে পারিলে খুশী হন। আবার বিপরীত রুচির লোকও বিরল নহেন। পল্লীগ্রামের জীবন-যাত্রাকে অত্যন্ত ক্লান্তিকর-জনক মনে করিয়া আজ অনেকেই পল্লী ছাড়িয়া নগরে গিয়া বাস করিতেছেন। কাজেই পল্লী-জীবন ও নাগরিক জীবনের মধ্যে যে একটা তুলনামূলক বিতর্কের কথা উঠিয়া থাকে উহার ভিত্তি হইল সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যাঁহারা পল্লীকে ভালবাসেন এবং অশেষ অসুবিধায় ভরা পল্লীর পক্ষ লইয়া নগরবাসীদের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের মনের কথাটা কি? তাঁহারা কি দেখিয়া পল্লীকে এতখানি ভালবাসিয়াছেন? তাঁহারা দেখিয়াছেন ইহার উদার আকাশ—যাহা মানুষের হানাহানিতে মুখরিত হইয়া উঠে না, সেই আম-নারিকেল নিস্তব্ধ কুঞ্জ—যাহা বহু দিনের সুখ-দুঃখময় জীবনযাত্রার মধুর স্মৃতি নীরবে বহন করিতেছে, সেই কল-কল নাদিনী নদী—যাহা কর্মভার-প্রপীড়িত মানুষকে বিনা-প্রয়োজনের বাড়ে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়, সেই সরল অনাড়ম্বর পরিতৃপ্ত জীবনযাত্রার মোহ এই সব পল্লী-প্রমিকদের প্রাণে এমনই একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা নাগরিক জীবনের সহস্র সুখ-সুবিধার প্রলোভনেও বিনষ্ট হইতে পায় না। এই প্রেমের গভীরতা তাঁহাদের হৃদয়ে যে

শক্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহা দ্বারা তাঁহারা অকাতরে পল্লী-জীবনের সকল রকম দুর্ভোগ সানন্দে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু শুধুই যে অযৌক্তিক ভাবপ্রবণতার জন্যই মানুষ পল্লীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাও নয়। সহরের জীবনে দুঃখও অনেক আছে, যাহা মাঝে মাঝে পল্লীর কথা মনে করাইয়া দেয়। নাগরিক জীবন যেন সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অনবরত খাটাইয়া লইবার জন্য একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। মানুষগুলি কলের মত অবিরাম ছুটিতেছে। প্রয়োজনের চাহিদা এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, আয়োজনের আর সীমা থাকিতেছে না। এই অবসর-হীন কর্মস্রোতে মানুষগুলি যেন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহাদের চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা শরীরই এখানে বেশী খাটিতেছে। কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের আয়োজনও যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু মানুষের মন এমন একটা জিনিস যে, সে মাপাজোপা 'রুটিন-বাঁধা' আমোদ-প্রমোদে প্রকৃত তৃপ্তি পায় না। তাই এখানকার বিশ্রামটাকেও সে কর্মেরই রূপান্তর বলিয়া মনে করে। চারিদিকের ইট কাঠের দেওয়ালে যেমন দৃষ্টি ব্যাহত হয় এবং পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে, তেমনি কর্মক্লান্ত মনও যেন এখানে মানুষের সমস্তটাকেই নানা উপকরণের আয়োজনে এমন ব্যাপৃত রাখিয়াছে যে, মানুষ আত্মস্থ হইবার একটু অবসর পাইতেছে না। এই যে অনবসর প্রয়োজনের তাগাদা, এই যে প্রকৃতিকে জীবনযাত্রা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেওয়া, ইহা মনুষ্যের চরিত্র গঠনের অন্তরায়। মানুষ এখানে পরিপূর্ণ রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এখানে পল্লীর সীমাহীন উদার আকাশ নাই, অসীমের আভাস লইয়া নদী বহিয়া যায় না, দিগন্তবিলীন প্রান্তর নাই, এমন কোন একটা বৃহৎ উদার প্রশস্ত জিনিস নাই—যাহার দিকে দৃষ্টি পতিত হইলে চিত্তটা বিস্ফারিত, প্রসারিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এমন প্রকৃতি-বহির্ভূত জীবনযাত্রা কি কখনও সত্যকার মানুষ গঠন করিতে পারে?

কিন্তু তাই বলিয়া সহরের গুণগুলি একেবারে ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? এই সহর মনুষ্য-সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। অনাদিকাল হইতে মানুষ নিরন্তর সাধনা করিয়া যাহা কিছু লাভ করিয়াছে, তাহা সে এই নগরেই পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছে। পল্লীর জন্ম হইয়াছে প্রকৃতি মাতার হাতে, আর নগর নির্মিত হইয়াছে মানুষের হাতে। ভগবান্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া যে অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই আদিম অরণ্য-জীবনের সহিত আধুনিক নগরের তুলনা

করিলেই মানব-সভ্যতার সুমহতী কীর্তি কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এক কথায় মানুষ এই নগরে প্রকৃতিকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। প্রকৃতিদেবী এখানে মানুষের বুদ্ধিকৌশলে বন্দিনী হইয়া, তাহার ঘরে আলো জ্বালিতেছেন, পাখা ঘুরাইতেছেন, তাহার কলকারখানায়, দোকানে, ছাপাখানায় খাটিতেছেন। জীবনযাত্রাকে সহজ, সুবিধাপূর্ণ ও আরামজনক করিবার যতগুলি পন্থা মানুষ কল্পনা করিতে পারিয়াছে, সমস্তই নাগরিক জীবনে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সংহারিণী শক্তিকেও মানুষ এখানে কতকটা ব্যাহত করিয়া দিয়াছে। রোগ হইলেই মানুষ মরিতে পারিবে না, নানা রকমের ঔষধপত্র ও অস্ত্রপাতী লইয়া সহরের মোড়ে মোড়ে ডাক্তার কবিরাজগণ সজাগ হইয়া আছেন। ঝড়-ঝঞ্ঝা শিল বৃষ্টিকে তুচ্ছ করিয়া রম্য হর্ম্যাবলী সগর্বে মাথা উঁচু করিয়া আছে। অগ্নিদেবও এখানে তেমন প্রতাপ বিস্তার করিতে পারিতেছেন না। কোথাও আগুন লাগিলেই অমনি বিজয়ী বীরের মত সদলবলে দমকল বা 'ফায়ার ব্রিগেড্' ছুটিয়া আসিতেছে। মানুষের ছেলেগুলিকে রাতারাতি পণ্ডিত করিয়া তুলিবারই বা কত আয়োজন। রাস্তার বাঁকে বাঁকে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, সভা-সমিতি। তাহা ছাড়া কত রকমের সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র নিরবধি বিদ্যা বিস্তারের চেষ্টায় লাগিয়া আছে। বিদ্যা বিস্তারের আয়োজন যেমন ব্যাপকভাবে হইতেছে, মানুষের খাদ্যাদির অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর আয়োজনও তদ্রূপ। পয়সা হইলেই আর কথা নাই, ঘরে বসিয়া সমস্তই পাওয়া যাইবে। রোগ-শোক অনশনক্লিষ্ট আধুনিক পল্লীগ্রামে এইসব সুবিধা পাওয়া যাইবে না। তাই আজ গ্রামের লোক দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে ভিড় জমাইয়াছে।

নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১)

[সূচনা—নগরে বাস করিবার সুবিধা ও অসুবিধা—পল্লীবাসের সুবিধা ও অসুবিধা—নাগরিক জীবন ও পল্লীজীবনের তুলনা—উপসংহার ।]

অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত আধুনিক সভ্যতার যে জয়যাত্রা চলিয়াছে,—তাহার শ্রেষ্ঠ দান হইল আধুনিক নগর। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-কলায় মানুষ এ পর্যন্ত যাহা কিছু অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহার দ্বারা সে এই নগরকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ দুঃখ চায় না, সুখ চায়। দুঃখ-ক্লেশ এড়াইবার জন্য যত রকমের সুবিধা সুযোগ সৃষ্টি করিবার উপায় এ পর্যন্ত তাহার মস্তিষ্কে আসিয়াছে, তাহার উদ্ভাবন ও সংসাধন করিয়া সে নগরকে নানা ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছে। কাজেই নগর-বাসের সুবিধার সীমা নাই।

কলিকাতা বা লণ্ডনের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড নগরে মানুষ কত সুখে বাস করিতেছে। এখানে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বলিয়া কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পয়সা থাকিলে সবই মিলিবে। আহার-বিহার, বেশ-বাস, আমোদ-প্রমোদ, গমনাগমন, যানবাহন কোনদিকেই বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকিবার উপায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ যেন একেবারে হাতের মুঠায় আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার দ্বারা মানুষের যে সব অনিষ্ট হইতে পারিত, সে সবকে সহরবাসীরা আজ আর আমল দিতেছেন না। ঝড় হইলে কি হইবে? জীর্ণ পর্ণকুটীর হইলে হয়তো ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু নগরের মর্মর অট্টালিকাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা সহজ কর্ম নয়। বৃষ্টিপাত হইলে মুহূর্তমধ্যে প্রস্তর-নির্মিত পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে রাস্তা-ঘাট জলশূন্য হইবে। এইরূপে শুধু যে খেয়ালী প্রকৃতির অন্যায় অত্যাচারের প্রতিরোধ করা হইয়াছে তাহা নয়। প্রকৃতিকে দিয়া নগরবাসী আজ দাসীর মত কাজ করাইয়া লইতেছে। প্রকৃতির বিদ্যুৎ আজ মানুষের ঘর আলোকিত করিতেছে, গ্রীষ্মাধিক্য অপনোদন করিবার জন্য পাখা ঘুরাইতেছে, কল-কারখানায় নিজে খাটিয়া মানুষের শ্রম লাঘব করিতেছে।

নগর-বাসের সহিত পল্লীবাসের তুলনায় প্রশ্ন সহজেই আসিয়া পড়ে।

পল্লীগ্রামে কাহারও হঠাৎ অসুখ হইয়া পড়িলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। এমন একজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক নাই, যাহার উপর রোগীর চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। হয়তো পাঁচ মাইল দূরে বাস করেন এক হাতুড়ে ডাক্তার অথবা এক বর্ণ-জ্ঞান-হীন নিরেট কবিরাজ। তাঁহাকে খবর দিয়া আনিতে আনিতেই হয়তো রোগী প্রাণত্যাগ করিল। আর চিকিৎসক যদি বা মিলিল, উপযুক্ত ঔষধ মিলিল না। নগরবাসীদের এ সব অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সহরে বড় বড় ডাক্তার রহিয়াছে; রোগের খবর পাওয়ামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মোটরে চড়িয়া আসিয়া হাজির হইবেন। তাঁহার ব্যবস্থামত ঔষধ তখনই কোন ঔষধালয় হইতে টাট্‌কা প্রস্তুত করাইয়া আনা চলিবে। টাকা ব্যয় করিলে সুশিক্ষিত শুশ্রূষাকারীরও অভাব হইবে না। এজন্য সহরে থাকিলে অতি বড় কঠিন পীড়া হইলেই মনে একটা বল থাকে। এটুকু সাহস ও ভরসা থাকে যে, বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে প্রাণ হারাইতে হইবে না।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবিধানেরই বা সুবিধা কত। সহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, সভা-সমিতি। স্কুলগুলি বেশ সুপরিচালিত, সুশিক্ষিত শিক্ষকগণ উন্নত প্রণালীতে বালকগণকে শিক্ষা দিতেছেন। অনেক সময় গরীব ছাত্রেরা বিনামূল্যেও পড়িতে পাইতেছে। আবার শুধু স্কুল-কলেজে পড়িলেই যে মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তাহা নয়। জনসাধারণের সংসর্গেও মানুষ অনেক তথ্য শিক্ষা করে। মোট কথা বাঁচিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী সহরে তীব্র সংগ্রাম করিতেছে। এই নীরন্ধ্র কর্মস্রোতের একটা প্রভাব প্রত্যেক বালকের চিত্তের নিত্য নিয়ত কাজ করিতেছে। বালক শিখিতেছে, কি করিয়া বাঁচিতে হইবে, বাঁচিবার জন্য কতখানি সংগ্রাম করিতে হইবে। সহরে কত ঠক, জুয়াচোর রহিয়াছে। তাহারা সরল প্রকৃতির লোকদিগকে প্রতিদিন কেমন করিয়া প্রতারণা করিতেছে, তাহা বালকদেরও অবিদিত থাকিতেছে না। এইজন্য তাহারা নিজের জীবনে ঠকিয়া শিখিবার পূর্বেই দেখিয়া শিখিতেছে। প্রায় প্রত্যহ একটা-না-একটা সভা-সমিতি আছেই। সভায় বড় বড় বিদ্বান

জন-নেতা ও বিখ্যাত বাগ্মীরা বক্তৃতা করিতেছেন। এই রকম কত ভাবেই যে সহরের ছেলে নিত্য নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দৈনিক খবরের কাগজই কি কম শিক্ষা দেয়? অথচ সুদূর পল্লীগ্রামে দৈনিক সংবাদপত্র খুব কমই যাইয়া থাকে।

সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রচুর সুবিধা। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়াই সর্বপ্রথমে সহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু লোকের সমাগমে জিনিস-পত্রের কাটতি হোওয়ায় ব্যবসায়ীরা নানাদিক্-দেশ হইতে নূতন নূতন পণ্যদ্রব্য সহরেই আমদানি করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের চেয়ে, সহরগুলির সহিতই রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে বিদেশীয়দের বেশী করিয়া যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে, এই জন্য সহরগুলিই দেশীয় পণ্যের বিদেশে রপ্তানী ও বিদেশীয় পণ্যের দেশে আমদানির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। পণ্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাট্কা অবস্থায় ও খাঁটি দরে কিনিতে এবং বিক্রয় করিতে পারা যায়। এই সব কারণে ব্যবসায়ীদের পক্ষে নগর একেবারে অপরিহার্য বলিলেও চলে।

শুধু ব্যবসায়ী কেন, আজিকার এই সভ্যতার যুগে কাহার পক্ষেই আর নগরকে পরিহার করিয়া চলিবার উপায় নাই। সুবিধা হউক আর অসুবিধাই হউক, আধুনিক বা up-to-date হইতে হইলেই নগরের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু সংসারের নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই, ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য। কাজেই মানুষের এত যত্নের গড়া সহরেও দুঃখ আছে। সহর গঠন করিতে গিয়া মানুষ প্রকৃতির উপরে, এমন কি বিধাতার উপরেও এক হাত চালাইয়াছে। এই প্রকার 'খোদার উপর খোদকারি' করিতে গিয়া তাহাকে অনেকটা মুস্কিলেও পড়িতে হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ 'শেষ রক্ষা' করিতে পারে নাই। এত যে ডাক্তারখানা হইয়াছে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য এত যত্ন লওয়া হইতেছে, তবু রোগ-পীড়ার সংখ্যা কিছুমাত্র কমিতেছে না। যদি সহরের কোন পল্লীতে একবার কলেরা বা বসন্ত লাগিল, তাহা হইলেই আর রক্ষা নাই। ডাক্তার-কবিরাজের শত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শত শত লোক অকালে মরণের মুখে আত্ম-সমর্পণ করিবে। মড়কের এই প্রকার তীব্র প্রকোপ পল্লীগ্রামে তত্টা দেখা যায় না। জন-সংখ্যার আধিক্যের জন্য স্বভাবতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী নগরে এইরূপ করাল মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে পারিবারিক জীবনটি বড় মধুর। পরিবারের মধ্যেই যে এই নিবিড় শান্তিটুকুর আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা নয়,—ইহা সমস্ত পল্লীটির মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে ব্যপ্ত হইয়া থাকে। পল্লীবাসীরা পরস্পরের মধ্যে একটা সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। রোগে-শোকে, বিপদে-আপদে একে অপরের জন্য বিপদ বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু নগরে এই ভাবটি বড় বিরল। সহরবাসীরা সাধারণতঃ স্বার্থপর ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া থাকেন। এমন কি প্রতিবেশীদের মধ্যেও অনেক সময় কিছুমাত্র পরিচয় থাকে না।

নগরে জীবন-যুদ্ধ বড় তীব্র ও প্রখর মূর্তিতেই দেখা দেয়। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত থাকে এবং অপরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অবকাশ খুব কমই পায়। এজন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে কত দুরূহ, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সাংসারিকতা নগরে বড় বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লী-অঞ্চলে ধর্মভাব অনেক বেশী পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। অবশ্য এই ধর্মভাবের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত গোঁড়ামীটিও পল্লী-অঞ্চলেই অধিক।

নাগরিক জীবনে শিক্ষা-বিধানের সুবিধা প্রচুর আছে, ইহা সত্য। কিন্তু আবার অসুবিধাও আছে। আজিকার যুগে বিপ্লব-মূলক চিন্তাস্রোত পৃথিবীর সর্বত্র একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লী অপেক্ষা সহরেই ইহার প্রভাব বেশী করিয়া অনুভূত হইয়াছে। বালকগণের অপরিণত মনে এই প্রকার প্রভাবের ফল ভাল নয়। ইহা তাহাদের সংযম ও চিত্তস্থৈর্যকে আঘাত করে—ফলে অনেক যুবকেরই ভবিষ্যৎ চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের গ্রাম

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৩, ১৯৩৬)

[গ্রামের অবস্থান—সীমা-নির্দেশ—বাসগৃহ ও গ্রামের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থান—হাট-বাজার, পোষ্ট অফিস, রাস্তাঘাট ইত্যাদি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—গ্রামের অধিবাসিদের প্রকৃতি—উন্নতির উপায়—উপসংহার ।]

আমাদের ছোট মহকুমা-সহরটি হইতে নদী পার হইয়া সোজা উত্তরদিকে 'আম-কাঁটালের' রাস্তাটি ধরিয়া তিন মাইল চলিয়া গেলেই আমাদের গ্রামখানি দেখা যাইবে। এই গ্রাম আমার জন্মভূমি, স্বর্গের অপেক্ষা ইহাকে আমি অধিক ভালবাসি। ইহার প্রত্যেক তরু লতা আমার হৃদয়ের বস্তু।

ছোট নদী। তাহার তীরে মাত্র এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া মানুষের বসতি। বসতির পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ,—মরসুমের সময় তাহা ফসলে ভরা থাকে, বাকী সারাটি বৎসর খালি পড়িয়া থাকে—গরু চরিয়া বেড়ায় গ্রামের ছেলেরা সকালে বিকালে খেলা করে। নদীর উপরে জিলা-বোর্ডের প্রস্তুত একটি সেতু, সেতুটি পার হইলেই গ্রামের পশ্চিম সীমায় পৌছান যায়। একটি সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ স্মরণাতীতকাল হইতে এইখানে দাঁড়াইয়া গ্রামের সীমানির্দেশ করিতেছে। ইহার মূলে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শীতলা দেবীর প্রস্তরময় পূজাবেদী। প্রতি বৎসর গ্রামবাসীরা মিলিয়া মহাসমারোহে এইখানে বারোয়ারী পূজা করিয়া থাকেন। তখন এইখানে দুই দিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। মেলায় কবির গান হয়, কোন কোন বৎসর যাত্রাগানও হয়।

সেখান হইতে বরাবর পূর্বদিকে নদীতীর ধরিয়া রাস্তাটি চলিয়াছে। প্রথমে বামুনপাড়া, তারপর কায়েতপাড়া, বৈদ্যপাড়া এবং আরও অন্যান্য বাসিন্দাদের বাড়ীঘর। কিছুদূরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'আদর্শ চতুষ্পাঠি', একখানি মাটির চালা ঘর, ছাউনির অভাবে একদিকের মাটির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিছু দূরে ঘোষবাবুদের বড় পুকুর, ঘাট বাঁধানো,—প্রায় সারাদিন স্নানার্থী ও জলার্থিগণের কলরবে মুখরিত। পুকুরপাড়ে প্রাচীন শিব-মন্দির। সেখানে দ্বিপ্রহরে পূজার ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় আরতির শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। এই দুইটি সময়েই সেখানে প্রসাদার্থী পল্লী বালকের ভিড় দেখা যায়। আর একটু

অগ্রসর হইলেই গ্রামের 'জগত্তারিণী বালিকা বিদ্যালয়'। ইহা একটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল, শ্যাম মুখুজ্জে মহাশয় উহার শিক্ষক। স্কুলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সামনে ছোট ফুলের বাগান, বাঁকারির বেড়া দিয়ে ঘেরা।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইলে 'পূর্ণচন্দ্র ইনস্টিট্যুশন' দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহা গ্রামের জমিদার চৌধুরী বাবুদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির অবস্থা ভাল নয়। ছাত্রদত্ত বেতনে শিক্ষকদের মাসিক প্রাপ্য মিটানো যায় না,—অথচ সরকারী সাহায্যও নাই। ইটের দেওয়ালের উপর 'করোগেটেড টিনের' ছাদ, দরজা জানালার কপাট একটাও নাই. স্কুলের সব কয়টি শ্রেণীতে 'ব্ল্যাকবোর্ড' নাই। মাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণীতে আছে। লাইব্রেরীর বালাই নাই। স্কুলের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর। সেখানে বাঁশ দিয়া ছেলেরা একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়াছে। স্কুলের একটি বারান্দায় গ্রামের পোষ্ট অফিস নাম 'করিমগঞ্জ-গোপালপুর'—পার্শ্ববর্তী করিমগঞ্জ গ্রাম যাহাতে পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা না করে, সেজন্য পোষ্ট-অফিসের এই প্রকার নাম-করণ হইয়াছে। পোষ্ট অফিস ছাড়িয়া গেলেই বাজার। শনিবার ও মঙ্গলবারে এইখানে হাট বসে। পার্শ্ববর্তী দশ-বারখানি গ্রামের লোক এই হাটে সওদা করিতে আসে মাছ তরকারী ও ফলমূলের বেশ আমদানি হয়। বাজারে একখানি মাত্র কাপড়ের ও একখানি মণিহারীর দোকান। বাজারের একটি প্রান্তে নবীন বাগদির বাস। নবীন গরীব মানুষ, তবে লোক ভাল। সে হাটখোলা ঝাঁট দেয়। হাটের দিন প্রত্যেক দোকান হইতে সে ইহার জন্য একটি করিয়া পয়সা আদায় করিয়া লয়।

হাটখোলা ছাড়াইয়াও রাস্তাটি অনেক দূরে গিয়াছে। কিন্তু ওদিকের রাস্তাটি স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। বর্ষাকালে সেখানে রীতিমত জলের স্রোত চলে। পারাপারের জন্য কয়েক জায়গায় বাঁশের অস্থায়ী সেতু নির্মিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই হাঁটিয়া পার হইতে হয়। রাস্তা যে সব দিকে ভাঙিয়া গিয়াছে, সে অঞ্চলের বাসিন্দারা অধিকাংশই চাষী গরীব লোক। তা'ছাড়া এই যাতায়াতের দৈনন্দিন কষ্ট সহিয়া যায়, কাহারও কাছে অভিযোগ করে না, করিতে জানেও না।

গ্রামের মাঠের সমস্ত ফসল এই চাষীরাই উৎপাদন করে। কাহারও কাহারও নিজের জমি আছে, অধিকাংশ চাষা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভদ্রলোকদের জমি ভাগে

চাষ করে। মাঠে ধান হয়, কলাই হয়, আবার ফুটি, তরমুজ, কাঁকুর ও শাঁখ-আলুও বেশ জন্মায়। মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে ছোট ছোট পুকুর কাটিয়া রাখা হয়। বর্ষার জলে যখন-মাঠ-ঘাট ডুবিয়া যায়, তখন এই পুকুরগুলিতে প্রচুর মাছ আসিয়া আশ্রয় লয়। বর্ষাকাল চলিয়া গেলে পুকুরের মালিকগণ সব মাছ সহজেই ধরিয়া লইতে পারেন।

গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই মাটির তৈয়ারী, আর চালাগুলি খড়ে ছাওয়া তবে গৃহলক্ষ্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্বত্রই একটা পরিচ্ছন্ন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য যুবকেরা অধিকাংশই অলস ও মূর্খ। যাহারা গ্রামের বিদ্যালয়ে দুই একটি শ্রেণী অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের সেই অল্পবিদ্যা সত্যই অত্যন্ত ভয়ঙ্করীরূপ ধারণ করে। শিক্ষার অভিমানে তাহারা মাটিতে পা ফেলে না, সামান্য পরিশ্রমের কাজ করিতে ঘৃণাবোধ করে। সাধারণের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা তাহাদের কথাবার্তায় ও আচার আচরণে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামের চারিদিকে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল। চারিদিকেই যেন একটা তামসিক আলস্য পল্লীলক্ষ্মীর কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে, তাই চারিদিকে নিস্তব্ধ। চেষ্টা নাই, উচ্চাশা নাই, রুচি নাই, শিক্ষা নাই, মনুষ্যত্ব নাই। এই সব দেখিয়া ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিবার লোকও নাই। যাহারা কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতে শিখিয়াছে, গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা সময় থাকিতে সরে পলাইয়া বাঁচিয়াছে। রোগ, শোক, অবিচার, অত্যাচারে দুর্বল অসহায় ব্যক্তি নিত্য নিয়ত নিপীড়িত হইতেছে।

কিন্তু এত যে দুঃখ, তবু যেন পল্লীমায়ের মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। এখনও বৃক্ষে বৃক্ষে তেমনি ফুল ফুটে, ছায়া-শীতল পল্লীপথখানি সুরভিত করিয়া বনগন্ধ-মধুর সমীরণ বহিয়া যায়, নদীর কলগীতি যুগযুগান্তরের ঘর-সংসারের সুখস্মৃতি বহিয়া আনে। চোখের জলে-ভেজা পল্লীলক্ষ্মীর এই হাসিমুখ বড় করুণ। আমার মনে হয়, মায়ের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া প্রত্যেক পল্লী-সন্তানের কর্তব্য। যে সুশিক্ষার অভাবে আজ পল্লীবাসীর রুচি কলুষিত হইয়াছে, সেই শিক্ষাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সেই সব শুভ-মুহূর্ত কবে আসিবে? সেদিন অন্ধকারে আলো জ্বলিয়া উঠিবে! কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না—শিখাইয়া দিতে হইবে না, পল্লীসন্তানেরা আত্মকর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরাই

উদ্বুদ্ধ হইবে। নগর-প্রবাসীরা ঘরে ফিরিবে, জঙ্গল পরিষ্কার হইবে, ম্যালেরিয়া দূর হইবে, স্কুলের সকল শ্রেণীতেই 'ব্ল্যাকবোর্ড' শোভা পাইবে, রাস্তার ভাঙ্গনে আবার জোড়া লাগিবে।

পল্লী-সংস্কার

[ভূমিকা - পল্লীর পূর্বতন অবস্থা—বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ও তাহার মূল কারণ—উহার প্রতিকারের উপায়—প্রতিকারের প্রণালী।]

বাঙ্গালা পল্লীময় দেশ। পল্লীর উন্নতিতেই বাঙ্গালার সত্যকার উন্নতি এবং পল্লীর অবনতিতেই ইহার অবনতি। আজ বাঙ্গালার পল্লী অবনতির শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একদিন বাঙ্গালার পল্লী ছিল শান্তির নীড়, মানুষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুখের বাসস্থান, আর আজ উহা বাসের পক্ষে একেবারে অযোগ্য।

আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বাঙ্গলার সেই পল্লীগ্রাম আজ কোথায়। যেখানে গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া গ্রামের জমিদার গ্রামেই বাস করিতেন। পানীয় জলের জন্য প্রশস্ত সরোবর, যাতায়াতের জন্য রাস্তা, লোকশিক্ষার জন্য পাঠশালা-চতুষ্পাঠি, আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, যাত্রাগান তাঁহারই অর্থে নির্বাহিত হইত। ঝোপ আর জঙ্গলের প্রাচুর্য পল্লীলক্ষ্মীর কণ্ঠরোধ করিতে পারিত না, মাঠে মাঠে ধান হইত, গোয়ালভরা সুন্দর সুপুষ্ট গোরু থাকিত, নদীতে, পুকুরে মাছের অফুরন্ত আয়োজন ছিল, গ্রামবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া-পরিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া, নাচিয়া-কুঁদিয়া ফিরিত। প্রত্যেকটি গ্রাম আমোদ-উৎসবে একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল। দোল-দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই ছিল। গ্রামবাসীরা গ্রাম্য জীবনে ক্ষুব্ধ ছিল না। গ্রাম্য জীবনে কোথায় কোন ত্রুটি হইলে, নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া ত্রুটি দূর করিয়া লইত।

কি কুক্ষণেই নাগরিক সভ্যতা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। তাহারসঙ্গে

আসিল চাকরির মোহ। ইংরাজ-শাসনের সহিত এই দুইটি জিনিসের আমদানি হইল আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের রূপ বদলাইয়া গেল। ইংরাজী শিখিলে চাকরি মিলিবে। চাকরি মিলিলে উচ্চস্তরের নাগরিক জীবন যাপন করা যাইবে। নাগরিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ ছিল—শ্রম না করিয়াই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরামবহুল জীবন যাপন করার সুযোগ। এই আলস্যের মোহ দুষ্টগ্রহের মত বাঙ্গালার পল্লী জীবনে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে তাসের ঘরের মত বাঙ্গালার শত সহস্র বৎসরের শান্তি-নিকেতন এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

আমাদের মনে হয়, আরও একটা জিনিস পল্লী-জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছে। ইহা ইংরাজী শিক্ষা। চাকরির মোহই এই শিক্ষা বিস্তারের সর্বপ্রধান সহায়। ইংরাজী শিক্ষা আসলে এমন কিছু খারাপ জিনিস নয় বটে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে ইহা পল্লী-জীবনের শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা একটি বিলাসবহুল, উপকরণ-বহুল, ধোপ-দুরস্ত জীবন যাত্রার ছায়া দেখিয়াছি। দেখিয়াই ঐ প্রকার জীবন যাপন করিবার জন্য আমাদের একটা দুর্দমনীয় লোভ হইয়াছে। ইহা ইংরাজদের দোষ নয়, ইংরাজ কিছুমাত্র বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন, ইহা বলিলে অতিমাত্র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এই ইংরাজী জীবন-যাত্রার স্বপ্ন আমাদের কাল হইয়াছে। আমরা যদি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্যে একদিনেই ভরত ইংরাজ হইয়া যাইতে পারিতাম, ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালার মাটিতে সহস্র বৎসরেও ইংরাজী জীবন-যাত্রা নির্বিঘ্নে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে এমন ভরসা নাই। দুইটি জাতির ধনাগমের পন্থাই স্বতন্ত্র। আমরা কৃষিজীবী, মাটিই আমাদের প্রাণ। আর উহাদের অস্ত্র হইল লোহা-লক্কড় কল কব্জা। এই লোহা-লক্কড় ও কল-কব্জার উপরেই যদি বাঙ্গালীর আন্তরিক আকর্ষণ হইয়া থাকে, তবে আর পল্লীর কোন আশা নাই। পল্লীগুলিই হয়ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একদিন সহর হইয়া বসিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুইটি কারণে আজ পল্লীগ্রাম দুঃখী হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি কারণ অন্তর্হিত হইলেই আবার পল্লীর দুঃখ ঘুচিবে। প্রথম পল্লীবাসীদের মধ্যে সহরমুখী হইবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। পল্লীগ্রামের অনেকগুলি অভাব-অভিযোগ এড়াইবার জন্য তাঁহারা সহরে

ছুটিতেছেন। সহরে না গেলে তাঁহারাই হয়ত পল্লীগ্রামের এই সব অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা নগরমুখী হওয়ায় পল্লীগ্রামের সেই সব অসুবিধা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় কারণটি উপকরণ-প্রিয়তা। পল্লীগ্রামে থাকিয়া পল্লীবাসীরা যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করেন, তবে পল্লীর অসুবিধা অনেকেই দূর করিতে পারেন বটে, কিন্তু সহরের মত সবদিক দিয়া সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই পল্লীগ্রামে সম্ভব হইবে না। কাজেই পল্লীগ্রামের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে, বিলাস বাহুল্য কমাইতেই হইবে। বিলাসের প্রবৃত্তি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে না কমিলে সহরের আকর্ষণ দূর হইবে না। তবে এই দিক দিয়া আজকাল বাঙ্গালীর কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ সহরের এই আসবাব-বহুল জীবন-যাত্রার অনুকরণ করতে গিয়া তাঁহাদের অনেকেই আজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং অতি ক্ষীণভাবে পল্লীর স্মৃতি আজ তাঁহাদের কাহারও মনে জাগিয়াছে।

নগর-প্রবাসীরা যখন হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রীতি লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসেন, শুধু তখনই প্রকৃত পল্লী-সংস্কারের কার্য গুরুত্বের সহিত আরম্ভ করা সম্ভব হইবে, তাহার পূর্বে নয়। পল্লীকে সবদিক দিয়া বাসোপযোগী করা হইলে তবে সকলেই ঘরে ফিরিবেন, এরূপ আশা করা ভুল। নিজেরা ঘরে ফিরিয়া নিজেদের ঘর গুছাইয়া লইতে হইবে। সত্য সত্যই আজ পল্লীবাসীরা অশান্ত দুঃখে কাল যাপন করে। তাহাদের মন বড় সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাহাদের মনের এই ঘন অন্ধকার শিক্ষার আলোকে দূরীভূত করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলিতে হইবে। বালিকাদের শিক্ষার জন্যও পৃথক স্কুল চাই। পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য গ্রামে বড় পুষ্করিণী ও অনেকগুলি করিয়া নলকূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জঙ্গল ও পানা-পুকুরগুলি পরিষ্কার করিয়া মশকের বাসস্থান নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের ভালরকম জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া দরকার। বাড়ীগুলি স্বাস্থ্যোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক। ছেলেরা যাহাতে রীতিমত ব্যায়াম করিয়া শরীরের উন্নতিবিধান করিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত হওয়া চাই। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও না হইলে চলিবে না। যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা, সঙ্কীর্তন প্রভৃতির পুনঃপ্রবর্তন আবশ্যক, যেন গ্রামবাসীরা আমোদের সন্ধানে আবার সহরের দিকে

না ছুটে। গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সরকার বাহাদুরের যথাযথ সহায়তা থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

গ্রামের চাষীরা যাহাতে চাষ-আবাদের যাবতীয় সুবিধা লাভ করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত না হইলে নয়। আজ চাষীদেব অধিকাংশই ঋণভার-গ্রস্ত। পল্লীগ্রামেব মহাজনেরা চাষীদেব মোটা সুদে টাকা ধাব দেয়। আর এই সব ঋণের দায়ে পরিণামে চাষীদেব ভিটা-মাটি উচ্ছন্ন যায়। চাষীদের প্রয়োজন মত অল্প সুদে বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা কবা উচিত। বীজধান্য ধাব দিয়া দুঃস্থ কৃষকগণের চাষ আবাদের সুযোগ সুবিধা কবিয়া দিবার বন্দোবস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। গো-জাতির অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। গো-পালন সম্বন্ধে এখন হইতেই যথেষ্ট মনোযোগ না দিলে অচিরে বাঙ্গালাদেশ গো-শূন্য হইবে। সুতরাং পল্লীবাসীরা অবিলম্বে গোধনের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

শিক্ষা ও সাহিত্য

ইতিহাস পঠনের আবশ্যকতা

ইতিহাস অতীতের কাহিনী; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্মদাতা। বর্তমানকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি না। তাহার বিশাল ব্যাপ্তি ও বিচিত্র অভিব্যক্তির কতটুকুই বা আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে? ভবিষ্যতের স্বরূপ আমাদের কাছে আরও রহস্যময়। তাহার ছায়াটিমাত্র স্বপ্নের মত আমাদের কাছে ক্ষণিকের জন্য ধরা দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যায়। সংসারের বিচিত্র অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে আমাদের সেই স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে সেই সব কল্পনা কালক্রমে খুব কমই কার্যে পরিণত হইয়া থাকে।

কিন্তু অতীতের কাহিনী, ইতিহাসের মধ্যেই ভবিষ্যতের ছবি লুকাইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা আবার ঘটিতে বাধ্য। History repeats itself. মানুষের রুচির প্রবৃত্তির একটা বাহ্যিক পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহার অন্তঃপ্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। সুদূর অতীতকালে মানুষ যেরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ অনুভব করিয়াছে, আজিও তদনুরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে মানুষ সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকে। কাজেই অতীতের ঘটনা-পরম্পরা অনুশীলন করিলে বর্তমান ভবিষ্যতে অনুরূপক্ষেত্রে মানুষের মনোভাব ও তজ্জনিত কর্মপ্রবৃত্তি কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই নিরূপণ করা যায়। তাই ইতিহাস পঠনে মানবের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের কার্যকলাপ কিরূপ হইবে তাহা জানা যাইতে পারে।

ইতিহাসের যে শুধু একটা রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্দৃষ্টিই দান করে তাহা নয়। সত্যকার ইতিহাসে শুধু রাজা-রাজড়ার কাহিনী, শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথাই থাকে না। তাহাতে অতীতকালের সমাজ-জীবন ও ধর্মজীবনের বিবরণও লিপিবদ্ধ থাকে। একটা জাতির স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণ কেমন করিয়া সুখে-দুঃখে তাঁহাদের জীবন কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল, সুখ-দুঃখের

ধারণাও বা তাঁহাদের কিরূপ ছিল। তাঁহাদের সামাজিক আচরণ কিরূপ ছিল, প্রকৃত ইতিহাসে আমরা তাহার চিত্র পাইয়া থাকি। আবার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে একটা ধর্ম্ম-গত চেতনার সঞ্চার হয়, কিরূপে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ধর্ম্মানুভূতি কোনও একজন মহাত্মা ধর্মগুরুর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র দেশে একটা ধর্মের আবেগ-প্লাবন আনয়ন করে, জাতির সংস্কৃতিকে সজীব করিয়া তুলে, তাহার কাহিনী আমরা ইতিহাসেই পাইয়া থাকি।

শুধু যে পুঁথিগত একটা Theoretical জ্ঞানলাভের জন্যই ইতিহাস পঠনের প্রয়োজন, তাহা নয়। একটা জাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ইতিহাসই নির্দেশ করিয়া দেয়। যে জাতির অতীতের ইতিহাস নাই, সে জাতি বড় দুর্ভাগ্য। সে জাতি আত্মবিস্মৃত। নিজেদেরই তাহারা চিনে না। জাতিগত স্বভাবটা না জানিতে পারিলে, শুধু অপর একটি উন্নত জাতির কর্মপন্থার অনুকরণের মধ্য দিয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে না। সকল জাতির কর্ম-প্রবণতা এক প্রকার নয়, সব কাজই সকলে করিতে পারে না। আমরা কোন কাজ করিতে পারিব, এবং সহজে পারিব, কোন কার্যের শক্তি যুগ-যুগ ধরিয়া আমাদের মধ্যে পূর্বপুরুষগণের সাধনার দ্বারা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সর্বপ্রথমেই আমাদের জানা দরকার। ভারতবাসী নিজেদের ইতিহাস, তাহাদের কর্ম সাধনার ইতিহাস হারাইয়াছে। তাহাদের সামাজিক ইতিহাস, তাহাদের কর্মসাধনার ইতিহাস অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই আজ যখন বিদেশী কর্ম-চঞ্চল জাতিরা পদে পদে কর্মের প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে, তখন তাহারা শুধু কপালে করাঘাত করিয়া নীরবে নিজেদের অদৃষ্ট ও নিজেদের অতীতকে ধিক্কার দিতেছে। তাই জাতিগত নিজস্ব প্রকৃতি তাহাদের একটা কিছু আছে কি না তাহার সন্ধান না লইয়াই পরের অন্ধ অনুকরণে প্রাণপাত করিতেছে। কিন্তু "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" ইতিহাস যদি একটা থাকিত, তবে তাহার মধ্য হইতে তাহারা অনায়াসেই এই আত্মজ্ঞানটা লাভ করিতে পারিত। ইতিহাস নাই, তাই তাহারা আজ নিজেদের কাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না। চিরন্তন আদর্শকে হারাইয়া ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাকে হারাইয়া কর্ণধার-বিহীন তরণীর ন্যায় এই প্রাচীন বিশাল জাতি দুর্গতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম শুধু Theoretical জ্ঞানের জন্য নয়, কর্ম সাধনার জন্য, প্রেরণা ও পদ্ধতির জন্যও আমাদিগকে ইতিহাস পড়িতে হইবে।

এত গেল সব কাজের কথা। ইতিহাস পঠনের মধ্যে একটা বিনা প্রয়োজনের আনন্দও আছে। কত বিদগ্ধ জন যুগে যুগে কলাবস্তুর জন্য প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক কাহিনীর সন্ধান লইয়াছেন। বস্তুতঃ এই বর্তমানে যে প্রিয়-ভূমির উপর আমরা বাস করিতেছি, নিতান্ত আপনার বলিয়া যাহাতে সযত্নে বৃক্ষাদি রোপণ করিতেছি, যাহার চিরনবীন শস্যশ্যামল পুষ্প-পল্লব শোভিত কমনীয় বক্ষে আমরা নিয়ত পরমানন্দে বিচরণ করিতেছি, তাহার অতীত কাহিনী যে কত বিচিত্র তাহা ভাবিলে মন বিবিধ রসে আপ্লুত হয়। সখের বাগানে কোদাল দিয়া মাটি খুঁড়িতে গেলে কত মাটির হাঁড়ি কলসীর টুকরা কুড়াইয়া পাই। তাহা কোন্ বিস্মৃত যুগের ঘর-কন্নার বাণী বহন করিয়া আনে। মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত মৃৎ-পুত্তল ও ক্রীড়নকের ভগ্নাংশ দেখিয়া কোন যুগের কোন বিস্মৃত শিশুর আনন্দময় হাস্যোচ্ছাসের বাতাস যেন আবার বহিয়া যায়। অতীত যুগের বিস্মৃত জীবনযাত্রার মধ্যে বস্তুতঃ কল্পনার একটা প্রশস্ত অবসর রহিয়া গিয়াছে। আমাদেরি পরিচিত এই ভূমিতে আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা কিরূপ বিচিত্র আচরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা স্বভাবতঃই আমাদের প্রীতিকর। তাই অর্বাচীন কালের কবি, চিত্রশিল্পী ও উপন্যাসকারগণ নিজেদের শিল্প সাধনার বিষয়-বস্তু অতীত জীবন-যাত্রার মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া থাকেন। প্রাচীনের এই মোহ শিল্পকলার এক বিশাল বিভাগকে ব্যাপ্ত করিয়া সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়াও আমাদের এই ধরণের কার্য-রস-পিপাসা কিয়দংশ পরিতৃপ্ত হয়।

তাই সজীব কর্মপ্রাণ জাতি মাত্রই অতীতের ইতিহাস রচনা ও অধ্যয়ন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাঁহারা অতীতকালের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি দেখিতে পান বলিয়া অতীতের সংবাদ যতখানি সত্য ও নিখুঁত হইয়া ধরা পড়ে, তাহারই জন্য অনুক্ষণ সচেষ্ট। কত মনীষী আজীবন ঐতিহাসিক গবেষণায় তাহাদের অমূল্য সময় ও সংসারের যাবতীয় ভোগবিলাস অকাতরে উৎসর্গ করিয়াছেন। অতীতের সত্যকার ইতিহাসকে সুরচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা কত বিজন অরণ্যে বিচরণ করেন, কত প্রাচীন জনপদের সর্প-সঙ্কুল ভগ্নাবশেষের মধ্যে দিবারাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। কত প্রাচীন

শিলালেখ, তাম্রশাসন ও স্মরণাতীত কালের কত মুদ্রা ও তৈজসপত্রের অনুসন্ধানে ক্লেশময় প্রবাস জীবন যাপন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নামে আজ যাহা প্রচারিত উহা ভারতের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের একটি তালিকা মাত্র। উহাতে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার মর্মকথাটি ধরা পড়ে নাই। তাই আজিকার নব জাগ্রত ভারতবর্ষের মনীষীরা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভারতের ইতিহাস আমাদের চিরন্তন সাধনার কাহিনী, আমাদের আদর্শের নির্দেশ পাঠ করিব, অতীত আবার বিস্মৃতির কুহেলিকা ভেদ করিয়া ভাস্বর গৌরবময় মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিবে, আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি।

বয়স্ক শিক্ষা

বাঙ্গালা দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, অশিক্ষা। শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালী আজ অতি দীন, দরিদ্র আনন্দহীন চিত্ত লইয়া ঘরের কোণে জীবন্মৃত হইয়া আছে। বস্তুতঃ শিক্ষাই আলোক। অন্ধকার যেমন সমস্ত বিশ্ব অপরিচয়ের অন্ধকারে ছাইয়া যায়, তেমনি শিক্ষার অভাবেও মানুষের সহিত মানুষের যে একটা সহজ আত্মীয়তার যোগ আছে, তাহা আর বুঝা যায় না। অশিক্ষিত মানুষ বিশ্বে চিরজীবন বাস করিয়াও নিতান্ত প্রবাসী হইয়া থাকে; বিশ্ববাসীর সহিত প্রেমের ও মিলনের আনন্দে এক হইয়া সুখী হইতে পারে না। প্রতিবেশীর প্রতি তাহাদের সন্দেহ ও সঙ্কোচ কিছুতেই যেন ঘুচে না।

বাঙ্গালা দেশে আধুনিক কালে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় শিক্ষার প্রসার ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে, ইংরাজী শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও উপকরণবহুল। সাজ, সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র দূর হইতে দেখিয়াই দরিদ্র বঙ্গবাসী এই বিদ্যালাভের আশা সুদূরপরাহত মনে করিয়া দূরে সরিয়া যায়। তাহা ছাড়া ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই আধুনিক কালে বঙ্গদেশে সর্বপ্রকার

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়। ইংরাজী, বিদেশী ভাষা এই ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করা সকলের কর্ম নয়। যে ইহা আয়ত্ত করিতে পাবে, তাহারও এই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সময় প্রচুর শক্তি ব্যয় করিতে হয়। যাহ'রা চেষ্টা-যত্ন বা মেধা শক্তির অল্পতা হেতু ইংবাজী ভাষা আয়ত্ত করিতে পাবে না, তাহারা জ্ঞানমন্দির হইতে চিবদিনের মত নির্বাসিত হয়।

শিক্ষাব ক্ষেত্রেব ইহা চরম অবিচাব। বস্তুতঃ ইংবাজী আধুনিক জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় পৃথিবীব কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহাদের সাহিত্যিক কীর্তি নিবদ্ধ কবিয়াছেন। এই ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা কবিতে পাবিলে সেই সাহিত্যিক সম্পদেব বসাস্বাদন করিযা ধন্য হওয়া যায়। যাঁহাবা ইংবাজী ভাষায় শিক্ষিত ও ইংবাজী ভাষায় পাবদর্শী, তাঁহারা ভাগ্যবান সে বিষযে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাবা ইংবাজী ভাষা কিছুতেই শিখিতে পাবিল না, এরূপ বাঙ্গালী একেবাবে কোন বিদ্যাই শিখবাব যোগ্য নয়, এরূপ ধাবণা কবা নিতান্ত অন্যায।

সকলেব মেধাব পবিমাণ সমান নয়। অনেকের মেধা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিতে পারে, অন্যক্ষেত্রে উহা তেমন খেলে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালীব পক্ষে ইংবাজী ভাষা শিক্ষা কবা বিশেষ দুরূহ। বাঙ্গালা ভাষাব সহিত ইংবাজী ভাষাব একটা ভাবগত ও জাতিগত বিরোধ আছে। বাঙ্গালায় পদবিন্যাস প্রণালী (বা Syntax) ও ইংবাজী ভাষায় পদবিন্যাস প্রণালীব মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীব ছেলে যদি ইংবাজী ভাষা আযত্ত কবিতে না পাবিয়া উঠে, তবে তাহাকে খুব বেশী দোষ দেওযা যায় না। তা ছাড়া ভাষা শিক্ষার প্রবণতা সকলেব সমান নয। অনেক ভাষা ও সাহিত্যে পাবদর্শী না হইযাও গণিত, রসাযনাদি, বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষ কুশলতা প্রদর্শন কবিযা থাকেন। যদি ইংবাজী ভাষাব বন্ধন হইতে বিজ্ঞানসমূহকে মুক্ত কবা যায়, যদি বাঙ্গালায বৈজ্ঞানিক আলোচনাসমূহ নিবদ্ধ কবা যায তবে বাঙ্গালীব ছেলেবা ইংবাজী না শিখিযাও জ্ঞান লাভ কবিতে পারে।

কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষাপদ্ধতিতে এই ধবণেব কোনও সুবিধাব অবকাশ নাই। তাই অধিকাংশ বাঙ্গালাব ছেলেই বাঙ্গালাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাসিত। অশিক্ষার অন্ধকাবে আজ দেশেব চৌদ্দ আনা অংশ আচ্ছন্ন। মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ কবিতেছেন, 'তাতল সৈকতে

বারিবিন্দু সম' তাঁহারা যে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছেন, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার; অধিকাংশের অন্ধকারে এই স্বল্প আলোক যেন অন্ধকারের নিবিড়তা আরও বাড়াইয়া দিতেছে।

ইহার উপায় কি? হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সুব্যবস্থা করিবেন। না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে জনসাধারণ ইহার ব্যবস্থা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জনশিক্ষার দায়িত্ব যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এ কর্তব্য তাঁহারই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে এই ধরণের সুযোগ নাই। দেশের মধ্যে আজও নানা কারণে শিক্ষার মর্যাদাবোধ সঞ্চারিত হয় নাই। শ্রমিক মহলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে নাই। আমাদের দেশের কৃষকগণ তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চায় না। অল্পবয়সেই তাহাদের উপর সাংসারিক কার্যের কিয়দংশ চাপাইয়া দিতে চায়। শ্রমজীবীদের গুরুভার কর্তব্যের লাঘব করিবার জন্য তাহাদের মনে পুত্রদের একটু সাহায্য কামনা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। ইহাতে যে পুত্রদের ভবিষ্যৎও অন্ধকার হইয়া গেল, ততখানি দূরদৃষ্টি তাহাদের নাই।

শিক্ষিত না হইলে শিক্ষার মর্যাদাবোধ জন্মে না। তাই আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বয়স্ক অশিক্ষিতদের শিক্ষা দান করা। যে সব দরিদ্র শ্রমজীবী দিবসের অধিকাংশ সময় মজুরী করে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যাইবার সময় কোথায় পাইবে? তাহাদের অবসর সময় শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। এজন্য নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিশেষ ফলদায়ক হইবে আশা করা যায়। কিন্তু নৈশবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও সর্বত্র আশানুরূপ ফলদান করিতে পারে নাই। কারণ দিনের পরিশ্রমের পর শ্রমজীবীদের মধ্যে স্বভাবতই একটু বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক। তবে যদি নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি একটু সরস ও আমোদজনক করিয়া তোলা যায়, তবে এই প্রচেষ্টা কিয়দংশ ফলপ্রসূ হইতে পারে। সম্প্রতি বাঙ্গালার বেতার প্রতিষ্ঠান 'পল্লী মঙ্গল আসর' নামক পর্যায়ে এই প্রকার একটি আদর্শ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতি পল্লীতে ইহার অনুকরণ করা বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ— তেমন উৎসাহই বা কোথায়?

শুধু বয়স্ক পুরুষদের শিক্ষা বিধান করাই একমাত্র সমস্যা নয়। বয়স্ক নারীদের শিক্ষা-বিধান করা বরং কঠিনতর সমস্যা। পল্লীগ্রামের মেয়েরা অধিকাংশই

অশিক্ষিত। খুব কম গ্রামেই বালিকা বিদ্যালয় আছে। অল্পসংখ্যক যাহা আছে, তাহাতেও অতি অল্পমাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা। সুতরাং গ্রামে গ্রামে বয়স্ক নারীদেরও শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কারণ তাঁহারা গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করিয়া দিবাভাগে শিক্ষার অবসর কমই পাইয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় আপাততঃ যে ইহার কোন সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এমত মনে হয় না। তবে শিক্ষার প্রেরণা দানের জন্য তাঁহারা এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। দেশবাসীকে এই ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। উৎসাহী শিক্ষিত যুবকগণই এখন একমাত্র ভরসা। তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হন তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সরকার বাহাদুর এই সম্পর্কে অর্থ সাহায্য করিলে এই আয়োজন আরও সাফল্যমণ্ডিত হইবে। বয়স্ক শিক্ষা আইনের ব্যবস্থা দ্বারা আবশ্যিক (compulsory) করিয়া দিলে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রের অভাব হইবে না।

মোটের উপর দেশব্যাপী অশিক্ষার অন্ধকার সম্পর্কে দেশবাসীদেরই অবহিত হইতে হইবে। অশিক্ষার মর্মজ্বালা যদি দেশবাসী সাধারণের মনে একবার সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে দিকে দিকে উৎসাহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে। অচিরে সুদিন আসিবে, অন্ধকার দূরীভূত হইয়া আলোকের উচ্ছ্বাসে সমগ্র বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে!

স্কুল-ম্যাগাজিনের উপযোগিতা

[সূচনা :—স্কুল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য—উহার আকার প্রকার—উহার উপযোগিতা—উপসংহার।]

নিজের কথা পরকে শোনাইবার প্রবৃত্তিই সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে। এই প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। আনন্দ হইলেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ঐ আনন্দকে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। আমার

মনের আনন্দ যখন আরও একজনকে আনন্দিত করিল তখন আমার নিজের উচ্ছ্বাসটিই যেন আরও বাড়িয়া গেল। নিজের কথা এইরূপে পরকে শোনাইবার মধ্যে যে সুবিপুল আনন্দ আছে, তাহার সন্ধান যিনি পাইলেন, সাহিত্যিক হইবার জন্য তাঁহার মনে একটা অনুপ্রেরণা আসা স্বাভাবিক। স্কুলের অল্পবয়স্ক বালকগণের মধ্যে এই সাহিত্যিক প্রেরণা জাগাইয়া দিবার জন্য স্কুল-ম্যাগাজিনের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমানকালে বাঙ্গালার প্রায় সকল বড় বড় স্কুলেই একটা মুখপত্র বা ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে মফঃস্বলের অধিকাংশ স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। অধিকাংশ ছাত্রই দরিদ্র। একটা পত্রিকা নিয়মিতভাবে ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করিতে তাহারা পারে না। কিন্তু স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রথা আমাদের দেশে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, দারিদ্রও উহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। ছেলেরা হাতে লিখিয়াই ম্যাগাজিন বাহির করে। ম্যাগাজিন হাতে লিখিয়া বাহির করার ব্যাপারটি যে কতখানি দুরূহ, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু ছাত্রদের উদ্যমে ও উৎসাহে এই দুরূহ কাজও অনায়াসে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শুধু ছাত্র নয় শিক্ষকেরাও এই ব্যাপারে ছাত্রদের সাহায্য যোগদান করেন। তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে এই সকল পত্রিকা পরিচালিত হয়।

মনে করা যাউক, একখানি ছোট বই—বড় জোর ষাট সত্তর পৃষ্ঠা। উহার মলাটে স্কুলের ছবিটি ছাপানো। প্রথমেই হয়ত ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে 'ঈশ্বর' বা 'প্রার্থনা' শীর্ষক ত্রিপদীছন্দে রচিত একটি কবিতা। তাহার পর ছোট-খাট দুই-একটি ভ্রমণ কাহিনী—ইহাতে পূজার ছুটিতে মামার বাড়ী অথবা দিদির বাড়ীতে গমন ও তদুপযোগী অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অবশ্য ইহার মধ্যে শিক্ষক মহাশয়েরও হাত আছে। 'হিতোপদেশ' বা 'ঈসপ্‌স্ ফেবল' অনূদিত হইতে নীতিমূলক দুই-একটি গল্প। পাঠ্য পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুকরণে দুই-একটি প্রাকৃতিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতায় রচিত একটি সম্পাদকীয় বিবরণী—উহাতে স্কুলের সরস্বতী পূজা, বাৎসরিক পরীক্ষা ও বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেই বিশেষ স্কুলটির ছাত্রগণের কৃতিত্ব, খেলাধূলার কথা ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। স্কুল ম্যাগাজিনের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা এই। দোষ ত্রুটি অনেক আছে, কিন্তু সেজন্য কেহ

স্কুল-ম্যাগাজিনকে ঘৃণার চোখে দেখে না। কারণ সম্পূর্ণাঙ্গ-সৌষ্ঠব ইহার লক্ষ্য বস্তু নয়, তরুণ মনের একটি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসই ইহার প্রাণ।

স্কুল ম্যাগাজিনের উপযোগিতা কম নয়। সাহিত্যিক হইতে হইলে সুদীর্ঘ সাধনা চাই। কেহ রাতারাতি সাহিত্যিক হইতে পারে না। মনের কথাগুলি যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে অনেক সংযম, অনেক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। বহুদিন ধরিয়া রচনার মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ রচনাগুলিই যে সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে, এমন কথা নাই। ইহাতেই কিন্তু অনেকে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেন। রচনার মধ্যে রসবস্তুর কিছুমাত্র স্ফুরণ না হইলে, সম্পাদকগণও তাহা তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন না। কাজেই অপরিচিত সাহিত্যিকগণের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কেহই তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করে না। তাঁহারাও হতাশ হইয়া সাহিত্য-সাধনার পথ পরিত্যাগ করেন।

সাহিত্যিক জীবনের এই শিক্ষানবিশীর জন্য একটা সময় ও সুযোগ থাকা আবশ্যক। স্কুলের ছেলেরা স্কুল-ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়া এই সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। ম্যাগাজিনে ছাপা হইবে, এই আশায় ও উৎসাহে তাহারা তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি। বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ভুল-ত্রুটি কিছু থাকিলে শিক্ষক মহাশয় তাহা দেখাইয়া দেন। তাহাতেও তাহাদের শিক্ষা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আর পাঁচজনে পড়িয়া উহার সমালোচনা করে। ইহার ফলে, তাহার মনে সাহিত্য-রচনার একটা আদর্শ গড়িয়া উঠিতে থাকে। বৎসরে কোথাও তিনবার কোথাও বা চারবার স্কুলের ম্যাগাজিন বাহির হয়। ছাত্রেরা ইহার মারফতে নিজেদের রচনা সাধারণে প্রচার করিবার বিপুল আগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়া বহুসংখ্যক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ফেলে। এইরূপে তাহারা অল্প বয়সেই সাহিত্যিক জীবনে দীক্ষা লাভ করিয়া উত্তরকালে নিপুণ রসস্রষ্টা হিসাবে সম্মান লাভ করে।

—:—

পারিবারিক জীবনের শিক্ষা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯২৭]

[সূচনা :—আদিম মানবজীবন—সভ্যতার গোড়াপত্তন—পারিবারিক জীবনের শিক্ষা—মানুষের চিত্তে পরিবারের প্রভাব—মানব-চরিত্র একটা বিশেষ পরিমণ্ডল বা আবেষ্টনীর সৃষ্টি—উপসংহার।]

আদিম মানব যেদিন পরস্পব-বিচ্ছিন্ন আরণ্য-জীবন পরিহার কবিয়া, মিলন ও গৃহের মর্যাদা বুঝিল, সেই দিন হইতেই মানব-সভ্যতাব বিকাশ আরম্ভ হইল। পাঁচজনের মিলনেব ফলে গঠিত হইল একটি 'পবিবাব'। পবিবাব মানুষকে দান কাবিল এমন কতকগুলি মনোবৃত্তি, যাহা ধীবে ধীবে মানুষেব শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিব জন্মদান কবিযা মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

পারিবারিক জীবনে মানুষ কি শিক্ষা করে? দেখা যায় মানুষের চিত্তবৃত্তির সমগ্র কামনীয় অংশটুকুই অপব একটি মানুষেব অপেক্ষা রাখে। আব একজনকে ভিত্তি কবিয়াই তাহাব হৃদয়বৃত্তি স্নিগ্ধ, মধুর ও কর্মপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। একটি মানুষ আর একজনেব স্বার্থ ও সুখকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজের কর্মগুলি সম্পাদন কবিবে, এইরূপ একটা ধাবণা, বহুশত বৎসবের পাবিবারিক জীবনেব ফল-স্বরূপ। পাবিবারিক জীবন মানুষকে দয়ালু হইতে শিখাইয়াছে, প্রেম ভক্তি শিখাইয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে, কোন একটি আদর্শকে অনুসরণ করিয়া কর্ম করিবার প্রবৃত্তি জোগাইযাছে। মানব-সভ্যতার শুধু যে উৎপত্তিস্থান এই পরিবার, তাহা নয়, ইহা তাহাব কেন্দ্র-বিন্দু। এই পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই যুগ যুগান্তর ধবিয়া মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন এই পাবিবারিক বন্ধন যদি কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সমস্ত মানব-সভ্যতা 'তাসেব ঘরেব' মত এক মুহূর্তে কোথায় উড়িয়া যাইবে, তাহাব ঠিকানা থাকিবে না।

আজ মানুষ ভুলিয়া যায়, পারিবারিক আবেষ্টনী তাহাব হৃদয়ে কতখানি প্রভাব বিস্তাব করে। পরিবার যে শুধু তাহাকে জন্মদান কবে তাহা নয়, পরিবার মানুষকে গঠন করে। তাহার চিত্তবৃত্তি, চরিত্র ও কর্মপ্রেরণা সমস্তই তাহার পরিবারের দান। পরিবারের প্রভাব অতি অলক্ষিতে ধীবে ধীরে মানুষের

চিত্তপটে এমন করিয়া মুদ্রিত হইয়া যায় যে, সেই লিখা আর ইহজীবনে মুছে না। পরিবার মানুষের বিরাট শিক্ষাক্ষেত্র। স্কুল-কলেজে মানুষ কতটুকু শিখে? দুই চারিখানি বই পড়িয়া, শিক্ষকের মুখে দুই-চারিটি গল্প শুনিয়া হৃদয় কতটুকু শিক্ষা লাভ করে? স্কুল-কলেজের এই শিক্ষা নিতান্ত বাহিরের বস্তু। হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে ইহাদের গতি অতি সীমাবদ্ধ। অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়া বাহিরেই চলিয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যাহা প্রবেশ করে, জীবনের উপর তাহার প্রভাব অতি ক্ষীণ। কিন্তু পরিবারের প্রভাব প্লাবনের জলস্রোতের ন্যায় দুর্বার। ইহা দুরতিক্রম্য বেগে হৃদয়কে প্লাবিত, ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান থাকে, মানুষকে এই প্রভাব সচেষ্ট হইয়া গ্রহণ করিতে হয় না; ইহা নিজেই নিজের শক্তিতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ফলতঃ মানুষ পারিবারিক প্রভাবের দাস মাত্র। পারিবারিক প্রভাবকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে, এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়।

কাজেই বুঝিতে হইবে মানব-চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক আবেষ্টনের ফল মাত্র। মানুষ শৈশব হইতে যে পরিবেশ বা পরিমণ্ডলে লালিত ও বর্ধিত হইয়া উঠে, তাহাই তাহার চরিত্রে অভিব্যক্ত হয়। যাহা দেখে, সে তাহাই অনুকরণ করে। যদি ভাল দেখে, তবে পরিণামে সে নিজেও ভাল হইয়া উঠে। যদি চারিদিকেই মন্দ জিনিস দেখে, তবে সেই সব কু-আদর্শ ও কুদৃষ্টান্ত তাহার চিত্তকে কলুষিত করিয়া দেয়, এবং পরিণামে সে সেই সমস্ত কু-আদর্শের অনুসরণ করিয়া নিজেই অধঃপতিত হয়। 'Charity begins at home'—মানুষ আপনার চিত্তে আপন পরিবার হইতে যে বীজ গ্রহণ করে, তাহাই কালক্রমে অঙ্কুরিত, বর্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া তাহার চরিত্র-রূপ বৃক্ষে পরিণত হইয়া থাকে। পরিবারের ধারা বা tradition বংশধরগণের উপরে কম প্রভাব বিস্তার করে না। ভাল বংশের ছেলে বলিয়া যে ছেলের মনে একটা গৌরব-বোধ ও একটা আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে সে সহজে এমন কর্ম করিতে চাহে না, যাহাতে তাহার বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। এই জন্য আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন, সকল দেশেই বংশ ও পরিবার দেখিয়াই অনেকে কোনও বিশেষ মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লন। বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করিবার সময়েও এই জন্যই বংশ-মর্যাদার বিচার করা হইয়া থাকে।

আমাদের পারিবারিক একাত্মবোধের মধ্যে একটা উদার পবিত্রভাব রহিয়াছে। আমরা পারিবার-সামান্যে কোন একটি গুণের জন্য গর্ব করিতে ভালবাসি, আবার কোন একটি দোষের জন্য লজ্জিত হই। আমাদের অজ্ঞাতসারে পারিবারিক পরিবেশ যে আমাদের চিত্তে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা যে কোনও মানুষের গোষ্ঠি-সামান্যে গণিত গুণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত গুণগুলির পরিমাণ করিলেই বুঝা যাইবে। ইহা নিঃসন্দেহরূপে দেখা যাইবে যে, মানুষ নিজে স্কুল-কলেজ বা অন্য কোথাও যাহা শিখে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী শিখে নিজের গৃহে।

ছাত্র-জীবন

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯২৫]

[ছাত্র-জীবন কাহাকে বলে—ছাত্র জীবনের বৈশিষ্ট্য—ছাত্র-জীবনের সুখ—ছাত্র-জীবনের কর্তব্য—দরিদ্র ছাত্র—আধুনিক ছাত্র-সমাজ—শ্রমশীলতা—জীবনের আদর্শ-নির্ধারণ।]

মানব-জীবনের যে অংশ শিক্ষা লাভে ব্যয়িত হয় তাহাই 'ছাত্র-জীবন'। মানুষ চিরদিনই শিক্ষা করে, সে হিসাবে সে চিরজীবনই 'ছাত্র'। তবে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'ছাত্র-জীবন' বলিতে আমরা বুঝি সেই সময়টা—যাহা স্কুল-কলেজে পড়িয়া আমরা ব্যয় করি।

'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ'—অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা-স্বরূপ। তরুণ বয়সই অধ্যয়নের উপযুক্ত কাল। এই সময়ে মানুষের মন অতি কোমল থাকে, এই সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, জীবন-যুদ্ধের কঠোরতা তাহাদের মনকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে না। সবল ও কোমল মন লইয়া মানুষ যাহা কিছু শিখিতে যায়, তাহাই তাহার চিত্তে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইতে পারে। কাঁচা মাটিতে দাগ দেওয়া যেমন সহজ, পোড়া মাটিতে তেমন সহজ নয়। কাঁচা মাটিতে দাগ কাটিয়া দিলে পরে ঐ মাটি যখন দগ্ধ হয়, তখন সেই দাগটি আর মুছিয়া যাইতে পারে না। মানুষের চিত্তও ঐরূপ। কম বয়সে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহা চিরদিনই

মানুষের মনে বর্তমান থাকে—সহজে উহা বিলুপ্ত হয় না। কথায় বলে, "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁশ টাঁশ্।" মানুষের যাহা কিছু শিক্ষণীয়, তাহা তরুণ বয়সেই শিখিয়া লওয়া বিধেয়। নচেৎ বয়স বেশী হইয়া গেলে, পরে ঐ বিষয়টি শেখা মানুষের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, ছাত্র-জীবন অতি সুখেরই সময়। সংসারের চিন্তা তখন থাকে না,—একবয়সী সদানন্দ বালকের দলে মিলিয়া মিশিয়া আমাদের সময়টা বড়ই আনন্দে কাটিয়া যায়। স্কুলে বা কলেজে সকলেই বন্ধু, সকলেই লঘুচিত্ত ও আনন্দ-চটুল, কোথাও তেমন গুরু দায়িত্বের গাম্ভীর্য নাই। এই মুক্ত আবহাওয়ায় ছাত্রের মনটি বড়ই উৎফুল্ল থাকে। এই আনন্দের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। সেই আনন্দের সঙ্গী সহপাঠীদের সঙ্গে ছাত্রদের যেরূপ একটা প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে তাহার তুলনা হয় না। এই সময়কার বন্ধুত্বে স্বার্থের নামগন্ধ থাকে না।

আনন্দময় হইলেও, ছাত্র-জীবনের দায়িত্ব কম নয়। ছাত্র-জীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। তরুণ বয়সে মানুষ যেরূপ শিক্ষা লাভ করে, উত্তর জীবনে সে তদনুরূপ ভাবেই গড়িয়া উঠে। ছাত্রের হৃদয় কোমল বলিয়াই, কুসংসর্গ ও প্রলোভনের ভয় তাহারই বেশী। এই সময়ে যদি পাপের আপাত-মধুর পথ তাহাকে প্রলুব্ধ করে, তবে তাহার উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই সব প্রলোভন হইতে নিজেকে নিরন্তর রক্ষা করিয়া, একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শে, প্রত্যেক ছাত্র আপনাকে সব দিক্ দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তাহার এই আয়োজনে যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটি না থাকে। দয়া-মায়া-পরোপকার, প্রেম-ভক্তি-উদারতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলি ছাত্র-জীবনে উন্মেষিত ও বিকশিত হইবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আলস্য জীবনের প্রধান শত্রু। এই আলস্যকে জয় করিতে হইলে, ছাত্র-জীবন হইতেই চেষ্টা করা উচিত। ছাত্র-জীবনে যদি আলস্য আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তবে আর উহাকে কখনই নিঃশেষে উন্মূলিত করা যায় না।

অনেক ছাত্র আছেন, যাঁহাদের জীবন সাধারণের মত নয়। তাঁহারা হয়ত জীবনে অনেক দুঃখ সহিতেছেন এবং সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ও অভাব-অনটন তাঁহাদিগকে তরুণ বয়সেই আক্রমণ করিয়াছে। সাধারণ ছাত্রদের অপেক্ষা এই সমস্ত তরুণ বয়স্ক ছাত্রদের কর্তব্যভার অনেক কঠোর, তাঁহাদের জীবনও

পরীক্ষা-ময়। তাঁহারা একটি সুমহান আদর্শকে নিরন্তর সম্মুখে রাখিয়া অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া কর্তব্য-পথে না চলিলে, সহজেই সত্যপথভ্রষ্ট হইবেন। এ সংসারে শুধু দুঃখ-দৈন্যের চাপেই কত শত ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশের ছাত্রসমাজে একটা শৈথিল্য ও আলস্যের ভাব খুব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। ছাত্রেরা যেন ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভারতীয় জীবনের সারল্য, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতার আদর্শ হইতে যেন অনেকটা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রমশীলতা ছাত্র-জীবনে একেবারে অপরিহার্য। পরিশ্রমই উন্নতির সোপান। পরিশ্রম না করিয়া কেহ কখনও জীবনে কোন মহৎ কার্য করিতে পারে নাই। আজকাল আমাদের দেশে বালকগণের মধ্যে এমন একটা শ্রমবিমুখতা দেখা দিয়াছে যে উহাদের জীবনের নানাদিকে নানাবিধ গ্লানি সঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে। স্বাবলম্বী হইতে হইলেই শ্রম করিতে হইবে, আর স্বাবলম্বী না হইলে এ সংসারে কেহই উন্নতি করিতে পারে না। যে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই পরমুখাপেক্ষী, তাহার দ্বারা সংসারের কোন্ কার্য সাধিত হইবে? কিন্তু শ্রমশীল হইতে হইলে, শরীরটাও ভাল থাকা দরকার। যাহার শরীর ভাল নয়, সে কেমন করিয়া পরিশ্রম করিবে? ছাত্র-জীবন হইতেই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকেরই উচিত। প্রত্যেক ছাত্রেরই ব্যায়ামাদি শরীর-পোষক শ্রম-সাধ্য কার্য করিয়া অল্প বয়স হইতেই শরীরকে শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা উচিত।

ছাত্র-জীবন হইতেই জীবনের একটি আদর্শ সুনির্দিষ্ট করিয়া ফেলা একান্ত আবশ্যক। কোন মহান্ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, জীবনে কর্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় আদর্শহীন জীবন কখনও সত্য-পথে চলিতে পারে না। জগতে যে সব মনীষী মহাপুরুষেরা বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধার সহিত কাজ করিয়া চলিলে, প্রত্যেক ছাত্রই জীবনে উন্নতি লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্র পাঠ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৫)

[সূচনা :—সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—উপযোগিতা—অল্পশিক্ষিত ও সুশিক্ষিতের প্রয়োজনের তারতম্য—সংবাদপত্রে আলোচিত বিষয়-সমূহ—সংবাদ প্রকাশের উপযোগী যন্ত্রাদি—সংবাদপত্রের অপকারিতা—উপসংহার।]

নয়শত বৎসর পূর্বে প্রথম যখন চীনদেশে সংবাদপত্র বাহির হয়, সেদিন হয়ত কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, যে একদিন ইহা জগতের সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। যে বিচিত্র ইতিহাসের মধ্য দিয়া আজ সংবাদপত্র মানব-সভ্যতার একটি একান্ত আবশ্যকীয় উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনই আনন্দজনক। ইউরোপ মহাদেশে প্রথমে ভেনিসে, তারপর জার্মাণীতে ও তারপর ইংলণ্ডে সংবাদপত্রের প্রচলন হইয়াছিল। এই পরম কল্যাণকর বস্তুটির জন্য বাঙ্গালাদেশে, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের নিকট ঋণী, তাঁহারাই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় 'সমাচার-দর্পণ' নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ভারতে কত সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে ও হইতেছে,—কে তাহার সংখ্যা করিবে ?

সংবাদপত্র আজ মানব-সভ্যতার একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে কেন ? এক কথায় বলিতে গেলে, সংবাদপত্রই আজিকার দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সংবাদপত্রই জন-সমাজের নেতৃস্থানীয়, সত্যকার পথপ্রদর্শক। সংবাদপত্র এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে কেন ? সমাজ আজ ইহার মধ্য হইতে অশেষ-বিধ কল্যাণের সন্ধান পাইয়াছে। দৈবের নির্বন্ধে যাহারা অল্প বয়সে উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারিল না, তাহারা যদি নিয়মিত ভাবে সংবাদপত্র পাঠ করে, তবে অবশ্যই প্রচুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আর শিক্ষিত ব্যক্তির ত সংবাদপত্র না পড়িলেই নয়। শিক্ষাকে কবির ভাষায় বলে 'আলো'। জ্ঞানের আলোকে জগতের অন্ধকার দূর হয়। যাহা দূর, তাহা নিকট হয়, অনাত্মীয় আত্মীয়ে পরিণত হয়। কাজেই নিভৃত

পল্লীর একটি প্রান্তে যে ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াছে, ঘরের বাহির না হইয়াও আজ বিশ্বের সহিত তাহার একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সে ঘরে বসিয়া থাকিলেও সুদূর দেশের বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার একটা আন্তরিক উৎকণ্ঠা থাকে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনকথা তাহারা না শুনিলে নয়। সংবাদপত্র তাহার এই অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে একেবারে ঘরের দ্বারে বহিয়া আনে।

আর শুধু যে জগতের দৈনন্দিন খবরটাই আমরা সংবাদপত্রে পাইতেছি, তাহা ত নয়। দেশ-বিদেশের সংবাদ বহনই হয়ত একদিন সংবাদপত্রের এক মাত্র কার্য ছিল। কিন্তু মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ সংবাদপত্রকে নানাবিধ রচনায় সুসজ্জিত হইতে হইয়াছে। সাহিত্য, রাজনীতি সমাজনীতি, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রভৃতি সর্ববিধ আলোচনাই আজ সংবাদপত্রে নিয়মিত স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা ছাড়া চিত্র আছে, কবিতা আছে, গল্প আছে, উপন্যাস আছে। মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়াই সংবাদপত্রের কর্তব্য শেষ হয় নাই। লোকের চিত্ত-রঞ্জন করিবার ভারও আজ সংবাদপত্র গ্রহণ করিয়াছে। খেলাধূলার সংবাদ এবং থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের সংবাদও এই সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিত্য প্রকাশ লাভ করিতেছে।

সংবাদপত্র মানুষের চিত্তবৃত্তির যে সব খোরাক নিত্য-নিয়ত জোগাইতেছে, এগুলি ত গেল তাহার কথা। কিন্তু ইহাতেও তাহার কর্তব্য শেষ হয় নাই। মানুষের চিত্তোন্নতি সাধন করিয়াই সংবাদপত্র ক্ষান্ত হয় নাই। সাংসারিক জীবনে সে মানুষকে যে পরিমাণ সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার মূল্য অল্প নয়। যিনি ব্যবসায়ী তিনি সংবাদপত্রে ব্যবসায়ের গতিবিধি, দৈনিক বাজার-দর প্রভৃতি জানিতে পারেন। অনেক সংবাদপত্রে বাণিজ্য সম্বন্ধে যে পূর্বাভাস প্রকাশিত হয়, ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাহা অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, আমেরিকা প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান দেশে এই শ্রেণীর পূর্বাভাস অগ্রে জানিবার জন্য সংবাদপত্রের অফিসে ব্যবসায়ীদের ভিড় জমিয়া যায়। আর এই প্রকার পূর্বাভাসের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য খরিদ বা বিক্রয় করিয়া থাকেন। আইন-ব্যবসায়ী সংবাদপত্রে তাঁহার অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ পাইয়া থাকেন। এমন কি যে বেকার ভদ্র যুবক চাকরির

সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান, তিনিও তাঁহার অভীষ্ট সংবাদটি 'কর্মখালির' স্তম্ভে লাভ করিয়া থাকেন।

আধুনিক বা up-to-date হইতে হইলে সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করা চাই। সভ্য-জগত যখন যে চিন্তাটি লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকেন, তাহার যথাযথ প্রতিবিম্বটি আমরা সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রাপ্ত হই। রাজা এবং প্রজা উভয়েই আপন আপন স্বার্থ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রের সাহায্যেই সচেতন হইয়া থাকেন।

এই সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার সর্বপ্রধান বাহন, তাই আধুনিক সভ্যতা তাহার সমস্ত অভিনব সম্পদের সাহায্যে ইহাকে সম্পন্ন ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র, টেলিগ্রাফ, বেতার-বার্তা, টেলিফোন্ প্রভৃতি অত্যাধিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এই সংবাদপত্রের সেবা করিতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তিকে নানাভাবে সংবাদপত্র-মুদ্রণের যন্ত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে। জগতের বিভিন্ন স্থানে অতি সতর্ক, সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ শক্তি ইহার জন্য সংবাদ-সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

কিন্তু এ জগতে কোনও পদার্থই নিরবচ্ছিন্নভাবে কল্যাণকর হয় না। তাই সংবাদপত্রের অপরিসীম উপকারিতা সত্ত্বেও, তাহার অপকারিতাও আছে। সংবাদপত্র যতই কেন সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হউক না, উহার পরিচালকেরা মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন। তাই মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলিকেও তাঁহারা সর্বদা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাই দেখিতে পাই, এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদে প্রতিদিন কত লোক প্রতারিত হইতেছে। পরিচালকগণ নিতান্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কতজনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া লোক-চক্ষুতে তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিতেছেন—আবার কতজনকে অযথা প্রশংসা করিয়া রাতারাতি আকাশে তুলিয়া দিতেছেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকের কোনও একটি ব্যক্তিগত উপকার করিবার ফলে হয়ত কোন ব্যক্তি দুই-চারিদিনের মধ্যে স্বার্থত্যাগী দেশনেতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। অনেক সংবাদপত্র ন্যায়ধর্ম ও মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়া হয়ত কোনও একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ লইয়া প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের অযথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের অযোগ্য সমালোচনায় কত প্রতিভাবান ব্যক্তি মর্মাহত হইয়া চিরদিনের জন্য সাহিত্যসাধনার পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মহাকবি কীট্‌স্ যে অতি অপরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন,

সংবাদপত্রের অন্যায় সমালোচনার নিষ্ঠুর আক্রমণই নাকি তাহার প্রধান কারণ। ফল কথা, জনসাধারণ সহজে কোন কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে না। কোন একটি সাময়িক উত্তেজনার অনুবর্তী হইয়া চলাই জনসাধারণের স্বভাব। সংবাদপত্র অতি সহজেই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে পারে।

সে যাহাই হউক, আজ আর একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে অভিনব সভ্যতার কল্যাণে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা ভাবগত মিলন ঘটিয়াছে, এবং আজ আমরা পৃথিবীর সুদূর প্রান্তবাসী মানুষটার জন্যও হৃদয়ে যে একটা আত্মীয়োচিত আকর্ষণ অনুভব করিতেছি, সংবাদপত্র আমাদের এই মনোভাবকে সযত্নে পুষ্ট ও বর্ধিত করিতেছে। আজ সংবাদপত্রগুলি তুলিয়া দাও, এক নিমিষেই যেন সকল আলো নিভিয়া যাইবে,—সমস্ত বিশ্ব অপরিচয়ের অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইবে।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার মানব-সভ্যতার অমূল্য সম্পদ্। স্মরণাতীত কাল হইতে মানব কর্ম ও চিন্তায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, গ্রন্থাগার তাহার ইতিহাস সযত্নে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের চিন্তা কালক্রমে ধ্বংসের করালগ্রাসে বিলুপ্ত হয় নাই,—চিরকালীন মানবের মনে পৌছিবার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার যে একটা স্বাভাবিক প্রয়াস ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মানবের মনেই বর্তমান রহিয়াছে, গ্রন্থাগার তাহারই মূর্তি। মানুষ যাহা ভাবে ও করে, তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে দিতে চায় না। তাই বিবিধ গ্রন্থে তাহাদের কীর্তিকে নিবদ্ধ করিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রন্থাগার সভ্য মানুষের জীবনে একটা নিতান্ত অপরিহার্য বস্তু। মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারে আসিয়া দাঁড়াইলে সে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ সেই সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্তিলাভ করে। সে যেন অনন্তকালের মানুষ হইয়া পড়ে। শুধু

একটি মাত্র দেশ নয়, গ্রন্থাগারে আসিয়া সে যেন সমগ্র জগতের নাগরিক হইয়া দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারে সমস্ত কাল ও সমস্ত দেশের মানুষের চিন্তা একসঙ্গে এক পংক্তিতে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে। মানুষ গ্রন্থাগারেব মধ্যে আসিয়া এই উন্মুক্ত উদাব আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

গ্রন্থাগাব প্রতিষ্ঠার কল্পনা মানব ইতিহাসেব এক প্রাচীনকালের কথা স্মবণ করাইয়া দেয়। মানুষ যখন সবেমাত্র রেখার দ্বারা মনেব ভাব প্রকাশ করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিল, তখনই কখনও বা নরম মাটিতে আঁক-জোক কাটিয়া তাহা শুকাইয়া সযত্নে রক্ষা কবিতে আরম্ভ কবিল। ইচ্ছা এই যে তাহাদেব মনের কথাগুলি উত্তবকালেব মানুষেব কাছেও যাইয়া পৌছাক। তারপবে পাহাড়েব গাযে, আবাব খণ্ড খণ্ড পাথবেব উপব কতভাবে কতপ্রকারেব লিখনকে তাঁহাবা স্থায়িত্ব দান কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। কালেব সর্বধ্বংসী প্রভাবে সেই সব কীর্তিব কতটুকুই বা আমাদেব হস্তগত হইয়াছে। কাগজ আবিষ্কাব হইবাব পূর্ব হইতেই নানাবিধ বৃক্ষপত্রে গ্রন্থাদি লিখিত হইত। এই সব গ্রন্থ এক জায়গায় সঞ্চিত কবিযা বাখিবাব পদ্ধতিও সুদূব অতীতেই মানবের মনে উদিত হইয়াছিল। বহু দেবমন্দিব বা ভজনালয়ে এই প্রকার গ্রন্থ-সমাবেশ দেখা যাইত। সুলতান মাহ্মুদ যখন সোমনাথেব মন্দিব লুণ্ঠন কবিয়াছিলেন, তখনও সেখানে বৃক্ষপত্রেব উপব হস্তলিখিত পুঁথিব একটি বিশাল কক্ষ দেখা গিয়াছিল। মুসলমানগণ যখন মিশব বিজয় কবেন তখন আলেকজান্দ্রিয়া নগবীব সুবিশাল গ্রন্থাগারটি পুড়াইয়া ফেলেন। এই অপকীর্তি অতীতেব সেই বিজয়-গৌরবকে চিরদিনের মত কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত কবিয়া রাখিয়াছে।

অধুনা সুসভ্য মানব সমাজে গ্রন্থাগারেব অপরিহার্যতা সর্বজন-স্বীকৃত। গ্রন্থাগার পরিচালনা আজ একটা বিশিষ্ট বিজ্ঞানেব মর্যাদা লাভ কবিয়াছে। কিরূপে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ পঠনের সুবিধা দান করা যায়, তাহাই এই বিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ গ্রন্থাগাবের সাহায্যেই সর্বাপেক্ষা কম অর্থ ব্যয়ে জ্ঞান প্রচার করা যাইতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ সুরচিত সুন্দর গ্রন্থগুলি ব্যক্তিগতভাবে ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার মত অর্থবল ধনবানদের মধ্যেও খুব কমই আছে। তা ছাড়া এই ভোগ-বিলাস-বিহ্বল সংসারে জ্ঞানলাভের জন্য অর্থব্যয় করিবাব যথাযোগ্য আগ্রহও খুব কমই দেখা যায়। অধ্যয়নের আগ্রহ যাহাদের আছে, তাহাদের হয়ত আবার গ্রন্থ ক্রয়ের

সঙ্গতি নাই। এমত ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সাহায্যেই বিনা ব্যয়ে বা অতি অল্প-মাত্র ব্যয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করা যায়।

শুধু গ্রন্থ থাকিলেই হয় না, গ্রন্থপাঠের আবার একটি সুনির্দিষ্ট ধারা থাকা চাই। মানুষের চিন্তাশক্তি সর্বদাই একটা শৃঙ্খলার সন্ধান করে। একখানি রসায়ন বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করিয়া হয়ত কাহারও ঐ শাস্ত্রে একটা রুচি জন্মিয়াছে, এই রুচিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করিবার মত যথোপযুক্ত গ্রন্থখানি যথাকালে হাতের কাছে থাকা চাই। কাজেই শুধু বহু গ্রন্থের একত্র সমাবেশ থাকিলেই চলিবে না। উহাদের মধ্যে একটা ধারাবাহিক ক্রমনির্দেশ ও সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাও থাকা একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিচালনা নামক আধুনিক বিজ্ঞান এই শৃঙ্খলা-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা-শাখায় বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন স্থানে সুসজ্জিত করিয়া দেয়। বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে হইতে উদ্দিষ্ট গ্রন্থখানিকে সত্বর খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যও গ্রন্থতালিকাটিকে বিবিধ ধারায় সুকৌশলে সাজানো হইয়া থাকে।

আমাদের দেশেও আজকাল গ্রন্থগার পরিচালনা বিদ্যার আলোচনার উন্নতি হইয়াছে। সরকার বাহাদুর গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া জ্ঞান প্রচারের সুবিধা বুঝিতে পারিয়া নানা স্থানে গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীতে National Library নামক বিরাট গ্রন্থাগার গভর্ণ-মেণ্টের অর্থেই পরিচালিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটিও সুবৃহৎ ও সুপরিচালিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Post-Graduate বিভাগে গ্রন্থাগার-পরিচালনা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা করিতেছেন, আশা করা যায়, উহার ফল খুব ভালই হইবে।

বঙ্গদেশ পল্লী-অঞ্চলেও গ্রন্থাগারের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। উন্নতিশীল গ্রাম মাত্রেই একটি করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব গ্রন্থাগারে অল্প মাসিক চাঁদা দিলে নানা রকমের পুস্তক পাঠ করা যায়। যাঁহারা দিবসের অধিকাংশ সময় বিষয়-কর্মে ব্যাপৃত, যে সকল গৃহস্থবধূ গৃহস্থালীর কাজকর্মে জ্ঞানচর্চার সময় খুব কমই পাইয়া থাকেন, তাঁহারাও বিবিধ পুস্তক অতি সহজে হাতের কাছে পাইয়া দুই একখানি পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোথাও উদ্যোগী কর্মিগণের মহতী প্রচেষ্টার ফলে ভ্রাম্যমান পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

এইভাবে গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া অতীতের আলোকে বর্তমানের মর্মতল উদ্ভাসিত হইয়াছে, দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চিরন্তন মানুষের বাণী এক উদার উন্মুক্ত বিশ্বে বিঘোষিত হইয়াছে;—মানুষের দৈনন্দিন সংকীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া গিয়াছে, লাইব্রেরীতে আসিয়া সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছে।

বিজ্ঞানের দান

সৃষ্টির প্রভাতে প্রকৃতি ছিল মানবের উপরে। প্রকৃতির দুর্বার শক্তি মানবের জীবন-পথে প্রতি-পদে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্ভেদ্য অরণ্যে ভীষণ অজগরের কবাল কবলে কত মানুষের প্রাণ গিয়াছে। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ দুর্গম অরণ্যপথ রৌদ্র-বৃষ্টিতে গৃহহীন মানব-সন্তান কত যুগ বন্য পশুর ন্যায় উৎপীড়িত বেদনাময় জীবন বহন করিয়াছে। তারপর কোন শুভক্ষণে মানুষের মনে বিজ্ঞানের প্রথম রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন হইতে সভ্যতার জয়যাত্রা গৌরবের নিশান উড়াইয়া মানুষের জীবনের পথকে প্রতি পদক্ষেপে সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে মণ্ডিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রতিদিন মানুষ আরাম ও আনন্দের দিকে একটু একটু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিকূলতা এই বিজ্ঞানের শক্তিতে দিন দিন পরাভূত হইয়াছে। আজ প্রকৃতি মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে বন্দিনী, দাসীর ন্যায় সে নিয়ত মানুষের সেবা করিতেছে। বিজ্ঞানের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান সগৌরবে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুস্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য মানুষ প্রথমে নৌকা, পরে ধীরে ধীরে দুর্ভেদ্য ভাসমান দুর্গ-স্বরূপ জাহাজ আবিষ্কার করিয়াছে। অপার বারিনিধির ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া ধরিত্রীর এক প্রান্তের মানুষের সহিত অন্য প্রান্তের মানুষের মিলন ও মৈত্রী সংঘটিত হইয়াছে। এক দেশে দুর্লভ বস্তুবিশেষ অনায়াসে দেশান্তর

হইতে প্রেরিত হইয়া মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বর্ধন করিতেছে। জলীয় বাষ্পের সাহায্যে জলস্থল-আকাশে মানুষের হস্তনির্মিত বিশাল যানশ্রেণী পবন বেগকে পরাভূত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষের অর্জন লিপ্সাকে চরিতার্থ করিবার জন্য কখনও পণ্য কখনও বা সৈন্য বহন করিয়া সুনীল সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অর্ণবপোতগুলি চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ বিশ্বের অপরাজেয় শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। মানুষ আজ যেন বিধাতার হাত হইতে সৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া লইতে চায়। বিধাতার সৃষ্টিকে সে চিরিয়া চিরিয়া উহার সমস্ত রহস্যই যেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। সৌরজগৎ ও তাহার অন্তর্গত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যুগে যুগে মানুষের মনস্বী সন্তানেরা কতই নব নব সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আরিষ্টটল, টলেমী, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস্, নিউটন্—বিভিন্ন যুগের এই সব মনীষীরা বিশ্বের অন্তর্নিহিত বিরাট কারখানার সুগোপন রহস্যটি আজ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। চন্দ্র-সূর্য-তারকা-প্রমুখ যে ভাস্কর জ্যোতিঃপিণ্ডগুলিকে অনন্ত নভোমণ্ডল দৈবশক্তিরূপে প্রাচীন মানুষ কল্পনা করিয়াছিল, আজ তাহাদের নিতান্ত স্থূল স্বরূপ মানুষ নগ্ন চোক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই দৃষ্টি উদ্‌ঘাটনের পিছনে রহিয়াছে যুগ-যুগান্তরের মনীষী মানবের সাধনা।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানুষের এই বিজ্ঞানের সাধনা চলিয়াছে। সভ্যতার সর্বাঙ্গীন উন্নতির ভিত্তিমূলেই রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিশেষ করিয়া বিগত দুই শত বৎসরে বিজ্ঞানের সাধনা সফলতার উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংল্যাণ্ডের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ রিভিলিউসন্ বিজ্ঞানের চর্চাকে যেন তড়িৎগতি দান করিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হইয়াছিল তাহা সহস্রাধিক বৎসরের পক্ষেও পরম গৌরবময়। জেমস্ ওয়াট ষ্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন, তাহার ফলে যন্ত্র-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। শুধু জলযান ও স্থলযানেই নয়, বিভিন্ন শিল্প-যন্ত্রেও আজ ষ্টীম-এঞ্জিনের ব্যবহার হইতেছে। মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎশক্তি মানুষের করায়ত্ত হইল। আজ বিদ্যুতের বলে ট্রাম চলিতেছে; বিদ্যুৎ মানুষের গৃহে পরিচারকের ন্যায় পাখা ঘুরাইতেছে,—আলো জ্বালিতেছে,—ভাত রাঁধিতেছে—কাপড়

হ্রাস করিয়া দিতেছে,—টেলিগ্রাফের সাহায্যে অত্যল্প কালের মধ্যে দেশ-দেশান্তরের খবর পাওয়া যাইতেছে।

ইটালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনি কর্তৃক বেতার আবিষ্কার বিজ্ঞানের আর একটি পরম বিস্ময়কর অবদান। বিনা-তারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তের শব্দ শুনা যাইতেছে। বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতাদের কলা-সৃষ্টি আমরা অত্যল্প মূল্যে ঘরে বসিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছি। সবাক্ চিত্রের আবিষ্কারের ফলে আমরা স্বল্পমাত্র অর্থব্যয় করিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি।

কৃষিকার্যেও বিজ্ঞান মানুষের সাহায্য করিতেছে। কত অনুর্বর ভূমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্ষিত হইতেছে,—বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগের ফলে সেই ঊষর ভূমির অনুর্বরতার অভিশাপ ঘুচিয়া উহা শস্যশ্যামল শ্রীধারণ করিতেছে। মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করিতেও বিজ্ঞান কতই সহায়তা করিতেছে। মানুষের রোগমুক্তির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত ভেষজ প্রস্তুত হইতেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন রোগের বীজাণুর স্বরূপ, জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাহার ফলে সেই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের বীজাণু নষ্ট করিবার জন্য বিভিন্ন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের চিকিৎসা ও রোগমুক্তি আজ অনেক পরিমাণে নিশ্চিত ও সহজসাধ্য হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত এক্স-রে বা রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরস্থ অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এইরূপে বিজ্ঞান রোগমুক্তির উপায় বিধান করিয়া মানুষকে দীর্ঘায়ু করিয়া তুলিতেছে।

জড়জগৎ আজ বিজ্ঞানের মন্ত্রে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষলতার হাসি-অশ্রু আজ বিজ্ঞানের যন্ত্রে ধরা দিতেছে। শুধু জড়জগৎ নহে, মনোজগতেও বিজ্ঞানের জয় বিঘোষিত হইয়াছে। ডারউন, ফ্রয়েড, আইনষ্টাইন, রেঁলা প্রভৃতি জ্ঞানতপস্বীরা মনকে চিরিয়া চিরিয়া উহার বিকাশ ও গতির পথকে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, কি দৃশ্য, কি অদৃশ্য, কোন বস্তুই বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম নয়নের দৃষ্টিকে এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না।

এত করিয়াও কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের ভিতরকার আদিম হিংস্রতা ও স্বার্থ-লোলুপতাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির

বশীভূত হইয়া বিজ্ঞান আজ দিকে দিকে হিংসার পতাকা উড়াইয়া ফিরিতেছে। লোভ ও দম্ভের হস্তের ক্রীড়নকস্বরূপ বিজ্ঞান আজ বিস্ফোরক ও মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া ধরিত্রীর বক্ষ জীবশোণিতে প্লাবিত করিতেছে, দুর্বল ও অসহায়ের আর্ত চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। যে বিজ্ঞান একদিন মানুষের সহিত মানুষের ব্যবধান ঘুচাইয়া, মৈত্রী ও প্রেমের পথে সভ্যতাকে জয়যুক্ত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, আরোগ্য ও জীব-সংরক্ষণ যাহার তপস্যা ছিল, বিবিধ প্রকারের ধরিত্রীর সম্পদ-বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা পৃথিবীবাসিদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই যে বিজ্ঞানে সাধনার বিষয় ছিল—আজ সে বৈর-নির্যাতন ও দুর্বল পীড়নের অস্ত্র, ব্যক্তিগত লোভের বেদীমূলে আজ বিজ্ঞানের খড়্গে মানবকুল পশুর ন্যায় বলিপ্রদত্ত হইতেছে,—অহমিকা ও দম্ভের মারণযজ্ঞাগ্নিতে বিজ্ঞান আজ পুরোহিত,—লেলিহান লোহিত শিখায় আজ বিশ্বশান্তির পুষ্পাঞ্জলি ভস্মীভূত হইয়া গেল।

স্ত্রী-শিক্ষা

[সূচনা :—সমাজে স্ত্রী-জাতির স্থান—স্ত্রী-জাতিকে সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার কুফল—স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বাঙ্গালীর মনোভাব—স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির ত্রুটি—স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ—উপসংহার।]

আধুনিক সভ্য সমাজ যে কয়টি গুরুতর সমস্যা লইয়া ব্যতিব্যস্ত আছে, 'স্ত্রী-শিক্ষা' তন্মধ্যে একটি। আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা আজকাল অনেকেই বুঝিয়াছেন, কিন্তু তবু স্ত্রী-শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। যেটুকু হইতেছে, তাহা যেমন নিখুঁত নয়, তেমনি ব্যাপকও নয়।

কোন দেশেই পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম নয়, বরং বেশী। সমাজ বলিতে স্ত্রী ও পুরুষ দুই-ই বুঝায়। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না। শিক্ষার অর্থ আলোক, ইহা মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দেয়, চারিদিকের জগতের সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ করিয়া দেয়।

অশিক্ষাই অন্ধকার। যদি পুরুষেরাই শুধু শিক্ষালাভ করিতে থাকে, মেয়েরা অশিক্ষিত থাকিয়া যায়, তবে সমাজের মাত্র অর্ধেকটাই আলোকিত হয়। ইহাতে কখনই সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না। সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান তুচ্ছ নয়। সমাজ-গঠনে স্ত্রীলোকের প্রভাব খুব গভীর, খুব সুদূরপ্রসারী, একথা কেহ কোন দিন অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেইজন্য এই স্ত্রীলোকদের শিক্ষিত হওয়া যে কত দরকার, সে কথা আমাদের দেশে তেমন করিয়া কয়জনে ভাবিয়া থাকেন?

কিন্তু না ভাবিলে আর চলিতেছে না। শিক্ষা মনকে আলোকিত করে, ফুলের মত প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে। পুরুষ শিক্ষিত হইয়া এই মানসিক সৌন্দর্য লাভ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে কি হয়? সে নিজের জীবনে এই সৌন্দর্যকে রূপায়িত করিতে পারিতেছে না। শিক্ষা তাহার মনে যে সৌন্দর্যের কল্পলোক সৃষ্টি করিতেছে—তাহার জীবন তাহা হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহার ফলে সামাজিক জীবনে প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে যে মার্জনা ও সংস্কৃতি লাভ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়া থাকি, ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। ইহার কারণ কি?

ইহার একমাত্র কারণ স্ত্রী-জাতির অশিক্ষা। স্ত্রীলোক লইয়াই প্রধানতঃ মানুষের সংসার; স্ত্রী-ই পরিবারের কেন্দ্র-স্বরূপ। তাহাকে ঘেরিয়াই মানব-জীবনের সমস্ত সংগ্রাম চলিতেছে। এরূপস্থলে যদি স্ত্রীলোক অশিক্ষিত হয়, তবে তাহার অমার্জিত ও অশিক্ষিত রুচি পদে পদে পুরুষের সৌন্দর্য-বোধকে আঘাত করিতে থাকে। আমাদের পারিবারিক জীবনে এইভাবে শিক্ষার মার্জনা ও সংস্কৃতি প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। আমাদের জীবনের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদের শিক্ষা নিতান্তই একটি বাহিরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। পুরুষের শিক্ষার সাধনা এইভাবে নিত্যই ব্যর্থ হইতেছে। পুরুষ তাহার মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্য বুদ্ধিকে লইয়া অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাহাকে ছোট হইয়া সমস্ত মার্জনা ও সংস্কৃতিকে বাহিরে রাখিয়া হৃদয়ের সমস্ত আলোক প্রায় নিভাইয়া দিয়া, নিতান্ত ক্ষুব্ধ-চিত্তে সেই অন্ধকার গৃহকোণে কাল কাটাইতে হয়। জীবনের আকাশে অতৃপ্তির মেঘে ঢাকিয়া যায়। স্ত্রী-জাতিকে শিক্ষা

আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার ইহাই ফল। এ সংসারে কাহাকেও ছোট করিয়া রাখিবার উপায় নাই,—তাহাতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ঠকিতে হয়। ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই কবিতায় সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন :—

"যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে!
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

কাজেই স্ত্রী-জাতির শিক্ষা-বিধান হইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যায়, অন্ধকারের আঘাতে আলোক-শিখাকে এমন করিয়া নিভিয়া যাইতে হয় না। এক নিমেষেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত সংসার আলোয় আলোময় হইয়া উঠে। কোথাও আর বিরোধ থাকে না। এ কথাটি আজ অনেকেই বুঝিয়াছেন। তবে বহু যুগের জড়তা কাটাইয়া উঠা সহজ নয়। তাই এখনও প্রাচীন পন্থীদের একটা কুণ্ঠা স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সহরে স্ত্রী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত কিছু কিছু হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও স্ত্রী-শিক্ষার আশানুরূপ ব্যবস্থা হয় নাই।

তবে একথা ভুলিলে চলিবে না, কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা মন্দের ভাল। প্রকৃত শিক্ষা হওয়া চাই। যে শিক্ষায় মানুষের মনকে মার্জিত করে না, যাহা শুধু ব্যর্থ অহঙ্কারে হৃদয়কে ছোট করিয়া দেয়, যাহা শুধু ভোগবিলাসের দিকে ছুটিয়া দরিদ্র সমাজের অভাব বাড়াইয়া দেয়, তাহা শিক্ষাই নয়। বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালীর সংসারের সর্বস্ব। বাঙ্গালীর সংসারের মত সুখের সংসার পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এই সংসারকে চূর্ণ করিবার জন্য যে শিক্ষা বিপ্লবের সৃষ্টি করে, তাহা আত্মঘাতী ও অশুভ,—তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

সেই শিক্ষাই চাই, যাহা আমাদের জীবনকে, আমাদের পারিবারিক শৃঙ্খলাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলে। স্ত্রীলোকের এমন শিক্ষা চাই না, যাহা শুধু অর্থহীন বিরোধ তুলিয়া পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চায়। তাহার মধ্যে কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, বিন্দুমাত্র সুবুদ্ধি নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে এমন শিক্ষা লাভ করুন, যাহাতে তাঁহার চিরন্তন উদারতা, স্নেহ-মমতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং সেবাপরায়ণতা আরও সুন্দর, আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

স্কুলের ছাত্রের সুখ দুঃখ

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৮]

[সংক্ষিপ্ত ভূমিকাঃ 'স্কুলের জীবন' বলিতে কি বুঝায়—সুখস্মৃতি—ছুটির আনন্দ—অধ্যয়নে অভিনিবেশের আনন্দ—খেলাধূলার আনন্দ—ভ্রমণ, ভোজ প্রভৃতিতে মিলনের আনন্দ—বন্দী থাকিবার দুঃখ।]

বাঙ্গালীর ছেলে সাধারণতঃ ছয়-সাত বৎসর বয়স হইতে ষোল-সতের বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলের ছাত্র থাকে। তারপর তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করে। সুতরাং স্কুল-জীবন বলিতে আমরা এই সময়টাই বুঝি। এই সময়ের সুখও আছে, দুঃখও আছে। ফলতঃ সুখ জিনিসটাই এমন, যাহা দুঃখের সংস্পর্শ ছাড়া দাঁড়াইতেই পারে না। কোন একটা দুঃখ আছে বলিয়াই, সেই দুঃখের অভাবসূচক অবস্থাটাই আমাদের কাছে সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্কুলের জীবনে দুঃখ অনেক ছিল বলিয়াই সুখও অনেক ছিল।

একটি একটি করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনের দশটি বৎসর আমরা স্কুলে কাটাইলাম। এই দশটি বৎসরের শত-সহস্র স্মৃতি মনের কোণে উঁকি মারিতেছে। কোন স্মৃতিই আজ তুচ্ছ মনে হইতেছে না। ইহারই মধ্যে কত বন্ধুর দেখা পাইয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজও আমাদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু অনেকের সঙ্গে হয়ত চিরদিনের মতই ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আর ইহজগতে নাই। বিদ্যালয়ের এই পরিচিত প্রাঙ্গণটিতে সেই-সব বন্ধুদের সঙ্গ যে কতখানি আনন্দময় ছিল, আজ তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আজ তাহাদের বিচ্ছেদ-দুঃখ বুঝাইয়া দিতেছে, তাহাদের সঙ্গ আমাদিগকে এতকাল কতখানি সুখ দিয়াছে। বাস্তবিক, কিশোর-বয়সের প্রাণটি বড়ই কোমল, বড়ই মাধুর্য্যে ভরা। এই সময়ের মৈত্রী স্বার্থলেশশূন্য, উদার ও আনন্দময়। শুধু যে সুখের স্মৃতিটিই সুখময় বলিয়া মনে হয়, তাহা নহে। এই সময়ের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অপ্রাচুর্য্যগুলিও যেন পরম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। স্কুলের ছোট ঘরখানি, যাহা চাল দিয়া বর্ষার দিনে অবিরল জলধারা ঝরিয়াছে, শিক্ষক মহাশয়ের সেই হাতল-ভাঙ্গা ক্লাস-ঘরের চেয়ারখানি, ভাঙ্গা ব্লাকবোর্ডটি, পুরস্কার-বিতরণী সভার

সেই অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক নাট্যাভিনয়,—সমস্তই যেন সীমাহীন সুষমায় অপরূপ বলিয়া মনে হয়।

ছুটির আনন্দের সহিত জীবনের কোন সুখেরই তুলনা হয় না। প্রতিদিনকার পাঠ শেষ হইলে পর যে অসীম উল্লাসের সহিত ছেলের দল গৃহাভিমুখে ধাবমান হয়, তাহা সত্যই দেখিবার জিনিস। আবার বিদ্যালয়ের এক-একটি বড় পরীক্ষার পর যে বড় বড় ছুটিগুলি বালকদের অনেকদিন পূর্ব হইতেই যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে, ছাত্র-জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেই সব দীর্ঘ অবকাশের মাধুর্য একেবারেই কমিয়া যায়।

যে ছাত্র পড়াশুনায় ভাল, পরীক্ষায় যাহার কৃতিত্ব সপ্রমান হয়, ছাত্র-জীবন তাহার পক্ষে অমৃত-নির্ঝরের মত। শিক্ষকগণের মমতা, সহপাঠিগণের আন্তরিক প্রীতি ও মাতাপিতার হাসিমুখ তাহার প্রাণে যে আত্মপ্রসাদ আনিয়া দেয়, তাহার বর্ণনা হয় না। পুরস্কার-বিতরণী সভায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে যে লাল ফিতায় জড়ানো বইখানি পুরস্কার পাওয়া গেল, তাহার ক্রয়-মূল্য যাহাই হউক না কেন, ছাত্রের কাছে তাহা নেপোলিয়নের ইউরোপ-বিজয়ের আনন্দ বহন করিয়া আনে।

স্কুলের খেলাধূলায় ছেলেদের অপরিসীম আনন্দ। স্কুলের নামে দল বাঁধিয়া যখন ছাত্রেরা অন্য দলের সহিত প্রতিযোগিতায় খেলা করে, তখন তাহাদের বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ যে কিরূপ তীব্র তাহা বোঝা যায়। এই জিনিসটি শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই পরম প্রীতিকর বস্তু। এই প্রীতির মধ্য দিয়া যে শৃঙ্খলা বা discipline সহজেই গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদাকে খর্ব করিবার প্রশ্ন উঠে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আঘাত না করিয়াও যে কি প্রকারে সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা পাইতে পারে, ছাত্র-জীবনের এই শৃঙ্খলার মধ্যে যেন তাহার একটি সুমধুর আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রায় সকল স্কুলেই সরস্বতী পূজা, কোন একটি প্রসিদ্ধ স্থানে গমন (excursion) প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া ছেলেদের একত্র সমবেত হইয়া ভোজ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করার প্রথা আছে। এই প্রথাটি যে কতখানি প্রীতিকর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ছেলের দল একত্র মিলিয়া ভাত রাঁধিতেছে, কেহ তরকারি কুটিতেছে, কেহ উনান জ্বালানো লইয়া ব্যস্ত। হয়ত কোন

একজন শিক্ষক মহাশয় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। অন্য ছেলেরা অবাধ স্বাধীনতার সহিত অদূরে লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত ঘটনার মধুর স্মৃতি মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলিতে পারে না। কৈশোরের এই নির্মল আনন্দ চিরদিন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়া থাকে।

কিন্তু দুঃখও আছে। আমরা স্কুলের রুটিনে সময়কে বেড়াজালে বাঁধিয়াছি। বিভিন্ন সময়াংশের স্কন্ধে অঙ্ক, ইংরাজী, ভূগোল, সাহিত্যের ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সময় নির্বিকার; সে কিছুতেই আপত্তি করে না, করিতে জানে না। কিন্তু চিরচঞ্চল শিশু-মন কি অমন করিয়া বাহিরের বন্ধনে আটকাইয়া রাখার জিনিস? শিশুর রুচি ও ইচ্ছার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার অবকাশ কেহ কোথাও রাখিয়াছেন কি? ঘণ্টা মিনিটের বিভিন্ন কোঠায় শিশুর স্কন্ধে আমরা যখন ইংরাজী ও ভূগোল-শাস্ত্র চাপাইয়াছি, তখনও যে সম্মুখের সীমাহীন মাঠের দিগন্তে চিল ডাক দিয়া যায়, কড়াই-শুঁটির ক্ষেতে চাষার ছেলে ঘুড়িয়া বেড়ায়, ওপারের তালগাছের পাতায় বৈকালের স্বুবর্ণ-রশ্মি কল্পলোকের মায়া-জাল বুনিয়া যায়, দূরের অশ্বত্থতলে পুঁতির কণ্ঠী গলায় পরিয়া বাউল নাচিয়া নাচিয়া গান করে। তখন কি পড়িবার সময়? কে বলিবে? বেড়াবেড়া স্কুলের নির্দিষ্ট আসনে খোকাবাবু বসিয়া আছেন। কোলে তাঁহার সেলেট, কিন্তু মন তাহার ঐ জানালা দিয়া বাহির হইয়া বাউলের গানের সুরে চাপিয়া মটরের ক্ষেত পার হইয়া, রৌদ্রোচিক্কণ তালপত্রের কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক তখনই অতর্কিতে খোকার পিঠে বেত পড়িল। শিক্ষক মহাশয় অনবধানতার জন্য তাহার কান মলিয়া দিলেন। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ শিশু-মনোবৃত্তির এমন বর্বরোচিত অপমান আর কি হইতে পারে? ছুটির আনন্দের কথা বলিলাম, কিন্তু এই গভীর উল্লাসের কারণটি ভাবিয়া দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। 'ঘুঘু-ঘোড়া', 'চেয়ারে বসা', 'গাধার টুপি মাথায় দেওয়া' প্রভৃতি শাস্তির আস্বাদ অনেকেরই জানা আছে। যাহারা আমাদের অত্যন্ত আদরের, অতি স্নেহের ধন, মায়ের সজল দৃষ্টি ও সুকোমল অঙ্ক হইতে শুধু 'মানুষ' করিবার আকাঙ্ক্ষায় যাহাদিগকে আমরা এই নিষ্ঠুর যন্ত্রের নিষ্পেষণে পাঠাইয়া দিই, তাহাদের নির্যাতন কিসে কমে, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

প্রবন্ধ-সংকেত

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা—সূচনা—বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়?

প্রয়োজনীয়তা—বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বিজ্ঞানের উপরেই জাতির উন্নতি নির্ভর করে। যে জাতি বিজ্ঞানে যত উন্নতি করিয়াছে সে সেই জাতিই তত শক্তিমান্। ট্রেন, ষ্টীমার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ্, ট্রাম, মোটর, এরোপ্লেন, মুদ্রাযন্ত্র—এ সমস্ত বিজ্ঞানের দান। এ সব উপকরণ ছাড়া কোন সভ্য জাতিরই চলে না। যে জাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার অল্প তাহাকে অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হয়। নিজেরা বিজ্ঞান চর্চা করিলে স্বাবলম্বী হওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অল্প, সরকারী সাহায্যও অপ্রতুল। দেশের জন-সাধারণকে এদিকে অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। স্কুলে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মাতৃভাষার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে অধিকতর সুফল আশা করা যায়। হাতে কলমে শিক্ষা না পাইলে বিজ্ঞান পড়া ব্যর্থ হয়।

বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উপসংহার—বিজ্ঞানের কুফলও আছে। বিষবাষ্প (Poison gas), ডিনামাইট্, কামান, বন্দুক, টর্পেডো, বোমা, অ্যাটম বোমা প্রভৃতি নরহত্যার বিবিধ উপকরণ। কিন্তু কুফল আছে বলিয়াই সুফল উপেক্ষণীয় নয়। হয় তো এমন একদিন আসিবে যেদিন মানুষ মানুষ-নামের যোগ্য হইবে, মানুষ মানুষকেই ভাই বলিয়া মনে করিবে। সেদিন বিজ্ঞান শুধু মঙ্গল কাজই করিবে।

তোমার পঠিত একটি উপন্যাস—গ্রন্থ ও গ্রন্থকার—উপন্যাসের নাম। ঔপন্যাসিকের পরিচয়। ঐ ঔপন্যাসিকের লেখা আর কয়েকটি গ্রন্থের নাম। প্রস্তাবিত গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ঐ উপন্যাসের বিষয়-বস্তু—সংক্ষেপে গল্পাংশ। প্রধান চরিত্রগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

তোমার মতামত—বইটি কি তোমার ভাল লাগে? যদি লাগে তো কেন লাগে? বইয়ের ভাষা কি রকম? রচনা রীতির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি?

স্কুল-লাইব্রেরি—সূচনা—স্কুল-লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা। কেবল পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয় না। সাধারণ অবস্থার ছাত্রগণের পক্ষে পাঠ্য-পুস্তক কেনাই কঠিন, অতিরিক্ত বই কিনিয়া পড়া অসম্ভব। স্কুল-লাইব্রেরির বই পাঠার্থীর পাঠস্পৃহা নিবারণ করিবে।

স্কুল-লাইব্রেরিতে কিরূপ বই রাখা হয়—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান, মাসিক পত্রিকা, অভিধান। পুস্তক-নির্বাচনে শিক্ষকগণের সতর্কতা। গল্প, উপন্যাস, এবং কবিতার বই কেবল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা হইতে বাছাই করা হয়। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বই ছাড়া অন্য ভাষার বই খুব কমই আছে।

লাইব্রেরির সার্থকতা—যে উদ্দেশ্যে লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হয় না। বই পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পড়িবার স্পৃহা ক্রমশঃই বাড়ে। লাইব্রেরির বই শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই কাজে লাগে।

লাইব্রেরিকে আরও জনপ্রিয় করা যায় কেমন করিয়া—নানা-বিষয়ক পুস্তক থাকিলেও সাধারণতঃ পুস্তকের সংখ্যা অল্প। তাহা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলি অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লেখা। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বইগুলি শেষ করিতে বেশী সময় লাগে না। তাহার পর অগত্যা ইংরাজী বই পড়িতে হয়। যাহারা ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন নয় তাহাদের পক্ষে অসুবিধা হয়। নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বাঙ্গালা বই যদি অধিক পরিমাণে লাইব্রেরিতে রাখা হয় তাহা হইলে ছাত্রগণের উপকার হইবে।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে ছাত্রগণের কর্তব্য—লাইব্রেরির বইগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রগণের ঔদাসীন্য। বই যাহাতে না ছিঁড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একজন একখানি বই অধিক দিন রাখিলে অপরের অসুবিধা হইবে এ কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। ছাত্রগণ আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে লাইব্রেরিতে দুই একখানি করিয়া বই দান করিলে লাইব্রেরির উন্নতির সম্ভাবনা। পুরাতন পাঠ্যপুস্তক দান করিলে দরিদ্র ছাত্রেরা পড়িবার সুযোগ পাইবে।

উপসংহার—লাইব্রেরির উন্নতির সঙ্গে সমগ্র স্কুলের উন্নতি।

———

—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

বাংলার নদনদী

নদী-মাতৃক বলিয়া বঙ্গদেশের খ্যাতি আছে। প্রাণীদেহের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেমন শিরা-উপশিরা ছড়াইয়া রহিয়াছে, বাংলার নদ-নদীও তেমনি ইহার প্রতিটি ভূখণ্ড সিক্ত-প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি নিবিড়। বাংলার নদ-নদী ইহার অধিবাসীদিগকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা একদিকে যেমন প্রতি কণা-মৃত্তিকায় উর্বরতার অপূর্ব ঐশ্বর্য প্রেরণ করিয়াছে তেমনি জাতিকে প্রতিনিয়তই কোন নবতর জীবনের ইঙ্গিতে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছে। নদীর দ্রুত স্রোতের সহিত মানুষের বক্ষস্পন্দন তালে তালে নাচিতে থাকে—ধমনীতে রক্তের ধারা চঞ্চল হইয়া উঠে। এই চাঞ্চল্য তাহাকে কোন বিশেষ মত বা ধারণার অচলায়তনে আবদ্ধ থাকিতে দেয় না, জীবন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তোলে। তাই যুগে যুগে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ দিয়া যখন বিভিন্ন জাতি বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, বাঙ্গালী তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে নাই। নবাগত জাতির সহিত স্বীয় সুপ্রতিষ্ঠ জীবনের একটা সমন্বয় করিয়া লইয়াছে। বহু যুগ হইতে উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ দিয়া যেমন অগণিত শক, হুন, পাঠান, মোগল বন্যার স্রোতের মত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, বাংলার অসংখ্য নদীগুলিও তেমনি এই উর্বর ভূখণ্ডকে অনাহত থাকিতে দেয় নাই। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বাংলার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া এখানে সংসার পাতিয়া বসিল, ফলে প্রচলিত এবং অপ্রচলিতের সংযোগে একটা নূতন জীবনযাত্রার প্রণালী গড়িয়া উঠিল। যে ভাষা নানা দেশ হইতে শব্দ আহরণ করে, অবিমিশ্র ভাষা অপেক্ষা তাহার শক্তি বেশী। নদীপথে আগত বহু জাতির সহিত সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালী সাহসে, বাহুবলে, মনুষ্যত্বে ভারতের অপর জাতি অপেক্ষা অধিকতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যকে বুঝিতে হইলে তাহার নদ-নদীর ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। আবার কেবলমাত্র বিদেশীকে আহ্বান করিয়াই ইহাদের কর্তব্য শেষ হয় নাই। নদীর এককূল

গড়ে অপর কূল ভাঙে। যে কূল ভঙ্গুর তাহার অধিবাসীরা দলবল, স্ত্রীপুত্র লইয়া নূতন কোন স্থানে ঘর বাঁধিয়াছে। দুই বিভিন্ন দলের মিলনে পুনরায় এক উদার নমনীয় নীতির প্রবর্তন হইয়াছে। বহু জাতির কাছে শিখিয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য এবং অনেক জাতিকে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়াই তাহার নীতি ও ধর্মমত এত উদার। বাঙ্গালী কাহাকেও দূরে রাখে নাই। শাক্ত এবং বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী এবং ফকির, বৌদ্ধ এবং জৈন উভয়েই তাহার আশ্রয় পাইয়াছে। ভিক্ষা চাহিতে আসিলে কাহাকেও সে ফিরাইয়া দেয় না। শুধু ইহাই নয়, একদা একটা সুদিন আসিয়াছিল যখন হিন্দু-মুসলমান স্বীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলিয়া উভয়ের সমবায়ে একটা মিশ্র সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিল—তাহার নাম দরবেশ। বহু নদ ও নদী-বিশিষ্ট বাংলায়ই এই মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় 'ভারত-তীর্থ' সম্বন্ধে যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, বঙ্গদেশ সম্বন্ধেও তাহা সার্থক।

অজস্র নদ-নদী বাংলার প্রাচীন স্বাধীনতার রক্ষক। এই নদী-পথে জলযুদ্ধ করিয়া বাংলার অধিবাসী সমাগত শত্রুকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। দ্বাদশ ভৌমিক (ভূঁইয়া) যে মোগলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মূলে রহিয়াছে পদ্মা ও মেঘনার রুদ্ররূপ। খাল, বিল, নদী, নালা বাংলার ভূখণ্ডকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ব্যাপক সেনা সমাবেশ এই ক্ষুদ্র ভূমিতে সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া বর্ষা সমাগমে নদীতে যখন প্লাবন বহিয়াছে নবাগত আক্রমণকারীরা তখন জয় অপেক্ষা পলায়নকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

বাংলার নদ নদী বাঙ্গালীর চরিত্রকে সুগঠিত করিয়াছে। নদীর চরে বাস করিয়া কুমীরের সহিত লড়াই করিতে করিতে বাঙ্গালী জীবন কাটাইয়াছে। আবার নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ঘন অরণ্যের মাঝে বাঘের সহিতও তাহাকে কম বুঝিতে হয় নাই। ইহার ফলে সে সাহসী এবং নির্ভীক হইয়াছে। এই নদীগুলিই আবার তাহাকে অপূর্ব ভাবুকতায় মণ্ডিত করিয়াছে। উদার আকাশ-তলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পদ্মা, আত্রেয়ী, তিস্তা, করতোয়া এবং মেঘনার বিশাল বক্ষে তরী ভাসাইয়া বাঙ্গালী বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছে। কোন বস্তুর সুবিপুল রূপ দেখিয়াই মানুষের মনে স্রষ্টার ভূমার

অর্থাৎ বিশালত্বের আভাস জাগিয়া উঠে। পদ্মা, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী দেখিয়াছে—মাথার উপরে গভীর নীলাকাশ, যতদূর দৃষ্টি যায় সম্মুখে রজতশুভ্র তরঙ্গ তাহার পর দিগন্ত বিশাল সবুজ ক্ষেত্র তাহাতে বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—একেবারে বহুদূরে যাইয়া আকাশের সহিত মিশিয়াছে। এই বিশাল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর বলিয়াই আবালবৃদ্ধবনিতা উন্নত, অনুন্নত বাঙ্গালীর পক্ষে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করা কঠিন হয় নাই। Mysticism (অতীন্দ্রিয়বাদ) বাঙ্গালীর মজ্জাগত। দুরূহ শ্যামাসঙ্গীতের নিগূঢ় ভাব সকল বাঙ্গালীই বুঝে। কবি মনোভাব সম্পন্ন বলিয়াই বাঙ্গালীর কাছে বৈষ্ণব পদাবলী স্বর্গীয়।

বাংলার নদ-নদী দেশকে বাণিজ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নদীপথে শত সহস্র জলযান দেশের পণ্য একস্থান হইতে স্থানান্তরিত করে। প্রাচীনকালে যখন রেলপথের প্রচলন হয় নাই তখন বাংলার এক সীমান্ত হইতে অপর সীমান্ত অবধি পণ্যদ্রব্য নদীপথেই বহন করা হইত। বাংলার নদী বিদেশের সহিত বাংলার বাণিজ্যের পথও সুগম করিয়া দিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে নদীগুলির দান অপরিমেয়। ইহাদের কল্যাণে বাংলার ভূমি সরস। সুজলা বলিয়াই বঙ্গভূমি সুফলা এবং শস্যশ্যামলা। প্রতি বর্ষের প্লাবনে বাংলার জমিতে যে পলিমাটির আবরণ পড়ে বর্ষ বর্ষ ধরিয়া তাহা সুবিপুল জনতার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দেয়। বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধীবরের দানও সামান্য নয়। ধীবর, কৃষক এবং শিল্পী ইহারাই হইল বাংলার মেরুদণ্ড। দেশের অগণিত নদ-নদীগুলিই বহুশতাব্দী ধরিয়া ধীবরকুলকে প্রতিপালন করিতেছে।

যে দেশে নদী নাই, সে দেশ শ্রীহীন। বাংলার নদী দেশকে যেমন সমৃদ্ধি দিয়াছে তেমনি ইহাকে দিয়াছে রূপ। আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘন অরণ্যের মাঝে পথ করিয়া লইয়া নদী নানা স্থানে নানা দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সে রূপ বৃক্ষলতার অন্তরালে কোথাও গম্ভীর, অপরিচিতের মনে তাহা শঙ্কা জাগাইয়া তোলে। কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর ভেদ করিয়া তাহা অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে মন উদাস হইয়া যায়। বাতাসে নদীর জল ঝির্ ঝির্ করিয়া কাঁপে, নদীর চরে কাশবন দুলিয়া উঠে—উদাসী পথিক অপলক নয়নে চাহিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়।

নৌকা বাহিয়া নদীর উৎসমুখে উজাইয়া গেলে আরও অনেক কিছু দেখা

যায়। অধিকাংশ নদীরই উভয় পার্শ্বে মানুষের বসতি। নদীর উপরেই তাহাদের ঘর-দুয়ার, খামার-গোলা। গ্রাম্যবধূ নদী হইতেই কলসী ভরিয়া জল লইয়া যায়। "বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ"র কলসী কক্ষের রূপটি প্রায় নদী-কূলেই চক্ষে পড়ে। গ্রামের শিশুগুলি ছাগল, ভেড়া, বাছুর লইয়া নদীর তীরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। বৃদ্ধরা মাঝে মাঝে হুঁকা হাতে নদীর কূলে বসিয়া খোস্-গল্প করেন। নদী হইতে কিছু দূরে গাছপালার অন্তরালে মাঝে মাঝে জীর্ণ দেবমন্দির জাগিয়া উঠে। একদা এই মন্দির কত শত জনতার কোলাহলে মুখর থাকিত—অধিষ্ঠিত দেবতার পদতলে লক্ষশত পূজারী আসিয়া অর্ঘ্য ঢালিয়া দিত—আজ সে দেবতাও নাই, পূজারীরাও বোধ করি জীবনের ভালমন্দের হিসাব নিকাশ করিবার নিমিত্ত অন্য কোথাও সরিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নের নদীদৃশ্য আরও সুন্দর। দিবসের কোলাহল থামিয়া আসে। একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস যেন নদীর বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া ধীরে ধীরে বাতাসে ছড়াইয়া যায়! এইবার তাহার কর্তব্যের পালা ফুরাইল। মাল বোঝাই নৌকার চলাচল আগামী সকালের মত সমাপ্ত হইয়াছে। যে দু-একটি গ্রাম্যবধূ মাঝে মাঝে কলস ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে, তাহাদেরও প্রয়োজন শেষ হইল বলিয়া। ক্রমে সূর্য ডুবিয়া নদীর জল কালো রঙিন হইয়া উঠে। অবশেষে সেই বিরাট অগ্নিগোলকটিও ধীরে ধীরে বৃক্ষলতার আড়ালে সরিয়া যায়। সন্ধ্যা নামিয়া আসে। নদীর চতুর্দিকে একটা বিরাট প্রশান্তি—প্রকৃতি যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে ধ্যানে বসিয়াছেন। অদূরে দেবালয় হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের পবিত্র কলতান ভাসিয়া আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লণ্ঠন নদীতীরে বাঁধা নৌকাগুলির অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। ধীবরেরা নৌকার বাহিরে বসিয়া বাউল সুরে গান গাহিতে থাকে। কুটিরের আলোকে নদীবক্ষ ঝল্‌মল্ করে।

নদীতীরে বাংলার এই যে দৃশ্য, ইহাই তাহার নিজস্ব প্রতিকৃতি। কত নূতন ধরণের কত শহর গড়িয়া উঠিল, কালক্রমে তাহাদের ধ্বংসস্তূপে পুনরায় নূতন নগর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাংলার এই রূপের আর পরিবর্তন নাই। ইহা চিরন্তন। বাংলার নদনদী বাংলার ভূমিকে এই রূপ দিয়াছিল—দেশে নদনদী যতদিন থাকিবে, এই রূপেরও ততদিন সমাপ্তি ঘটিবে না। "God made the country and man made the town"—এই চরম সত্যের সন্ধান মিলে বাংলার নদীপথের ভ্রমণের দ্বারা।

বাংলার নদ-নদী বাংলার সর্বোৎকৃষ্টের সাধিকা। কিন্তু এই নদীগুলিই প্রতিবর্ষে প্লাবন, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে চরম দুর্গতির পথে টানিয়া আনে। বর্ষা সমাগমে নদীতে আসে প্রবল বন্যা—গ্রামের পর গ্রাম এই জলপ্রবাহে ভাসিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিয়াছি। দামোদর ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীর জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য বড বড় বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে শুধু যে বন্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইব তাহা নয়, অনাবৃষ্টির জন্য যে সব অঞ্চলে চাষবাস ভাল হইত না এই সঞ্চিত জলে তাহাদের কৃষিকার্যের সুবিধা হইবে। এই সঞ্চিত জলরাশি হইতে যে জলজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে দেশের শিল্প সমৃদ্ধি বর্ধনে তাহার মূল্য হইবে অপরিমেয়।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে, নদী বাংলার প্রাণসার। বাঙ্গালীর অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি নদ-নদীগুলি জননীর মত স্তন্যরসে জাতিকে অভিষিক্ত করিয়া চলিয়াছে। নদীগুলির সংস্কার হউক—বাঙ্গালীর রোগ, শোক, নৈরাশ্য মন্ত্রবলে অপসৃত হইয়া যাইবে। যে বৈশিষ্ট্য তিন শতাব্দী পূর্বেও বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য বিধান করিত, দুর্দিনের অবসানে তাহাও পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিবে।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ

ধনসম্পদের অনুপাতে প্রত্যেক দেশেই সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র বা শ্রমিক। বাংলাদেশেও এই প্রকার বিভাগ রহিয়াছে। এইরূপ বিভাগ কৃত্রিম নয় অর্থাৎ কোন মানুষ চেষ্টা চরিত্র করিয়া এই ধরণের শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি করে নাই। ধনাধিকারের পরিমাণে ইহা সমাজের মধ্যে আপনিই গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আপনিই ধরা পড়ে। প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, উচ্চশ্রেণীর বা ধনীসম্প্রদায়ের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধনবলে যথেষ্ট ন্যূন হইলেও, এই দুইটি

সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। উচ্চ-চিন্তা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দিক দিয়া বাংলাদেশে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই অগ্রণী। বাঙ্গালাদেশে সুশিক্ষিতের সংখ্যা এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বাধিক। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত সমাজ উচ্চশ্রেণীর ন্যায় সামাজিক জীবনযাত্রার সৌষ্ঠব ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিতে গিয়া সর্বদাই বিপন্ন। আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান যথেষ্ট থাকিলেও সামাজিক ব্যবধান বিশেষ কিছুই নাই। মধ্যবিত্তদেরও আভিজাত্য আছে। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থই ধনবানের আত্মীয়, এককালে যাঁহারা ধনবান ছিলেন, তাঁহারাই হয়ত কালক্রমে দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন, হয়ত গোষ্ঠীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পত্তি বহুধা বিভক্তি হইয়া গিয়াছে, হয়ত তাঁহাদেরই এক অংশীদার অভগ্ন-সম্পত্তি-গৌরবে এখনও ধনবান্। আবার, মহারাজ বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা অনুসারে অনেকে দরিদ্র হইয়াও কুলীন। এই কৌলীন্য গৌরবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত ধনবানের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। বরং বিগত শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথার এতই গৌরব বাঙ্গালী সমাজে দেখা গিয়াছে যে অনেক ধনশালী জমিদার নিঃস্ব, এমন কি মূর্খ কুলীন সন্তানকে কন্যাদান করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত বাঙ্গালী সমাজে ধনবানের অর্থনৈতিক ব্যবধান থাকিলেও সামাজিক ব্যবধান বিশেষ কিছুই নাই। ইহা অবিমিশ্র সুখের হয় নাই। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রায় এইজন্য সর্বদাই একটা বিক্ষোভ ও অতৃপ্তির ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ বর্তমান শতাব্দীতে সামাজিক জীবনযাত্রা একটু বেশীমাত্রায় উপকরণবহুল হওয়াতে মধ্যবিত্তের সংসার ধনবানের অনুকরণের ধাক্কা সামলাইতে গিয়া সর্বদাই বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। মোটের উপর একটা অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিশেষ বিপন্ন। জাতীয় ধনসৃষ্টির ব্যাপারে তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুবই অল্প, পরোক্ষভাবে নিতান্ত উপেক্ষিত সহায়ক হিসাবে তাহার যাহা কিছু উপযোগিতা। বাঙ্গালা মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাহার সামাজিক বিশেষ অবস্থাটির জন্য সোজাসুজি লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকর্ম করিতে অপমান বোধ করে। অনেকের কিছু কিছু চাষ-বাসের উপযোগী জমি জায়গা অবশ্য আছে। কিন্তু উহার চাষের জন্য তাহাকে শ্রমিক শ্রেণীর মুখাপেক্ষী হইতে হয়। শ্রমিকরাও অন্য কোন

উপায় থাকিলে পরের জমি চাষ করা লাভজনক বিবেচনা করে না। ফলতঃ শ্রমিকের দ্বারা জমি চাষ করাইয়া লওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা যাহাদের একবার হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সুবিধা পাইলে অন্যতর জীবিকার সন্ধান করে। এইরূপে অধিকাংশ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ক্ষেত্রস্বামীই নিজের জমি-জায়গা প্রজাবিলি করিয়া, অথবা ভাগীদার শ্রমিকগণের কবলার উপর উহা ছাড়িয়া দিয়া শহরে গিয়া চাকুরি বাকুরির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছেন। ফলে, অনেকের সহিত কাগজে কলমে কৃষিক্ষেত্রের সম্বন্ধ থাকিলেও, হাতে কলমে নাই। বাঙ্গালার কৃষিজাত সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপার হইতে এইভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া পড়িতেছে।

চাকুরি-বাকরির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের দুর্গতি কিছুমাত্র কমে নাই। সরকারী চাকুরির সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আধুনিক কালে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। উহা প্রধানতঃ ধনবানদের সৃষ্টি, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-শ্রেণী ধনশালীদের ধনবৃদ্ধির জন্যই সেখানে নিযুক্ত। নিতান্ত বাঁচিয়া থাকিবার মত বেতন (living wages) মাত্র তাহাদের দেওয়া হয়। বস্তুতঃ আরও ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থাৎ ধনবানের নিজস্ব সম্পত্তি না হইয়া বহুজনের সাধারণ প্রতিষ্ঠান না হইলে, এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আশার কথা, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভার সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিতেছেন।

সুতরাং আজ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের শোচনীয় দুর্গতি। তাহারা শ্রমিক নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই শ্রমিকের অপেক্ষা দরিদ্র। তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ, বেশীর ভাগই তাহাদের সামজিক ঠাট বজায় রাখিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া যায়। সমাজে তাহারাও ভদ্রলোক; এই ভদ্রলোকত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া পোশাক পরিচ্ছদে তৈজসপত্রে যাহা তাহার ব্যয় করিতে হয়, ক্ষুধার সময় উদরকে শান্ত করিতে ততটা ব্যয় করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। তাহার চক্ষু কোটরাগত, শরীর শীর্ণ, মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। কন্যার বিবাহে, পিতৃশ্রাদ্ধে তাহাকে সাধ্যতীত খরচ করিতে হয়। অধিকাংশ মধ্যবিত্তেরই দেশের সাধারণ অবস্থায়ও অতিকষ্টে দিন চলে, খুব কম লোকেরই হাতে কিছু জমা থাকে।

দেশে এখনও দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্যাদি এখনও যেরূপ মহার্ঘ তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বাধিক পীড়িত হইতেছে। কেরাণী, শিক্ষক প্রভৃতি যাহাদের

বর্তমান সময়ের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অনুপাতে আয় বৃদ্ধি হয় নাই, তাহাদের দিন কি-ভাবে চলিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

মনে হয়, মধ্যবিত্তদের ভাবিবার দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি গঠনের ইতিহাসে মধ্যবিত্তদের দান অসামান্য। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব প্রতিভা যুগে যুগে বিকাশলাভ করিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, সুকুমার কথাশিল্পের সাধনা, স্বদেশের জন্য আত্মবিলোপ, ইহা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদেরই কীর্তি। এই দীনহীন, ক্ষীণকায়, ক্লান্ত-শ্রান্ত অগণিত নর-নারী এই দুর্দিনেও বাঙ্গালার বিশ্ব-বিদ্যালয়, বাঙ্গালার শিল্প-সাধনা, রাজনৈতিক, পারমার্থিক, সর্বপ্রকার কীর্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহারাই ক্ষীণ হস্তে ছিন্ন পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। ইহাদের বাঁচাও।

একান্নবর্তী পরিবার

[সূচনা—ইহার উপযোগিতা—ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ইহার অসুবিধা—ইউরোপীয় সমাজে ইহার অভাব—তাহাতে ইউরোপীয়দের সুবিধা-অসুবিধা—উপসংহার।]

ভারতবর্ষের ও ইউরোপের জীবনযাত্রার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিতে গেলে, একটি বস্তু সর্বাগ্রেই চোখে পড়ে—ইহা একান্নবর্তী পরিবার। ভারতবর্ষে ইহা আছে—অতি প্রাচীনকাল হইতেই আছে। আর ইউরোপে ইহা নাই বলিলেই হয়।

মিলনের মধ্যে একটা আনন্দ আছেই। ইহা কেহ কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। ভাইয়ের সঙ্গে ভাই, মায়ের সঙ্গে ছেলে, যতই মিলিয়া মিশিয়া থাকে ততই যেন জীবন সুখময় হইয়া উঠে। যাহাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ রহিয়াছে, বহুদিনের নানা সুখ-দুঃখের স্মৃতি ও সহানুভূতি যাহাদিগকে একটি সাধারণ বন্ধনে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে একত্র সংঘবদ্ধ করিয়াছে, তাহারা চিরদিন মিলিত জীবনযাপন করুক, ইহা বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে এই প্রথা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, পৃথিবীর

প্রায় সর্বত্রই সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানুষ এইরূপ সম্মিলিত জীবনযাপন করিত। একটি গোষ্ঠীপতির অধীনে এক বংশের বহুসংখ্যক লোক একত্র বাস করিত। ঐ কুল-নায়ক বা গোষ্ঠীপতির আজ্ঞানুক্রমেই পরিবারের প্রত্যেকেই কার্য করিতেন। যিনি যাহা উপার্জন করিতেন সমস্তই আনিয়া কুলস্বামীর হস্তে দিতেন। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে উহা পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করিতেন। এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থাকে ইংরাজীতে Patriarchal system বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এখনও যে একান্নবর্তী পরিবারের প্রথাটি প্রচলিত আছে, উহাকে সেই সুপ্রাচীন Patriarchal system-এরই জের বলিয়া মনে করা যায়।

এই প্রকার ব্যবস্থার সুবিধাও যেমন আছে, তেমনই আবার অসুবিধাও যথেষ্ট আছে। একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শটি স্বার্থশূন্য উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উদার ভাবটির যতই অভাব হইতেছে, একান্নবর্তী পরিবারও ততখানি অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে। এই প্রকার উদার ও সুমার্জিত মনোভাব উচ্চস্তরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি না হইলে জন্মিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবন এই প্রকার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। কাজেই মানুষগুলিও ভিতরে ভিতরে অতিমাত্র স্বার্থ-সর্বস্ব ও অনুদার হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক লইয়া যখন একান্নবর্তী পরিবার গঠিত হয়, তখন তাহা নানাবিধ পারিবারিক অশান্তির আকর হইয়া উঠে, চারিদিকেই সাম্যের অভাব লক্ষিত হয়। পরিবারস্থ বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে হয়ত মাত্র কয়েকজনই উপার্জনক্ষম। তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া রোজগার করিতেছে। কিন্তু সেই কষ্টার্জিত অর্থ আর সকলেই অলস ও অকর্মণ্য হইয়া উপভোগ করিতেছে। তাহারা এইরূপে কিছুমাত্র কাজ না করিয়াও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবার সুযোগ পাইতেছে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে কর্মশক্তির সম্যক্ স্ফুরণ হইতেছে না, কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সাধ্যমত উপার্জনের ক্লেশ তাহারা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। এইরূপ সাম্যের অভাবের ফলেই পরিণামে বিদ্রোহ জন্মলাভ করিতেছে। যিনি উপায় করেন, তিনি ক্রমেই এই একান্নবর্তী পরিবারে বৃহৎ ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহিতেছেন।

যেখানে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ জন্মিয়া গিয়াছে, সেরূপ ক্ষেত্রে পৃথগন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। নচেৎ সেই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত-

ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। স্ত্রীলোকেরাই এই বিরোধ-বিস্তারের সর্বপ্রধান অস্ত্র বলিয়া কথিত হন। ক্রমে সমর্থ ও অসমর্থের মধ্যে জীবনযাত্রার একটা পার্থক্য একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যেই বেশ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। ইহা অসমর্থের পক্ষে গ্লানিজনক ও অপমানকর। অসমর্থ ব্যক্তি যদি অস্বীকার করিয়াও সেই পরিবারের মধ্যে থাকিতে চান, তবে উহার স্বাভাবিক প্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা যায় না। এরূপ অবস্থায় পৃথগন্ন হইলেই বরং পরস্পরের মধ্যে কতটা সম্প্রীতি রক্ষা পাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের প্রথা নাই বলিলেই চলে। পারিবারিক বন্ধনের এই শৈথিল্যের উপকারিতা যে নাই, তাহা বলা যায় না। সেখানে পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, খুড়া-জেঠা কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। সকলেই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে অভ্যাস করে। ইহারই ফলে দেখা যায়, ইউরোপীয় সমাজে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তটা অতি প্রবল। প্রত্যেকেই নিরঙ্কুশভাবে নিজের ক্ষমতার বিকাশ করিবার সুযোগ পায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতিত্বের সম্পূর্ণ সুবিধা উপভোগ করিতে পারে। কেহ কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চায় না,—থাকিতে পারও না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিশ্রমের ফল নিজেই আত্মসাৎ করিতে চায়। তাই নিজের শক্তি ও সামর্থের সম্পূর্ণ বিকাশ করিবার জন্ম তাহাদের আগ্রহও স্বভাবতঃ খুব বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক বন্ধন স্বার্থ-কলুষিত হইতে পারে না বলিয়াই তাহাদের সমাজে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতি থাকে, আমাদের দেশে পারিবারিক স্বার্থের সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সেটুকু দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদিও একটা প্রেমময় আদর্শকে ভিত্তি করিয়া আমাদের সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তবু কার্যতঃ ইহাতে 'হিতে বিপরীত' হইয়াছে, মিলনের সহায়ক হইবার পরিবর্তে ইহা মিলনকে আরও অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,—মানুষের স্বাভাবিক উদারতাকে পীড়িত করিয়া উহাকে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজকাল একান্নবর্তী পরিবারের প্রথা যে স্বতঃই লুপ্ত হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

কৃষির উন্নতি

শুধু বাংলাদেশে বলিয়া নয়, জগতের সব দেশেই কৃষি এবং কৃষকের প্রয়োজন অপর সকল প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক। যে দেশে স্বভাবজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য নাই, উদর পূরণের নিমিত্ত তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইহার পর যে দেশের শতকরা আশী জন কৃষক এবং পঁচানব্বই জন পল্লীবাসী, কৃষিই যে দেশের অধিবাসীর একমাত্র আশ্রয়স্থল ইহা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের মতই স্পষ্ট। বারিপাতের তারতম্য হইলে যে বৎসর ফসলের অবনতি ঘটে সে বৎসর ইহাদের দুর্দশার সীমা থাকে না।

অতএব কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলার উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু এই যাহাদের বুকের রক্ত নিঙড়াইয়া জাতির আহার্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের জীবন অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ইহারা যেমনি অসহায়, তেমনি অজ্ঞ। ইহারা দরিদ্র, মূক, সংখ্যায় অগণিত। দেশের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে ইহাদেরই উপরে, অথচ দেশের সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য হইতে ইহারা বঞ্চিত। ইহারা নিরক্ষর —জগৎ সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে ইহাদের অজ্ঞতা অসীম। জন্ম-জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে ইহাদের কেহ যদি শহরে আসে, ইহার বিচিত্র অট্টালিকা এবং ততোধিক বিচিত্র মানুষের দিকে সে বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অবশেষে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। দেশের মেরুদণ্ড হইল ইহারা—যাহাদের ললাট নিষিক্ত ঘর্ম-বিন্দুতে ভূমি উর্বরা হয়, অথচ ইহাদেরই জীবনযাত্রার ইতিহাস জাতীয় জীবনের এক ঘৃণিত মর্মন্তুদ কাহিনী। দারিদ্র্যের কথাই সর্বাগ্রে ধরা যাক্। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাংলার কৃষক নিরন্ন। খেয়ালী প্রকৃতির আশীর্বাদে ইহারা কোন কোন বৎসর প্রচুর শস্য পায় কিন্তু সেই বৎসরই উৎসবাদিতে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হয়, আর যে বৎসর বিধাতার অভিশাপে যথাসময়ে প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টিপাত হয় না অথবা অতিবৃষ্টি হইয়া জমিজমা ডুবিয়া যায়, বন্যা নামিয়া ঘরবাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যায় সে বৎসর গৃহহারা অন্নহীন কৃষককুল অনশনে, অর্ধাশনে কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া জীবনের শেষ দিনটির প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া সহজ নয়। মরিব বলিলেই যদি মানুষ মরিতে পারিত, তবে তাহার জীবনের পনের আনা দুঃখেরই সমাধান হইয়া যাইত। ক্ষুধার্ত কৃষক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য শেষ কপর্দকটিও ব্যয় করে, অবশেষে সে আশাও যখন বিলুপ্ত হয় তখন শান্তদেহে কম্পবক্ষে হতভাগ্য কৃষক পল্লীগ্রামের মহাজনের নিকট হস্ত প্রসারিত করে। সর্বনাশের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া তাহার আশু প্রতিকারের নিমিত্ত মানুষ ব্যাকুল হইয়া উঠে। সব কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেই তখন সে প্রস্তুত। রক্তশোষক পল্লীমহাজন কৃষকের এই চরম দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। সুদের হার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে এবং তাহারই অসম্ভব চাহিদা মিটাইতে গিয়া বাংলার কৃষক আত্ম বিসর্জন দেয়, তথাপি ঋণ তাহাকে ছাড়িতে চায় না; নাবিক সিন্দবাদের স্কন্ধারূঢ় দৈত্যের মত ইহা অবিরাম তাহার উপর চাপিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ যুবক কৃষক যখন পিতৃপিতামহের বহুযত্নে গঠিত সংসারের ভার মাথায় তুলিয়া লয়, তখন তাহার চক্ষে অন্ধকার নামে। সংসারে সর্ব অশান্তির আবরণ ভেদ করিয়া এই বস্তুটিই তাহার সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিশ্বগ্রাসী মহাজন বিরাট হাঁ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, জীবনের শেষ সঞ্চয়টিও তাহারই অতলস্পর্শী গহ্বরে প্রবেশ করিবে। মুক্তির সর্বপ্রকার আশা সে বিস্মৃত হয় এবং অভাব আসিলে পুনরায় ঋণ করিয়া যথাকালে পরবর্তী বংশধরের হাতে ঋণশুদ্ধ সমগ্র সংসারের বোঝাটা নিঃশব্দে চাপাইয়া দিয়া পরলোকের পথে পাড়ি জমায়।

ইহার পর স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই জাতীয় সম্পদের মূল, কিন্তু যাহারা জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করিবে বাংলার সেই কৃষককুল ভগ্নস্বাস্থ্য। প্রতি বৎসর বিবিধ মহামারীর প্রাবল্য বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহার ফলে সহস্র সহস্র কৃষক অকালে আত্মবিসর্জন করে। রোগে ইহাদের ঔষধ মিলে না। তাহারা অকালে প্রাণত্যাগ করে। আর যাহারা মৃত্যুর হাত হইতে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহারাও হীন, বিকলাঙ্গ এবং জীবন্মৃত।

তথাপি বাঙালা কৃষক সাহসী এবং শ্রমশীল। দুর্যোগে ইহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। পাটক্ষেত্রে জলে ডুবিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাট কাচে, হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত জনমানবহীন নদীচরে একাকী কর্ষণ করিতে যায়। 'চারদিকে জলরাশি, অফুরন্ত জলকল্লোল, তাহার মধ্যে একটু উচ্চ ডাঙার উপর একটি মাত্র কৃষক পরিবার। কৃষকবধূ, শিশুকে কোলে করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টির মধ্যে দূর হইতে দেখে পাটের

ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ডিঙা মসমসিয়া চালাইতে চালাইতে দুর্যোগ মাথায় করিয়া কৃষক ঘরে ফিরিতেছে'। এই চিত্র দুর্লভ নয়।

কিন্তু এ অচল অবস্থার সমাধান চাই। যে শোচনীয় পরাজয় আজ লক্ষ বাহু মেলিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়াছে তাহার হাত হইতে মুক্তির উপায় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনসাধারণের উদ্ধারের মধ্যে নিহিত নাই। যাহারা দেশের মেরুদণ্ড সেই অগণিত কৃষক সম্প্রদায়কে উন্নত করিতে হইবে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক চাষপ্রণালী প্রবর্তন করিতে হইবে। কৃষির সহিত শিল্পোন্নতি আবশ্যক। এমন সব কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহাতে কৃষিজাত কাঁচামাল ব্যবহৃত হইতে পারে। সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। ইহাদের উদ্দেশ্য হইবে, কৃষকের নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতি বিধান। এই সমিতিগুলি নিম্নহারে কৃষককে ঋণগ্রহণের সুবিধা করিয়া দিবে এবং "যৌথপণ্য বিক্রয় সমিতি"র দ্বারা ফসলের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া সর্বনাশী প্রতিযোগিতা হইতে কৃষককে রক্ষা করিবে।

সর্বশেষ কৃষকের ভগ্নহৃদয়কে আশার দৈববাণী প্রেরণ করিতে হইবে। স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপকরণ ও ব্যবস্থার দাবি করিবার অধিকার সকল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। সর্বনাশের মূল বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-শক্তিকে জয়যাত্রার পথে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

সুখের কথা, জাতীয় সরকার কৃষিকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। কৃষকগণকে জমিদার ও মহাজনদের শোষণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নূতন নূতন বিধান রচিত হইতেছে। কৃষকগণের জীবনমান ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে তাহাও আমরা লক্ষ্য করিতেছি। কৃষিকার্যকেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালার কুটীর-শিল্প

সূচনা—কুটীর-শিল্প কাহাকে বলে—কুটীর-শিল্পের সহিত যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা—কুটীর-শিল্পের পরাজয়—বাঙ্গালার কুটীর-শিল্প।

বাঙ্গালা পল্লীময় দেশ। শহরে বাস করিবার জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটা প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, ইহা নিতান্ত আধুনিক। বাঙ্গালী চিরদিনই পল্লীর শান্তিময় পারিবারিক জীবনেই সন্তুষ্ট ছিল। এই পল্লী-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল বাঙ্গালীর বিবিধ কুটীর-শিল্প। ইহার জন্য সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন ছিল না, কলকব্জার ব্যবহারও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আপন আপন পরিবারের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাঙ্গালী গৃহস্থগণ এক একটি কুটীর-শিল্প লইয়া থাকিতেন।

যন্ত্রজাত দ্রব্যাদি যত শীঘ্র প্রস্তুত হয় কুটীর-জাত দ্রব্যসমূহ তত শীঘ্র নির্মিত হয় না। তাহা ছাড়া কুটীর-শিল্প নির্মাণে শারীরিক পরিশ্রমের দরকারও বেশী। কিন্তু ইহাতে বহু লোকে কিছু কিছু কাজ করিতে পায় এবং তাহার দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করিতে পারে। কলকব্জার শিল্পে এই সুবিধাটি হয় না। সাধারণতঃ কোন ধনবান্ ব্যক্তি মূলধন দিয়া কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঐ কল-কারখানার মালিক হন। কল-কব্জার কাজে মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন তেমন না হওয়ায়, অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যেই বহু পরিমাণে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কল-কারখানায় উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য এইজন্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু কুটীর-শিল্প সমূহের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রম ও সময় সাপেক্ষ হওয়ায় তত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। ইহার ফলে কলের জিনিসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুটীর-শিল্পের পরাজয় ঘটিতেছে। বাঙ্গালার বহু কুটীর-শিল্প লোপ পাইয়াছে এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শীঘ্রই লোপ পাইবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। সঙ্গে কুটীর-শিল্পের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার যে অসংখ্য নর-নারী জীবিকা অর্জন করিত, তাহারা আজ নিরন্ন হইয়াছে, ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের কুটীর-শিল্পের কথা উঠিলে, বস্ত্রশিল্পের কথাই সর্বপ্রথম মনে পড়ে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মিত হইত। পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলে 'মস্‌লিন' নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, উহা ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। এই মস্‌লিন এখন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মস্‌লিন ছাড়াও বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানের তন্তুবায়গণ অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত। কার্পাসের তূলা হইতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা চরকায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ঐ সূতার দ্বারা শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের তাঁতীরা অতি সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিত। এখনও এই সব স্থানের তাঁতের কাপড় সর্বত্র আদর লাভ করে। কিন্তু কলে প্রস্তুত সস্তা মিহি কাপড় বাজারে প্রচুর আমদানি হওয়ায় বাঙ্গালার কুটীর-জাত বস্ত্রশিল্পের ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছে। শুধু সূতার কাপড় নয় মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে তুঁতপোকা ও এণ্ডিপোকা প্রভৃতির গুটি হইতে চরকায় সূতা প্রস্তুত করিয়া তাঁতে সুন্দর সুন্দর রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত,—এখনও হয়। কিন্তু বিদেশী সস্তা রেশমের বহুল আমদানি হওয়ায় বাঙ্গালার রেশম-শিল্প দ্রুতগতিতে লোপ পাইতেছে।

বহরমপুর, ইসলামপুর প্রভৃতি স্থানের পিতল ও কাঁসার থালা-বাসনও বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য কুটীর-শিল্প। এই শিল্পটি এখনও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ম ও কাঁচের বাসনের প্রচলন বাড়িয়া চলিয়াছে। এ জন্য কাঁসা-পিতলের ব্যবহারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিয়াছে। দেশী কামারেরা ঘরে বসিয়া লোহা পিটিয়া দা, কুড়ুল, বঁটি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-পাতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। বর্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চননগরের লৌহ-শিল্প প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার মৃৎশিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী গৃহস্থেরা মাটির হাঁড়ি, কলসী, সরা, কুঁজো প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী কুম্ভকারেরা এই সব জিনিস প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জন করে। মাটির পুতুল, খেলনা এবং দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতিও তাহারা গঠন করে। নদীয়া ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালী তৈলিকগণ ঘানির সাহায্যে সরিষা, তিল প্রভৃতি তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া থাকে। কলের তেলের আমদানি হওয়ায় ঘানির শিল্পটি একেবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বেরিবেরি রোগের

প্রাতুর্ভাব হওয়ায় দেশবাসীরা আবার ঘানির তৈল ব্যবহার করিতেছেন। এজন্য এই শিল্পটি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে পূর্বে মালাকারেরা ফুল দিয়া নানারকম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারিত। এই শিল্পটি এখন লুপ্ত হইয়াছে। মালাকার বা মালীরা এখন শোলার দ্বারা নানারকম ফুল প্রস্তুত করে। বিবাহাদি উৎসবে এখনও এই সব শোলার ফুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেশী মুচিরা যে জুতা প্রস্তুত করে, উহা উৎকৃষ্ট না হইলেও গরীব লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বাঁশ দিয়া ঝুড়ি, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা, বেতের সাহায্যে সুটকেশ বা পেটিকা প্রস্তুত করা, শাঁকা ও সোনা রূপার অলঙ্কার নির্মাণ, জাল ও দোলনা বোনা ইত্যাদি গৃহ-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা পূর্বে অতি সুন্দর সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। আজকাল কাঁথার আর সে আদর নাই। আধুনিক-রুচি ছাপাই চাদরকে কাঁথার উপরে আসন দিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতে কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রবর্তন করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারত আজ গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ভারত সরকার বিবিধ কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ

আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ—বাণিজ্য। বাণিজ্যই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে। সুদূর অতীতে মনুষ্য-সমাজ-গঠনের প্রারম্ভেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। পরস্পরের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যেই আদিম মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছিল। আদিম মানুষকে তাহার নিজের সমস্ত ঐহিক প্রয়োজনের সামগ্রী নিজের চেষ্টায় প্রস্তুত ও আহরণ করিয়া লইতে হইত। ইহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই পরস্পরের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রাকে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে মানুষ সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করিতে অভ্যাস করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজ-বন্ধনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কর্মবিভাগ

বা division of labour। এই কর্মবিভাগ-পদ্ধতির উৎকর্ষের ফলে আজ সভ্য মানুষ শুধু একটি কর্ম লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেছে। তাহার জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নরনারীর শ্রম ও কৌশলে উৎপন্ন হইয়া তাহার নিকট আনীত হইতেছে। নিজের জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রয়োজনের বস্তুর জন্য আজ আর ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে থাকিয়া প্রত্যেকেই আজ সমাজের সেবা করিতে পারিতেছে, যে কোনও সামাজিক প্রয়োজনের বস্তু উৎপাদন করিতে পারিলেই আজ তাহার কর্তব্য সমাধা হইতেছে।

এই ব্যবস্থা সৌকর্যের পিছনে যে সমস্ত উপযোগী শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, বাণিজ্য তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। সামাজিক ব্যক্তিকে সমষ্টির যোগসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া বাণিজ্যের কাজ। পরস্পরের উৎপাদন ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া বাণিজ্য সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। বাণিজ্যের উপযোগিতা প্রধানতঃ স্থানগত ও কালগত। বাণিজ্যের দ্বারা এক দেশের জনসাধারণ সুদূর দেশান্তরের পণ্যজাত ব্যবহার করিতে পারিতেছে। আবার বণিক সম্প্রদায়ই এককালের সামগ্রী কালান্তরের ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। যে কালে যে সামগ্রী সুলভ তাঁহারা সেই কালে তাহা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতেছেন। পরে যখন উহা দুর্লভ, তখন তাঁহারা সমাজের সেবার জন্য তাহা জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছেন।

এই সময়গত ও কালগত সুবিধার জন্য সমাজ বণিক সম্প্রদায়কে যে মূল্য দান করে, তাহাই তাঁহাদের লভ্যাংশ। এই লভ্যাংশ বণিকের ন্যায্য প্রাপ্য। সমাজ সেবায় তাঁহাদের কার্য অত্যন্ত মূল্যবান্। এইজন্য বণিকের যে সমৃদ্ধি তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত ধনাগম হইয়া থাকে। ইংরেজ জাতি বাণিজ্যের দ্বারাই আজ জগতে অতুল সম্পদের অধিকারী। আমেরিকা, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি আধুনিক উন্নতিশীল দেশগুলির বাণিজ্য-বৃত্তির দ্বারা নিজেদের ধনবৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের পণ্যবাহী বিরাট জাহাজগুলি সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া দুর্গম দেশে যাতায়াত করিতেছে, সুদূর দেশের দুর্লভ সামগ্রী স্বদেশে আনিয়া দিতেছে। আবার স্বদেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতেছে।

সাধুতা ও শ্রমই বাণিজ্যের উন্নতি-বিধায়ক গুণ। সাধুতা না থাকিলে বাজারে বণিকের প্রতিপত্তি থাকে না। কেহই তাহাকে বিশ্বাস করে না। আবার বাজারে যদি একবার সাধুতার প্রসিদ্ধি জমিয়া যায়, তবে অল্প মূলধনেও বাণিজ্যের উন্নতি করা যায়। শ্রমের দ্বারা বণিক সর্বাপেক্ষা কম মূল্যে বাজারে পণ্য সরবরাহ করিতে পারেন। যে স্থানে যে দ্রব্য সর্বাপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রীত হয়, সোজাসুজি সেই স্থান হইতে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলে মধ্যবর্তী বণিকদের লভ্যাংশ দিতে না হওয়ায়, বাজারে ন্যূনতম মূল্যে উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে। ন্যূনতম মূল্যে অধিক পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করাই বণিকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধিক বিক্রয়ের জন্য ইহাতে লাভের পরিমাণ মোটের উপর অধিকই হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে বাণিজ্যের বিশেষ সমাদর ছিল। সমাজে বণিকের প্রতিপত্তি ছিল রাজসম্মানের অব্যবহিত পরে। ভারতের বাণিজ্য-পোত সুনীল মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিত। ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করিয়া বস্ত্র-শিল্প এই ভারতীয় বাণিজ্য-বৃত্তির সাহায্যেই বিদেশীয় বাজারে সমাদর লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। মুসলমান আমলে ভারতীয় হিন্দু-সমাজে নানা কারণে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে সমাজে আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

এখনও আমরা বাণিজ্যে পরাঙ্মুখ। আমাদের দেশে কুটীর-শিল্প যে আজ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, দেশীয় বাণিজ্য-লোপ তাহার অন্যতম কারণ। আমরা কৃষিবল জাতি। শিল্পের দিকে আমাদের আগ্রহ কম। কৃষিকর্মের অব্যবহিত ফলস্বরূপ নিজ নিজ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকার ফলে আমাদের মধ্যে এক প্রকার কূপমণ্ডুকতা জন্মলাভ করিয়াছে। বাহির বিশ্বে যাতায়াত করিয়া দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্য চালাইবার আগ্রহ আমাদের মধ্যে কমিয়া গিয়াছে। ইংরেজ আমলে প্রধানতঃ বৈদেশিক বণিক-সমাজের প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে তাহার প্রসার ধীরে ধীরে বাড়িয়াছিল। আমাদের দেশের অনেক কাঁচা-মাল বিদেশে চলিয়া যায়। আমরা বর্তমানে এমন সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছি যাহার দ্বারা এখানেই এই সব কাঁচা মালের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি।

শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পর-সাপেক্ষ বৃত্তি। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিল্প-প্রসারের আগ্রহ দেখা যায়। আধুনিক কালে দেশে যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, দেশে বাণিজ্যের প্রসার তাহার প্রেরণা দান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। বাঙ্গালী সমাজে বাণিজ্যের আগ্রহ এখনও পুরামাত্রায় দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্রেরা চাকুরির জন্য উন্মুখ, দ্বারে দ্বারে চাকুরীর উমেদারি করিয়া বেড়াইতেছেন, বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই।

দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কবে আমাদের যুবকেরা বদ্ধ-পরিকর হইবেন?—কবে উমেদারি ছাড়িয়া ব্যবসায়ের দিকে তাঁহারা মন দিবেন?—কবে দেশের সুদিন আসিবে? দারিদ্র্যের কালো কুজ্‌ঝটিকা ছায়া আজ দেশের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। দিকে দিকে অনাহার দুর্ভিক্ষ,—অন্নবস্ত্রহীন নর-নারী একদা-সমৃদ্ধ শ্যামলশ্রী বঙ্গভূমির উপর কঙ্কাল দুঃস্বপ্নের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। বাণিজ্য-লক্ষ্মী কবে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিবেন,—দেশের সকল দুর্দশা দূর হইয়া যাইবে?

প্রবন্ধ-সংকেত

বাঙালাদেশে ধান চাষ ঃ—সূচনা—বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য।

চাষের বিবরণ—কখন আরম্ভ হয়, ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, গাছগুলি কতদিনে বড় হয়, কখন শস্য ধরে, কখন পাকে, কখন কাটা হয়।

চাষের অসুবিধা—জলের অভাব, সেচের অব্যবস্থা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, কৃষকগণের অজ্ঞতা ও দারিদ্র।

উপসংহার—ধানের সহিত কৃষকগণের অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সুতরাং কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক।

বাঙালাদেশের কৃষক ঃ—সূচনা—বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিকর্মের উন্নতির উপরেই বাঙ্গালার উন্নতি নির্ভর করে। কৃষকের দুর্গতির ফলে কৃষির অবনতি, বাঙ্গালাকে চিনিতে হইলে বাঙ্গালী কৃষককে জানিতে হইবে।

কৃষকের দুরবস্থা—দরিদ্র, অশিক্ষিত, লাঞ্ছিত, মহাজনের ঋণ এবং জমিদারের খাজনার ভারে পীড়িত, রোগ-জ্বালা লাগিয়াই আছে, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা নাই, শিক্ষার দ্বার একরকম রুদ্ধ।

প্রতিকার—প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার, সমবায় আন্দোলন, আইন প্রণয়ন করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন।

উপসংহার—শিক্ষিত সমাজ কৃত্রিম সভ্যতার মোহে পড়িয়া কৃষিকর্মকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন। এই মিথ্যা ধারণা দূর করিতে হইবে। কৃষককে চাষা বলিয়া অশ্রদ্ধা করিলে চলিবে না। যে সম্মান হইতে এতদিন তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে সেই সম্মান কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে, তবে দেশের উন্নতি।

———

—অষ্টম পরিচ্ছেদ—

বর্ষাকাল

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩১]

[সূচনা—সময়—আকাশ ও প্রকৃতির অবস্থা—সুবিধা ও অসুবিধা—উপসংহার।]

বৎসরের ছয়টি ঋতুর মধ্যে বর্ষা একটি। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস লইয়া বর্ষাকাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা গ্রীষ্ম ঋতুরই অন্তর্গত। তবে এই সময়ে দক্ষিণ দিক হইতে মৌসুমী বাতাস প্রবাহিত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সময়টাকে বর্ষা ঋতু বলা হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাত যে শুধু বৎসরের এই দুইটি মাসেই হইয়া থাকে, তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের পনের দিন হইতেই কোন কোন বৎসরে বর্ষাকাল রীতিমত শুরু হইয়া যায়। আবার এদিকে পুরা ভাদ্র মাস এবং কখনও কখনও আশ্বিনেরও প্রথমাংশকে বর্ষা-কালেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

বর্ষাকালের আকাশ থাকে মেঘে ঢাকা, সেই মেঘ হইতে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। কখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, কখনও বা সারাদিন ধরিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া অল্প অল্প বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। কখনও কখনও বজ্রপাত হয়। মাঝে মাঝে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া উজ্জ্বল সূর্যালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়। আবার হয়ত পরক্ষণেই আকাশ মেঘাবৃত হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে।

বর্ষাকালের নদী কূলে কূলে ভরা থাকে। বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে প্রায় প্রতি বৎসরই বান ডাকে। নদীর জল কূল ছাপাইয়া অনেক দূর অগ্রসর হয়। নদীতীরবর্তী গ্রামগুলি অনেক সময় জলে প্লাবিত হইয়া যায়। ইহার ফলে গ্রামবাসিগণের ক্লেশের সীমা থাকে না। গোচর-ভূমি জলে প্লাবিত হওয়ায় গো-মহিষাদির খাদ্যাভাব ঘটিয়া থাকে। যে বৎসর বর্ষাকালে জল-প্লাবন হয়, সে বৎসর ধান্যাদি শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ এই সময় পল্লী-প্রকৃতিতে অপূর্ব সৌন্দর্য সঞ্চার হইয়া থাকে। গ্রীষ্মাতপ-তপ্ত বৃক্ষ-লতাগুলি যেন বর্ষার বারিধারা সিঞ্চনে নব প্রাণ লাভ করে। বর্ষাবারি-বিধৌত প্রকৃতির উজ্জ্বল

শ্যামলবর্ণ সকলেরই মনে আনন্দ দান করিয়া থাকে। চারিদিকেই ভেকের কলরব শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ষার জলে ইহাদের অপার আনন্দ।

বর্ষাকালের অসুবিধা কম নয়। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও বর্ষাকালে বাঙ্গালাদেশের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। বর্ষাকালে পল্লীবাসীর জীবন যেন দুর্বহ হইয়া উঠিত। অবশ্য অভ্যাস-বশে পল্লীবাসীরা ইহাতে তেমন কষ্ট বোধ করিতেন না। কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ত প্রায় সারা বর্ষাকালটা ধরিয়া বন্ধ থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়েরা পাঠশালা প্রায় প্রত্যেক দিনই বন্ধ রাখিতেন। নদীগুলি অত্যন্ত স্ফীত হওয়ায় ও স্রোতাবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, জলপথে চলাচল এক প্রকার বন্ধ থাকিত। পল্লীপথগুলি বর্ষার জলে ও কাদায় অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিত। গৃহস্থেরা কেবল নিজ নিজ বাটীর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেন এবং বাজে গল্প করিয়া কোনমতে আলস্যময় দিনগুলি কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু আজকাল পথঘাটের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু উন্নত হইয়াছে। বাঙ্গালার বহু স্থানে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে, বড় বড় রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। নদীপথে ষ্টিমার যাতায়াত করিতেছে। অতি-দূরবর্তী পল্লীগ্রামগুলি ছাড়া, বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই এখন বর্ষাকালেও বৎসরের অন্যান্য সময়ের ন্যায় কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে। তবে এখনও বাঙ্গালাদেশে এমন অনেক পল্লীগ্রাম আছে, যেখানে সেই প্রাচীন অবস্থা এখনও অব্যাহত আছে।

বর্ষাকালে স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকে না। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগটি এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠে। বর্ষার জলে গাছের পাতা ও পরিত্যক্ত আবর্জনাদি পচিয়া অনেক মশা জন্মে। এই মশা ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার করে। এই সময়ে সাপ ও শৃগালের উৎপাতও বাড়িয়া যায়। ভাল খাবার জিনিস ত একরকম পাওয়াই যায় না। জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়া যায়।

কিন্তু সুবিধাও আছে। বর্ষাকালই ধান্যরোপণের মরসুম। ধান্য বাঙ্গালীর জীবন-স্বরূপ। বৃষ্টির জল না পাইলে ধানগাছ জন্মিতে পারে না। গ্রীষ্মের অত্যধিক উত্তাপে ধরিত্রী যেন তৃষিত হইয়া থাকেন। গাছের পাতা, পৃথিবীর ঘাস, সবই জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। সকল প্রাণীই যেন তৃষ্ণার্ত হইয়া প্রাণের দায়ে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। এইরূপ তৃষ্ণা-পীড়িত ধরিত্রীর শুষ্ক বক্ষে প্রাণ সঞ্চার করিয়া বর্ষা বিধাতার আশীর্বাদের ন্যায় নামিয়া আসে, পৃথিবী শীতল হয়। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন কোমলতা সঞ্চারিত হয়। গগন, পবন যেন

সজীব হইয়া উঠে। আষাঢের প্রথম নববর্ষা যেন বিচিত্র উৎসবের রঙিন বেশে অপূর্ব সমারোহের সহিত ধরিত্রীর বুকে নামিয়া আসে। প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্যন্ত নববর্ষার আগমন এই জন্য কবিগণের দ্বারা বিপুল সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া আসিতেছে।

পৃথিবীতে এমন কিছু নাই—যাহা নিছক সুখের। সুখের পিছনে দুঃখ অবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই বর্ষারও দুঃখক্লেশ আছে। কিন্তু বর্ষা জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণময়ী, ইহা ধরণীর প্রাণ-স্বরূপা। বর্ষা-রূপে দেবতার স্নেহধারা যেন ধরিত্রীর সকল দাহ জুড়াইয়া দিয়া যায়। তাই মেঘের গুরু-গুরু গর্জনে যেন কি এক বিপুল ভরসা সূচিত হয়, ধরিত্রীর অঙ্গ যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, ভেক ডাকিয়া উঠে, অপরিমেয় পুলকে ময়ূর বিচিত্র কলাপখানি বিস্তারিত করিয়া বর্ষার আবাহন করে।

আমার প্রিয় ঋতু

[সংকেত :—সূচনা—সময়—আকাশ ও প্রকৃতির অবস্থা—সুবিধা—আনন্দ—দুর্গাপূজা—অসুবিধা—উপসংহার।]

(বঙ্গে শরৎ)

সংবাদের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে বৎসরে কোন ঋতুই বিশেষ অপ্রীতিকর নয়—প্রত্যেক ঋতুতেই কিছু কিছু অসুবিধার সঙ্গে নানাপ্রকার সুখ-সুবিধাও রহিয়াছে। তবে বাঙ্গালাদেশে শরৎকাল যেন মূর্তিমান সুন্দরের বেশ ধরিয়া উপস্থিত হয়। চারিদিকেই সৌন্দর্য, চারিদিকেই আনন্দ। সেই আনন্দের বন্যায় দুঃখ-দারিদ্র্যের বেদনা যেন কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। তাই আমি বৎসরের ঋতুগুলির মধ্যে শরৎকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি।

ভাদ্র আর আশ্বিন, এই দুইটি মাসকেই শরৎকাল বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ বৎসরেই ভাদ্রের প্রথম দিকেও বর্ষাকালের জের

থাকে। তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে, রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত থাকে। কিন্তু ভাদ্রের প্রথমার্ধ গত হইলেই ঋতুর পরিবর্তন সূচিত করিয়া আকাশ নির্মল ও নির্মেঘ হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে আকাশের নীলিমা যেরূপ গাঢ় হয়, বৎসরের অন্যান্য ঋতুতে সেরূপ দেখা যায় না। নাতিশীতোষ্ণ বাতাস বহিতে থাকে। প্রভাতে বেড়াইতে বাহির হইলেই ঘাসের উপর অল্প অল্প শিশির দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিশিরাসার-শীতল মৃদু-মন্দ সমীরণ যেন বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনে। বর্ষাবারি-বিধৌত প্রকৃতিদেবী যেন একখানি সবুজ রঙের শাড়ী পরিয়া, শেফালী কবরীর মালায় সাজিয়া থাকেন। কূলে-কূলে ভরা নদীর জলে প্রভাতের সোনালী সূর্যরশ্মি যেন রাশি রাশি সোনা ঢালিয়া দিয়া যায়। বাঙ্গালার সর্বত্রই যেন একটা নবজীবন সঞ্চারিত হয়। মাঠে মাঠে হৈমন্তিক ধান্য গাঢ় হরিদ্বর্ণের শোভা বিস্তার করিয়া পল্লীবাসীর কৃষকের বক্ষ আশার আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেয়। নদীতীরের কাশবনে রাশি রাশি ফুল যেন প্রকৃতির অঙ্গে শ্বেত চামর দোলাইতে থাকে। আলো-ছায়ায়, ফুলে-পাতায় বনভূমি যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মায়া সৃষ্টি করে। আকাশে সাদা সাদা জলহারা মেঘখণ্ডগুলি যেন নবনীর মত দেখায়। শেফালি, কামিনী ও যুঁই ফুলের প্রাচুর্যে কানন-ভূমি আমোদিত হইয়া উঠে। দোয়েল-কোয়েল প্রভৃতি যে সকল বন-বিহঙ্গ বর্ষার জলে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে, আজ বর্ষা উপশমে শরতের সুবর্ণ রৌদ্রে তাহারা যেন নূতন প্রাণ লাভ করে। তাই বৃক্ষে বৃক্ষে, নদীর তীরে, গৃহস্থবাড়ীর চালে তাহারা মনের সুখে উড়িয়া বেড়ায়—গলা ছাড়িয়া গান ধরে।

পথঘাটের কাদা শুকাইয়া যায়। যাতায়াতের সুবিধা হয়। গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্যতাপে বাঙ্গালাদেশের অনেক নদীই শুকাইয়া বিদীর্ণবক্ষ হইয়া থাকে। আবার বর্ষাকালে ঐসব নদীতে প্রবল বন্যার স্রোত বহিয়া যায়। তখন সেই খরস্রোতের উপর দিয়া নৌকা চালান দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু শরৎকালে ঐসব নদীতে জলের স্রোত কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া যায়। সুতরাং নৌকাদি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। এজন্য বাঙ্গালার কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদি গ্রাম্য লোকেরা নৌকাযোগে শহরে লইয়া বিক্রয় করিবার সুবিধা পায়। জল ও স্থল এই উভয় পথেই যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায়, এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের বেশ সুবিধা হয়।

সুদীর্ঘ বর্ষাকালের অবসানের জন্যই হউক, অথবা মাঠ-ভরা হৈমন্তিক ধান্যে কৃষিজীবী বাঙ্গালীর প্রাণে যে বিপুল আশার সঞ্চার করে, তাহার জন্য হউক, শরৎকাল বাঙ্গালার একটা নবজীবনের আনন্দকে রূপ দান করে বলিয়া বাঙ্গালাদেশে এই সময় নানা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। দুর্গাপূজা এই সব উৎসবের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহার অপেক্ষা আনন্দজনক উৎসব বাঙ্গালা-দেশে আর নাই। উৎসবের মধ্যে বাঙ্গালী যে কেমন করিয়া সারা প্রাণটি ঢালিয়া দিতে পারে, কি ভাবে এই বিপুল আনন্দের স্রোতে বাঙ্গালী তাহার সকল দৈন্য, সকল দুঃখ নিঃশেষে ভাসাইয়া দিতে পারে তাহা যিনি বাঙ্গালার দুর্গাপূজা না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। বিদেশবাসী বাঙ্গালী—যিনি যেখানেই থাকুন এই দুর্গোৎসবের আনন্দের অংশ লইবার আগ্রহে ঘরে ফিরিবার জন্য যে কি প্রকার ব্যগ্র হইয়া উঠেন, ট্রেনের ও ষ্টিমারের দারুণ ভিড়ই তাহার নিদর্শন।

শুধু পত্রপুষ্পময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য দিয়া শরৎ শুধু যে বাঙ্গালীর মনকেই আনন্দ দেয় তাহা নয়, বাঙ্গালার পেটের ক্ষুধা নিবারণের উপযোগী ফল-শস্যের ডালাও সে পূর্ণ করিয়া রাখে। শরৎকালে আউষ ধান পাকে। শরৎকালের ফলের মধ্যে নারিকেল, বাতাপি নেবু, শশা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এ সংসারে অবিমিশ্র সুখ কিছুতেই নাই। সুখের সঙ্গে দুঃখ চিরদিনই অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এমন যে সুন্দর শরৎকাল—এমন যে তাহার নির্মল আকাশ, মনোহর জ্যোৎস্না, এত ফুল-ফল,—সমস্তই ম্লান হইয়া গিয়াছে একটি দুঃখে। ইহা ম্যালেরিয়া। শরৎকালেই ম্যালেরিয়ার জন্ম। বর্ষাকালের জল পল্লীর খানা-ডোবায় সঞ্চিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে প্রচুর মশক জন্মলাভ করে। ইহারাই ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তার করিয়া থাকে। এই রোগে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র পল্লীবাসী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহাতেই শরৎকালের সকল আনন্দ ম্লান হইয়া গিয়াছে। পল্লীবাসীরা এই সময়ে এই ভীষণ জ্বরের ভয়ে সশঙ্ক হইয়া কাল কাটায়।

শরৎকালের দুঃখ কিছু কিছু থাকিলেও সুখের তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর। মোটের উপর সব দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, শরৎকেই বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ ঋতু বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রবন্ধ-সংকেত

ভারতের ষড়্‌ঋতু ঃ—সূচনা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, হেমন্ত, শরৎ ও বসন্ত। প্রত্যেক ঋতুর স্থায়িত্ব—মোটামুটি হিসাবে দুই মাস করিয়া প্রত্যেক ঋতুর বিশেষত্ব—প্রাকৃতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, চাষবাস, উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বাঙ্গালাদেশে শীতকাল ঃ—সূচনা—পৌষ-মাঘ শীতকাল, তবে কার্তিক-অগ্রহায়ণ হইতেই শীত আরম্ভ হয়।

প্রাকৃতিক অবস্থা—আকাশ নির্মল, রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর নয়, দিন ছোট, রাত্রি বড়। গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে, সেইজন্য প্রকৃতির দৃশ্য তত মনোরম থাকে না, নানারকম ফল ও তরি-তরকারি পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য—শীতকালে সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মানুষের কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বসন্তকাল ঃ—সূচনা—ফাল্গুন-চৈত্র।

প্রাকৃতিক অবস্থা—শীতের প্রবলতা কমিয়া আসে গ্রীষ্মের উত্তাপও অধিক নয়, নানা ফুলে প্রকৃতি সুসজ্জিত হয়। কোকিলের গান, ভ্রমরের গুঞ্জন।

স্বাস্থ্য—এই সময় স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে, তবে হঠাৎ গরম পড়িতে আরম্ভ হইলে বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

উৎসব—দোলযাত্রা, বাসন্তীপূজা।

'বঙ্গে বর্ষা'—এই বিষয় অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুর্গাপূজা

[সূচনা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ইহার আনন্দ—আমোদজনক আয়োজন—উপসংহার।]

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাঙ্গালার পল্লীগুলি যেন অকস্মাৎ নবপ্রাণ লাভ করে। চারিদিকের বর্ষা-বিধৌত শ্যামল পত্র-পল্লব যেন কি একটা বিপুল সম্ভাবনার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইয়া উঠে। নদীর চরে কাশফুলের রাশি, সরোবরে কুমুদ-কহ্লার, বনে বনে শেফালি, টগর, অপরাজিতা ফুটিয়া উঠে, নির্মল আকাশে চন্দ্র-সূর্যের আলো কি একটা সঞ্জীবন মন্ত্রের মায়া-জাল বুনিয়া যায়। এমনি সময়ে পল্লীবাসীর অন্তরকে উদ্বেল করিয়া তুমুল রবে ঢাক বাজিয়া উঠে। দুর্গাপূজা আসিয়াছে।

আশ্বিনের শুক্লপক্ষটির নাম 'দেবী-পক্ষ',—এই পক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী আদ্যাশক্তির পূজা হয়। সত্য যুগে মেধস্ ঋষির আশ্রমে মহারাজ সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য এই দৈত্য-সংহারিণী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি বসন্তকালেই এই পূজার অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু ত্রেতা যুগে রাক্ষসের ঘরে বন্দিনী সীতাদেবীর উদ্ধারকল্পে রামচন্দ্র বিপদে পড়িয়া শরৎকালেই এই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পূজার পর হইতে শরৎকালেই এই পূজার বিধান হইল। বাঙ্গালী হিন্দুরাই এই প্রথার মতে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। ভারতের অন্য কোথাও ইহার প্রচলন নাই। পূজার সাতেক দিন পূর্ব হইতেই পুরোহিত মার্কণ্ডেয় মুনি-বিরচিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামক দেবী-মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রণালী বৃত্তান্ত-সম্বলিত পবিত্র সংস্কৃত গ্রন্থ স্তব করিয়া পড়িতে থাকেন। তারপর শুক্লষষ্ঠী তিথিতে বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিচিত্র পদ্ধতিতে বিবিধ নৈবেদ্য ও উপচারে মহাসমারোহে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। দেবী ভগবতী বিশ্ব-শক্তি-স্বরূপিণী। এজন্য তাঁহার পূজায় পশু-বলির বিধান আছে। শুনা যায়, এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালাদেশে দেবীপূজা উপলক্ষ্যে শুধু ছাগল ও মহিষ নয়, নরবলিও হইত।

কিন্তু সেদিন আর নাই। এখন দেবীর সম্মুখে শুধু ছাগবলি দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও ছাগবলির প্রথাও উঠিয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে পশুর পরিবর্তে শুষ্ক আখ, মানকচু, কুমড়া প্রভৃতি বলি হয়। এই নূতন মনোবৃত্তিটি প্রশংসনীয়। জগজ্জননীর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই জীব-সন্তানগুলিকে নির্মমভাবে হত্যা করায় কিছুমাত্র পুণ্য বা ধর্ম অর্জন হইতে পারে না।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে উৎসব ও আনন্দের কথা এইবার বলিতে হয়। দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙ্গালী জাতির সমস্ত প্রাণ যেন সারাটি বৎসর ধরিয়া এই উৎসবের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। তাই আশ্বিন মাস পড়িতে না পড়িতেই বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণ একটা অপূর্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যিনি কর্ম উপলক্ষ্যে প্রবাসে থাকেন, তিনি ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হন। বালক-বালিকারা অপরিসীম উৎসাহে পূজাবাড়ীতে আসিয়া ভিড় জমায়।

বিদেশবাসী ছাত্রেরা দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করেন। পূজার প্রায় এক মাস পূর্ব হইতেই কুমারেরা মাটি দিয়া ঠাকুর গড়িবার কার্যে প্রবৃত্ত হয়। গ্রামবৃদ্ধেরা হুঁকা হাতে করিয়া প্রায়ই সেখানে সমবেত হন এবং প্রতিমার সমালোচনা ও খোস গল্প করিয়া দিন কাটাইতে থাকেন। পূজার সময় সকলেই নূতন কাপড়-চোপড় পরিধান করে। এমন কি যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারাও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন কাপড় কিনিয়া আনে। পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজিলেই বালক-বালিকারা সেই নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেখানে গিয়া সমবেত হয়। বালক-বালিকাদের ঠেলাঠেলি ও চেঁচামেচিতে পূজাবাড়ীটি সর্বদাই সরগরম থাকে। দুর্গাপূজা ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, ইহাতে এত অধিক উপকরণ-সম্ভারের প্রয়োজন হয় যে, ধনবান্ ভিন্ন কেহই এই পূজা করিবার সঙ্কল্প করে না। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠাতা ধনবান ব্যক্তি প্রায়ই গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকলকেই আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, পূজার তিনটি দিন পূজাবাড়ীতে ছাড়া গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতে হাঁড়ি চড়াইতে হয় না। গ্রামবাসীরা সকলেই পূজাবাড়ীতে প্রায় সর্বদাই উপস্থিত থাকেন,—পূজার অনুষ্ঠানটিকে তাঁহারা সকলেই নিজের বাড়ীর কাজ বলিয়া মনে করেন। যাহাতে পূজার কোথাও কিছু খুঁত না থাকে, কোন বিষয়েই কোন অঙ্গহানি না ঘটে, সেদিকে সকলেই নজর রাখেন।

পূজার বাড়ীতে গৃহস্বামী প্রায়ই সাধ্যমত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেন। কোথাও বা যাত্রাগান হয়, কোথাও কীর্তন বা ঢপ, কোথাও বা কবির গান হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে এই সময়ে লাঠিয়ালেরা পূজাবাড়ীতে আসিয়া লাঠিখেলার নানাবিধ কসরৎ দেখান। আজকাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই যুবকেরা মিলিয়া সখের নাট্যসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামের এই নাট্যসমিতিগুলি অনেক সময়ে পূজাবাড়ীতে নাটকাভিনয় করিয়া থাকে। ইহা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জিত হয়। নিকটবর্তী কোন কোন নদীতে অথবা পুষ্করিণীতে প্রতিমাগুলিকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ করা হয়। এই দৃশ্যটি অতি করুণ সমবেত নরনারীর প্রায় প্রত্যেকেরই চক্ষু এই সময় সজল হইয়া উঠে। প্রতিমা বিসর্জন করিয়া ভক্তেরা সেই শূন্য মণ্ডপে ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া ফেলেন। প্রতিমা-বিসর্জনের পর সকলেই আত্মীয়-স্বজনের সহিত কোলাকুলি করেন, সকলেই নিজ নিজ গুরুজনকে প্রণাম করেন। কাহারও বিরোধ থাকিলে অনেক সময় তাহা এই মিলনের আনন্দে বিস্মৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেকেই বন্ধু-বান্ধবকে সাধ্যমত 'মিষ্টিমুখ' করাইয়া থাকেন। এইরূপে বিপুল আনন্দে বাঙ্গালীর ঘরে পূজার কয়েকটি দিন সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া যায়।

পঁচিশে বৈশাখ

প্রতিবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরে আমরা তাঁহার উদ্দেশে ভক্তির অর্ঘ রচনা করি।

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার বলিয়া নয়—মহত্তের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিজেদের সেই মহত্ত্বে মণ্ডিত করিবার নিমিত্তই ইহার অবতারণা।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান তাই একান্তই অন্তরের প্রেরণায়। আমাদের জীবনের এটি একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি, ভারতের

কবি, বিশ্বের কবি। জানি না কত সুকৃতির ফলে আমরা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলাম। তাই তাঁহার জন্মোৎসবে আমরা মাতিয়া উঠি। আমরা সব স্কুলের ছাত্র। একদিন প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঘোষণা করিলেন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই দিনটির নিমিত্ত আমরা উন্মুখ হইয়া থাকি। বার মাসের তের পার্বণের মধ্যে কবিগুরুর জন্মদিনও আমাদের জাতীয় উৎসবের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের বাংলা ভাষার শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে হাজির হইলাম। তিনি আগ্রহভরে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে আবৃত্তি করিবার নিমিত্ত কয়েকটি কবিতা বাছিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে বিশ্বকবির জন্মদিনটিকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত আমাদের মধ্যে প্রবল সাড়া পড়িয়া গেল। আবৃত্তির মহড়া চলিতে লাগিল এবং কয়েকজন সুকণ্ঠ সহপাঠি একজন সঙ্গীতজ্ঞের নিকট যাইয়া রবীন্দ্রনাথের রচিত গীত শিখিতে লাগিলেন।

আয়োজন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল। অবশেষে সেই চিরবাঞ্ছিত দিনটি আসিয়া পড়িল। ২৫শে বৈশাখ 'ভোর' হইল। প্রত্যুষে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়াছিলাম—২৫শে বৈশাখের প্রথম সূর্যরশ্মি আমার ললাট অভিষিক্ত করিল। আমি পুলকিত অন্তরে উঠিয়া আসিলাম। সূর্য প্রত্যহই উঠেন, তাঁহার কিরণজাল প্রত্যহই সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে—এ ত নিত্যনূতন ব্যাপার। কিন্তু আজ ঐ চির পুরাতন সূর্যকেই যেন কোন অনির্বচনীয় আনন্দের অগ্রদূত বলিয়া মনে হইল। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রতি পদক্ষেপেই মনে হইতেছিল বহু বৎসর পূর্বে এমনি একদিনেই বিধাতা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেদিনের আকাশ বাতাস কি এই বিশ্ব মানবকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আজিকার অপেক্ষা কোন বিচিত্রতর সাজে সজ্জিত হইয়াছিল? স্কুলের ছাত্রগণ সকলেই সমবেত হইয়াছিল। আমাদের উৎসবের সময় নির্ধারিত হইয়াছিল সায়াহ্ন। প্রশস্ত হল ঘরটিকে লতাপাতা ফুলে চিত্রিত করা হইল। পল্লীগ্রামে আমাদের বাস—এখানে এই জিনিসগুলি প্রচুর। শহরে যেমন অট্টালিকার ভিড় এখানে তেমনি স্বচ্ছন্দ বনজাত বৃক্ষের প্রাচুর্য। হলের একপার্শ্বে সভাপতির আসন এবং তাহারই সম্মুখে অনুচ্চ বেদীর উপর বিশ্বকবির প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত হইল। অতঃপর অতিথিগণের নিমিত্ত আসন রচনা করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

সায়াহ্নের পূর্বেই আমরা পুনরায় সভাগৃহে সমবেত হইলাম। প্রায়ান্ধকার গৃহের সেই বিচিত্র রূপরাশি আমার মনে তেমনি ভাবেই মুদ্রিত আছে। ক্রমে ছাত্রবন্ধুগণ আসিলেন। অতিথি অভ্যাগতে গৃহ পূর্ণ হইল। অবশেষে সভাপতির আগমনে আমরা উৎসব আরম্ভ করিলাম।

কার্যসূচী পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছিল। একটি শিশুছাত্র বিশ্বকবির কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া দিল। আমরা সকলে শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অতঃপর সংস্কৃতসাহিত্যের শিক্ষক মহাশয় বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন। তাঁহার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর আকাশের স্তর ভেদ করিয়া যেন কোন ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিতেছিল। মনে হইতেছিল অসংখ্য প্রদীপজ্বালা এই সভাগৃহে আমরা ও যাহারা সমবেত হইয়াছেন তাহারা সাধারণ মানুষ নয়—বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ আশীর্বাদে নিমিষের মধ্যে আমরা এক একটি বিরাট পুরুষে পরিণত হইয়াছি—এই জগতে যাহাদের অসাধ্য কিছু নাই, অজেয় কেহ নাই।

বেদমন্ত্র ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। এইবার আবৃত্তি এবং সঙ্গীতের পালা, আমরা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, সুতরাং উৎসবের এই অঙ্গটিতে আমাদের অভিনয় সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অতঃপর বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র বিশ্বকবির জীবনী লইয়া আলোচনা করিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথের কথা বলিলেন। এবদ যে বিরাট মহীরুহ হিমালয়ের বক্ষ আশ্রিত দেবদারুর মত ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত হইয়াছিল—তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল এই ২৫শে বৈশাখ। সে আজ বহু বৎসর পূর্বের কথা; সেটা ১২৬৮ সাল।

ক্রমে সেই অঙ্কুর এক শিশুবৃক্ষে পরিণত হইল। ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্তী পুষ্করিণীতে স্নানার্থীগণের ভীড় দেখিতে দেখিতে বালক কবি সময়ের হিসাব ভুলিয়া যাইতেন। পালকীর ভিতরে বসিয়া মনে করিতেন সেটা একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া, তিনি তাহার সওয়ার—কোন স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অনির্দেশের পানে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছেন ত' চলিয়াছেন; সে যাত্রার আর সীমা নাই, শেষ নাই।

প্রভাত রবিই দ্বিপ্রহরের ভাস্করমূর্তির সূচক। মধ্যাহ্নের যে পরিণত সূর্য ধরণীর কন্দরে কন্দরে আলোর বারতা পাঠাইয়া দেয়, প্রভাতের অরুণরাগরঞ্জিত আকাশ হইতেই তাহার পরিচয় মিলে। বিশ্বকবির উত্তর জীবনের

সার্থকতার পশ্চাতে ছিল তাঁহার শৈশব কৈশোরের অদম্য বাসনা এবং অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা।

তারপর কেমন করিয়া এই মহামানব ধীরে ধীরে স্বীয় সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সভাপতি মহাশয় আমাদের তাহা শুনাইলেন। তীর্থযাত্রীর মতই তিনি মানব রাজ্যের যুগ যুগান্তে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার চিরন্তন আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানলোকে অজ্ঞানতার অন্ধতমসাচ্ছন্ন গহ্বরও আলোকিত হইয়াছিল। আজ রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার বিপুল কীর্তি তাঁহাকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে, সমাজে, ভাবনায়, কল্পনায় প্রতিনিয়ত তাঁহার প্রভাব অনুভব করিতেছি। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি—তিনি স্বর্গ হইতে আমাদের আশীর্বাদ করিবেন।

সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণ শেষ করিলেন। মনে নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। নিমন্ত্রিতগণ সভাত্যাগ করিলেন। সাফল্যের আনন্দে পুলকিত হইয়া আমরাও গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

মহর্‌রম

[সূচনা—মহররম মাসের সহিত বিজড়িত পুণ্যস্মৃতি—এমাম হাসান ও এজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—কারবালার যুদ্ধ—ঐ যুদ্ধের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে মুসলমানদের অনুষ্ঠান—উপসংহার।]

আরবীয় বৎসরের প্রথম মাস 'মহর্‌রম' এই মাসটি বহু পুণ্যস্মৃতিতে মণ্ডিত হইয়া আছে। ঈশ্বর এই মাসেই নাকি বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মাসেই মানবের আদি পিতা আদমের জন্ম হয়, এই মাসেই হজরত নূহ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যে করুণ স্মৃতিটি এই মাসটিকে মানুষের হৃদয়ে চিরদিনের স্থায়ী আসন প্রদান করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত শোকাবহ!

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের দৌহিত্র এমাম হাসান ও এমাম হোসেন হজরত আলির পুত্র। হজরত আলি মুসলমানগণের নেতা বা 'খলিফা'

নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দামেস্কের শাসনকর্তা মহাত্মা মাবিয়ার সহিত এই সময়েই হজরত আলির খলিফা পদ লইয়া একটা গোলযোগের সূত্রপাত হয়। আলির মৃত্যুর পর মাবিয়া দামেস্কের খলিফা এবং এমাম হাসান মদিনায় খলিফা নির্বাচিত হইলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একটা অবাঞ্ছনীয় বিরোধের অবসান করিবার জন্য হাসান মাবিয়াকেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং নিজে মদিনার খলিফার পদ পরিত্যাগ করিলেন। স্থির হইল, মাবিয়ার মৃত্যুর পর এমাম হাসানই খলিফা হইবেন।

মাবিয়ার পুত্র এজিদ অত্যন্ত দুরাচার ছিল। সে দেখিল মাবিয়ার মৃত্যুর পর খলিফার গৌরবজনক পদে হাসানই নিযুক্ত হইবেন। এমাম হাসান ও এমাম হোসেনকে বধ করাই তখন তাহার একমাত্র সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইল। দুর্বৃত্ত এজিদ তখন এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগে এমাম হাসানকে হত্যা করিল। মাবিয়া অগত্যা মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র এজিদকে খলিফা মনোনীত করিয়া গেলেন। কিন্তু এমাম হোসেন দুরাচার এজিদকে খলিফা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হইল। এজিদ এমাম হোসেনকে বশীভূত করিবার জন্য নানারকমের আয়োজন করিল, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিল। এমাম হোসেন তখন মদিনা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে মক্কা নগরীতে গমন করিলেন। সেখান হইতে আবার তিনি সাহায্যলাভের আশায় কুফানগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে 'কারবালা' নামক সুবিশাল প্রান্তর। উহার মধ্য দিয়া 'ফোরাত' বা 'ইউফ্রেটিস্' নদী বহিয়া চলিয়াছে। এমাম হোসেনের কুফা-গমনের পথ বন্ধ করিবার জন্য এজিদ একদল সৈন্য প্রেরণ করিল। ফোরাত নদীর তীরে সেই সেনাদল এমাম হোসেন ও তাঁহার অনুচরবর্গের পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়াইল। সম্মুখের পথ রুদ্ধ দেখিয়া এমাম হোসেন মক্কায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু এজিদের সেনাপতি তাঁহাকে জানাইল যে, এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহাকে মক্কায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। এমাম হোসেনের সঙ্গে মাত্র বাহাত্তর জন সঙ্গী। তাহা ছাড়া স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা সমন্বিত তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারও তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া এমাম হোসেন সম্মুখ-যুদ্ধে আত্ম-বিসর্জন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কোমলপ্রাণ বালক-বালিকারা এবং তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ মৃতপ্রায়

হইলেন। তবু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। একে একে তাঁহার অনুচরগণ ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই সেই ভীষণ যুদ্ধে আত্মবিসর্জন করিলেন। অবশেষে এমাম হোসেনও সম্মুখ-সমরে বীরের মত প্রাণ দিলেন।

এই ভীষণ ধর্মযুদ্ধের হৃদয়বিদারক পরিণাম স্মরণ করিয়া আজিও জগতের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় অশ্রু বিসর্জন করেন। শুধু মুসলমান কেন, এমাম হোসেনের বীরোচিত আত্মবিসর্জন পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের কাছেই পরম শ্রদ্ধার বস্তু। যে শোচনীয় অবস্থায় এমাম হোসেনের পরিবার সেই ভীষণ 'কারবালা' প্রান্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইলেন, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, মানুষ মাত্রই ব্যথিত না হইয়া পারে না। হজরত মহম্মদের শিষ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের হাতেই যে তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র এইরূপ কঠোর নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা পরম পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই।

মহররম মাসেই হৃদয়বিদারক ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। তাই আজিও যখন মহররম মাস আসে, তখনই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয় বেদনা বিধুর ও নয়ন অশ্রু-সজল হইয়া উঠে। আজিও তাঁহারা সেই পরম শোকাবহ ব্যাপারটিকে স্মরণ করিয়া শোক প্রকাশ করেন। মুসলমানদের 'শিয়া'-সম্প্রদায়ই এই উপলক্ষ্যে যথেষ্ট সমারোহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দশদিন যাবৎ 'রোজা' অর্থাৎ উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া তৃতীয় দিবসে বিরাট শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া, কারবালা প্রান্তরের সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পুনরাভিনয় করিয়া থাকেন। 'সুন্নি'-সম্প্রদায় এই প্রকার সমারোহ ও বাহ্যাড়ম্বরকে ধর্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। তাহারা শুধু নীরবে সেই বিষাদময় ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করেন ও ভগবানের নিকট মানুষের পাপ-তাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

প্রবন্ধ-সঙ্কেত

সরস্বতীপূজা ঃ—সূচনা—হিন্দু জাতির উৎসব সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার বর্ণ গৌর, বেশবাস শুভ্র, বাহন হংস ও শুভ্রবর্ণ শুচিতার লক্ষণ। উৎসব কাল—মাঘ মাস, শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতিথি, সকালে পূজা, সন্ধ্যায় আরতি। প্রতিমার বর্ণনা—হংসবাহিনী, শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা, হাতে বীণা ও পুস্তক, পা দুইটি শ্বেতপদ্মের উপর স্থাপিত, দেবীর আধুনিক মূর্তি।

পূজার আনন্দ—ছেলেমেয়েদের আনন্দ কেহ ফুল তোলে, কেহ পূজার আয়োজন করে, কেহ মণ্ডপ সাজায়, কেহ ধূপ-দীপ জ্বালায়, দেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান। স্কুলের পূজা ও বাড়ীর পূজা। বিসর্জন—দ্বাদশীতে প্রতিমা বিসর্জন, বিকালে প্রতিমাসহ শোভাযাত্রা, নদীতে বা সরোবরে প্রতিমা-বিসর্জন।

ইদ্ বা ইদজ্জোহা ঃ সূচনা—মুসলমান জাতির উৎসব। উৎসবের ইতিহাস—হজরত ইব্রাহিম ঈশ্বরের সন্তোষবিধানার্থ স্বীয় পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হন, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রের পরিবর্তে পশু উৎসর্গ করিতে আদেশ দেন। সেই হইতে কোরবানি অনুষ্ঠান দ্বারা মুসলমানেরা ইদ্ উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। [illegible]—অশ্বমেধ [illegible] আল্লাহের [illegible] কিছুই নাই। ইদ্ উৎসবের [illegible] এক বা [illegible] বৎসর। বৎসরে প্রায় [illegible] হইয়া আসিতেছে।

রথযাত্রা ঃ—সূচনা—হিন্দুর উৎসব। উৎসব কাল—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া। উৎসবের স্থান—[illegible] প্রায় সর্বত্র [illegible], পুরী ও [illegible] রথযাত্রা প্রসিদ্ধ। উৎসবের বর্ণনা—রথের বর্ণনা, রথারূঢ় দেবতার বর্ণনা, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। শোভাযাত্রা, আমোদ-প্রমোদ মেলা, [illegible]। সপ্তাহান্তে পুনর্যাত্রা রথ।

দোলযাত্রা ঃ—সূচনা—দোলযাত্রা [illegible], বাঙ্গালীর উৎসব। উৎসবকাল—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। উৎসবের স্থান—ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। উৎসবের বর্ণনা—আবির, কুঙ্কুম, রং লইয়া খেলা।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত যে কোন একটি উৎসব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ :—

বড়দিন, দেওয়ালি, নববর্ষ, বাঙ্গালীর বিবাহ, নবান্ন।

নবম পরিচ্ছেদ

পশুশালার তিন ঘণ্টা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৬]

[সূচনা—ভ্রমণের সঙ্গী—ভ্রমণ-পথ—পশু-পক্ষীর বর্ণনা—বিশেষ বিশেষ জন্তুর প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—উপসংহার।]

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সেদিন আলিপুরের পশুশালা দেখিয়া আসিলাম। দেখিবার মত জিনিসই বটে। বাসে চড়িয়া গেলাম। যেখানে বাস হইতে নামিলাম, তাহার অনতিদূরেই পশুশালার প্রবেশ-পথ। রাস্তার দুই পার্শ্বে ছোলা ও কলার দোকান। দোকানী হাঁকিতেছে—'চিড়িয়ার জন্য খাবার নিয়ে যান বাবু'। আমরা দুই-এক পয়সার ছোলা ও কলা ক্রয় করিলাম। পশুশালার দ্বারে কয়েকজন কর্মচারী দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেক দর্শকের নিকট তাহারা দুই আনা করিয়া দর্শনী আদায় করিতেছেন। গেটের মধ্যে একটা চক্রাকার যন্ত্র রহিয়াছে। ঐ চাকাটির সঙ্গে মাত্র একজন লোক একবারে পশুশালার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। চাকাটি যতবার ঘুরিবে তত আনা আদায় হইবে। প্রবেশ করিবার পরই দেখিলাম রাস্তার এক ধারে সোডা-লেমনেড, আখ, বিস্কুট ও লজঞ্জুসের 'ষ্টল' বসিয়াছে। একটি লোক কতকগুলি বেলও বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিয়াছে। হাতীকে খাওয়াইবার জন্য আমরা কিছু আখ ও বেল কিনিয়া লইলাম।

প্রথমেই দেখিলাম বড় বড় উটপাখী গলা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এগুলির শরীর যেরূপ ভারী ও বড়, সে অনুপাতে ইহাদের ডানা ও পালক খুবই কম। ইহারা আকাশে উড়িতে পারে না। পাখী হইলেও ইহারা জন্মাবধি পৃথিবীর উপরেই পায়ে হাঁটিয়া বিচরণ করে। পক্ষি-সমাজের কাছে উটপাখীর ইহা একটা বড় রকমের লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই।

কত রকমের রঙ-বেরঙের জানা-অজানা, দেশী-বিদেশী পাখী যে দেখিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের দেশের অতি পরিচিত ঘুঘু, বাঁশঘুঘু, বেলে হাঁস, পাতিহাঁস, চীনা হাঁস, রাজহাঁস, পায়রা, কাঠঠোকরা, শালিক,

চড়াই, টিয়া, ময়না সবই এখানে আছে। বাজপাখীগুলিকে তারের জাল দিয়া ঘেরা ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। একদিকে যেমন ভারতীয় ময়ূর ও কাকাতুয়া আছে, অন্যদিকে তেমনি বিলাতী লার্ক এবং নাইটিঙ্গেলও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত কয়েকটি সুন্দর পক্ষী দেখিলাম। উহাদের পালকগুলি বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত। উহাদের স্বর কিন্তু বড় কর্কশ। আমাদের কোকিল কালো পাখী, কিন্তু উহার সুর শুনিলেই সকলেরই মন মুগ্ধ হয়।

হিংস্র পশুগুলির মধ্যে বাঘ ও সিংহ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি মাননীয় লেডী উইলিংডন আলিপুর পশুশালায় যে প্রকাণ্ড বাঘটি দিয়াছেন, উহাকে দেখিলেই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তবে খাদ্যাভাবে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে তেজ ও বীরত্বও স্বভাবতঃ কমিয়া আসিয়াছে। একটি শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ক্যামেরার সাহায্যে ঐ বাঘের ছবি তুলিয়া লইতেছেন। পশুরাজ সিংহ আছেন। যে কয়টি সিংহ দেখিলাম, সবগুলিই আকারে বৃহৎ ও ভয়াবহ। কিন্তু স্বাধীনতা ও আহারের অভাবে, তাহাদের শ্রী ও লাবণ্য আর নাই। দেশ-ভেদে বাঘ এবং সিংহের আকার ও অবয়বের বেশ প্রভেদ হইয়া থাকে তাহার নমুনা সেদিন পশুশালায় দেখিয়া আসিলাম। বাঘের ঘরের কাছে কয়েকটি ভল্লুক দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে একটি একেবারে মড়ার মত পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অথবা ভল্লুকটি সত্যই মরিয়া গিয়াছে কি না, কে বলিবে? শুনিলাম, আজকাল পশুশালায় প্রত্যহ বহুসংখ্যক প্রাণী মারা যাইতেছে। বনের স্বচ্ছন্দচারী পশুপক্ষীকে লৌহপিঞ্জরের মধ্যে কতক্ষণ আটকাইয়া রাখা যায়? ইঁদুরের উৎপাত নাকি এই মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

'জিরাফ্' গুলি দেখিবার জিনিস বটে! শরীর যে তাহাদের খুব বৃহৎ তাহা নয়, তবে উহাদের পা ও গলা অত্যন্ত দীর্ঘ। গলা উঁচু করিয়া যখন উহারা দাঁড়াইয়া থাকে, তখন উহাদের দিকে চাহিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। উহাদের গলা ও পায়ের অতিরিক্ত দৈর্ঘের সহিত লঘু দেহটির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, এজন্য উহারা দেখিতে কুৎসিত। পশুশালায় জাত একটি জিরাফের শাবকও দেখিলাম।

'হিপোপোটেমাস' জলে থাকে। পশুশালার মধ্যে একটা প্রশস্ত ডোবার মত স্থানে এই বিরাট জন্তুগুলি বাস করিতেছে। ইহাদের মুখের দিক অনেকটা

গণ্ডারের মত, তবে বিরাট আকারের জন্য লোকে সাধারণতঃ ইহাদিগকে 'জলহস্তী' বলিয়া থাকে।

নানা রকমের বানর দেখিলাম। ছোট, বড, কালো, ধূসর, মেটে প্রায় শতাধিক বানর চিড়িয়াখানায় তারের জাল-বেষ্টিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ আছে। দর্শকেরা কিছু কিছু ছোলা ফেলিয়া দিতেছেন। উহারা মহানন্দে তাহা কুড়াইয়া খাইতেছে। আমরা উহাদিগকে কয়েকটি কলা দিলাম। উহারা কলাগুলি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়াইয়া খাইয়া ফেলিল।

দুই-তিনটা 'ওরাংওটাং' রহিয়াছে। ইহাদের চেহারা প্রায় মানুষের মত। ডারউইনের মতে বানর মানুষের পূর্বপুরুষ। যদি তাহা হয়, তবে বানর ও মানুষের মধ্যবর্তী অবস্থাটি এই 'বন-মানুষ' বা ওরাংওটাংয়ের মধ্যে দেখা যাইবে। বানরের লেজ আছে, কিন্তু ইহাদের লেজ নাই। তাই বোধ হয় ইহাদিগকে সম্মান করিয়া 'বন-মানুষ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

কয়েকটি বৃহদাকার হস্তী পশুশালার মধ্যে শৃঙ্খলিত রহিয়াছে দেখিলাম। স্থলচর জন্তুগণের মধ্যে হস্তী আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পাগুলা যেন গোটা থামের মত! কান দুইখানি যেন কুলা। একটি হাতী সেদিন আমাদের হাত হইতেই কয়েকটি কলা তুলিয়া লইয়া আহার করিল। আমরা একটি হাতীকে একগাছা আখও খাইতে দিলাম।

সরীসৃপদের জন্য একটি পৃথক গৃহ রহিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে ময়াল, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, ঢোড়া, লাউডগা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের সর্প রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে বাঁধানো জলাশয়ের মধ্যে কয়েকটি ছোট কুমীরও শুইয়া রৌদ্র পোহাইতেছে। টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতির জন্যও স্বতন্ত্র ঘর রহিয়াছে।

'জেব্রা' একটি সুদৃশ্য জন্তু, দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার মত, তবে গায়ে সুদৃশ্য সাদা সাদা ডোরা-কাটা। ইহাদের পোষ মানাইতে পারিলে মানুষ আর একটি প্রয়োজনীয় জন্তু লাভ করিত। শুনিয়াছি মানুষ সেজন্য চেষ্টাও কম করে নাই। তবে ইহারা নাকি কিছুতেই পোষ মানে না।

মহিষের ন্যায় দেখিতে, একপ্রকার অতিকায় জানোয়ার দেখিলাম, উহাদের নাম 'বাইসন'। ইহারা তৃণ-ভোজী জীব। অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গল হইতে আনীত অদ্ভুত জীবজন্তুগুলির মধ্যে 'কাঙ্গারু'র নাম উল্লেখযোগ্য। কাঙ্গারুর উদরে একটা থলির মত আছে। সন্তানকে এই থলির মধ্যে লুকাইয়া কাঙ্গারু-জননী

স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। বহুপ্রকারের সজারু, কাঠ-বিড়ালী, গোধিকা, শশক, ছাগ ও হরিণ দেখিলাম। কয়েকটি প্রকাণ্ড কচ্ছপও দৃষ্টিগোচর হইল।

আলিপুরের পশুশালা একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

এই পশুশালা দর্শন করিলে অত্যল্পকালের মধ্যে জীব-জগৎ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়। জীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিয়া মনে যথেষ্ট আনন্দও হয়। কিন্তু এই যে মানুষ স্বচ্ছন্দচারী শত-সহস্র প্রাণীকে শৃঙ্খলিত, নিপীড়িত ও নিহত করিয়া মানুষ নিজের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতেছে—মানুষের এই প্রবৃত্তির মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠুরতা লুকাইয়া আছে, তাহা মনে করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

একটি প্রদর্শনী

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৮]

[সূচনা—প্রদর্শনী যাত্রা [illegible]—[illegible] বর্ণনা ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য—প্রদর্শনীর [illegible] ও [illegible]—উপসংহার।]

সেদিন আমাদের জেলা-সহরে একটি প্রদর্শনী দেখিয়া আসিলাম—কৃষি-শিল্পের প্রদর্শনী। বেশ ভাল লাগিল। বাংলাদেশের কোথায় কোন্ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা জানিলাম। অধিক পরিমাণে কোথায়,—কোথায় কোন্ শিল্পের উন্নতি হইতেছে—এ প্রদর্শনীতে তাহা সব একখানি ছবির মত দেখানো হইয়াছে।

বাবা, মা, আমি, ভাই দিলীপ ও ছোট বোন মঞ্জু—এই চারিজন একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া প্রদর্শনীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একজন স্বেচ্ছাসেবক দ্বারে দাড়াইয়া প্রত্যেক দর্শকের নিকট হইতে এক আনা করিয়া দর্শনী আদায় করিতেছে। এই সমস্ত পয়সা স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের

উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। বেশ সুন্দর তোরণটি, দুইপাশে দুইটি কলাগাছ, দুইটি মঙ্গল কলস। অর্ধগোলাকার তোরণ দেবদারু-পত্রে মণ্ডিত। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রটির চারিদিক 'করোগেট টিনে'র বেড়া দিয়া ঘেরা। ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি চৌমাথা, সেখান হইতে চারিদিকে চারিটা রাস্তা গিয়াছে। একদিকে সারি সারি 'ষ্টলে' বাঙ্গালার কৃষিজাত পণ্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্যদিকে শিল্পদ্রব্যের ষ্টল।

মেদিনীপুর কমলা-ভাণ্ডার নামক প্রসিদ্ধ ধান্যের আড়তের স্বত্বাধিকারী একটি ষ্টল বসাইয়াছেন। বিভিন্ন পাত্রে বালাম, বাঁশফুল, দাদখানি, চামরমণি, বাদশাভোগ, সীতাভোগ, রামশাল, বোরো, গিরকি প্রভৃতি প্রায় দুই শত প্রকার আমন ও আউশ ধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এত রকমের ধান যে বাঙ্গালাদেশে জন্মায়, তাহা পূর্বে জানিতাম না। ভাল করিয়া চাষ করিলে ফসল কেমন উৎকৃষ্ট হয়, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ কয়েক গুচ্ছ ধানের গাছও রাখা হইয়াছে। এক একটি গাছে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে।

কমলা ভাণ্ডারের ষ্টলের পার্শ্বেই তমলুক কৃষি-সমিতির ষ্টলে পাট প্রদর্শিত হইয়াছে। ধান ও পাট বাঙ্গালার সর্বপ্রধান কৃষিজাত পণ্য। এক একটি গাছ যে কত দীর্ঘ হইতে পারে, এবং উহা হইতে যে কত বেশী পরিমাণ পাট বাহির হইতে পারে, এখানে তাহার নমুনা দেখিতে পাইলাম।

তারপর ইক্ষু। খুব মোটা মোটা প্রচুর ইক্ষু আমদানি হইয়াছে। কোইম্বাটুর নামক ইক্ষু হইতে নাকি প্রচুর গুড় জন্মে। 'রুকইপুর পল্লীমঙ্গল কৃষিক্ষেত্র' হইতে এই প্রকারের ইক্ষু আনয়ন করা হইয়াছে। আমরা কয়েকগাছা আখ ক্রয় করিলাম।

তুলার ষ্টলটি দেখিয়া কিন্তু আনন্দ হইল না। শুনিলাম, পশ্চিম বাঙ্গালায় যেটুকু তুলা জন্মে তাহা অতি সামান্য। প্রয়োজনীয় বস্ত্রের তুলার জন্য বাঙ্গালা-দেশকে অন্য দেশের উপরেই অধিক নির্ভর করিতে হয়।

তিসি, সরিষা, তিল, রাই প্রভৃতি তৈলবীজের ষ্টলটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে জোয়ার, যব, ভুট্টা, ছোলা, মটর, কলাই, মসুর, অড়হর, খেঁসারি, বরবটী, মুগ, চীনা বাদাম ইত্যাদিও বেশ জন্মে। এইগুলির জন্য একটি ষ্টল খোলা হইয়াছে, দেখিলাম।

দার্জিলিং ও আসামের চা দেখাইবার জন্য একটি সুদৃশ্য ষ্টল খোলা

হইয়াছে। বাংলাদেশে চা-পানের অভ্যাস খুব দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। কাজেই চা-চাষেরও উন্নতি হইবে, আশা করা যায়।

ইহা ছাড়া, তামাক, শণ, হলুদ, লঙ্কা, আদা, ধনে প্রভৃতি মশলার জন্য পৃথক ষ্টল দেখিলাম। সরকার হইতে কুইনিনের উপযোগিতা বুঝাইবার জন্য একটি ষ্টল বসানো হইয়াছে। সেখানে একজন লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুইনিনের অপরিসীম উপকারিতা সম্বন্ধে অনর্গল বকিয়া যাইতেছে। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু লোকটার ক্লান্তি নাই—সে অবিশ্রান্ত বক্তৃতা চালাইতেছে।

ফলমূলের ষ্টলটি চমৎকার। একটি প্রকাণ্ড আলু দেখিলাম, উহার ওজন বোধ হয় এক সের হইবে। একটা প্রায় আধমণী প্রকাণ্ড কুমড়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ষ্টলের সম্মুখভাগে দুইটি শিকায় প্রকাণ্ড পেঁপে টাঙ্গানো আছে, দূর হইতে আমরা পেঁপে দুইটিকে লাউ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। চাঁপা, মর্তমান, কাঁঠালি, সবরি প্রভৃতি নানাজাতীয় কলার কাঁদিও সাজানো রহিয়াছে। কলাগুলি যেমন বড়, তেমনি পরিপুষ্ট, পাকা কলাগুলির রঙ ঠিক যেন কাঁচা সোনার মত। ইহা ছাড়া খুব বড় মূলা, বেগুন, ওল, মান, শালগম, ঝিঙ্গা ও শশাও দেখিলাম।

এ তো গেল কৃষিজাত দ্রব্যের কথা—শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনীও বেশ সুন্দর হইয়াছিল। প্রথমেই কাপড়ের কথা বলিতে হয়। বাঙ্গালাদেশ এক সময় ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। সে দিন আর নাই। ঢাকাই শাড়ীও আজকাল দুর্লভ। ঢাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহার আমদানি নাই বলিলেই হয়। তবে শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে যে সব তাঁতের কাপড় আনা হইয়াছে, উহারা আজও বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সুদৃশ্য রেশমী কাপড়ও আমদানি হইয়াছে।

বহরমপুরের কাঁসারীদের ষ্টলটি দেখিবার জিনিস। কত রকমের সুন্দর সুন্দর কাঁসা, পিতল ও তামার জিনিস যে ইহারা প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহা দেখিয়া আনন্দ হয়। কাঁসার ষ্টলের পাশেই বাঙ্গালার কারখানায় প্রস্তুত এলুমিনিয়মের বাসন-কোশনের ষ্টলটিও বেশ সুন্দর। জামসেদপুরের সুবিখ্যাত 'টাটা আয়রন্ ওয়ার্কস' একটা ষ্টল খুলিয়াছেন। ইঁহাদের লোহের কারখানা

আজ জগৎ-প্রসিদ্ধ। বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের কর্মকারগণও ছুরি, কাঁচি, দা, জাঁতি প্রভৃতি লৌহনির্মিত দ্রব্যের ষ্টল খুলিয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত লৌহ দ্রব্যের খ্যাতি আছে।

ঢাকার উদ্বাস্তু শাঁখারীরা একটা শাঁখার ষ্টল খুলিয়াছেন, শাঁখার উপর কি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য কৃষ্ণনগরের কুমারদের ষ্টল। কি সুন্দর সুন্দর পুতুল। মাটি দিয়া তরমুজ, কলা, পেঁপে, মাছ প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইয়াছে। জিনিসগুলির আকার, গঠন ও বর্ণ এমন নিখুঁত হইয়াছে যে, আসল কি নকল, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখিয়া আমার বোন মুকুল উহা কিনিবার জন্য বায়না ধরিল। মা তাহাকে একটি মাটির বানর ও একটি বিড়াল কিনিয়া দিলেন।

বাঙ্গালার গৃহলক্ষ্মীদের পবিত্র হস্তের প্রস্তুত সুন্দর সুন্দর কাঁথা ও অন্যান্য শিল্প-দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য একটি ষ্টল খোলা হইয়াছে। শেফালিকা-নাম্নী কোনও বালিকা মাছের আঁইশ দিয়া একটা ফুলগাছ প্রস্তুত করিয়াছে, উহা দেখিয়া সত্যই খুব আনন্দ হইল। শুনিলাম, মেয়েটির বয়স মাত্র নয় বৎসর।

বোলপুর 'শান্তিনিকেতনের' চামড়ার কাজ প্রদর্শনের জন্য একটি সুদৃশ্য ষ্টল খোলা হইয়াছে। সুন্দর, সুদৃশ্য কারুকলা-যুক্ত চামড়ার ব্যাগ, মনিব্যাগ, পুস্তকের মলাট প্রভৃতি নানা প্রকারের জিনিস দেখিতে পাইলাম।

'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামক প্রসিদ্ধ কারখানার ষ্টলটি দেখিতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। এখানে নানাপ্রকার ঔষধ, গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধ কেশ তৈল, সাবান, স্নো প্রভৃতি অঙ্গরাগ ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের প্রচুর আমদানি দেখিলাম। আমাকে ও মুকুলকে উহারা কয়েকটি সাবান ও গন্ধদ্রব্য নমুনাস্বরূপ উপহার দিলেন।

বেলা পড়িয়া আসিল। সন্ধ্যার পরেই ঘরে ফিরিতে হইবে, এজন্য আমরা তাড়াতাড়ি প্রদর্শনী-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইলাম। প্রদর্শনীর তোরণে তখন নহবত বাজিতেছে। যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, তখন কৃষি-শিল্পময়ী বঙ্গ-জননীর শ্যামল মূর্তিখানি যেন ছবির মত আমার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

———

প্রবন্ধ-সঙ্কেত

আগ্রার তাজমহল ঃ—সূচনা—সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি, তাজমহল তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাজমহল নির্মাণের উদ্দেশ্য—শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিবার জন্য সম্রাট এই সমাধিমন্দির রচনা করেন। তাজমহল নির্মাণ—হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীগণের সমবেত চেষ্টায় নির্মিত, ইউরোপীয় শিল্পীরাও নির্মাণকার্যে সহায়তা করিবার জন্য আহূত হন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে নানাবিধ উপাদান সংগৃহীত হয়, বিশ হাজার লোকের আঠার বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে এই সমাধি মন্দির রচিত হয়। তাজমহলের শিল্প-চাতুর্য—শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত, সাজসজ্জা অপরূপ, একটি বেদীর উপর সমাধি মন্দিরটি স্থাপিত। চারিটি উচ্চ মিনার মধ্যে একটি বৃহৎ গম্বুজ, উহার চারিদিকে চারিটি ছোট গম্বুজ। যমুনা-তীরবর্তী এই মর্মর-মন্দির দেখিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কত শিল্পী, কত পর্যটক, কত কবি ভারতবর্ষে আসেন। তাজমহলের বাহিরের সৌন্দর্য যেমন শিল্পীর কৌতূহল চরিতার্থ করে, উহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য তেমনি ভাবুকের হৃদয়-মন মুগ্ধ করে। কত শিল্পী তাজমহলের ছবি আঁকিয়াছেন, কত কবি তাজমহলের সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়াছেন। উপসংহার—তাজমহলের মধ্যে শাহজাহানের পত্নীপ্রেম অমর হইয়া আছে। এই তাজমহলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিরহী সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

সারনাথ ঃ—সূচনা—ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি, বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান, বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র প্রবর্তন। ভৌগোলিক বিবরণ—কাশীর উত্তরে প্রায় সাড়ে চার মাইল দূরে অবস্থিত, কাশী হইতে ট্রেণে যাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ—প্রায় দুই বর্গমাইল স্থান সারনাথ নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে বহু স্তূপ, বিহার প্রভৃতি নির্মিত হয়, সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ক্রমে মাটি চাপা পড়ে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া এই বৌদ্ধ কীর্তিসমূহ মাটির নীচে ছিল, বর্তমানে খনন করিয়া অনেক অংশ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মিউজিয়ম—সারনাথ প্রাচীন নিদর্শন সমূহের সংগ্রহশালা, নানা আকারের এবং নানা যুগের মূর্তি, মুদ্রা, লিপি, মৃৎপাত্র প্রভৃতি সেখানে রক্ষিত হইয়াছে। মূলগন্ধকুটী বিহার—সংগ্রহশালার কিছু দূরে, এই মন্দিরটি মহাবোধি সোসাইটির চেষ্টায় নির্মিত হয়, সুদৃশ্য সমুন্নত মন্দির। মন্দিরে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী চিত্রাকারে বর্ণিত। উপসংহার—বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান।

—দশম পরিচ্ছেদ—

দেশ ভ্রমণের উপকারিতা

প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষই এক। ছড়াইয়া আছে বলিযাই এই একত্বের সূত্রটা ধরিতে পারা যায় না—নহিলে হিসাব করিলেই বুঝা যায়, যে আশা আকাঙ্ক্ষার স্রোত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহমান তাহারই নিরবচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি চলিয়াছে, বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের অন্তরে। এই চরম সত্যটির প্রকাশ হয় দেশ ভ্রমণের দ্বারা। পৃথিবীর একপ্রান্তে অবস্থিত থাকিয়া পাহাড়-পর্বত, নদ নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা অপর প্রান্তের অধিবাসীদিগকে বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া মনে করি—ভাবি ইহারা ঠিক আমাদের মত নয়। দেশ-ভ্রমণে মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়া যায়। পরিব্রাজক মানুষ দেশান্তরে যাইয়া বিভিন্ন মানুষের অন্তরের সুরটি বুঝিতে পারে, এবং এই সত্যটাই তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হয় যে, বাহ্যত পৃথক্ হইলেও সকল দেশের সকল কালের মানব সমাজের মধ্যে কোথাও একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্য আছে।

বিষ্ণুশর্মা বলিয়াছেন,—এই ব্যক্তি আমার আপনার এবং এ আমার পর এই ধরণের হিসাব—শুধু নীচ ব্যক্তি করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের অন্তর সমুদ্রবক্ষের মত প্রশস্ত তাহাদের নিকটে সমগ্র বিশ্বই কুটুম্বের রূপ লইয়া আছে। এই কুটুম্বভাব মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া মানুষ বুঝে একই আকাশতলে আমরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করি—একই গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র আমাদের জীবনে আলোকপাত করে—একই পৃথিবীর বক্ষে নিঃসৃত রসে আমরা প্রতিপালিত হই, তবে প্রভেদটা কোথায়? 'অয়ং নিজঃ পরো বেতি' এই হিসাবের ধারা তখন মানুষ ভুলিয়া যায়। অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মানুষের সহিত মানুষকে আবদ্ধ করে। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মধ্যেই যে প্রীতি সীমাবদ্ধ ছিল —দেশ ভ্রমণের ফলে তাহাই সার্বজনীন হইয়া দাঁড়ায়।

পর্যটনের দ্বারা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের মানুষের সহিত মিশিয়া মানব চরিত্র সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞতা লাভ করে। দেশভেদে মানুষের রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়। শুধু ইহাই নহে জলবায়ুর তারতম্যের সহিত প্রকৃতি

জনিত বস্তুরও পার্থক্য জন্মে। দেশভ্রমণে মানুষ ইহাদের সহিত পরিচিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। দেশভ্রমণ সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক করে। গৃহে বসিয়া কেবলমাত্র পুস্তক পড়িয়া মানুষ জগতের সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পারে না। মানব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস জানিতে হইলে বিভিন্ন দেশের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় অপরিহার্য।

ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিকগণ পর্যটন হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভ্রমণই তাঁহাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। কবে কোন্ প্রাচীন রাজা কোথায় আসিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেখানে কি সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তারপর কোন অনিবার্য কারণে সেই রাজবংশের সমাপ্তি ঘটিল—আর এক নূতন রাজা সেখানে সিংহাসন পাতিয়া বসিলেন—দেশে দেশে ঘুরিয়া ভগ্নস্তূপ খুঁড়িয়া তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির দ্বারা ঐতিহাসিক তাহার মর্ম উৎঘাটন করেন। পৃথিবীর নানা স্থান লইয়াই ভৌগোলিকের আসর। সুতরাং জলবায়ু, অবস্থান, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য প্রভৃতির যথাযথ বিবরণ তৈয়ারী করিতে হইলে দেশের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীয়। পুঁথি পড়িয়া বিদ্যালাভ হয় বটে, কিন্তু সে বিদ্যা অসম্পূর্ণ।

কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকের পক্ষে ভ্রমণ একেবারে অপরিহার্য। বৈচিত্র্যই ইহাদের রচনার প্রাণবস্তু। কোন দেশের প্রকৃতিই রূপসম্ভারে স্বতঃ পরিপূর্ণ নয়। চির তুষারমণ্ডিত কাশ্মীরের গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য কলিকাতা বসিয়া মিলিবে না। কুশলী শিল্পীর তুলিকা-অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া সেই বিরাট ঐশ্বর্যের হয়ত একটা ধারণা হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ, কারণ প্রকৃতির পূর্ণ অনুকরণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সৌন্দর্য পিপাসুর পক্ষে তাই দেশভ্রমণের মূল্য যথেষ্ট।

দেশ ভ্রমণে মনের জড়তা নষ্ট হয়। বহুদিনের অন্ধ কুসংস্কারের প্রাচীর এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া যায়। গৃহ কোণে বসিয়া থাকিয়া মানুষ নিজেকেই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া মনে করে; ধর্মান্ধতা তাহার মজ্জাগত হইয়া দাঁড়ায়—দেশ ভ্রমণের ফলে তাহার আত্মাভিমান দূর হয়। পর ধর্মদ্রোহ, দাস মনোভাব প্রভৃতি কুসংস্কারগুলি চিরদিনের নিমিত্ত তাহার অন্তর হইতে বিদায় লয়। সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং বিরাট রূপ দেখিয়া মানুষের চিত্ত একদিকে যেমন উদার হয়,

অন্যদিকে তেমনি নিরভিমান হয়। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সে এই বিশাল প্রকৃতির স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়।

কোন সময়ে কোন একটি জাতি তাহার সমগ্র অভাব পূরণে সমর্থ হয় না। জগতের কাছে তাঁহার অনেক কিছুই চাহিবার থাকে। প্রাচীনকালে সহস্র নাবিকগণ জীবন বিপন্ন করিয়া দেশ আবিষ্কারে বাহির হইয়াছিলেন—তাঁহাদের অধ্যবসায়ের ফলে আজ দেশ-বিদেশের বাণিজ্য পথ রচিত হইয়াছে। একস্থানের পণ্য অন্যস্থানে নীত হইতেছে। মানুষের অভাব এইভাবেই পূর্ণ হয়। যুগে যুগে পৃথিবীর নানা অংশে শ্রেষ্ঠ মানবগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহাদের সাধনার বলে জাতি শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, রাজনীতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে। পরিব্রাজকগণের ও পর্যটকগণের ভ্রমণের ফলে সেই অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার পৃথিবীর সর্ব মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

দেশ ভ্রমণের ফলে মানুষ স্বাস্থ্যবান হয়। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মানুষের দেহ শক্তিমান, কর্মদক্ষ এবং মন সাহসী হয়। ভ্রমণশীল মানুষ অল্প পরিশ্রমে কাতর হয় না। বিভিন্ন জলবায়ুর মধ্যে চলিয়া তাহার দেহ এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে নানাবিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সে স্বাস্থ্য-রক্ষণ করিয়া চলিতে সক্ষম হয়। তাহার অন্তরের শান্তি সমভাবে বজায় থাকে। অপর কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও নিছক আনন্দের জন্যও দেশ ভ্রমণের মূল্য অল্প নয়।

ভ্রমণের ফলে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। তীর্থ-যাত্রায় চিত্তশুদ্ধি হয়। কত শতাব্দী ধরিয়া দুঃসাধ্য সাধনরত মানুষের দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন রহিয়া চলিয়াছে—এই তীর্থ যাত্রা তাহারই প্রতীক। প্রাচীনকালে দেশ ভ্রমণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হইত। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা অবধি ভ্রমণ করিয়া —অভিযাত্রীগণ পাপের ক্ষালন করিতেন। আজও সম্প্রদায় বিশেষ নর্মদার তীর পরিক্রম করিয়া আত্মার শুদ্ধি বিধান করেন। প্রাচীনকালে সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা ধর্মের একটি অঙ্গ ছিল। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'ব্রহ্মচার্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহীয়া ভূত্বা বনী ভবেদ্ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ', শাস্ত্রের এই অনুশাসন মানিয়া কেহ কেহ আজীবন এবং কেহ কেহ জীবনের অল্পকাল পর্যটনে অতিবাহিত করিতেন।

প্রাচীনকালে দেশ ভ্রমণের বিভিন্ন ধারা ছিল। তীর্থযাত্রার কথা বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এবং সন্ধিৎসুগণ জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বহির্মুখী হইতেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার

নিমিত্ত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। চীন পরিব্রাজক যুয়াঙ চুয়াং, ফা হিয়েন এবং গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস প্রভৃতি ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—আমাদের নিকটে তাহার মূল্য অপরিসীম। ছাত্রগণও তাঁহাদের উপযুক্ত অধ্যাপক নির্বাচন অথবা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিমিত্ত ভ্রমণে বাহির হইতেন। পাশ্চাত্য দেশের সরকার আজিও ব্যয়ভার বহন করিয়া উচ্চাভিলাষী ছাত্রগণকে দেশান্তরে প্রেরণ করেন। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ভ্রমণের পথ এমন সুগম ছিল না। অরণ্যসঙ্কুল পথ দিয়া যাত্রীদিগকে পদব্রজে যাতায়াত করিতে হইত। কত লোক হয়ত দস্যু তস্করের হাতে প্রাণ হারাইতেন। কিন্তু নদ-নদী, গিরি-কান্তার অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের এই দুঃসহ ক্লেশে দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য যেন অধিকতর মহিমান্বিত হইয়া উঠিত। আজ রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির আবির্ভাবে দেশভ্রমণ অত্যন্ত সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহারই সহিত ইহার অর্ধেক আনন্দও অন্তর্হিত হইয়াছে। মানুষ তাহার জীবনযাত্রার প্রণালীগুলি যতই একমুখী করিয়া তুলিতেছে, ততই ইহাদের অন্তর্নিহিত উন্মাদনাও যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কূপমণ্ডুকতা এবং অজ্ঞতা দূর করিবার নিমিত্ত সকলেরই কিছু কিছু দেশ ভ্রমণ করা উচিত।

———

পুরী ভ্রমণ

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৮]

[সূচনা—ভ্রমণের উপলক্ষ্য—যাত্রা—যাত্রাপথের দৃশ্য—যাত্রাপথের প্রসিদ্ধ স্থান—যাত্রাপথের বিশেষ ঘটনা—প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা—গন্তব্য-স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি—উপসংহার।]

গত বৎসর 'গুড্ ফ্রাইডে ও ইষ্টার মন্ডে' উপলক্ষ্যে নয় দিন স্কুল বন্ধ ছিল। স্থির করিলাম তিন বন্ধুতে মিলিয়া এই ছুটিতে পুরী বেড়াইতে আসিব। জীবনে কখনও পুরী যাই নাই। স্মরণাতীত কালের সহস্র-স্মৃতি-বিজড়িত উড়িষ্যার সেই প্রাচীন নগরীটি দেখিবার জন্য মনে বহুদিন হইতেই একটা ঔৎসুক্য ছিল। তাই

সেদিন যখন রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তিন বন্ধুতে-আসিয়া হাওড়া ষ্টেশনে সমবেত হইলাম, তখন আনন্দের আর সীমা রহিল না।

ছুটি অল্প। যত তাড়াতাড়ি গিয়া পৌছান যায়, ততই ভাল। তাই 'পুরী প্যাসেঞ্জার' গাড়ীতে না যাইয়া দ্রুতগামী 'পুরী-এক্সপ্রেসে' চলিয়াছি। ভিড় খুব বেশী ছিল না। সহজেই তিনজনে একটি কামরায় চড়িয়া বসিবার স্থান করিয়া লইলাম। নয়টা বাজিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চৈত্র মাসের ভীষণ গরমে প্রাণটা আই ঢাই করিতেছিল। ট্রেণ ছাড়িতেই অল্প অল্প হাওয়া খোলা জানালার মধ্য দিয়া আসিয়া গায়ে লাগিল, প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের ঠিক মাঝখানে অষ্টমীর চাঁদ উঠিয়াছে। দুই পাশে গ্রামগুলি, চন্দ্রকরোদ্ভাসিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তাহার মধ্য দিয়া ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে—এই সব দৃশ্যের মধ্য দিয়া রেলগাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট বড় কত ষ্টেশন, এক্সপ্রেস গাড়ী মাত্র তাহার দুই-একটিতে থামিতেছে। খড়্গপুর, বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ভোর পাঁচটায় আমরা ভুবনেশ্বরে পৌছিলাম। ভুবনেশ্বর সুপ্রাচীন তীর্থস্থান। এখানে আমরা নামিব স্থির ছিল।

ছোট ষ্টেশন, একজন হিন্দুস্থানী ষ্টেশন-মাষ্টার। আমাদের ষ্টীলট্রাঙ্কটি ও সামান্য তৈজস-পত্র এই ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া আমরা পদব্রজে ভুবনেশ্বর যাইব, স্থির করিলাম। একটি পাণ্ডা জুটিল। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম ভুবনেশ্বর এখান হইতে এক মাইল, আর খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান মাত্র তিন মাইল। ইহা শুনিয়া আমরা স্থির করিলাম পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া আমরা প্রথমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিয়া আসিব, তারপর ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করিব। ষ্টেশনের পিছন দিক্ হইতে সঙ্কীর্ণ রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। মাটি ত নয়, যেন পাথর। দুই পাশে সারি সারি কুচিলার গাছ। যেদিকে চাই—অবারিত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—মাঝে মাঝে একটু-আধটু তৃণগুল্মের কথা বাদ দিলে, কোথাও আর শ্যামলতার লেশমাত্র নাই। শ্যামা বঙ্গভূমির সন্তান আমরা, প্রথমে এই পাহাড়ের রাজ্যের ঊষর মূর্তি দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। পথে একটি মেয়ে মুড়ি বেচিতে চলিয়াছে। তাহার পরণের কাপড়খানি আগা-গোড়া হরিদ্রা-রঞ্জিত।

উহার নিকট হইতে চারি পয়সার মুড়ি কিনিয়া একটি 'আনি' দিলাম—কিন্তু মেয়েটি উহা লইল না, শেষে চারিটি পয়সা দিতে খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

তিন মাইলের স্থলে, আমরা বোধ হয় পাঁচ মাইলেরও বেশী হাঁটিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই প্রাচীন গিরিদ্বয়ের সন্ধান পাইলাম না। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, আরও এক মাইল আছে। যাহা হউক অবশেষে দূর হইতে পাহাড়ের উচ্চ চূড়া দেখিতে পাইলাম। চূড়ার উপর মর্মর নির্মিত বিচিত্র মন্দির মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল কিরণে রূপার ন্যায় জ্বলিতেছে। দেখিয়া সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম। রাস্তার দুইটি ধারে ছোট দুইটি পর্বত। বামদিকে খণ্ডগিরি, দক্ষিণে উদয়গিরি। গিরিগাত্রে ছোট ছোট গুহা, শুনিলাম, প্রাচীনকালে সেখানে তপস্বীরা বাস করিতেন। গিরিগাত্রের সোপানাবলী বাহিয়া চূড়ায় পৌঁছিলাম। কে এক মাড়োয়ারী ধনী চূড়ার উপরে মর্মর-পাথর দিয়া সেই ক্ষুদ্র জৈন-মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের পিছনেই পাহাড়ের উপরেই খানিকটা সমতল স্থানে কয়েকটি পাথর সাজান রহিয়াছে। স্থানীয় পাণ্ডা বলিল, ইহার নাম ইন্দ্রসভা, ঐ বড় পাথরটি স্বয়ং ইন্দ্র, ছোটগুলি অন্যান্য দেবতা। দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া আমরা উদয়গিরি দেখিতে গেলাম। উহার অধিকাংশ স্থলই চিত্রিত। মহারাজ খারবেল নাকি এইখানে একটি মঠ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে কত কি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

কোন্ বিস্মৃত যুগের সেই অজ্ঞাত বাণীর দিকে আমরা সসম্ভ্রমে শুধু চাহিয়া রহিলাম। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিয়া আমরা ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম। ভুবনেশ্বরের মন্দির অপূর্ব! পাথরের উপর যে মানুষ এমন কারুকার্য করিতে পারে তাহা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। মন্দিরের কাছেই ক্ষুদ্র বাজার। বাজারের এক প্রান্তে প্রশস্ত দীর্ঘিকা;—নাম 'বিন্দু-সরোবর'। শুনিলাম ইহার জল পবিত্র। পবিত্র হয়ত হইবে, কিন্তু নির্মল যে নয় তাহা আমরা স্নান করিতে নামিয়াই বুঝিলাম। বিন্দু সরোবরের ঠিক মাঝখানে একটি মন্দির। সেখানে সানাই বাজিতেছে, শুনিতে পাইলাম। সরোবরের তীরদেশে প্রকাণ্ড ধর্মশালা। মন্দির হইতে প্রসাদ আনিয়া পাণ্ডাজী সেই ধর্মশালায় আমাদিগকে আহার করাইলেন। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, যাহা পাইলাম আগ্রহে আহার করিলাম।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া আমরা দুপুরের গাড়ীতেই পুরী রওনা

হইলাম। পুরী স্টেশন হইতে শহর বেশী দূরে নয়। একটা মুটের মাথায় বিছানাপত্র চাপাইয়া, তিন বন্ধুতে হাঁটিয়া চলিলাম। শহরের একপাশে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক 'বাংলো-বাড়ী'তে বাস করিতেছেন। প্রশস্ত পিচ্ ঢালা রাস্তা, স্কুল, খেলার মাঠ, ছোট বড় পাকা-বাড়ী—দেখিতে দেখিতে চলিলাম। হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই আমরা থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এ কি দৃশ্য! অনন্ত নীল নভোমণ্ডল যেন পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে! এই সমুদ্র! যতদূর দৃষ্টি যায়, জল, শুধু জল, অন্তহীন, পরিমাণহীন, সীমাহীন জল! সেই অপূর্ব অভাবনীয় বারিরাশি বারংবার উত্তাল তরঙ্গে বালুকাবেলায় আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অস্তোন্মুখ সূর্যের আরক্ত রশ্মিতে সেই বিরাট সমুদ্র-বক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে। 'নুলিয়া' জেলেদের কয়েকখানি নৌকা দূর সমুদ্র-বক্ষে যেন গগনসঞ্চারী পক্ষীর ন্যায় ভাসিতেছে। সেই উদার দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আমাদের প্রাণ ভরিয়া গেল। আমরা যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

সমুদ্রের তীরে 'স্বর্গদ্বার'। সেখানে 'পান্থশালা' নামে হোটেল। উহাতে আমরা বাসা লইলাম। সেখান হইতে জগন্নাথের মন্দির বেশী দূর নয়। অতি উচ্চ মন্দির বহুসংখ্যক সোপান বাহিয়া সেই মন্দিরের দিকে উঠা যায়। তারপর প্রকাণ্ড নাট-মন্দির। তারপর দেবালয়। মন্দিরটি ভারতের ভাস্কর্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। সৌন্দর্যে ও বিরাটত্বে ইহার সহিত তুলনীয় মন্দির ভারতে আর নাই। যে কয়টি দিন পুরীতে ছিলাম প্রত্যহ মন্দিরে আসিয়া কিছুক্ষণ কাটাইতাম। ভাবিতাম, কত যুগ-যুগান্তরের পবিত্র স্মৃতি এই প্রাচীন মন্দিরকে জড়াইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাণ-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাশ্রুধারা এই মন্দিরকে সিঞ্চিত করিয়াছে। এইখানে শঙ্করাচার্যের অপূর্ব কীর্তি অমর হইয়া আছে। এই নীলাচলধাম ভারতের চিরদিনকার শ্রীক্ষেত্র। এই স্থানের মাহাত্ম্যে বিভিন্ন প্রদেশবাসী, বিভিন্ন জাতীয় ভারতবাসী নিজেদের জাতিবর্ণ বিরোধ ভুলিয়া বক্ষে বক্ষে মিলিত হইতেছে। এস্থান ধন্য!

দেখিতে দেখিতে ছুটি ফুরাইয়া আসিল। অপার আনন্দের সঞ্চয় বক্ষে লইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

প্রবন্ধ-সঙ্কেত

মানস সরোবর দর্শন ঃ—সূচনা—তিব্বতের পশ্চিমে মানস সরোবর, ভারতের উত্তরে তিব্বত, যান বাহনের অসুবিধা, দস্যুভয়, গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন যাওয়া যায় না।

যাত্রার আয়োজন—কয়েকজন দক্ষ মিলিয়া যাত্রার ব্যবস্থা—গভর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র সংগ্রহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, যাত্রার অন্যান্য উপকরণ, কিছু অস্ত্রশস্ত্র, কিছু ঔষধ।

যাত্রা—কলিকাতা হইতে রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা, কাঠগোদাম, নৈনিতাল, আলমোরা, সেখান হইতে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা আসকোট, ধরচুলা, গার্বিয়াং, পথে দোভাষী সংগ্রহ।

পথের দৃশ্য—পার্বত্য পথ, পাহাড়ের তলায় সবুজ মাঠ, পাহাড়ের গায়ে ঝরণা, তিব্বতের কথা, লামা, বৌদ্ধমঠ ইত্যাদির বিবরণ।

মানস সরোবরে আগমন—প্রাচীন কাব্যের রচনায় মানস সরোবরের উল্লেখ, মানস সরোবরের অপরূপ সৌন্দর্য।

উপসংহার—প্রত্যাবর্তন।

—একাদশ পরিচ্ছেদ—

রামায়ণ

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৩, ১৯৩৪]

[সূচনা রামায়ণের বৈশিষ্ট্য প্রাচীনতা—বর্ণনা-নৈপুণ্য—রামচন্দ্রের চরিত্র-মাধুর্য—অন্যান্য সৌন্দর্য—উপসংহার।]

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাঙ্গালা রামায়ণ আমার প্রিয় গ্রন্থ। বর্ণজ্ঞান হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত সহচর। মনে হয়, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা আমার ভাল লাগিবে।

কোন একটা জিনিস কেন যে ভাল লাগে, এই প্রশ্ন উঠিলেই বড় বিপদে পড়িতে হয়। ভাল লাগার কারণ নির্দেশ করা সর্বত্র খুব সহজ নয়, কোথাও কোথাও একেবারে অসম্ভব। অনেক সময়ে উহা গুণাগুণনিরপেক্ষ,—অনেক নির্গুণকে ভালবাসি অথচ এমন অনেক গুণী ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমাদের হৃদয়ে স্থান পান না। ফলতঃ গুণাগুণের বিচার করে আমাদের মস্তিষ্কের জাগ্রত চৈতন্য, আর আমাদের রুচি নির্দেশ করে আমাদের সুপ্ত বা মগ্ন চৈতন্য। যখন আমরা বিচার করিতে শিখি না—সেই সুদূর শৈশব হইতেই কতকগুলি সংস্কার আমাদের মস্তিষ্কে গিয়া স্থায়ী আসন করিয়া লয়। যাঁহারা পূর্বজন্ম মানেন, আমাদের রুচির উপর তাঁহারা জন্মান্তরের সঞ্চিত সংস্কারগুলির কর্তৃত্বও স্বীকার করেন।

সে যাহা হউক, রামায়ণ গ্রন্থ যে কেন ভাল লাগে সে সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কারণ দেখান যাইতে পারে। শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কোনও বস্তু যেমন আমাদের প্রিয়, সুপ্রাচীন কালের স্মৃতিগুলিও আমাদের অনেকটা সেই রকম প্রিয়। প্রাচীনকালের প্রাচীনতাটারই একটা আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ কম নয়, ইহাই শত শত প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের সকল প্রচেষ্টার মূল কারণ। সেই অযোধ্যা, সরযূ, চিত্রকূট, কিষ্কিন্ধ্যা, লংকা এখনও পড়িয়া আছে। এই সব স্থানে স্মরণাতীত কালে যে কি অপূর্ব ঘটনার সমাবেশ

হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আমাদিগকে পুলকিত করে। যে রামচন্দ্রের কীর্তি সেতুবন্ধ রামেশ্বর এখনও বিরাজ করিতেছে, সেই রামচন্দ্রের কাহিনী যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

এ তো গেল বিষয়-বস্তুটির ঘটনাকালের গুণ। ইহাতে কবির কৃতিত্ব কোথায়? কবির প্রধান কৃতিত্ব উহার বর্ণনায়। রাম-রাবণের কাহিনীটি এই গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এমন সুন্দর আখ্যান-বিবরণ পৃথিবীর সাহিত্যে অতি বিরল। অতি প্রাচীন যুগের একটা অতি সম্পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য যেন চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরা হইয়াছে। এই প্রকার সম্পূর্ণতাই মহাকাব্যের লক্ষণ। কোন একটি বিরাট পুরুষের চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীটিকে নিখুঁত করিয়া আঁকিবেন, ইহাই মহাকাব্য। এজন্য মহাকাব্যকে হইতে হইয়াছে আকারে বৃহৎ ও বর্ণনামূলক। রামায়ণ রামচন্দ্রের যুগের যেন একখানি আলোকচিত্র। একটির পর একটি করিয়া দৃশ্যগুলি যেন পটে আঁকা ছবির মত সুন্দর, সুস্পষ্ট হইয়া চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। বর্ণনার মধ্যে কোথাও কার্পণ্য নাই, ছল-চাতুরী নাই। সর্বত্রই একটা অকপট, উদার ভাব মনকে নিতান্ত আত্মীয়ের মত বিশ্রব্ধভাবে আমন্ত্রণ করিতেছে। বর্ণনার এই পরিপূর্ণতা ও ত্রুটিশূন্যতা আমার ভাল লাগে।

কিন্তু সবাপেক্ষা বড় আকর্ষণের বস্তু ইহা নয়। যে বিরাট মানুষটি আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ধরাধরের মত এই মহাকাব্যের মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সেই রামচরিত্রই আমার আকর্ষণের উৎসরূপ। আমি এমন চরিত্র দেখি নাই। রামের ন্যায় কর্তব্যনিষ্ঠ, তাঁহার ন্যায় বড় বীর, তাঁহার মত ভাল রাজা অনেকেই আঁকিয়াছেন, উহা যে কোন কবির পক্ষেই খুব বেশী কঠিন নয়। কিন্তু রামচন্দ্রের মত বড় মানুষ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যে নিষ্ঠুর, হত্যা করা তাহার পক্ষে বড় কথা নয়; যে অপ্রেমিক, প্রিয়জনকে সে অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারে, যে গৃহবাসের মাধুর্য জানে না, সে অনায়াসে বনবাস বরণ করিতে পারে। মন যাহার সবদিক হইতে শক্ত গণ্ডারের চামড়া দিয়া ঢাকা কোন আঘাতই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। সেই প্রকার আঘাত-সহিষ্ণুতায় যতই মাহাত্ম্য থাকুক না কেন, উহাতে মনুষ্যত্ব নাই। যেই চরিত্র খুব বড় চরিত্র কি না জানি না, কিন্তু মানুষের চরিত্র হিসাবে ঐ চরিত্র বিচার করিতে ইচ্ছা করে না। রামচন্দ্র তেমন ছিলেন না, রক্তমাংসে

গড়া এমন খাঁটি মানুষটি আর কে কোথায় দেখিয়াছে? মনুষ্যোচিত হৃদয়-বৃত্তিগুলির এমন সর্বাঙ্গীন বিকাশ আর কোথায় চিত্রিত হইয়াছে? রামচন্দ্র সৃষ্টির প্রথম দিনকার মানব-শিশু, এবং সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত ইনিই ফিরিয়া মানবের ঘরে জন্ম লইবেন। তাঁহার এই চিরন্তন মানবিকতা রামায়ণকে অমর করিয়া রাখিবে। দেশ ভেদে তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। ন্যায্য উত্তরাধিকার অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নির্বিরোধে বনবাস বরণ করিয়া তিনি ভাল করিয়াছিলেন কি না, ধর্মপত্নীকে লোকাপবাদ-ভয়ে ত্যাগ করিয়া তিনি কর্তব্য করিয়াছিলেন কিনা—এই সমস্ত প্রশ্নের দ্বারা চিরদিনকার মানুষের বিচার করা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত বিচার কোন একটি যুগের বিশেষ আদর্শের উপর নির্ভর করে। যুগধর্মের চক্রের ন্যায় আদর্শের পরিবর্তন ঘটিতেছে। রামচন্দ্র তাঁহার যুগের আদর্শকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। দেখিতে হইবে, সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি কতখানি ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিচার-বুদ্ধির পরিমাণ লইয়া মানুষের বিচার করা চলে না, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মানুষকে বিচার করিতে হয়। এই মানুষটি ভুল বুঝিয়াছিলেন, কি ঠিক বুঝিয়াছিলেন, কোন যুগেই তাহার মীমাংসা হইবে না। কিন্তু যে বীরত্ব লইয়া চিরসুখলালিত রাজকুমার বনে চলিয়া যায়, যে প্রেম লইয়া বিজয়োদ্ধত বীর পত্নীর জন্য বালকের ন্যায় বনে বনে কাঁদিয়া বেড়ায়, ভাইয়ের জন্য নিজের মৃত্যুভয় ভুলিয়া সমর-ক্ষেত্রে বসিয়াই শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, যে বীরত্ব অস্পৃশ্যকে কোল দেয়, শবরীর অন্ন গ্রহণ করে, সর্বোপরি যে সীমাহীন বীরত্ব নিজের হৃদয়াধিক প্রিয় পত্নীকে, পৃথিবী ও সমুদ্র বিধ্বস্ত করিয়া করাল রাক্ষসের কবল হইতে যাহাকে ছিনাইয়া আনা হইয়াছে—সেই পত্নীকে পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে,—তাহা মানুষ নিজের যুগাদর্শ ভুলিয়াও চিরদিন পূজা করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

রামচন্দ্র ছাড়া আর যে সব চরিত্র এই মহাকাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের বীরত্বও অতুলনীয়। ইহাদের প্রত্যেকেই প্রেমের বেদীতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি দিয়াছেন। সেই লক্ষ্মণ, সেই ভরত, সেই হনুমান ইহারা প্রেমের মণি-দীপ,—চিরদিনের জন্য এই অনির্বাণ দীপাবলী মহাকাব্যের রত্ন-খনিকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। তুলসীর মূলে সুবর্ণ দেউটির ন্যায় সীতা ভারত-রমণীর চিরদিনকার আদর্শ হইয়া থাকিবেন।

কৃত্তিবাসের সুললিত পদ্য বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা। স্মরণাতীত কাল হইতে ইহা বাঙ্গালীর নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গালীর কত শোকের সান্ত্বনা ও সুখের উৎসব জোগাইয়াছে, যুগ যুগ হইতে বাঙ্গালী গায়কেরা নূপুর পায়ে দিয়া নাচিয়া নাচিয়া এই রামায়ণ-কথা গান করিয়াছে, শেষের দিনে কত বাঙ্গালী এই রাম-নাম সম্বল করিয়া অনন্তের পথে যাত্রী হইয়াছেন! তাই রামায়ণকে আমি ভালবাসি। কাব্য সুন্দর, সুর সুন্দর, ভাবা সুন্দর, স্মৃতি সুন্দর,—এই গ্রন্থ আমার প্রাণের বস্তু।

মহাভারতের কাহিনী

[সূচনা—মহাভারতের বিষয়—দ্যূতক্রীড়ার কথা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান—উপসংহার।]

মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত। এই ভারত বংশের ইতিহাস 'মহাভারত', জগতের মধ্যে ইহা একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। মহাভারতের কবি একটি অখণ্ড জাতির সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে রূপ দান করিয়াছে। কালক্রমে মহাভারতের মূল আখ্যায়িকার সহিত বহু ক্ষুদ্র উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হইয়া ইহার কলেবর স্ফীত করিয়াছিল। ক্ষত্রিয় আর্যগণের দুইটি শাখার মধ্যে আধিপত্য লইয়া যে বিপুল সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই মহাভারতের বিষয়-বস্তু।

কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ কাজেই পাণ্ডু রাজা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসনাদি একশত পুত্র, পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র। অল্প বয়সে পাণ্ডু দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পঞ্চ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। অস্ত্রাচার্য দ্রোণের নিকট রাজকুমারগণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষবশে বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে

উহার মধ্যে পুড়াইয়া মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। সেই জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিলে, পাণ্ডবগণ কোন মতে পলাইয়া গিয়া জননীর সহিত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময় পাঞ্চালরাজ্যে দ্রুপদ রাজার কন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন চলিতেছিল। ঘূর্ণমানচক্রের ছিদ্রপথে যিনি বাণ নিক্ষেপ করিয়া ঊর্ধ্বে স্থাপিত মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করিতে পারিবেন তিনিই রাজকুমারী দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে পারিবেন। পাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণের বেশে এই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। যখন ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণের কেহই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিলেন না, তখন অসামান্য বীর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ কুপিত হইয়া ইহাতে বাধা প্রদান করিতে গেলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের পরাক্রমে সকলেই পরাভূত হইলেন। ইহার পর জননী কুন্তীর আদেশে পাঁচ ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। প্রায় সকল প্রাচীন সমাজেই এক নারীর বহুপতিত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। পাণ্ডবগণের এই বিবাহ সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটি আভাস মাত্র।

পাণ্ডবগণ এখনও বাঁচিয়া আছেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া অর্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সাহায্যে ইন্দ্রপ্রস্থে মনোহর রাজধানী স্থাপনপূর্বক রাজসূয় নামক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞোপলক্ষ্যে দেশবিদেশের নৃপতিবর্গ আমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া সম্মান জানাইলেন। পাণ্ডবদের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। দুর্যোধনের মাতুল শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির পাশায় পরাজিত হইলেন। তিনি একে একে রাজ্য, ঐশ্বর্য, স্ত্রী ও ভাইদের পর্যন্ত পণ রাখিয়া পাশা খেলিলেন। যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। দুর্যোধনাদি সুবিধা পাইয়া পাণ্ডবদের সহধর্মিণী দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়া লাঞ্ছিত করিলেন। পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইল। দ্বাদশবর্ষ অত্যন্ত দীনভাবে বনে বনে ঘুরিবার পর তাঁহারা বিরাটরাজের গৃহে ছদ্মবেশে এক বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করিলেন। তারপর যুধিষ্ঠির নিজের রাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন বিনা-যুদ্ধে সূচাগ্র-পরিমিত ভূমিও দিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই যুদ্ধ বাধিল।

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে এক ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন হইল। ভারতের প্রায়

সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা এক পক্ষে না এক পক্ষে যোগদান করিলেন। দুর্যোধনাদির পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী ও পাণ্ডবগণের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইল। এই যুদ্ধের আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগ দান করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই, 'গীতা'। গীতা সর্বদেশের ও সর্বকালের একখানি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিলেন এবং দুর্যোধনাদি পরাজিত ও নিহত হইলেন।

ইহার পর যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিহত্যার জন্য তাঁহার চিত্তে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পত্নী দ্রৌপদী দেহত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির একাকী সশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন।

ইহাই মহাভারতের কাহিনী। ইহা আর্য ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শকে নিখুঁত ও জীবন্ত করিয়া চিত্রিত করিয়াছে। মহাভারতে যে সভ্যতার চিত্র রহিয়াছে, তাহা লাভ করিতে হইলে আধুনিক মানবকে বহুকালব্যাপী কঠোর সাধনা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন

বিসর্জন একখানি নাট্য-কাব্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নাটকগুলির মধ্যে এইখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কবির সৃজনীশক্তি, হৃদয়ের উদারতা ও সত্যনিষ্ঠা আকার ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকে দেখাইয়াছেন যে, প্রথা প্রেমকে বিনাশ করিতে চাহিলে, প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অপর্ণা এতটুকু মেয়ে, কিন্তু তাহার শক্তি অপরিমেয়—সে জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া যাইতে ডাকিতেছে, রঘুপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, রাজাকে সত্যদৃষ্টি দিয়া

সত্যপথে তাঁহাকে অটল দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। রঘুপতির ভয় গোবিন্দমাণিক্যকেও নহে, রাজার সৈন্য-সামন্তকেও নহে, তাহার ভয় ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে। যতক্ষণ মিথ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীকে, ভাই ভাইকে, প্রজা রাজাকে, পিতা (রঘুপতি) পুত্রকে (জয়সিংহকে) পর্যন্ত ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু একটু ছোট্ট প্রাণের প্রীতি ও করুণার স্পর্শে রাজার যেই সত্যদর্শন ঘটিল, অমনি মিথ্যা প্রথা ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সকলে সত্যের অমৃত স্পর্শ লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেল,—প্রেম ও মনুষ্যত্ব সকলকে সমস্ত মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে অব্যাহতি দিল। একটি জীবন্ত প্রাণশক্তি জড়তার উপরে জয়ী হইবার ক্রমাগত চেষ্টা করে,—যেমন ছোট একটি বটের চারা প্রকাণ্ড পাথরের মন্দিরের শুষ্কতাকে এবং একটু ঘাসের পাতা মরুভূমির বিরাট বন্ধ্যাত্বকে জয় করিতে উদ্যত হয়, তেমনি সামান্য বালিকা অপর্ণার করুণা যুগ-যুগান্তরের জড় প্রথাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

মানুষের চিরন্তন মনোবৃত্তি, প্রেম, মায়া, মমতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কতকগুলা বিধি-নিষেধ ও আচারের শুষ্ক শাসনমাত্র মানিয়া চলিলে জয়সিংহের মতন মহাপ্রাণকে বিসর্জন দিতে হয়। জয়সিংহের অপঘাত মৃত্যুতে রঘুপতির দারুণ মর্মদাহ এই কথাই প্রকাশ করিতেছে। বিসর্জন নাটকে আছে—মানব-প্রণীত আচার-বিধির নৃশংসতার বিরুদ্ধে মানব-চিত্তের বেদনার্ত প্রতিবাদ। তাই অন্ধ সংস্কারে জড়িত জয়সিংহ রঘুপতির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াও 'রাজরক্ত চাই' বাক্য এই দেবীর বাণী বলিয়া ভুল করিয়াছিল। মানুষ সংস্কার-বদ্ধ হইয়া থাকিলে পদে পদে ভুল করে—অন্তরের মনুষ্যত্বের চিরন্তন সত্যকে দেখিতে পায় না। শাস্ত্রবিধি লোকাচার যত পুরাতনই হোক তাহার স্থান মনুষ্যত্বের ও হৃদয়-ধর্মের অনেক নীচে।

রঘুপতি ত্রিপুর-রাজ্যের চিরাগত 'বৃদ্ধ প্রথা'—ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে জীব বলির প্রথা—বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই প্রথা বজায় রাখিবার জন্য রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে ও প্রজাদিগকে বিদ্রোহী ও উত্তেজিত করিতে এবং রাজা ও রাণীর মধ্যেও বিরোধ ঘটাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু রঘুপতির উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের লোভ বা স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই, এইজন্য তিনি পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেন। এই যে বিরোধ—ইহা কেবল মতের বিরোধ, ইহার মধ্যে নীচতার লেশমাত্র নাই।

যদিও রঘুপতি রাজাকে গুপ্তহত্যা করাইতে বা প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম নহে, তিনি যে প্রথাকে সত্য ও ধর্ম বলিয়া মনে ধারণা পোষণ করিতেছিলেন, তাহারই সমর্থনের জন্ম তিনি ঐ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইজন্ম রঘুপতি রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার চরিত্র-স্থষ্টি।

কিন্তু বিসর্জনের জয়সিংহ কবির একটি উৎকৃষ্টতর ও সুন্দরতর চরিত্র-স্থষ্টি। গুরুর প্রতি এবং গুরুর বাক্যের উপর তাহার অচলা ভক্তি তাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু তাহার মনের উপর বিবেকের প্রভাব গুরুভক্তির চেয়েও প্রবলতর; রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠে তাহার বিবেকই তাহাকে বলিল—"অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর পূজা"। এবং তিনি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গুরুকে বলিলেন—"ছি, ছি, ভক্তি পিপাসিতা মাতা, তারে বলো রক্ত পিপাসিনী।"

জয়সিংহের মনের মধ্যে এই গুরুভক্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব তাহাকে আত্ম-বিসর্জন করিয়া—নিজের রক্ত দিয়া—রাজ্যের বিদ্বেষানল নির্বাপিত করিতে প্রেরণা দিল। জয়সিংহের এই আত্মবিসর্জন অতীব অপূর্ব ও গৌরবমণ্ডিত।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের দ্বারা সর্ব অকল্যাণ মোচন করিতে চাহিয়াছেন। সেই ভাবের প্রতীক হইতেছে অপর্ণা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মানুষ যখন প্রথা ও শাস্ত্রের কাছে আপনার বুদ্ধি ও বিবেককে বলি দিয়া পাপের ও নৃশংসতার লীলায় সমাজকে ছারখার করিতে উদ্যত হয়, তখনই প্রেমাবতার অপর্ণার আবির্ভাব আবশ্যক হয়—যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অনেকের মনে প্রেমের বীজ গুপ্ত সুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অঙ্কুরিত ও প্রকাশিত হইতে অপরের প্রেমের বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার কথায় নিজের অন্তরের সেই সুপ্ত প্রেমের প্রথম পরিচয় পাইলেন। জয়সিংহ গুরুভক্তির মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তাই তিনি সাহস করিয়া প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু অপর্ণা-রূপিণী প্রেম-বৃত্তি সর্ব-গ্রাসিণী—আজ হোক, কাল হোক প্রেমের কাছে সকলকেই পরাজয় ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। রঘুপতি পুরাতন প্রথার পাষাণ-ভিত্তি। প্রেমের বীজ সেই পাষাণের মধ্যেও পড়িয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যখন তাঁহার প্রাণপ্রতিম পালিত-পুত্র জয়সিংহ আপন রক্ত দিয়া প্রথার পাষাণ-

ভিত্তি সিক্ত, শিথিল-মূল এবং সরস করিয়া দিল, তখন সেই পাষাণের অন্তরেও প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ ও অনুকূল অবস্থা লাভ করিল। রঘুপতি তখন বুঝিতে পারিলেন যে জীবন্ত প্রেমপ্রতিমা অপর্ণার তুলনায় পাষাণী কালীপ্রতিমা কত তুচ্ছ।

এখন রঘুপতি অপর্ণাকেই মা বলিয়া অবলম্বন করিলেন। অপর্ণা সমস্ত নাটকের মধ্যে বিস্ময়জনক কিছু করে নাই, তবু কবির কলা-কৌশলে সেই সমস্ত ঘটনার মূল ও কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

প্রবন্ধ-সংকেত

মনসা-মঙ্গল—সূচনা—মঙ্গল কাব্যের অন্যতম, মনসার মাহাত্ম্য, বাঙ্গালা সাহিত্যে মনসা-মঙ্গলের স্থান।

গ্রন্থকার—অনেক কবি মনসার গান কীর্তন করিয়াছেন। কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি। প্রত্যেকের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মনসা-মঙ্গলের বিষয়বস্তু শিবোপাসক চাঁদ সদাগর মনসাকে ভক্তি করিতেন না। মনসা তাঁহার পূজা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন, এই জন্য তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করেন, সর্বশেষে লখিন্দরও বিবাহ-বাসরে সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার পত্নী বেহুলা দেবসভায় নৃত্য করিয়া মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনেন, এই পুত্রবধূর অনুরোধে শেষে চাঁদ মনসার পায়ে ফুল দেন।

উপসংহার—মনসা-মঙ্গলে বাঙ্গালাদেশের ধর্মকলহের ইতিহাস দেখা যায়।

মেঘনাদবধ-কাব্য—সূচনা—আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কাব্যের স্থান।

গ্রন্থকার—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কাব্য-পরিচয়—মহাকাব্য কি না? কাব্যের বিষয়বস্তু—লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের নিধন। কবির রাবণ পক্ষে সহানুভূতি, প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম, রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রের দুর্বলতা।

রচনা-পরিচয়—বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। মেঘনাদবধ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, বর্ণনা সুন্দর, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য। পাশ্চাত্য প্রভাব।

উপসংহার—মেঘনাদ কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক।

—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—

সবাক চিত্র

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরম বিস্ময়কর অবদান চলচ্চিত্র। মহাকালের সর্বনাশ স্পর্শ হইতে মানুষের বুদ্ধি বিশেষ স্থান ও বিশেষ কালের রূপ এবং বাণীকে চিরদিনের জন্য বাঁচাইয়া রাখিবার এই কৌশল বিজ্ঞানের চরম গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আনন্দের সহিত শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়া মানুষের এই অভিনব সৃষ্টি সমাজের অনন্ত কল্যাণ সাধনের আয়োজন করিয়াছে।

আধুনিক সমাজে চলচ্চিত্রের প্রসার অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের এমন সহর নাই বলিলেও হয়, যেখানে দুই একটি চলচ্চিত্রগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ইহা আজ আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকজন যুবক একত্র সমবেত হইলেই চলচ্চিত্রের কথা উঠিয়া পড়ে। চলচ্চিত্রের সঙ্গীতগুলিতে আজ দেশের হাট মাঠ ঘাট মুখরিত। গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পর্যন্ত গাড়ী চালাইতে চালাইতে সিনেমার গান করে,—নিরক্ষর চাষী চাষ করিতে করিতে চলচ্চিত্রে গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। বাজারে অভিনেতৃবিশেষের নামে সার্ট, ব্লাউজ, শাড়ী বিক্রয় হয়, অভিনেতা বিশেষের অনুকরণে যুবকেরা গোঁপ রাখে, চুল ছাঁটে। এইরূপে আজিকার সমাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আলোকচিত্র হইতে সিনেমা শিল্পের উদ্ভব। প্রসিদ্ধ মার্কিন বিজ্ঞানবিদ্ টমাস এডিসন বিগত ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে চলমান বস্তুর আলোকচিত্র গ্রহণের এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে আর একজন মনীষী বিজ্ঞানবিদ্ শ্বেত যবনিকার উপর আলোকসম্পাতের দ্বারা আলোকচিত্রের প্রতিবিম্ব ক্ষেপনের যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহার সাহায্যে প্রথম প্রথম সাদা কাপড়ের উপর চলমান বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র প্রতিফলিত করিয়া লোকের চিত্তবিনোদন করা হইত। অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন, বৃক্ষ উচ্চস্থান হইতে কেহ লাফাইয়া নীচে পড়িল, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীর স্রোতে নৌকা

ভাসিয়া চলিয়াছে, বাঘ হরিণ শিকার করিতেছে—এই প্রকার চলমান জীবজন্তুর ছবি পর্দার উপর এমনভাবে প্রতিফলিত হইত যে, দেখিলে মনে হইত যেন জীবন্ত প্রাণীদেরই কার্যকলাপ দেখা যাইতেছে। পরবর্তীকালে বিশেষ কোন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ নাটক বা উপন্যাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ চলচ্চিত্র রচিত হইত। কয়েক সহস্র সেলুলয়েডের ফিতার উপর ক্যামেরার সাহায্যে প্রতি মুহূর্তেই চলমান বস্তুটির চিত্র তুলিয়া লওয়া হয়। এই প্রকার অসংখ্য ছবি মুদ্রিত হওয়ায় চলন্ত বস্তুটির প্রতি মুহূর্তের অবস্থানই ঐ সেলুলয়েড ফিতার উপর মুদ্রিত হইয়া যায়। তারপর আলোকচিত্র ক্ষেপণের যন্ত্রের মধ্য দিয়া ঐ দীর্ঘ ফিতাটিকে দ্রুত টানিয়া লইলেই বিপরীত দিকে স্থাপিত সাদা পর্দার উপর বস্তুটির চলমান অবস্থার অবিকল প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নিখুঁত আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য ঐ প্রতিকৃতিকে একেবারে সজীব বলিয়া মনে হয়। প্রথম প্রথম মূক চলচ্চিত্রের প্রচলন হয়, পরবর্তী যুগে 'সিনেমেটোগ্রাফের সহিত ফনোগ্রাফ' একযোগে কাজ করিতে থাকে। ইহার ফলে সবাক চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়। শব্দ ও দৃশ্যের অবিকল প্রতিমূর্তি নয়ন ও কর্ণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া ফেলে, এবং চলচ্চিত্রকে জীবন্ত নরনারীর কার্যকলাপ মনে করিয়া আমরা বিস্মিত হই।

চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া আমরা যে পরিমাণ আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারি, তাহার তুলনা হয় না। পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকিয়া জগদ্বিখ্যাত গুণী শিল্পীর অভিনয় ও সঙ্গীত-নৈপুণ্য উপভোগ করিয়া আমরা মুগ্ধ হই। পৃথিবীর গিরিসঙ্কট, তুষার মরুভূমি, উত্তাল-তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, জঙ্গলে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য আমাদের কয়জনের ভাগ্যে দেখা হয়! তাহাদের অবিকল প্রতিকৃতি সিনেমায় দেখিয়া আমরা উহার সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আজকাল সমরাঙ্গণে আলোকচিত্র গ্রহণের রেওয়াজ হইয়াছে। ইহার ফলে আমরা নিরাপদে ঘরে বসিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের অপরূপ যুদ্ধোদ্যম সন্দর্শন করিয়া শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতে পারি। দেশ-বিদেশের বিচিত্র জীবন-যাত্রার অবিকল চিত্র আমাদের চিত্তে বিদেশের অচেনা মানুষদের সম্পর্কে আত্মীয়তার ভাব জাগাইয়া তুলে। বর্তমান কালে বাস করিয়াও আমরা পৃথিবীর কতটুকু জানিতে পারি? সিনেমার সাহায্যে বর্তমান কাল আমাদের নিকট সত্য হইয়া উঠে। অতীতের যে সব ঘটনা ও ভাব কালের গর্ভে বিলীন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, অতীতের

কাহিনী সম্বলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের গ্রন্থ চিত্রাভিনীত হইলে তদ্দর্শনে আমরা যেন অতীতলোকে আবার ফিরিয়া যাই।

চলচ্চিত্র এইভাবে আজ রঙ্গমঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের অবিকল প্রতিকৃতি সৃষ্টিতে এবং শিল্পীর শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যটুকুই চিত্রে মুদ্রিত হওয়ার ফলে নির্দোষ অভিনয়ের ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চের অপেক্ষা চলচ্চিত্রের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি। কিন্তু রুচিহি ভিন্না কেহ কেহ মনে করেন সজীব শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত রঙ্গমঞ্চের অভিনয়, চলচ্চিত্রের অভিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। যাহা হউক অন্ততঃ আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের প্রবর্তন হওয়ায় রঙ্গমঞ্চের প্রতিপত্তি যে অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষার দিক দিয়া চলচ্চিত্রের দান মহামূল্য। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের পুস্তক অধিক সংখ্যায় পড়িবার সুযোগ ও সময় সমাজের কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? চলচ্চিত্রের অভিনয়ের মধ্য দিয়া আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যিকদের রচনার সংস্পর্শে আসিতে পারি। এইভাবে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তার ও সৃষ্টির সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের চরিত্র গঠনের অনেক সহায়তা হইতে পারে।

কিন্তু এই পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন শুভ বলিয়া বোধ হয় কিছুই নাই। চলচ্চিত্রের একটা অশুভ দিক্ রহিয়াছে। যেমন সুরুচিপূর্ণ সুন্দর চিত্রের সাহায্যে আমাদের চরিত্র উন্নত হয়, তেমনি আবার কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্রের মধ্য দিয়া আমাদের মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ তরুণীদের চিত্তে যৌন-উদ্দীপনাময়, অশ্লীল চিত্রাবলী কদর্যভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অনেকে বলেন চলচ্চিত্র আধুনিক সমাজের নৈতিক অবনতির একটি প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। কুরুচিপূর্ণ চিত্রের দর্শক সংখ্যা অধিক হয় মনে করিয়া অসাধু চিত্র স্রষ্টার দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়া থাকেন। উচ্চস্তরের চিত্রাভিনয় সর্বসাধারণের আনন্দজনক নয়—অথচ চিত্রদর্শক-সংখ্যা এই প্রকার স্থূল মনোবৃত্তির নিতান্ত সাধারণ লোকদের মধ্যেই অধিক। এই জন্য ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রশিল্পীরা চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া উচ্চস্তরের কলাসৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেন না। ফলতঃ ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি লইয়া সমাজের কল্যাণ করা যায় না।

চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া যেমন দেশের সহিত দেশান্তরের সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোদিত ব্যক্তিরা কোনও বিশেষ দেশের সম্পর্কে অযথা নিন্দাত্মক চলচ্চিত্রের প্রচার করিয়া এই পারস্পরিক সম্প্রীতির বিরোধিতা করিতে পারেন কিন্তু এইগুলির বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রের দোষ নয়, মানুষের দোষ। চলচ্চিত্র যন্ত্র মাত্র,—মানুষ যন্ত্রী। মানুষ তাহাকে যেভাবে চালাইবে—সে সেই ভাবে চলিবে। মোটের উপর চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের গৌরব। ইহার সাহায্যে মানুষের চিত্তে জ্ঞানের আলো বিস্তার করা যায়,—প্রেম ও মিলনের সৌরভ বিভিন্ন দেশ ও কালের মানুষের চিত্তে সঞ্চারিত করা যায়। চলচ্চিত্র রূপ ও বাণীকে সে কালের সংহারিণী শক্তির কবল হইতে রক্ষা করিয়া চিরজীবনের শাশ্বত বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বেতারের জন্মকথা

[সূচনা—বেতার বলতে কি বুঝি? প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র—ফ্যারাডের পরিকল্পনা—আলোক তরঙ্গ ও বিদ্যুৎ তরঙ্গ—জগদীশচন্দ্র ও মার্কনির কৃতিত্ব—উপসংহার।]

বেতার বা wireless বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে একস্থানে একজন প্রেরক এবং অন্যস্থানে একজন গ্রাহক আছে। দুয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোনও সংযোগ নাই—অথচ একজন কথাবার্তা বলিলে আর একজনের কাছে সে কথাবার্তা পৌঁছায়। বেতারকে এইভাবে দেখিলে ইহাকে খুব একটা অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আমি এখানে বসিয়া কথা বলিতেছি আর একজন পাঁচ হাত দূরে বসিয়া আমার কথা শুনিতেছে, অথচ আমার মুখ এবং তাহার কাণের মধ্যে কোনও তারের যোগ নাই। সুতরাং ইহাও ত এক রকম বেতার-বার্তা! বাস্তবিক পক্ষে ইহাকেও বেতার-বার্তা বলা যাইতে পারে। আমি যখন কথা বলিতেছি তখন আমার কণ্ঠের স্বরযন্ত্র সম্মুখের বাতাসের তরঙ্গ তুলিতেছে। এই তরঙ্গ বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া অপরের কাণে পৌঁছাইতেছে।

আবার একটা আয়না দিয়া সূর্যের আলো প্রতিফলিত করিয়া আমরা অনেক দূরে আলোক-সঙ্কেত পাঠাইতে পারি। যুদ্ধের সময়ে এই উপায়ে দূর হইতে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়।

এইভাবের সংবাদ আদান-প্রদানকেও প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে কোনও তারের যোগ থাকে না। সুতরাং ইহাকেও বেতার-বার্তা বলা যাইতে পারে। আলোর বেতার অনেক দূর হইতে অতি অল্প সময়ে সংবাদ বহন করিয়া আনিতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃতি-দত্ত এত রকম বেতারের ব্যবস্থা থাকিতে মানুষ যে আবার নূতন করিয়া বেতার সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছে তাহার বাস্তবিক নূতনত্ব কোথায়? মানুষের উদ্ভাবিত বেতার প্রকৃতি-প্রদত্ত আলোর বেতার ও শব্দের বেতার—এই দুই বেতারের গুণের সমন্বয় করিয়াছে। এই বেতারে মুহূর্তমধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরে সংবাদ বহন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আবার শব্দের তরঙ্গের ন্যায় চলিতে চলিতে গতিপথে কোন বাধা পাইলে বাঁকিয়া ঘুরিয়া যাইতেও পারে। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, মানুষের উদ্ভাবিত বেতার যন্ত্রে এক জায়গায় একটা প্রেরক ও দূরে আর এক জায়গায় একটা গ্রাহক যন্ত্র থাকে। প্রেরক যন্ত্র হইতে আকাশে সুদীর্ঘ ও সুবৃহৎ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তোলা হয়। এই তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে, সম্মুখে বাড়ী-ঘর, এমন কি পাহাড় পর্বত পড়িলেও তাহা বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া যায়। দূরে গ্রাহক যন্ত্র এই বেতার-তরঙ্গ ধরিয়া তাহা হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লয়। প্রেরক যন্ত্র যেন দীপশিখা, আর গ্রাহকযন্ত্র যেন মানুষের চক্ষু। দীপশিখা আকাশে ছোট ছোট ঢেউ তোলে, আর আমাদের প্রেরকযন্ত্র লম্বা লম্বা ঢেউ সৃষ্টি করে। চক্ষু শুধু ছোট ছোট আলোর ঢেউ ধরিতে পারে, বড় বড় ঢেউ তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। কিন্তু গ্রাহক যন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, বড় বড় ঢেউ ধরিয়া সে উহাকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে। এই প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে মানুষকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। আকাশে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি এবং অন্যত্র তাহাকে গ্রহণ—এ সব কাজই বিদ্যুৎ ও চুম্বক-শক্তির খেলা, সুতরাং বেতার উদ্ভাবনের কথা বলিতে গেলে যিনি বিদ্যুৎ ও চুম্বক-শক্তি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন, সেই মাইকেল ফ্যারাডের নাম প্রথমেই মনে পড়ে।

একটা গালার কাঠি রেশমী রুমালে ঘষিলে তাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়।

গালার কাঠিটা ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকটে ধরিলে কাগজের টুকরাগুলি লাফাইয়া গালায় আসিয়া লাগে। কাগজ ও গালার মধ্যে আকর্ষণের কারণ কি? ফ্যারাডে বলেন যে, কাগজ ও গালার মাঝে যে আকাশটুকু আছে সেই আকাশই এই আকর্ষণের সৃষ্টি করিতেছে। গালাতে বিদ্যুৎ সঞ্চারের অর্থই—গালার চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশে টানের সৃষ্টি করা।

ফ্যারাডের এই পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক-সমাজ সহজে মানিতে প্রস্তুত হয় নাই। ফ্যারাডের মৃত্যুর কিছুকাল পরে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এই পরিকল্পনা আবার নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া গণিতের ভিত্তির উপর সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সেই সঙ্গে ম্যাক্সওয়েল আবার একটা নূতন কথাও বলিলেন—একটা বস্তুতে হঠাৎ বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইলে ফ্যারাডের পরিকল্পনা অনুযায়ী আকাশে টান ত পড়েই আবার সেই সঙ্গে সেই বৈদ্যুতিক টান তরঙ্গের আকারে চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আকাশে এই বৈদ্যুতিক টানাটানির ঢেউ ঠিক আলোর মতই সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। ম্যাক্সওয়েলের এই কথায় সে সময়ে বৈজ্ঞানিক-সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে সুগভীর গবেষণা করেন। ম্যাক্সওয়েল মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি তাঁহার মতের পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই। সে প্রমাণ প্রথম দেন হার্ৎজ নামক একজন জার্মাণ বৈজ্ঞানিক। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কেমন করিয়া সহজে তোলা যায় তাহা তিনিই হাতে কলমে দেখান। বিদ্যুৎ এবং আলোকের তরঙ্গ যে একই জাতীয় তাহাও তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দেন। হার্ৎজের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক এই সব ব্যাপার লইয়া গবেষণা সুরু করিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গুণ পরীক্ষা করার জন্য চমৎকার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। সে সময়কার বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁহার যন্ত্রকে শত-মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যে সময়ে বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গুণ পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে ইটালির প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মার্কনি চিন্তা করিতেছিলেন কি ভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের

সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। ইনি নানাদেশের বৈজ্ঞানিকদিগকে গবেষণালব্ধ যন্ত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া টেলিগ্রাফের যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। মার্কনির প্রবর্তিত বেতার যন্ত্রে এক জায়গায় একটা প্রেরক যন্ত্র (transmitter) থাকে। প্রেরক যন্ত্র আকাশে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তোলে। এই তরঙ্গ দূরে ছড়াইয়া দিবার জন্য উঁচু মাস্তুলে তার টাঙ্গাইয়া তাহাতে প্রেরক-যন্ত্রের বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া দেওয়া হয়। এই তারই প্রেরক-যন্ত্রের আকাশ তার (transmitting aerial)। দূরে যেখানে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরা হইবে সেখানে আর একটা তার উঁচু করিয়া টাঙ্গান হয়। এইটিই গ্রাহক-যন্ত্রের আকাশ তার (receiving aerial)। তারপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার জন্য একটি যন্ত্র থাকে, তাহার নাম কো-হিয়ারার (co-hearer)।

বিগত ৩৫ বৎসরের মধ্যে মার্কনির উদ্ভাবিত বেতার টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন বেতার টেলিগ্রাফ ছাড়া বেতার টেলিফোনও উদ্ভাবিত হইয়াছে। বেতারে কথাবার্তা, গান-বাজনা এক দেশ হইতে আর এক দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বেতারের আবিষ্কারের ফলে আজ মানুষ দূরত্বের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানকে অবলীলা-ক্রমে লঙ্ঘন করিয়াছে। সপ্তসিন্ধুর অপরিমেয় বাধা অতিক্রম করিয়া আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের সহিত সম্মিলিত হইয়া মানুষের জয়গান করিতেছে।

আধুনিক যুদ্ধের মারণাস্ত্র

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজ প্রকৃতির নিয়মকে নিজের আয়ত্ত করিয়া জীবনযাত্রাকে অনেক পরিমাণে সুখময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির বিপর্যয়কারী খেয়ালে স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ কত যে অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রকৃতির নির্মম খেয়ালকে দমন করিয়া যখন ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল,— তখন সমাজের চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাস দেখা গিয়াছিল। কিন্তু মানুষের বিধাতা বুঝি সেদিন অন্তরীক্ষে থাকিয়া মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন।

জীবনকে সুখের করিয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতির সংহারিণী শক্তিকে দমন করাই একদিন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহার বিপরীত ফল দেখা গেল। মানুষের মধ্যে সভ্যতার সুদীর্ঘ ও সুবিপুল আয়োজন সত্ত্বেও তাহার মধ্যে আদিম বর্বর ও হিংস্র প্রবৃত্তি নির্মূল হয় নাই। উহা ঘুমাইয়া রহিয়াছে মাত্র। লোভ ও আত্মস্বার্থ সাধনায় সেই আদিম প্রবৃত্তি মুখোস পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকেও উলঙ্গ হিংস্রমূর্তিতে তাণ্ডবনৃত্য করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছে না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব আজ এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ শত্রুশক্তির আশঙ্কায় বিশ্রামসুখ ভুলিয়াছে নিদ্রার শান্তিও হারাইয়াছে, তাহার তন্দ্রার নিকনতাও দুঃস্বপ্নের তাড়নায় মুহুর্মুহু ঘুচিয়া যাইতেছে। মানুষ আজ অশান্ত ভীত ত্রস্ত হইয়া নিজের জন্মস্থানে থাকিয়াও যেন শত্রুপুরীতে বাস করিতেছে।

সংগ্রাম মনুষ্যের আদিম সহজাত প্রবৃত্তি। সভ্যতার শত মিলনায়োজন সত্ত্বেও যুগে যুগে এই সংগ্রামের শক্তি ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে। একদিন ছিল যখন মানুষ রণক্ষেত্রে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া তীর ধনু, অসি, গদা, চক্র, পট্টিশ, তোমর জাঠা প্রভৃতি নিক্ষেপে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত। সেদিন সংগ্রামে ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যের একটা মূল্য ছিল, ক্ষত্রিয় শক্তির একটা মর্যাদা ছিল। আজ বিজ্ঞানের যুগে সেই প্রাচীন শৌর্য বর্বর যুগের পাশবিক রীতি বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। বিজ্ঞান অভাবিতপূর্ব অগণিত মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া বিশ্ববাসীকে নিত্য নূতন চকিত করিয়া তুলিয়াছে।

জল-স্থল-অন্তরীক্ষ আজ মারণাস্ত্র সজ্জিত রণবাহিনীতে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। বিমানপোতে অন্তরীক্ষ হইতে নানাবিধ জীবনান্তকর বিস্ফোরক বোমা শত্রুপক্ষের উপর নিক্ষেপ করিতেছে। ট্যাঙ্ক নামক এক অতি ভীষণ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাকে সচল দুর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ৮০।৮৫ টন পর্যন্ত ইহার ওজন, ঘণ্টায় প্রায় বাত্রিশ মাইল ইহার গতি। যে পথে ইহা যাইবে, সে পথে পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ কোন অন্তরায়ই ইহাকে বাধা দিতে পারিবে না। সম্মুখের সমস্ত সমভূমি করিয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে ট্যাঙ্ক অগ্রসর হয়। ইহার মধ্যে কামান ও মেসিনগান চালাইবার সর্বপ্রকার আয়োজন থাকে। একাধিক শ্রেণীর যুদ্ধবিমান আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলপথ ও স্থলপথ উভয় ক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিমানপোত ব্যবহৃত হয়। সকল বিমানের আকার এক প্রকার নয়। মৃত্যুবাহী বিস্ফোরক বিমান হইতে শত্রুপক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাই বা কত প্রকারের। সাময়িক বোমা, গ্যাস বোমা, রোগের জীবাণু-বাহক বোমা, আগুনে বোমা এবং আরও বহুপ্রকার বোমা আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। প্রায় সত্তর মণ ওজনের অতিকায় বোমার সাহায্যে আধ মাইল জায়গা জুড়িয়া নগরকে আগুন জ্বালাইয়া দিবার আয়োজনও আজ করা হইয়াছে।

শুধু আকাশপথ নয়, জলপথেও আধুনিক যুদ্ধশক্তি কল্পনাতীত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। Navy বা নৌবাহিনী আজ দেশরক্ষার জন্য সমুদ্রচারী বা পাহারার কাজে নিযুক্ত হইয়া দেশরক্ষা করিতেছে। ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার, পণ্যতরী ও সাবমেরিন লইয়া এক একটি Navy সংগঠন। সাবমেরিনগুলি শত্রুপোত সংহারক টর্পেডো বহন করিয়া জলের তলদেশ দিয়া এবং জলের উপর দিয়া সমভাবে চলিতে পারে। হয়ত কোন শত্রুপক্ষের জাহাজ নিঃশব্দভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে এমন সময় অলক্ষ্যভাবে শত্রুর সাবমেরিন হইতে একটি টর্পেডো বিদ্যুৎগতিতে আসিয়া জাহাজের তলা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল।

বিভিন্ন মারণাস্ত্রকে প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্যও নানাপ্রকার উপায় বৈজ্ঞানিকেরা আজ উদ্ভাবন করিয়াছেন। শত্রু গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করিলে আত্মরক্ষার জন্য গ্যাস মুখোস ব্যবহার করিতে হয়। চুম্বক মাইনকে প্রতিহত করিতে মাইন সুইপার প্রস্তুত হইতেছে। বোমারু বিমানকে প্রতিহত করিবার জন্য Anti aircraft gun বা বিমানধ্বংসকারী কামানের ব্যবহার

হইতেছে। এইরূপ কত প্রকারের রণসজ্জায় আজ রণচণ্ডী সাজিয়াছেন যে কে তাহার সংখ্যা করিবে? প্রেম ও মৈত্রীর রাজ্য আজ কোথায়? দিকে দিকে রণদামামা বাজিতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ ধূলিমুষ্টির ন্যায় বোমার ফুৎকারে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। জল-স্থল-আকাশে মানুষ মানুষেরই ভ্রূকুটি ভীষণ রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভীত চকিত হইতেছে।

এক একটি দেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় গৌরব নামে ভীষণ বিরোধ ও স্বার্থবুদ্ধি জগতে মৃত্যু ও বিভীষিকা ছড়াইয়া বেড়াইতেছে। কেহ আর কাহারও মুখ চাহিতেছে না। মানুষের জীবনের যেন কোনই মূল্য নাই। যুদ্ধের উন্মাদনায় মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি ভূকম্পোনচ্ছিত বালুস্তূপের ন্যায় ধ্বসিয়া গিয়াছে। প্রবল শক্তিদ্বয়ের যোদ্ধোন্মাদনায় নিরীহ নির্বোধ দরিদ্র গ্রামবাসীর দুর্বিসহ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আজিকার যুদ্ধের ভীষণতা শুধু রণক্ষেত্রেই থাকিতেছে না। সুদূর পল্লীর নিভৃত কোণটিতে বসিয়া গ্রামবাসী গৃহস্থগণ নিশ্চিন্ত মনে ঘর-কন্না করিতেছে,—অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বম্বের অনলে তাহাদের বহুদিনের গড়া ঘরখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কত প্রিয়জন সেই ধূলি সমাধিতে চিরনিদ্রায় সমাহিত হইল। সামরিক প্রয়োজনের তাড়নায় কত নিরীহ গ্রামবাসীকে গৃহচ্যুত হইতে হইতেছে। এইভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা, পারিবারিক শান্তির ভিত্তিমূল পর্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া উঠিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের অগ্নি নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তে নিভিয়া যায় নাই। ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় তাহা দ্বিগুণ তেজে আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ মারণশক্তিতে ও ভীষণতায় কল্পনাকে পরাভূত করিয়াছে। এই সমর-বহ্নিতে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ সন্তানের তপ্ত হৃদয়শোণিত নিত্য আহুত হইতেছে। উহার উত্তাপে ঘরে বাহিরে সমস্ত শান্তির শ্যামলতা ঝলসিয়া গিয়াছে তথাপি ইহার দুর্নিবার রক্ততৃষ্ণা প্রশমিত হয় নাই। কতদিনে এই বিরাট বিভৎস মারণ-মহাযজ্ঞের অবসান হইবে, কে বলিতে পারে?

প্রবন্ধ সংকেত

টেলিগ্রাফ ঃ—সূচনা—ইংরাজী শব্দটি telegraph, tele—দূর, graph—লেখা, টেলিগ্রাফ বলিতে বুঝায় দূরে সংবাদ প্রেরণ।

যন্ত্রের বিবরণ—এক স্থানে একটি প্রেরকযন্ত্র এবং অন্য স্থানে একটি গ্রাহকযন্ত্র থাকে। বৈদ্যুতিক তার যন্ত্রদ্বয় সংযুক্ত থাকে। প্রেরকযন্ত্রের একদিকে অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকযন্ত্রেও অনুরূপ শব্দ হয়। শব্দ মাত্র দুই প্রকার—টরে ও টক্কা, এই শব্দদ্বয়ের নানাবিধ সমাবেশে বিভিন্ন বর্ণের সংকেত সূচিত হয়।

আবিষ্কার—গাউস ও ওয়েবার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক ১৮৩৩ খৃ. অব্দে প্রথম কার্যকরী টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, তাহার পর সংকেতের ব্যবস্থা হয়, বর্তমানে যে সংকেতের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীতে সংবাদ আদান-প্রদান হইতেছে তাহার উদ্ভাবন কর্তার নাম মর্স (১৭৯১-১৭৯২ খৃঃ অব্দ)।

বেতার টেলিগ্রাফ—বর্তমানকালে বেতারেও সংকেত পাঠান সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে সুবিধা আরও বাড়িয়াছে।

উপসংহার—মানুষ বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছে, দূরত্বের ব্যবধান বুদ্ধিবলে কমাইয়াছে।

টেলিফোন ঃ—সূচনা—telephone ইংরাজী শব্দ, tele—দূর, phone—শব্দ, সুতরাং টেলিফোনের অর্থ দূরের শব্দ শোনা।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন—টেলিগ্রাফের সংকেত পাঠান হয় আর টেলিফোনে বক্তার মুখের কথাটি অবিকল শোনা যায়।

টেলিফোনের ব্যবহার—টেলিফোনের আবিষ্কারে কাজকর্মের সুবিধা হইতেছে, মুহূর্তমধ্যে বহু দূরদেশের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ভারতবর্ষে বসিয়া ইংলণ্ডপ্রবাসী আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যাইতেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে, বেতার টেলিফোনে সমুদ্রপোতে এবং বিমানপোতে সংবাদ পাঠান হইতেছে।

আবিষ্কার—১৮৭৬ খৃঃ অব্দে গ্রেহাম বেল ইহা আবিষ্কার করেন।

উপসংহার—বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করিয়াছে।

এরোপ্লেন ঃ—সূচনা—ইংরাজী শব্দ aeroplane, অর্থ আকাশ-যান বা ব্যোমযান, ইহার দ্বারা আকাশপথে গমনাগমন সম্ভব হইয়াছে।

আবিষ্কার—মানুষের আকাশে উড়িবার ইচ্ছা, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেজার্ড অ ভিনসি নামক এক ব্যক্তি কৃত্রিম পাখার সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পড়িয়া মারা যান, ইহার পর গোল্ডউইন, গুডম্যান, বাকচিন প্রভৃতির অনুরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মংগলফিয়ের বেলুন নির্মাণ, ১৯০৩ খৃঃ অব্দে উইলবার রাইট এরোপ্লেন তৈয়ার করেন, আধুনিক এরোপ্লেন ঐ এরোপ্লেনেরই উন্নত রূপ।

বেলুন ও এরোপ্লেনে উভযের মধ্যে পার্থক্য, উভয় যন্ত্রের বর্ণনা ও চালনা-প্রণালী।

ব্যবহার—এরোপ্লেনের ব্যবহারে বহুদূরের পথ অতি অল্প সময়ে যাওয়া যায়, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, মরুভূমির বাধা অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। আধুনিক যুগে যে জাতির বিমানবল যত অধিক, সেই জাতিই তত বলীয়ান। যুদ্ধ ব্যাপারে এরোপ্লেনের ব্যবহার।

উপসংহার—এখন এমন এরোপ্লেন নির্মিত হইয়াছে যাহা জলে ভাসিতে পারে, ডাঙায় ছুটিতে পারে আবার আকাশেও উড়িতে পারে, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আরও কত কি বিচিত্র জিনিসের আবিষ্কার হইবে।

বাষ্পযান ঃ—বাষ্প বা ষ্টিমের শক্তিতে চালিত যানকে বাষ্পযান বলা হয়—বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবিষ্কার—জেমসওয়াট ষ্টিফেনসন বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথম গাড়ী চালান—রেলগাড়ী ও জাহাজ সাধারণতঃ বাষ্পে চলে—ইহার আবিষ্কারে মনুষ্য-সমাজের সুবিধা—উপসংহার।

—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—

বন্যা

[সূচনা—'বন্যা' কাহাকে বলে ?—বন্যা হওয়ার কারণসমূহ—বন্যায় দুর্গতি—বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল—দুর্ভিক্ষ—বন্যার সুফল ও উপসংহার।]

পৃথিবীর তিন ভাগ জল—মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থল। কিন্তু এই স্থলভাগের অধিবাসীরা যুগ-যুগান্তরের অতি-সান্নিধ্য সত্ত্বেও জলে বাস করিতে শিখিল না। জল মানুষের জীবনে একেবারে অপরিহার্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অতি-প্রয়োজনীয় পদার্থটির একটু মাত্রাধিক্য ঘটিলেই যে মানুষ কতদূর বিপন্ন হইয়া পড়ে, একটি বন্যার দৃশ্য দেখিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

পৃথিবীর স্থলভাগে যখন জল অনধিকার প্রবেশ করে, পৃথিবীবাসিগণের ঘর দুয়ার, ভদ্রাসন যখন অকস্মাৎ অভাবনীয় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যায়, তখনই 'বন্যা' হইয়াছে বলা হয়। অতিবৃষ্টি বন্যার সর্বপ্রধান কারণ। অত্যধিক বর্ষণের ফলে নদ-নদীর জলপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া দুই তটের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করে, বারিরাশি ভীমবেগে গ্রাম-পল্লী, নগর-নগরী ভাসাইয়া লইয়া যায়। নদীর গতি পরিবর্তনও বন্যার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আবার এক প্রদেশের একাধিক নদী মজিয়া যখন ঐ সকল শুষ্ক বা শুষ্কপ্রায় নদীর জলস্রোত একটিমাত্র নদীপথে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন স্বভাবতঃই জলপ্লাবন হয়। উত্তরবঙ্গে যে এত বেশী বন্যা হয়, তাহা এই কারণেই। ইহা ছাড়া যদি কোনও নৈমিত্তিক কারণে অকস্মাৎ অত্যধিক তুষার বিগলিত হইয়া পর্বত হইতে অভাবিত পরিমাণে জল নিঃসৃত হয়, তাহা হইলেও বন্যা হইতে পারে। আবার নানা কারণে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত ও স্ফীত হইয়া উঠে। নদী-পথে সেই প্রচুর জলরাশি অগ্রসর হইয়া সমুদ্রকূলবর্তী ভূভাগকে প্লাবিত করিতে পারে।

বন্যার ফলে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক বৎসর বর্ষাকালে কোন না কোন অঞ্চলে বন্যা হইয়া থাকে। বন্যা যদি খুব বেশী না হয়, তবে দুর্গতি কম হয়। কবি ও বালকগণের

চোখে দৃশ্যটি মন্দ লাগে না, হয়ত যেখানে গোচরভূমি ছিল সেখানে একটি সরোবর হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র সমুদ্র হইয়াছে, রাস্তা, নদী, উঠান, জলাশয় ও ঘরগুলি দ্বীপ বা অতিকায় জলজন্তুর মত সেই অপূর্ব জলনিধির মধ্যে বিরাজ করিতেছে। কিছুকালের মধ্যেই হয়ত সেই বন্যা অপগত হইল। কিন্তু বন্যার করালমূর্তি দেখিলে কবি ও বালকগণের এই কাব্য-বিলাস মুহূর্তে মিলাইয়া যায়, তৎপরিবর্তে হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হয়। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গ্রাম, প্রান্তর, নদী, পথ একাকার হইয়াছে। প্রকৃতির হাহাকারের ন্যায় বায়ু বহিতেছে, তাহাতে সেই বন্যার জলে উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি হইয়াছে। বাড়ীর অনেকগুলিই লুপ্ত। পাকাবাড়ীগুলির কতক ভূমিসাৎ হইয়াছে, বাকীগুলিও জলমগ্ন, কখন পড়িয়া যাইবে স্থিরতা নাই। মানুষ, গোরু, ভেড়া, ছাগল জলের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। শস্যক্ষেত্রে শস্যের চিহ্ন নাই। যাহারা বাঁচিয়া আছে,—তাহাদের আহার্য নাই, বাসস্থান নাই, শীত নিবারণের বস্ত্র নাই, আত্মীয়-স্বজনের কে কোথায় গিয়াছে, আছে কি মরিয়াছে, স্থিরতা নাই। তাহারা কম্পিতবক্ষে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। একখণ্ড উচ্চ ভূমি পাইলে তাহাতে মানুষ, পশু, সর্প ও শ্বাপদ একত্র আশ্রয় লইতেছে। মানুষ লজ্জা, ক্রোধ, হিংসা, মমতা ভুলিয়াছে। ইহাই বন্যার দৃশ্য।

বন্যা যতকাল স্থায়ী হয়, মানুষের দুর্দশাও তদনুপাতে কম-বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু বন্যার জল অপগত হইলেই যে দুর্গতির অবসান হয়, তাহা নয়। বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রায়ই কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও আহার্যের অভাব ঘটে। দিকে দিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর হাহাকারে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইতে থাকে। ঘর-বাড়ী নাই, অর্থ নাই, আহার্য নাই, পরিচ্ছদ নাই,—ইহার অপেক্ষা দীনতর অবস্থা মানুষের আর কি হইতে পারে?

শুধু মানুষ কেন? গো-মহিষাদি জন্তুরও ক্লেশের অবধি থাকে না। এই সব জন্তু বন্যার সময় অনেক মরে। যাহারা বাকী থাকে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাহারাও রোগজীর্ণ হইয়া যায়। মাঠে তৃণের লেশমাত্র থাকে। যে সমস্ত তৃণ জলের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে, সেগুলিও বহুকাল জলের মধ্যে থাকিবার ফলে এমন দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে, গো-মহিষাদি উহা আহার করা দূরে থাকুক স্পর্শও করে না।

বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রকৃতি অতি দীনমূর্তি ধারণ করে। গাছপালা প্রায়ই মরিয়া যায়, এজন্য যেন চারিদিকেই একটা তিক্ততা ও দুর্ভাগ্যের ছায়া পড়ে। কিন্তু মঙ্গলময়ের বিধানে অকল্যাণের অন্তরালেও সীমাহীন মঙ্গলেচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকে। বন্যায় পৃথিবী পৃষ্ঠের যাবতীয় আবর্জনা বিধৌত হইয়া যায়। ইহার ফলে পৃথিবী নির্মল ও গ্লানিনির্মুক্ত হইয়া আবার অভিনব শান্তির রাজ্যে পরিণত হয়।

হিমালয়ের দৃশ্য

[সূচনা—হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহ—হিমালয়ের সন্নিহিত নগর-নগরী, পার্বত্য দৃশ্য, টোঙ্গলো শিখর, সূর্যাস্তের দৃশ্য।]

ভারতবর্ষের উত্তরে যে পাঁচশত ক্রোশ দীর্ঘ হিমালয় পর্বত গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহার সকল স্থানের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করা প্রায় অসাধ্য। কোন সুনিপুণ চিত্রকরও সেই সকল দৃশ্যের অবিকল চিত্র এ পর্যন্ত আঁকিতে পারে নাই। হিমালয়ের কোথাও শ্যামল উপত্যকা, কোথাও অতি-শুভ্র তুষারক্ষেত্র, কোথাও জলহীন বৃক্ষহীন প্রস্তররাশি, আবার কোথাও বা অতি সুন্দর নির্ঝরিণীর জলধারা কুল-কুল স্বরে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

এভারেষ্ট নামক হিমালয়ের যে উচ্চ শিখর আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহার উচ্চতা প্রায় পাঁচ মাইল। কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি আরও কয়েকটি শৃঙ্গ এভারেষ্ট হইতে কিছু কম উচ্চ হইলেও তাহাদের তুল্য উচ্চ শৃঙ্গ অন্য পর্বতে দেখা যায় না। হিমালয়ের এই শৃঙ্গগুলি শোভাসম্পদেও পৃথিবীর সকল শিখরকে পরাজিত করিয়াছে। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তর-ভারতকে ধনধান্যশালিনী করিয়াছে। এই সকল নদীর উৎপত্তি-স্থানের শোভা দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়।

পৃথিবীর সর্ব ঋতু এবং প্রায় সর্বপ্রকার বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষী এই মহাপর্বতে

বর্ত্তমান। উত্তরমেরুর তুষারক্ষেত্রে যে তৃণগুল্ম এবং জীবজন্তু দেখা যায়, হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছন্ন স্থানগুলিতে তাহার অনেকগুলি রহিয়াছে। আফ্রিকা এবং আমেরিকার গভীর অরণ্যে যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে, হিমালয়ে তাহাদেরও কতকগুলির অভাব নাই। ইহা দেখিলে মনে হয়, যেন গিরিরাজ পৃথিবীর নানা দেশের শোভা ও সম্পদ আহরণ করিয়া আনিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

দার্জিলিং, সিমলা, নাইনিতাল, মুশৌরী প্রভৃতি অশেষ-শোভাসম্পন্ন নগরগুলি হিমালয়ের অঙ্কে অবস্থিত। দার্জিলিংয়ের উচ্চতা সাত হাজার ফুট মাত্র। ইহারই নিকটে সিঞ্চল-নামক শৈলশিখরে দাঁড়াইলে হিমালয়ের যে মূর্তি দেখা যায়, তাহা অতি সুন্দর। চিরতুষারাবৃত পর্বতমালাকে এখান হইতে চিত্রে অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। নীল মহাসমুদ্রের ফেনযুক্ত ঢেউগুলি উপর হইতে যেমন দেখায়, ঐ স্থান হইতে নিম্ন শৃঙ্গগুলিও সেরূপ দেখায়। বহু নিম্নে ত্রিস্রোতা ও নদনদী প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর ধারাগুলি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। সেগুলিকে দেখিলে মনে হয়, কে যেন হিমালয়ের শ্যামল দেহে কয়েকটি রূপার সূতা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল নদীই হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া উত্তর বঙ্গের ভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়াছে। সিঞ্চল পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃক্ষের অভাব নাই। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই স্থানটি নানাজাতীয় তরু-গুল্ম লতায় আচ্ছন্ন থাকে। তাহার পরে যখন প্রত্যেক তরু ও লতা বিচিত্রবর্ণের পুষ্পাভরণে ভূষিত হয়, তখন সেখানে অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানকার ম্যাগ্‌নোলিয়া নামক একপ্রকার বৃক্ষের শ্বেত ও লোহিত পুষ্পস্তবক-গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এগুলির বর্ণে ও সৌন্দর্যে বনভূমি যেন উৎসবের বেশ ধারণ করে।

দার্জিলিং হইতে নেপালের দিকে অগ্রসর হইয়া যতই উপরে উঠা যায় ততই মনোরম নূতন দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে একঘেয়ে ভাব একটুও নাই। ইহার সকলই নূতন এবং নয়নের আনন্দজনক। কিন্তু পথ অতি দুর্গম, পথিকদিগকে প্রায়ই গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া অতি কষ্টে চলিতে হয়। কোথাও বামের তুরারোহ উচ্চ পর্বত এবং দক্ষিণের অতি গভীর গহ্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পথ অবস্থিত। কোথাও বা খরস্রোতা পার্বত্য নদী অতিক্রম না করিতে পারিলে আর উপরে উঠা যায় না।

এই সকল স্থানে অনেক পাইন, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ এবং গভীর বেণুবন দেখা যায়। মুক্তস্থানের মাঝে মাঝে যে দু-একটি গ্রাম আছে, সেগুলির দৃশ্য চমৎকার। প্রত্যেক গ্রামই ধান্য, ভুট্টা ও গোধূম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেষ্টিত। এগুলিকে দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকর পর্বত গাত্রে একখানি চিত্রপট আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

নেপাল রাজ্যের নিকটে টোঙ্গলো নামক যে সাড়ে নয় হাজার ফুট উচ্চ শিখর আছে, তাহার উপরে দাঁড়াইলে হিমালয়ের আর এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা তুষারের মুকুট পরিয়া সূর্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। পূর্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল তুষারাবৃত পর্বতমালা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

এখানে পর্বতে যে সূর্যাস্তের শোভা দেখা যায়, তাহা হিমালয়ের অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্যাস্তের সময় পর্বতমালার কটিদেশে যে সকল মেঘ স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে সেগুলি হঠাৎ লোহিত, পীত, পাটল প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। তাহার পরে সূর্যের অস্তাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল উজ্জ্বল বর্ণই একে একে অনুজ্জ্বল নানা বর্ণে পরিণত হইয়া অপূর্ব শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক এই রঙ্গের খেলা দেখাইতেছে।

হিমালয়ের যে অংশে কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত সেখানে গিরিরাজের আবার আর এক মূর্তি দেখা যায়। সেই স্থান বৎসরের সকল সময়েই শ্যামল তরুলতায় আচ্ছন্ন থাকে। এভারেষ্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় অত্যুচ্চ পর্বতের মহান্ গভীর দৃশ্য এ অঞ্চলে নাই সত্য, কিন্তু হরিপর্বত প্রভৃতির দৃশ্য অতি সুন্দর। ঝিলাম নদ খরস্রোতে এই স্থানে প্রবাহিত। নদীর দুই তীরই ফল-পুষ্পের ভারে অবনত বৃক্ষরাজিতে এবং শ্যামলক্ষেত্রে আবৃত। এই সকল দেখিলে মনে হয়, যেন প্রকৃতিদেবী নিজে বসিবার জন্য এই স্থানে তাঁহার বিচিত্র আসনখানি পাতিয়া রাখিয়াছেন। ঝিলাম নদের উভয় তীরে প্রসিদ্ধ নগর শ্রীনগর অবস্থিত। নদের উপর সাতটি সেতু আছে। নগরবাসীরা সেই সকল সেতুর উপর দিয়া এক তীর হইতে অপর তীরে গমনাগমন করে। কাশ্মীরের সকল দৃশ্যই মনোরম। এই জন্যই ইহা 'ভূস্বর্গ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধ-সংকেত

ভূমিকম্প ঃ—সূচনা—ভূমিকম্প বলিতে কি বুঝায়?

ভূমিকম্পের কারণ—ভূমিকম্প সম্বন্ধে অন্ধ ধারণা, বাসুকির মস্তক সঞ্চালনে পৃথিবী কম্পিত হয় ইত্যাদি, বৈজ্ঞানিক কারণ, নানা পণ্ডিতের মত। ভূমিকম্পের দৃশ্য—ঘরবাড়ী গাছপালা সব কাঁপিতে থাকে, ভূমিকম্পনের বেগ বেশী হইলে ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভূপৃষ্ঠ বিদারিত হয়, লোকজন চাপা পড়িয়া মরে, মানুষের দুঃখের অন্ত থাকে না।

দৃষ্টান্ত—বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্প, মানুষের দুরবস্থা, প্রাণহানি, আর্থিক ক্ষতি, দেশের লোকের সহানুভূতি, গভর্ণমেন্টের সদাশয়তা।

সাহারা ঃ—সূচনা—মরুভূমি কাহাকে বলে, সাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি।

অবস্থান—সাহারা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত, সাহারার পশ্চিম দিক অতিশয় ভয়াবহ।

নৈসর্গিক বিবরণ—বৃষ্টিপাত অতি অল্প, বৃষ্টি যদি বা কখনও হয়, তাহাও বালিতে শুষিয়া লয়, স্থানটি অত্যন্ত শুষ্ক, গাছপালা বিরল, মধ্যাহ্নে সাহারার দৃশ্য ভয়ঙ্কর, 'সমুম' নামক ঝড়, এই ঝড়ের বর্ণনা, কোথাও 'ওয়েসিস' বা মরূদ্যান আছে, মরীচিকা।

যানবাহন—উষ্ট্র ভিন্ন আর কোন প্রাণী চলিতে পারে না। উপসংহার—বিজ্ঞানের বলে অসাধ্য সাধন হইতেছে, বর্তমান যুগে মোটর চলিতেছে এরোপ্লেন যাতায়াতেরও ব্যবস্থা হইতেছে, কোন কোন স্থানে জনকোলাহল শুরু হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ ঃ—সূচনা—দুর্ভিক্ষ শব্দের অর্থ। কারণ—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি।

দুর্ভিক্ষ দেশের দুরবস্থা—মানুষ অনাহারে মরে, যে যৎসামান্য খাদ্য পাওয়া যায় মূল্যের আধিক্য হেতু তাহাও সকলে কিনিতে পারে না, লোকে অখাদ্য কুখাদ্য খাইতে বাধ্য হয়, তাহার ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার—জলসেচ প্রণালী এবং সেচের সুব্যবস্থা, বন্যার জল যাহাতে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশ ডুবাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য একদেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা, সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থাপন।

বর্তমান যুগে দুর্ভিক্ষ—বর্তমানকালে দুর্ভিক্ষের সেই ভয়াবহ রূপ তেমন দেখা যায় না, রেলপথে জিনিসপত্র সহজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, তাহার ফলে কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন জিনিসের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যাইতে পারে না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালাদেশের কিরূপ দুর্দশা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ, পঞ্চাশের মন্বন্তরের উল্লেখ, বর্তমানকালে যতই দুর্ভিক্ষ হউক না কেন ঠিক সেই রকম অবস্থা হয় না।

— —

—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—

ব্যায়াম

[সূচনা—স্বাস্থ্যের সুখ, স্বাস্থ্যহীনতার দুঃখ, ব্যায়ামের উপযোগিতা, ব্যায়ামের আনন্দ, বিবিধ ব্যায়াম, বিবিধ খেলাধুলা ও তাহাদের উপযোগিতা, বিদেশী খেলা ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য, নারীজাতির শরীর চর্চা, অত্যধিক ব্যায়ামের কুফল।]

স্বাস্থ্য মানবজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। যাহার শরীর সুস্থ নয়, তাহার মনে শান্তি নাই, কর্মে উৎসাহ নাই, সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকে। বিবিধ সুখের নিদান এই মানবজীবন তাহার কাছে অত্যন্ত ক্লেশময় ও দুর্বহ হইয়া উঠে। এ সংসারে মানুষের সুখের জন্য চারিদিকে যে বিচিত্র আয়োজন রহিয়াছে, তাহার কোনটিই অসুস্থ ব্যক্তির মনে ধরে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবানের কাছে সমস্তই সুখকর। সংসারে বিধাতার বিধানে মানুষের যে সমস্ত দুঃখ ক্লেশ সৃষ্ট হইয়াছে, সুস্থ সবল ব্যক্তি নিজের মনের আনন্দে তাহা সমস্তই উপেক্ষা করিতে পারেন। দারিদ্র্যকেও তিনি হেলায় পরাজিত করেন। তাঁহার মন পবিত্র হয়, চরিত্র উন্নত হয়।

ব্যায়াম না করিলে শরীর ভাল থাকিতে পারে না। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলির নিয়মিত চালনাকেই এক কথায় ব্যায়াম বলা যায়। ধাতু-নির্মিত যন্ত্র ব্যবহার না করিলে, উহাতে মরিচা পড়ে, উহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়, এমন কি শেষ পর্যন্ত উহা একেবারে অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। আমাদের শরীরও তেমনি একটি যন্ত্র-বিশেষ। বহুকালের অব্যবহারে এই যন্ত্রও বিকল হইয়া থাকে। শরীরের যথাযথ চালনা না করিলে, সমস্ত উৎসাহ ও কর্মশক্তি লোপ পায়। শরীরখানি যেন প্রাণের পক্ষে একটি কঠোর কারাগার হইয়া দাঁড়ায়, ইহার মধ্যে থাকিয়া আমাদের প্রাণ যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

ইহা ছাড়াও ব্যায়ামের আর একটি দিক আছে। প্রয়োজনকে বাদ দিয়াও দেখা যায়, মানুষের মধ্যে খেলাধূলার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। মানুষ নিরবধি প্রয়োজনের মধ্যে যেন বন্দী হইয়া থাকে। খেলাধূলার মধ্যেই যেন সে মুক্তি পায়। কাজ করিতে করিতে মন যখন ক্লান্ত হইয়া উঠে, তখন

মন আমাদের এই বিনা-প্রয়োজনের মুক্তিকে খুঁজিয়া বেড়ায়, যখনই ছাড়া পায়, ছুটিয়া গিয়া একটু খেলাধূলা করিতে চায়। খেলাধূলায় শারীরিক পরিশ্রম হয় না, এরূপ নয়, কিন্তু মানুষ এই মুক্তির আনন্দে সে কথা ভুলিয়া থাকে।

তাই সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য কর্ম করিবার সময় যদিও অঙ্গ চালনা হইয়া থাকে, তথাপি খেলাধূলার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আনন্দ পাওয়া যায়। এই খেলাধূলা বা ব্যায়াম অনেক প্রকারের হইতে পারে। যত প্রকার ব্যায়াম আছে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণই সর্বাপেক্ষা সহজ। ইহাতে কষ্ট কম। যাঁহারা রুগ্ন বা সদ্য রোগ হইতে উঠিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অত্যধিক পরিশ্রম-সাধ্য ব্যায়াম করা বিধেয় নয়। তাহাতে শরীরের ক্ষতি হইতে পারে। ভ্রমণ এইরূপ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ব্যায়াম। প্রত্যূষে বা সন্ধ্যাকালে মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিলে শরীরের গ্লানি দূর হয়, মনও ভাল হয়। সন্তরণও খুব উত্তম ব্যায়াম। ইহাতে হাত ও বুক খুব দৃঢ় হয়। সাঁতার দিতে জানিলে অনেক সময় বিপদ হইতে নিজে যেমন রক্ষা পাওয়া যায়, তেমনি নিমজ্জমান ব্যক্তিকেও রক্ষা করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে লাঠি খেলার রীতি প্রচলিত ছিল। এই লাঠিই একদিন বাঙ্গালাদেশে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। বাঙ্গালীরা লাঠি খেলার এমন আশ্চর্য কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল যে, ইহার সাহায্যে বলীয়ান বিপক্ষকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিত। ডন্, বৈঠক প্রভৃতি আরও অনেক ব্যায়াম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অশ্বারোহণও উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

এ তো গেল আমাদের দেশী ব্যায়ামের কথা, ইহা ছাড়াও আজকাল অনেক বিদেশী খেলা আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে। ফুটবল, ক্রিকেট, পোলো, গলফ, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি বিদেশী খেলা। এগুলি সমস্তই মুক্ত বাতাসে খেলিতে হয়। ফুটবল ও ক্রিকেট আমাদের দেশে বিলক্ষণ জনপ্রিয় হইয়াছে। তবে এই সব খেলা ন্যূনাধিক পরিমাণে ব্যয়সাধ্য। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে এই সব খেলাকে কেন্দ্র করিয়া জনসাধারণের বিপুল উল্লাস একটি দেখিবার মত জিনিস। ফুটবল খেলায় পারদর্শী ব্যক্তি আজকাল যেন দেবতার মত জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন।

শুধু পুরুষ নয়, নারীও আজ শরীর-চর্চায় সমভাবে যোগদান করিতেছেন। ইহা একটি সুলক্ষণ। নারীর স্বাস্থ্য অবহেলার জিনিস নয়। পুরুষের স্বাস্থ্যের

চেয়ে নারীর স্বাস্থ্যের প্রভাব সমাজে আরও অধিক, আরও সুদূরপ্রসারী। অসুস্থ জননী কখনও স্বাস্থ্যবান, সবল সন্তানের জন্মদান করিতে পারেন না। কাজেই জননীরা যে শুধু বর্তমান সমাজ দেহের অর্ধাংশ তাহা নয়, ইহারা সমগ্র ভবিষ্যৎ সমাজের জন্মদাত্রী। শারীরিক উন্নতি লাভের জন্য ইহাদের মধ্যে যে পুরুষেরই মত যত্ন ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে, ইহা সমাজের একটি মহৎ কল্যাণের সূচনা করিতেছে।

সংসারে সকল গুণের মধ্যেই সংযমের স্থান আছে। সংযমহীন হইলে গুণও দোষে পরিণত হয়। খেলাধূলা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। শরীর চর্চারও একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা থাকা উচিত। খেলাধূলার চটুলতা সাংসারিক কর্মের ক্ষেত্রে যদি অত্যধিক পরিমাণে প্রবেশ করে, তবে তাহা নিতান্ত ক্ষতিকর হইয়া উঠে। শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু শ্রম হয়। খেলা-ধূলার ঝোঁকে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া ফেলিলে, তাহার ফল ভাল হয় না। পরিশ্রমের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলেও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং খেলাধূলার মধ্যেও সর্বদাই সংযম রক্ষা করিয়া চলা অবশ্য কর্তব্য।

পরিচ্ছন্নতা

[সূচনা—আবর্জনাই মলিনতার কারণ, মলিনতা দূর করিবার উপায়, দেহের মলিনতা মনকেও অশুচি করে, সরলতা ও নির্মলতা, উপসংহার।]

সৌন্দর্য এ জগতে সকলেরই সাধনার ধন, আর এই সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। 'অপরিষ্কার' বস্তুটি কি? যে জিনিসে মানুষের প্রয়োজন নাই,—অথবা যাহার প্রয়োজন পূর্বে ছিল এখন আর নাই, তাহাই অপরিষ্কার, তাহাই আবর্জনা। মানুষের জীবনপথে এই সব আবর্জনা প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, এগুলিকে যথাসময়ে দূরে নিক্ষেপ করিতে না পারিলে ইহাদের সংস্পর্শে জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠে। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিলে, সর্বত্রই একটা নির্মল সৌন্দর্য লক্ষিত হইবে। মানুষ যখন

সম্পূর্ণরূপে এই প্রকৃতির অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল, তখন সেও প্রকৃতির স্বাভাবিক নির্মলতার অধিকারী ছিল। কিন্তু আজ বহু শত বৎসরের সভ্যতার আয়োজনে মানুষ প্রকৃতি হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, তাহার জীবনে নানাবিধ গ্লানি ও মলিনতা চারিদিক হইতে নিরন্তর ঘনাইয়া উঠিতেছে। জীবন হইতে এইগুলিকে দূরে রাখিবার জন্য মানুষকে আজ নিরবধি অতি সতর্ক ও সচেতন হইয়া থাকিতে হয়, নচেৎ জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে।

আলস্যই এই আবর্জনাকে সঞ্চিত হইবার সুযোগ দেয়। সুতরাং ইহাই মানুষের সর্বাঙ্গীন মলিনতার মুখ্য কারণ। মানুষ যদি তাহার দৈনন্দিন কর্মের প্রত্যেকটিতেই মলিনতা পরিহার করিয়া চলিতে চায়, তবে এককালে প্রচুর জঞ্জাল জমিবার উঠিবার সুযোগ পায় না। আলস্য-বশতঃ মলিনতার সংস্রবে থাকিতে থাকিতে অনেক সময় এমন একটা অভ্যাস জন্মিয়া যায়, যাহাতে পরে আর মলিনতার জন্য মনে কিছুমাত্র গ্লানি জন্মে না। মনের একটা সাত্ত্বিক পবিত্র ভাবই মানুষকে মালিন্যমুক্ত শুদ্ধ জীবনযাপনে অনুপ্রেরণা দান করে। অনেকে মনে করেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা অর্থসাপেক্ষ। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায় না। কিন্তু এই কথা সত্য নয়। এরূপ হইতে পারে যে, অর্থ থাকিলে পরিষ্কার থাকা অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। কারণ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা মানুষ অনেককে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যদি একটু শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করে, তবেই যথেষ্ট। মানুষ অনেক সময় শুধু আলস্যের জন্যই মলিন শয্যায় শয়ন করে, মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করে, ঘর-দুয়ারে আবর্জনা জমিতে দেয়। ইচ্ছা করিলেই কিন্তু সে সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এইগুলিকে পরিষ্কার করিতে পারে। কিন্তু আলস্য অনেকের এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা এই সমস্ত মলিনতার জন্য বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করে না।

শুধু বস্ত্রাদি নয়, দেহকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। নখ, চুল, দাঁত প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরিষ্কার না রাখিলে যে শুধু সৌন্দর্যেরই হানি হয়, তাহা নয়, ইহাতে স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া থাকে। অপরিষ্কার মলিন স্থানেই নানাবিধ রোগের জীবাণু বাস করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপরিষ্কৃত রাখিলে, ক্রমে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া অনিবার্য। মানুষের শরীরের সহিত

মনের বড়ই নিকট সম্বন্ধ। যদি শরীরের মালিন্য-দুষ্ট থাকে তবে মনও ধীরে ধীরে গ্লানিযুক্ত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। উৎকৃষ্ট চিন্তা করিতে হইলে, চারিদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটিও সুন্দর হওয়া দরকার। দেহমন গ্লানিযুক্ত থাকিলে মানুষের কর্মশক্তিও স্বভাবতঃ হ্রাস পাইয়া থাকে। কর্মে উৎসাহ কমিয়া যায়। আলস্য ও অবসাদ যেন মনকে চাপিয়া ধরে। তাহা ছাড়া, অপরিষ্কৃত ব্যক্তিকে সকলেই ঘৃণা করে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে সকলে স্বভাবতঃ ভালবাসে। কিন্তু অপরিষ্কৃত ব্যক্তিকে আপনার জনেরাও সর্বদা এড়াইয়া চলে—তাহার সহিত মিশিতে সকলেরই ঘৃণা এবং লজ্জাবোধ হয়। এইরূপে অপরিষ্কৃত ব্যক্তি অন্য নানাবিধ গুণে ভূষিত হইলেও সমাজের ন্যায্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হয়।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, বিলাসিতা সর্বদা বর্জনীয়। সরল অনাড়ম্বর জীবনই ভারতের চিরদিনকার আদর্শ। কথাটা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকে এই অজুহাতে অত্যন্ত মলিন সামঞ্জস্যহীন অসুন্দর বেশ-ভূষায় সরলতার হীন গর্ব করিয়া বেড়ায়। ইহা যে কতখানি হাস্যকর ও ভ্রান্ত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জীবন সরল হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়, অধিক আড়ম্বরও বর্জন করা উচিৎ। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আড়ম্বরের মধ্যে পার্থক্য অনেক। খুব দামী ও জাঁকালো পোষাকই যে পরিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কম দামী, সাদাসিধে পোষাক হইলেই চলিবে—কিন্তু উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। পরিচ্ছদের নির্মলতা আড়ম্বর-প্রিয়তা বা বিলাসিতার পরিচায়ক নয়, ইহা মার্জিত ও ভদ্র রুচির পরিচায়ক। যে মানুষ পবিত্র চিন্তা করে, উচ্চতত্ত্বের সংকল্প যাহার চিত্তকে এবং উদার কর্ম যাহার শরীরকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, সে কখনই অপরিচ্ছন্ন ও অশুচি বেশ-ভূষায় কাল কাটাইতে পারে না। মানুষ এই শুচিতার মধ্য দিয়াই দেবত্বের সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে। শুধু শারীরিক নয়, মানসিক শুদ্ধতাও মানবজীবনের সাধনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শারীরিক শুচিতা এই মানসিক শুচিতা-বিধানের একটি প্রধান উপায়।

মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও তাহার সৌন্দর্য-বুদ্ধির পরিচয়-চিহ্ন এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। সভ্যতা ও উন্নতির এমন সহজ সরল অথচ অভ্রান্ত মাপকাঠি আর নাই। এই শুচিতা যেমন ব্যক্তিগতভাবে

মানুষের চিত্তোন্নতি ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান করে, তেমনি আবার পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ বিস্তারেরও ইহা একটি প্রধান উপায়। শুচিতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, মনুষ্য সমাজে এমন লোক নাই বলিলেই হয়।

প্রবন্ধ সংকেত

স্বাস্থ্য ঃ—সূচনা—স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—প্রাতরুত্থান, নিয়মিত ব্যায়াম, পরিচ্ছন্নতা, সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য, মিতাচার। মানসিক স্বাস্থ্য—দেহের সহিত মনকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ, দেহ ভাল থাকিলে মনও ভাল থাকিবে। অস্বাস্থ্যের কুফল—স্বাস্থ্যহীন দেহ রোগের আকর, রুগ্ন ব্যক্তির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না, যে দেশের লোক অধিকাংশ রুগ্ন সে দেশের অধঃপতন অনিবার্য, নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখিলে শুধু যে নিজেরই মঙ্গল হইবে তাহা নহে সমগ্র জাতি তাহার দ্বারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ—অজ্ঞতা, অবহেলা, দারিদ্র্য। উপসংহার—প্রতিকারের উপায়।

একটি ক্রীড়ার বর্ণনা ঃ—নাম—দেশী না বিদেশী—খেলার নিয়ম—খেলার বিবরণ—উপকার ও অপকার—এই খেলাটি তুমি নিজে ভালবাস কিনা—মন্তব্য।

ভারতীয় বিদ্যালয়ে শরীর-চর্চার ব্যবস্থা ঃ ছাত্রগণের সাধারণ স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য—স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—ভারতীয় জলবায়ুর পক্ষে কোন কোন্ ব্যায়াম উপযোগী—দেহ ও মনের আনন্দ বিধানের প্রয়োজন—উপসংহার।

ব্যায়ামের সুফল ও কুফল ঃ—সূচনা—ব্যায়ামের আবশ্যকতা—নানাবিধ ব্যায়াম—হাডুডু, সাঁতার, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ইত্যাদি। স্বাস্থ্যগঠনের বিভিন্ন ব্যায়ামের উপযোগিতা—কোন ব্যায়াম কাহার পক্ষে উপযোগী তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। দেশের জলবায়ু অনুসারে ব্যায়াম নির্বাচন করা আবশ্যক, আবার ব্যায়ামকারীর বয়স, স্বাস্থ্য এবং অভ্যাসের দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ব্যায়ামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশা বর্তমান যুগে প্রবল, তাহার ফলে ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে বিভিন্ন ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আতিশয্যের কুফল—ব্যায়ামে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন, শরীরের পক্ষে যতটুকু ব্যায়াম প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত হইলেই স্বাস্থ্যহানি হইবে।

কোনও একদিনের ফুটবল ম্যাচের বিবরণ ঃ—সূচনা—কবে কখন কোন্ মাঠে খেলা হয়, কোনও শীল্ড বা কাপ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা বন্ধুভাবে শুধু আনন্দ করিবার জন্যই খেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রতিযোগী দল—কোন্ কোন্ দলে খেলা হইয়াছিল, উভয় দলের বিবরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলার কৌশল। আনুষঙ্গিক বিবরণ—খেলার মাঠটি কত বড়, মাঠটি খেলার পক্ষে উপযোগী কিনা, সেদিন আকাশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। খেলার

বিবরণ—সেদিন খেলা কিরূপ জমিয়াছিল, দর্শকদের মধ্যে কি রকম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, রেফারির বিচারে কোনও ভুলচুক হইয়াছিল কি না, কোন্ পক্ষ কয় গোলে জয়লাভ করিল।

বয়স্কাউট ঃ—সূচনা—বয়স্কাউট-আন্দোলনের উৎপত্তির ইতিহাস, লেফটেনাণ্ট জেনারেল স্যার বেডেন পাওয়েল এই আন্দোলনের প্রবর্তক। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বয়স্কাউট দল গঠন, বেশান্তর সহযোগিতা। আন্দোলনের উদ্দেশ্য—বালকগণকে স্বাবলম্বী, সচ্চরিত্র, কর্মঠ, উৎসাহী এবং সেবাব্রতী করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। বয়স্কাউটের কর্তব্য—রাজা ও স্বদেশের সেবা, বিপন্নের উদ্ধার, রোগীর শুশ্রূষা, পরের উপকারের জন্য স্বার্থ-বিসর্জন এবং দুঃখ-বরণ, মেলায় এবং নানাবিধ উৎসবে জনসঙ্ঘের মধ্যে শান্তিরক্ষা, সর্বতোভাবে সমিতির নিয়ম পালন। শিক্ষাবিধি—নানাবিধ ব্যায়াম, সন্তরণ, দৌড়, অগ্নিনির্বাপণ, আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিবিধান প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হয়।

উপসংহার—বাল্যকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময়, বাল্যকালের সুশিক্ষা চরিত্রগঠনের সহায়ক, বয়স্কাউট আন্দোলনের ছাত্রগণের দেহমনের স্ফূর্তিলাভ, জাতির ভবিষ্যৎগঠনে ইহার উপযোগিতা।

ব্রতচারী ঃ—সূচনা—লোকনৃত্য, রায়বেঁশে, প্রাচীন বাঙ্গালার শৌর্য-বীর্যের স্মৃতিচিহ্ন। ব্রতচারী আন্দোলন—বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থা, শরীরচর্চার প্রতি ঔদাসীন্য, জীবনে নির্মল আনন্দের অভাব। ব্রতচারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য—মানসিক আনন্দের সহিত দৈহিক শক্তির অনুশীলন, নৃত্য ও সংগীতের মধ্য দিয়া দেহমনের পুষ্টিবিধান। আন্দোলনের প্রবর্তন—আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, বঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের পুনরুদ্ধার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার, এই উদ্দেশ্যে ব্রতচারী দল গঠন। ব্রতচারীর কর্তব্য—ব্রতচারীর প্রধান কর্তব্য দুইটি— নৃত্য ও কৃত্য, কৃত্য অর্থাৎ করণীয় কাজ। ব্রতচারী হইতে হইলে ষোলটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়, জাতীয় জীবনের সর্ববিধ দুর্বলতা বর্জনের উদ্দেশ্যে এই প্রতিজ্ঞাগুলি রচিত হইয়াছে। ব্রতচারীরা রায়বেঁশে, জারি, কাঠি, ঢালী প্রভৃতি যে সকল নাচ অভ্যাস করে তাহার দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। আন্দোলনের বিশেষত্ব—সম্পূর্ণরূপে দেশীয়, অনাড়ম্বর, পরের নকল করিতে করিতে যে দাস মনোভাব জাগরূক হয় ইহার মধ্যে তাহার আশঙ্কা নাই, অথচ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার যুবসমাজ যে ভাবে কর্মঠ, অনলস, সেবাব্রতী ও উদারমনা হইয়া উঠিতেছে, তাহার মূল্য কম নহে, এদেশের পক্ষে ইহা একান্ত উপযোগী। উপসংহার—ভারতবর্ষে এই আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে, দেশের নেতারা ইহার সহযোগিতা করিতেছেন, একদিন ইহার সাহায্যে বাঙ্গালার পূর্ব গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যায়।

—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩০]

[মাতাপিতা প্রত্যক্ষ দেবতা—মাতাপিতা আমাদের কি করিয়াছেন—মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য—মাতাপিতার চরিত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব কিনা? পুরাণ হইতে দৃষ্টান্ত—উপসংহার।]

মাতাপিতা এ সংসারে প্রত্যক্ষ দেবতা। অন্যান্য দেবতার কথা শাস্ত্রেই শুনি, চোখে কখনও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। কিন্তু মাতাপিতাকে দিবা-রাত্র চোখে দেখিতে পাই, অথচ এত বড় দেবতা আর কোথায় পাইব? তাঁহারা মানুষ বটে, অন্যান্য মানুষের মত তাঁহাদেরও জীবনে হয়ত কতই ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে। কিন্তু সন্তানের প্রতি তাঁহাদের যে মনোভাব তাহা একেবারে দেব-জন-সুলভ। এমন নিঃস্বার্থ সেবা, এমন একাগ্র হিতৈষণা মানুষের মধ্যে আর কোন ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মাতাপিতা আমাদের কি করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আমাদের জন্মের পর আমরা অত্যন্ত অসহায়, অত্যন্ত দুর্বল ও সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। ক্ষুধা পাইলে আহার্য তুলিয়া খাইবার ক্ষমতা ছিল না, শীত পাইলে গায়ে কাপড়খানি তুলিতেও আমরা অশক্ত ছিলাম। এমন দিনে যদি মা-বাবা আমাদের দিকে না চাহিতেন তবে তখনই আমাদের ভব-লীলা শেষ হইত, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সেই দিন, সেই অতি অসহায় অবস্থায় শিশু-সন্তানটিকে পরম স্নেহময়ী জননী বুকে তুলিয়া লইয়াছেন। নিজের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার চিত্তে তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন। সন্তান যখন একটু বড় হয়, তখনও তাহার জন্য মাতাপিতার দুশ্চিন্তা কমিয়া যায় না। ছেলে যাহাতে কুসংসর্গে না মিশে, লেখাপড়া শিখিয়া যাহাতে মানুষের মত হয়, ভবিষ্যৎ-জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, যশস্বী ও কৃতী পুরুষ হইতে পারে সেজন্য মাতাপিতার উদ্বেগের সীমা নাই। পুত্র যখন বয়ঃপ্রাপ্ত এমন কি বৃদ্ধ হইয়া যায়, তখন মাতাপিতার স্নেহ ও উপচিকীর্ষা পূর্ববৎ অব্যাহত থাকে।

এমন মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কি? তাহা বাহির হইতে কেহ নির্দেশ করিয়া দিতে পারে না। মায়ের সঙ্গে ছেলের যে সম্বন্ধ, তাহা অন্তরের বস্তু। ছেলের পক্ষে মায়ের প্রতি চিরানুগত থাকাই স্বাভাবিক, মাতাপিতার বিরুদ্ধাচরণ করা পুত্রের পক্ষে শুধু যে অন্যায় তাহা নয়, ইহা প্রকৃতির বিরোধী। যে পুত্র মাতাপিতার প্রতি অনুরক্ত নয়, মাতাপিতার প্রাণে বেদনা দান করিবার প্রবৃত্তি যে পুত্রের জন্মিয়া থাকে, তাহার শিক্ষা ও চরিত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা রহিয়াছে। এইরূপ পুত্র যদি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, অর্থবান ও যশস্বী হয়, তবু তাহার এই দোষের জন্য বলিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই প্রকার লোকের অভাব নাই। বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করে, সামর্থ সত্ত্বেও যথোপযুক্তরূপে তাঁহাদের ভরণপোষণ করে না, তাঁহাদের বার্ধক্যের স্বাভাবিক ক্লেশের লাঘব করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে না, এরূপ কুপুত্র অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাও বলিতে হইবে, বাঙ্গালাদেশ, তথা ভারতবর্ষ—মাতৃভক্তের দেশ। পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত তুলনা করিলে ইহা বুঝিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি এই দেশবাসীর মজ্জাগত। সমাজের উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, নিম্নতম শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লোক পর্যন্ত এদেশে পরম মাতৃভক্ত। বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তিরাও মাতাপিতার মৃত্যুতে বালকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া রোদন করেন, এ দৃশ্য বাঙ্গালায় তথা ভারতবর্ষে দুর্লভ নয়। ভারতবাসীর চরিত্রে যদি এই মাতৃভক্তির সুরটি অব্যাহত থাকে, তবে মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য কি, তাহা বাহির হইতে স্বতন্ত্র অনুশাসনের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। মাতাপিতাকে ভালবাসা আমাদের মজ্জাগত ধর্ম। আর এই ভালবাসাই যদি থাকিল, তবে সমস্তই হইল। সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের প্রণালী নিতান্ত বাহিরের বস্তু। আপন পরিবারের মধ্যে শিষ্টাচারের কিছু কিছু লঙ্ঘন ঘটিলেও যদি আন্তরিক সম্বন্ধটি অব্যাহত থাকে, তবে সন্তান ও মাতাপিতা কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষোভের বা বেদনার কারণ থাকে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আন্তরিক শ্রদ্ধা বস্তুটি কেহ কি জোর করিয়া আনিয়া দিতে পারে? মাতাপিতার চরিত্রে যদি এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে যাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধার হ্রাস হয়, তবে সন্তানের সাধ্য কি যে, সে ঐ মাতাপিতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে? কথাটা শুনা মাত্র ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মাতাপিতা 'মানুষ' হিসাবে হয়ত তত ভাল না-ও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে, যাহা কোন ক্রমেই কলুষিত বা হীন হইতে পারে না। যিনি যতই দুশ্চরিত্র ও পাপাচারী হউন না কেন, সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহের ক্ষেত্রে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি থাকে না। এইখানে সকলেই দেবতা। পশুপ্রকৃতির মানুষও সন্তান সম্বন্ধে এই অপূর্ব দেবত্বে মণ্ডিত হইয়া উঠেন। কাজেই সন্তানের পক্ষে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবার পথে কিছুমাত্র অন্তরায় থাকিতে পারে না। তাহারা মাতাপিতার চারিত্রিক স্খলনে দুঃখিত হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের উপর ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করা সন্তানের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতাপিতার কোন দোষ-ত্রুটির অজুহাতেও সন্তান তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না, যদি দেয়, তবে তাহাকে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়।

আমাদের দেশে চিরকালই মাতাপিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করা অতি উচ্চস্তরের গুন বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণ, মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে অতুলনীয় মাতৃভক্তির ও পিতৃভক্তির অসংখ্য কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পিতা যযাতির জন্য পুরু সহস্র বৎসর কুষ্ঠরোগ ভোগ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম পিতার তৃপ্তির জন্য আজীবন বিষয়ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতৃ-সত্য-পালনের জন্য রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাস-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রকার কত শত কাহিনী পুরাণসমূহের মধ্যে উজ্জল হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের পরম সুখ ও অতি বড় গর্বের কথা এই যে, আমরাও কম মাতৃভক্ত নই। মাকে আমরাও প্রাণ দিয়া ভালবাসি। মায়ের চেয়ে এ সংসারে কে আর বেশী আপনার? নিজেকে যতখানি ভালবাসি, মাকেও তেমনি ভালবাসি। তাঁহার প্রতি কর্তব্য-অকর্তব্যের প্রশ্ন কখনও ভাবিয়া দেখি নাই।

মনে হয় ভাবিবার প্রয়োজনও হইবে না। ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি, যেন চিরদিন মাতাপিতাকে এমনই ভালবাসিতে পারি। এমন দুর্মতি যেন কখনও না হয়, যাহাতে মাতাপিতার প্রতি মমত্ববোধ হারাইয়া জীবনের এই পরম সুখ হইতে বঞ্চিত হই।

শ্রমের মর্যাদা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৫]

[শ্রমের মূল্য—শ্রমের দ্বারা দারিদ্র্য জয় করিতে হয়—তাহাতে আত্মপ্রসাদ আছে—পরিশ্রম চরিত্র-গঠনের প্রধান সহায়—বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা—শ্রমের প্রতি ঘৃণা—শ্রমের মর্যাদা ও ছাত্র-সমাজ।]

বাইবেলে আছে, মানুষ পরমেশ্বরের সৃষ্ট সুখময় নন্দন-কাননে নিরুদ্বেগে দিন কাটাইত। শেষে, জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাইয়া বিধাতার অভিশাপে জীবনে দুঃখ টানিয়া আনিয়াছে। বিধাতা এরূপ করিয়াছেন যে, মানুষকে দুঃখ-কষ্ট সহিতেই হইবে, তাহার জীবনের সকল সুখ দুঃখ ও শ্রমের অঙ্গনিবিষ্ট হইবে। কণ্টক-বৃক্ষের ফুলের মত দুঃখ সহিয়াই এই সুখকে লাভ করিতে হইবে। বিধাতার এই বিধান অভিশাপময় কিনা, মানুষ নিষিদ্ধ ফল খাইয়া ভাল করিয়াছিল—কি মন্দ করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। শ্রম না থাকিলে মানুষ সারা জীবন কোন্ সাধনা লইয়া দিন কাটাইত তাহা জানি না। উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া আজ মানুষ যে নির্মল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, পরমেশ্বরের রচিত সেই দুঃখ-লেশ-শূন্য নন্দন-বনে তাহার চেয়ে অধিকতর সুখ আছে কিনা, মানুষ আজ সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছে।

সংসারে দারিদ্র্য আছে, সেজন্য কেহ কেহ আক্ষেপ করেন। কিন্তু অগাধ ধনরাশির অধিকারীকেও কর্মহীনতার জন্য তৃপ্তিহীন নিরানন্দ জীবন যাপন করিতে দেখা যায়, অথচ শ্রমশীল ব্যক্তির জীবনে যে কত সুখ তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। এই পরিশ্রমের যদি কিছুমাত্র গৌরব না থাকিত তবে এই

আনন্দের উৎসটি কোথায়? মানুষের জীবন সুকোমল পুষ্পশয্যা নয়, মনুষ্যত্ব-লাভের যে পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' শারীরিক পরিশ্রম ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পরিশ্রমের মধ্যে যে আনন্দ নিহিত আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? পরিশ্রমের দ্বারা দারিদ্র্যকে জয় করিতেই হইবে—এই প্রকার সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া যিনি সাধনা করেন, তাঁহার সাধনা একদিন সিদ্ধিলাভ করিবেই। যে পরিমাণেই তিনি সফলতা লাভ করুন না কেন, পরিশ্রমের অনুপাতেই তিনি আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার চিত্ত-তৃপ্তির নামই আত্মপ্রসাদ। ইহাই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। জীবনের ব্রত-সাধন করিতে গিয়া যাহাকে যতখানি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, তাহার আনন্দ ততই নিবিড় হয়। এই কঠোর পরিশ্রমের কথা হয়ত কেহ জানিল না,—ইহার জন্য হয়ত কেহ একটি সান্ত্বনার কথাও বলিল না,—কিন্তু নিজের হৃদয়ের কাছেই মানুষ এই কঠোর সাধনার পূর্ণতম পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে।

পরিশ্রম চরিত্র-গঠনের প্রধান সহায়। আজকাল বিলাস-বাসনের ফলে আমাদের চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। তাই আমরা শ্রমের মর্যাদা বুঝি না, শারীরিক পরিশ্রম করিতে ঘৃণা বোধ করি। কিন্তু একটিবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এ জগতে পরিশ্রমীরাই সত্যকার মানুষ। যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবা-রাত্রি শ্রম করিতেছে, তাহারাই সৎ উপায়ে যোগাড়িত অন্ন ভোজন করে। আর সকলেই প্রতারণার জাল পাতিয়া জীবিকা অর্জন করে। পরিশ্রমী ছাড়া আর সকলকেই পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। পরের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য তাহাদের সকলেরই নানাবিধ প্রকারে নিজের ব্যক্তিত্বকে নিগৃহীত করিতে হয়। ইহাতে স্বভাবতঃই তাহাদের চরিত্রবল কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে পরিশ্রমী ব্যক্তিগণ অপরিসীম চরিত্র-শক্তিতে সর্বক্ষণ বলীয়ান্ থাকেন। তাঁহারা চিরদিন অন্যানপেক্ষ জীবন কাটাইয়া, যেন পৃথিবীবক্ষে সদর্পে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সমস্ত জাড্য পরিহার করিয়া সকলের মুখের প্রতি চোখ মেলিয়া কুণ্ঠাশূন্য ভাষায় কথা বলিবার শক্তি ধারণ করেন। নিজেদের হৃদয়ই তাঁহাদিগকে বিজয়ী বীরের জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছে।

আজ বাঙ্গালাদেশের অতিবড় দুর্দিন আসিয়াছে। আমরা আজ শারীরিক

পরিশ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। এই লক্ষণটি যেন উত্তরোত্তর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃদ্ধগণের চেয়ে আধুনিক যুবকগণই এই রোগের দ্বারা অধিকতর আক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। অথচ আমাদের দেশে যে ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাদেশ পূর্বাপেক্ষা আরও দরিদ্র হইয়াছে এবং যুবকগণের শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি এই প্রকার নিন্দনীয় মনোবৃত্তি দূরীভূত না হইলে ক্রমেই আরও দরিদ্র হইতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুগভীর দারিদ্র্যকে গোপন করিয়া বিলাসবহুল চাল-চলন বজায় রাখিবার জন্য আজ আমাদের কি হাস্যকর ব্যগ্রতাই না প্রকাশ পাইতেছে। অনাড়ম্বর সরলতা ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বিলাস-বাহুল্য-বর্জিত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্য জীবন ছিল আমাদের চিরদিনকার আদর্শ। উহা ছিল চরিত্রের পরিপোষক, মনঃশক্তি-বিধায়ক ও শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। আজ আমরা সেই অনাড়ম্বর শ্রমশীলতা পরিহার করিয়া যে জীবনকে কতখানি কপটতা-কলুষিত, মনুষ্যত্বহীন ও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছি, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আধুনিক [illegible] যুবক তাঁহার দারিদ্র্যের [illegible] লজ্জা পাইয়াছেন। কিন্তু বাহিরের সাজ-সজ্জায় একটা [illegible] আছেন।

ছাত্র-সমাজের মধ্যে এই লজ্জাজনক মনোবৃত্তির বিলক্ষণ প্রতিপত্তি দেখিতেছি। যে সমস্ত পল্লীগ্রামের ছাত্র বিদ্যালাভের জন্য কোন সহরে থাকিয়া লেখাপড়া করেন, তাঁহাদের সকলেই কিছু বড়লোক নহেন। অনেকেরই মাতাপিতা কষ্টার্জিত অর্থের অধিকাংশ প্রতিমাসে তাঁহাদের সহর-বাসের খরচ নির্বাহের জন্য পাঠাইয়া থাকেন, অবশিষ্ট টাকায় কায়ক্লেশে পল্লীগ্রামে সংসার চালান। কিন্তু এই সব ছাত্র পিতৃদত্ত এই অমূল্য অর্থের মর্যাদা না বুঝিয়া রীতিমত নাগরিক চালে দিন কাটান। মা যাঁহার দুঃখের সংসারে দাসীর মত খাটিতেছেন, পিতা যাঁহার সংসার প্রতিপালনের গুরুভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রাণে ছোট ছোট ভাই-ভগিনীদের 'মুখ কাড়া' সেই অর্থ অযথা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করেন, জানি না। গরীব ভদ্রলোকের ছেলে কেন যে নিজের কাপড় নিজে কাচিতে পারিবে না,—সামান্য পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না—তাহা বুঝি না। এই সব ছাত্র কি করিয়া মানুষ হইবে? ইহাদের হৃদয় নাই, বুদ্ধি নাই, প্রকৃত আত্মসম্ভ্রম

বোধ নাই, রুচি নাই,—অথচ ইহারাই বাঙ্গালার আশা-ভরসা, ইহারাই বাঙ্গালার সর্বস্ব! তাই বড় দুঃখে মনে পড়ে সেই সব সংযত, সাত্ত্বিক, সহিষ্ণু ও মনস্বী অন্তেবাসীদের কথা,—যাঁহারা রাজার দুলাল হইয়াও ফল-মূলাহারী তপস্বীর মত গুরু-গৃহে অপরিসীম কৃচ্ছ্রসাধন অম্লানবদনে বরণ করিয়া লইতেন! মনে পড়ে বাঙ্গালার প্রাণ-স্বরূপ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র,—যাঁহার বেশ দেখিলে মুটে বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারিত!

——

সময়ের মূল্য

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৬]

[সময় অমূল্য ধন—প্রত্যেক মুহূর্তেরই একটি কার্য আছে—সময়ের অপব্যবহার নিন্দনীয়—সময় একবার গেলে আর আসে না—সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রণালী—অন্যান্য জাতির সময়ানুবর্তিতা—উপসংহার।]

সময় অমূল্য ধন। অথচ ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে এই ধনের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছে। কিন্তু এই সময় মানুষ শুধু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণেই লাভ করিয়া থাকে। সেই নির্দিষ্ট সময়াংশ অতিক্রান্ত হইলেই তাহার সব ফুরাইল। যাহা কিছু কর্তব্য, মানুষ যদি সেই নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সমাধা না করে, তবে তাহার জীবনধারণই বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়।

এ জীবনের একটি মুহূর্তও বৃথা যাপন করিবার অবকাশ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় মানুষের কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বুঝি অবকাশ আছে। মানুষ শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে খাটিয়া মরিতেই সংসারে আসে নাই। কিন্তু এই কল্পনা নিতান্ত ভ্রান্ত। ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যেকটি মুহূর্তেরই একটা বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক এই কর্তব্য তখনই শেষ করিয়া ফেলা দরকার। যদি অবহেলা করিয়া মনে করা যায় যে এই সামান্য কাজটি পরেও করিয়া লওয়া যাইবে, তাহা হইলেই মানুষ ভ্রমে পড়িল। কারণ পরের মুহূর্তটিতে ত আর তাহার অবকাশ থাকিবে না। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ঐ পরের মুহূর্তটিও

কোন-না-কোন কার্যের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে সেই পূর্ব মুহূর্তের তুচ্ছ কার্যটিও করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সেই ভার অতিশয় দুর্বহ হইয়া পড়ে। সুতরাং কোন সময়াংশই আলস্যে কাটাইবার জন্যে নির্দিষ্ট নাই। এই সংসার পুষ্পশয্যা নহে। ইহা সর্বক্ষণের জন্য এবং সকল লোকের পক্ষেই সংগ্রামের ক্ষেত্র। কোন্ অবহেলার সামান্য ছিদ্র দিয়া যে মানুষের জীবনে সর্বনাশের কীট প্রবেশ করিবে, কোন্ সামান্য কর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র অনবধানতার সূত্র ধরিয়া যে সাংঘাতিক বিপৎপাত সূচিত হইবে, তাহা কেহই জানিতে পারে না।

এ সংসারে আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রায়ই সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় করি না। বিনা কারণে ভাণ্ডারের স্বর্ণমুদ্রাটি নদীর জলে কয়জন নিক্ষেপ করিয়া থাকে? যদি কেহ করে, সে উন্মাদ। সে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু প্রত্যেক ধন-রত্ন সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই এই প্রকার সাবধানতা থাকিলেও একটি অমূল্য রত্ন সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই উদাসীন থাকি। মণি-মুক্তা-হীরকাদি অপেক্ষা এই ধন কোন অংশেই হীন নহে। ইহা সময়। নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়াই মানুষ সংসারে যাবতীয় রত্নের অধিকারী হয়। সুতরাং সময়ই রত্ন-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা-স্বরূপ। কত রকম বাজে গল্প করিয়া, অনর্থক ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা কত মূল্যবান্ সময় হেলায় নষ্ট করি। এ কথা বলা হইতেছে না যে, বিশ্রাম করিলেও সময়ের অপব্যয় হয়। বিশ্রামও একটি কাজ। দেহের স্বাস্থ্য এবং মনের শান্তি রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য। এই বিশ্রামের জন্যও জীবনের কতকগুলি মুহূর্ত নির্ধারিত হইয়া আছে। সেই সময়ে বিশ্রাম না করাই সময়ের অপব্যবহার। বিশ্রামের সময় বিশ্রাম না করিলেও তাহার ফলে পরিণামে অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। শরীর ও মন ক্রমে ক্রমে অশক্ত হইয়া পড়ে। কর্ম করিবার শক্তি বিলুপ্ত হয়।

সময়ের সহিত সামান্য মণি-রত্নের তুলনা করা হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময় অপরাপর মণি-রত্নের অপেক্ষা মূল্যবান্। মণি-মুক্তা যদি একবার হারাইয়া যায়, তবে জীবনে আবার তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে নব নব রত্ন সঞ্চয় করা খুব অসম্ভব হয় না। কিন্তু সময় এমনই বস্তু যে, একবার উহা হারাইয়া গেলে আর জীবনে কখনও ফিরিয়া আসে না। জীবনের প্রত্যেকটি সুযোগ মাত্র একটিবার

আসিয়া থাকে। কথায় বলে, "মানুষ এক-নদীর জলে দুইবার স্নান করিতে পারে না"। সময়ের এই অনিবার্য গতির কথা মনে রাখিলেই উহার সত্যকার মূল্য নিরূপণ করা যায়।

সময়ের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করা খুব সহজ নয়। যাঁহারা বিচক্ষণ, তাঁহারা জীবনটাকে একটা কার্য-সূচীর দ্বারা সুন্দররূপে ভাগ করিয়া লন; একটি মুহূর্তও যাহাতে কোনক্রমে অপচিত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, আবার কাজ—এই রকম ভাবে যাহাতে সুষ্ঠুরূপে, সহজে এবং অনায়াসে বিবিধ কর্তব্য-কর্মের মধ্য দিয়া সময় অতিবাহিত হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই প্রকার কার্য-সূচী অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সূচী তাঁহারা কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে চাহেন না। একটি মুহূর্তের কর্তব্য যাহাতে সেই মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়, পর মুহূর্ত পর্যন্ত উহার জের না থাকে, সেদিকে তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি। যাঁহারা সময়ের যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে কখনও সময়ের অভাব বোধ করেন না। স্বচ্ছন্দে, ধীরে-সুস্থে, যথাযোগ্য মনোযোগের সহিত তাঁহারা প্রত্যেকটি কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জীবনে অনেক বেশী কাজ করিতে পারেন, তথাপি তাঁহাদের আরও কার্য করিবার সুযোগের অভাব হয় না।

সময়নিষ্ঠা প্রত্যেক সভ্য-জাতির একটা অসাধারণ গুণ। সময় সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন, এরূপ কোন ব্যক্তি বা জাতি সংসারে উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহা কেহ কখনও শুনে নাই। ইংরাজ জাতি বিশেষরূপে সময়ানুবর্তী, তাঁহারা জানেন, একটি সৈনিকের এক মিনিটের শৈথিল্যে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিয়াছিল। একটি মুহূর্তের আলস্যের ফলে সংসারে যে কতই অঘটন ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

নদীর স্রোত অবিরল ধাইয়া চলিয়াছে, ঘড়ির কাঁটাটি টিক্-টিক্ করিয়া অবিরাম ঘুরিতেছে, সময় তেমনি দুর্নিবার গতিতে চিরদিন ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার গতি রোধ করিতে পারে, এমন শক্তি বিশ্ব-সংসারে নাই। কালের স্রোতে সমস্তই ভাসিয়া যায়, শুধু মানুষের জীবনে সঞ্চিত থাকে কর্ম-সাধনের একটা সার্থকতা, একটা আত্মপ্রসাদ। এই সঞ্চয়ই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল। অনাদি অনন্ত কালের এই মহাযাত্রার পথে মানুষ সেই আত্মপ্রসাদের পাথেয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। মানুষের এই সাধনা, আলস্যের সাধনা নয়। বিশ্ব-সংসারের

নিরবচ্ছিন্ন অবিরাম গতির সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়া তাহাকে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে—এই পথ তামসিক আলস্যের পথ নয়,—শ্রমময়, কর্মময়, কণ্টকময় এই পথ। "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

স্বাবলম্বন

[সাধনা—মানুষের প্রকৃতি—[illegible]। আলস্য—পরনির্ভরতার প্রবৃত্তি দমন করিবার উপায়—গভীর আত্মবিশ্বাস—স্বাবলম্বনের ফল—স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত—উপসংহার।]

ভগবান যখন মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকে তিনি সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই দিলেন, শুধু 'বিশ্রাম' দিলেন না। এই বিশ্রামহীনতা লইয়াই, আজ মানুষ [illegible] জীবনের সমস্ত ভার নিত্য বহন করিয়া আসিতেছে। জীবন যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে [illegible], স্বার্থ-সংঘর্ষে যুদ্ধ করিতে হইবে। যিনি সশক্ত, তিনি জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবেন, পরাজয়ের গ্লানি তাঁহার সমস্ত জীবনকে কলঙ্কিত করিবে, বাঁচিয়া থাকিতেও তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিবেন। সাধনের যাহা কিছু প্রয়োজন, ভগবান তাহার সম্পূর্ণ আয়োজন মানুষের মধ্যেই করিয়া দিয়াছেন। মানুষকে সেই সুপ্ত শক্তিগুলিকে জাগ্রত, বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। সেগুলিকে নিজের কাজে খাটাইতে হইবে। এজন্য মানুষকে অবিশ্রাম কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই মানব-জীবনের সাধনা।

যিনি এই সাধনাকে অবহেলা করিয়া, আলস্যময় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে চাহিবেন, তাঁহার জীবনে চারিদিক হইতে সহস্র বিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হইবে। দিনে দিনে তাঁহার কর্মশক্তি দুর্বল হইয়া যাইবে। এই দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে পর-নির্ভরতা। তখন এই সংসারে নিজের জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। যিনি পরের দিকে চাহিয়া থাকেন, স্বভাবতঃই তাঁহার জীবনে নানাবিধ নৈরাশ্য দেখা দেয়। কারণ এ সংসারে সকলকেই অবিশ্রাম কর্তব্য

করিয়া যাইতে হয়। নিজের ইষ্ট-সিদ্ধির জন্যই সকলে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত রহিয়াছে। পরের মুখের দিকে চাহিবার অবসর কোথায়? কাজেই, অনুকম্পাজীবী অলস অকর্মণ্য ব্যক্তিকে পদে পদে বিড়ম্বনা সহিতে হয়। তাহার জীবন দুঃখময় ও দুর্বহ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই পর-নির্ভরতার প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয় হইতে কিরূপে দূর হইতে পারে? মানুষ নিজেকে অতিমাত্র দুর্বল ও অসমর্থ বিবেচনা করিয়াই পরাবলম্বী, পরগলগ্রহ হয়। প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই যে বিপুল শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার সন্ধানটি পাইলে, এই দুর্বলতা দূর হইয়া যায়। তখন নিজেকে সুপ্ত সিংহ বলিয়া মনে হয়। "সিংহ সুপ্ত থাকিলে মৃগ তাহার মুখে নিজে গিয়া প্রবেশ করে না। উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী বরণ করিয়া থাকেন"—এই বাক্যের তাৎপর্য তখনই মানুষ বুঝিতে পারে। প্রত্যেকটি কার্য সম্বন্ধে নিজের শক্তি কতটুকু, তাহা সর্বপ্রথমেই মানুষের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করিবার পরও যদি কার্যটি নিতান্তই দুষ্কর মনে হয়, তখন বরং অন্যের শরণাপন্ন হওয়া সাজে। কিন্তু নিজে চেষ্টা করিতে গেলেই, দেখা যায় যে, অধিকাংশ কার্যই মানুষের পক্ষে সুসাধ্য হইয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর পরের সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হয় না।

নিজের উপর প্রত্যেক মানুষের সুগভীর শ্রদ্ধা থাকা উচিত। ইহাই চিত্ত-শক্তির সর্বপ্রধান উপাদান। "আমি অসহায়, আমি ক্ষুদ্র"—এই প্রকার ধারণা মনুষ্যত্ব-লাভের অন্তরায়, ইহাতে চরিত্রের হীনতা প্রকাশ পায়। যাহার আত্মশক্তির প্রতি আস্থা নাই, তাহার সাধুতার উপর বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না।

অনেকে মনে করেন যে, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সহায় থাকা একটা কল্যাণকর ব্যাপার। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রকার সহায়ক থাকার জন্যই মানুষ প্রকৃতপক্ষে আরও অসহায় হইয়া পড়ে—কর্মক্ষেত্রে হয়ত তাহারা সহজেই এমন অবস্থা লাভ করে, যাহা অসহায় ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত আয়াস-লভ্য। কিন্তু উপকরণ-বাহুল্য বা বাহিরের কোন একটি উন্নত অবস্থা মানব-জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য-বস্তু নয়। সুখই ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। কিন্তু এই সুখ বস্তুটি কোন উপকরণ বা বাহ্য অবস্থার উপর নিভর করে না। স্বাবলম্বন ও

সাধনাই ইহার একমাত্র উৎস। মানুষ জীবনে যতটুকু সাধনা করিয়াছে,—ঐ সাধনার সিদ্ধি তাহাকে সেই পরিমাণে তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। কোন সহায়ক তাহাকে কর্মপথে সাহায্য করিয়া থাকিলে, ঐ তৃপ্তি সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় না। জীবনের যুদ্ধে কোন ফাঁকি চলে না। আমাদের মনই তাহার প্রধান সেনাপতি। কে কতটুকু কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা মনের কাছে অগোচর থাকে না। অন্য-নিরপেক্ষ সাধনার মধ্যে যে একটা তৃপ্তি ও মাধুর্য আছে, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না।

অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে স্বাবলম্বনের গুণে সংসারে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এমন মানুষের অভাব নাই। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামদুলাল সরকার, শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষগণ অতি হীন অবস্থা হইতে প্রধানতঃ স্বাবলম্বন গুণেই উত্তর জীবনে দেশ-প্রথিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন পুরুষাকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাগ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে, তাঁহারা কখনই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতেন না।

চরিত্র

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২]

[চরিত্র কাহাকে বলে—চরিত্র-গঠন কিরূপে হইয়া থাকে—পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত সাধনা—চরিত্র-গঠনের সহায় কি কি? আস্তিক্য-বুদ্ধি, আত্মসম্ভ্রম-বোধ ও সৌন্দর্য-বোধ—চরিত্রের প্রভাব—উপসংহার।]

চারিদিকের সমতল ক্ষেত্রের মাঝখানে যখন পর্বত মাথা উঁচু করিয়া থাকে, তখন তাহার মধ্যে একটা তেজ থাকে, একটা অন্তঃসারময় কাঠিন্য থাকে, বহু প্রাণীর আশ্রয়স্থান হওয়ার একটা উদারতা ও গরিমা থাকে, বহুদূর হইতে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একটা শক্তি থাকে। মানুষের চরিত্র অমনই একটা জিনিস,—যাহা সমাজের একটা আদর্শ গুণ, অথচ খুব

কম লোকেরই মধ্যে ইহা আছে বলিয়া বহুলোকের দৃষ্টিস্থানীয় হয়। ইহার স্বাভাবিক তেজ, সংযম ও স্থৈর্য বহু লোকের অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে।

এই চরিত্র কি ও কেমন করিয়া উহা গঠিত হয়? সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অটুট সঙ্কল্পই চরিত্র। চরিত্রবান্ ব্যক্তি সহস্র বিঘ্ন-বাধার সম্মুখেও সত্য পথ হইতে বিচলিত হন না,—ইহাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা। এই সাধনার পথ কণ্টকময়; এজন্য চরিত্রবত্তা তেজস্বিতার পরিচায়ক। নিজের হৃদয়ের মধ্যেই চরিত্রবলের পুরস্কার রহিয়াছে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি আর কোথাও তাঁহার সাধনার জন্য পুরস্কার বা প্রশংসার প্রত্যাশা রাখেন না। সত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—লোকপ্রশংসার আকর্ষণ ও লোকনিন্দার ভয় তাঁহার সাধনার সহায় নয়। অনেকে লোকপ্রশংসার প্রলোভনে বা লোকনিন্দার ভয়ে অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রবান লোকের [illegible] একমাত্র আশা ও [illegible] একমাত্র অবলম্বন—সত্য। সংযম ও নিষ্ঠা তাঁহার সহায়। লোকনিন্দা ও লোকপ্রশংসা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করে না—তাহাতে তিনি বিচলিত বা উল্লসিত হইয়া উঠেন না।

সুতরাং এই চরিত্র-গঠনের কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী থাকিতে পারে না। ইহা অনেকাংশে জন্মগত। অনেকে জন্ম হইতেই একটা চারিত্রিক নিষ্ঠার অধিকারী হন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্র মনুষ্যশক্তির আয়ত্ত। মানুষ নিজের সাধনা ও নিষ্ঠার সাহায্যে এই মহৎ গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও চরিত্রগঠনের সহায়তা করিয়া থাকে। জন্মাবধি যদি আমরা চারিদিকেই সত্যাচরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে থাকি, যদি সংযম ও নিষ্ঠার সহিত আমাদের একটা আত্মপরিচয়ের সুযোগ সংঘটিত হয়, তবে চরিত্রগঠনের প্রতি আমরা স্বভাবতঃই একটা আকর্ষণ অনুভব করি। অসংযম ও অসত্যের প্রতি সহজেই আমাদের ঘৃণা জন্মে। আর যদি জন্মাবধি আমাদের চারিদিকে কেবল দুর্বলতা, অসংযম ও মিথ্যাচরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে অভ্যস্ত হই তবে ঐ সকলের প্রতি আমাদের আর তেমন ঘৃণা থাকে না। ঐগুলি যে অত্যন্ত গর্হিত, এই প্রকারের ধারণা মনের মধ্যে জন্মিতে পারে না। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াও মানুষ অসামান্য চরিত্রশক্তিতে

বলীয়ান্ হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও সংসারে বিরল নহে। যিনি শিক্ষা গুণে কোনও ক্রমে সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুসংযত নিষ্ঠার ঔজ্জ্বল্য যাঁহার কল্পনাকে একবার উদ্ভাসিত করিয়াছে, তিনিও স্বচ্ছন্দে সত্য-পথের পথিক হইতে পারেন। তাঁহার জ্বলন্ত নিষ্ঠা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল প্রভাবকে সবিক্রমে অতিক্রম করিয়া সত্যের সাধনায় ব্রতী হইয়া থাকেন।

সত্যের সাধনা সহজ নয়। এই পথে কয়েকটি সহায় আছে। আস্তিক্য-বুদ্ধি আত্মসম্ভ্রম-বোধ ও সৌন্দর্য-বোধ তন্মধ্যে প্রধান। ঈশ্বরে বিশ্বাসের নামই এক কথায় আস্তিক্য-বুদ্ধি। এই জগৎ একজন সর্বশক্তিমান বিচারকের নিয়মাধীনে পরিচালিত হইতেছে যাহা সকলে দেখে না, তাহা তাঁহার দৃষ্টিকে এড়াইয়া যায় না, যাহার মাহাত্ম্য এ-সংসারে কেহ দেখিল না, সেই পরম-কারুণিকের কাছে তাঁহার পুরস্কার সঞ্চিত রহিয়াছে,—এই প্রকার বুদ্ধি মানবের চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। সর্বদর্শী সর্বক্রম কোন সত্তা যিনি সর্বদাই কাছে কাছে অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার আড়ালে পাপ না করাই স্বাভাবিক। মানুষের আত্মসম্মান-বোধ চরিত্র-গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। যাহারা নিজেকে যথোচিত সম্মান করে, নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্বের গৌরব বিশ্বাস করিতেছে, তাহারা স্বভাবতঃ অসৎ কার্যে লিপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কলুষিত করিতে চাহে না। আত্মসম্মান-বোধ অন্তরে এমন একটা তেজস্বিতা ও সাধুতার সঞ্চার করে যাহার প্রভাবে মানুষ নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও সত্যের পথ পরিত্যাগ করে না। যাহার নিজের শক্তির উপর সম্যক্ প্রত্যয় নাই, সে সহজেই প্রলোভনের পথে আত্মসমর্পণ করে, কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হইবার কালে তাহার মনে বিশেষ কোন প্রবল নিষেধ উত্থিত হয় না।

কিন্তু সৌন্দর্য-বোধই বোধ হয় চরিত্র-গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। যিনি স্বভাবতঃ সুন্দর পদার্থগুলিকে ভালবাসেন, অসুন্দরের প্রতি তাঁহার একটা সহজ বিতৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। যাহা কুৎসিত, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র সামঞ্জস্য ও ছন্দ দেখিতে পান না। সেই সব কুৎসিত জিনিসের মধ্যে যে কিছুমাত্র সুখ ও সুবিধা থাকিতে পারে, এই প্রকার প্রলোভন তাঁহার মনে কিছুতেই উদিত হয় না। সুতরাং সৌন্দর্য-বোধই চরিত্র-গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। সৌন্দর্য-পথের পথিক বিনা-আয়াসে, একান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সত্যের সাধনা করিয়া থাকেন। সংযম ও দৃঢ়ব্রত কথাগুলির মধ্যে যে একটা কঠোরতার

ইঙ্গিত লুকান রহিয়াছে, সুন্দরের উপাসক নিজের সাধনায় সেই প্রকার কঠোরতা অবলম্বনের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না। তাঁহার সুমার্জিত ভদ্র রুচি আপনা হইতেই তাঁহাকে প্রকৃষ্ট পথটিতে চালাইয়া যায়।

চরিত্রের একটা প্রভাব সমাজের সকলেই অনুভব করে। চরিত্রবান্ লোক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া থাকেন। চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে জনগণের নেতৃত্ব করা যায় না। চরিত্রবান্ ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিয়া থাকেন। মানুষের চিত্তের উপর চরিত্র এমন একটা প্রবল শক্তি বিস্তার করে, যাহা সহজে দূর করা সম্ভব হয় না। জগতে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনসমাজের চিত্ত জয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অসামান্য চরিত্র-শক্তিতে বলবান ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা লোকসমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্রের শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল। ইহার মধ্যে এমন একটা তেজস্বিতা থাকে যাহার সমক্ষে সকলেই মন্ত্র-বশীভূত সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করে। এই চরিত্রের মধ্যে এমন একটা স্থৈর্য্য ও সান্ত্বনা থাকে, তাহার আশ্রয়ে অনাহূতভাবে শত সহস্র লোক আসিয়া দাঁড়ায়—চরিত্রবান্ লোকের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যেন একটা স্বস্তি ও নিরাপত্তা বোধ করিয়া থাকে।

যাহার চরিত্র নাই—তাহার কিছুই নাই। যাহার চরিত্র আছে তাহার সকলই আছে। চরিত্রবান্ ব্যক্তির কাছে দারিদ্র্যও অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে, সরলতায় তাঁহার মধ্যে অপরূপ সমারোহের মত প্রতীয়মান হয়, —তাঁহার শান্ত শুভ্র জীবন লোক-চক্ষুতে চিরদিন অলৌকিক শোভায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

———

অধ্যবসায়

[সূচনা—অধ্যবসায়ের ফল—দৃষ্টান্ত—উপসংহার।]

সত্যকার মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইলেই মানুষকে আলস্য ও ঔদাস্য পরিহার করিতে হইবে। একবার কোন কার্য করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলেই দুর্বল মানুষ অনেক সময় দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অলস নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করে। এই শ্রেণীর মানুষ নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। ভাল কাজ করিতে গেলেই তাহাতে বিঘ্ন আসে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ইহাতে হতাশ না হইয়া কোন একটি কার্য করিবার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই 'অধ্যবসায়'। দৈবের প্রতি বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিরাও অধ্যবসায় সম্পন্ন হইতে পারেন। কারণ, দেবতা আমাদের মধ্যে বিপুল কর্মশক্তি ও বিবিধ সদ্বৃত্তি দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের বিকাশ ও অনুশীলন করাই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়,—বরং কণ্টকময়। এই পথে অনেক বিঘ্ন পদদলিত করিতে হইবে। আত্মশক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাসই আমাদের জীবনের সুদুর্গম পথের একমাত্র সম্বল। সুদৃঢ় অধ্যবসায় না হইলে আমরা জীবনের যুদ্ধে পরাজিত হইব। এপথে বিন্দুমাত্র আলস্য বা ঔদাস্যের অবকাশ নাই।

'মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারিবেই'—আমাদের বিবেক এই ইঙ্গিত করিতেছে। এই ইঙ্গিতই আমাদিগকে কর্তব্যে সুনির্দিষ্ট পথে সুপরিচালিত করিবে। সাধনাই মানুষের জীবনের সার্থকতা,—কাম্য ফল পাওয়া গেল কি না, তাহাই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু নয়। অলস উদাসীনের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না,—ভগবানের দেওয়া কর্মশক্তি ও সদ্বৃত্তিগুলি আমাদের মধ্যে অবিকশিত থাকিয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জীবনী অনুশীলন করিলেই অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনেক মিলিবে। বিখ্যাত বৈয়াকরণ বোপদেব বাল্যে অতি নির্বোধ ও মেধাহীন ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তিহীনতায় বিরক্ত হইয়া অধ্যাপক তাঁহাকে

চতুষ্পাঠী হইতে তাড়াইয়া দেন। বোপদেব ইহাতে মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যান। পথিমধ্যে এক পুষ্করিণীর শিলাময় ঘাটে মৃন্ময় কুম্ভের ঘর্ষণে গর্ত খনিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হয়। তিনি অধ্যবসায়ের গুণ বুঝিতে পারেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে মানুষের মেধাশক্তিও যে তীক্ষ্ণতা লাভ করিতে পারে,—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। তারপর পুনরায় তিনি পাঠ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হন ও অচিরকাল মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইংলণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী ডিস্‌রেলী একজন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। কিন্তু কথিত আছে, হাউস্ অফ্ কমন্স্ (House of Commons)-এর সভায় তিনি যখন প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠেন, তখন শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বক্তৃতার অক্ষমতায় বিরক্ত হন ও তাঁহাকে উপহাস করেন। তারপর মহাত্মা ডিস্‌রেলী বিপুল অধ্যবসায় সহকারে এবংবিধ বাগ্-বৈদগ্ধ্য আয়ত্ত করিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর নিকট একটি পরম আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল। উত্তরকালে তিনি যে প্রধান-মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাও তাঁহার এই অসাধারণ বাগ্মিতার ফলস্বরূপ। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্তি-স্বরূপ। তিনি অতি হীন অবস্থা হইতে অধ্যবসায় গুণেই দেশ-বরেণ্য মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন। কি অধ্যয়ন-সময়ে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে, তিনি যখন যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতেই অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বাল্যজীবনে বিদ্যাশিক্ষার কালে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদনও বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুশীলন করিতে গিয়া অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও বাল্যকাল হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত বহুবিধ দুরতিক্রম্য বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা প্রত্যেকেই অসামান্য অধ্যবসায়ী ছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে দেশ-বিশ্রুত হইতে পারিয়াছিলেন।

কর্তব্য-কর্মে একনিষ্ঠ দৃঢ়তাই অধ্যবসায়ের মূল উপাদান। অধ্যবসায় মানুষের পৌরুষ ও বীরত্বের পরিচয় দেয়। যাহাদের চিত্ত দুর্বল, তাহারা অধ্যবসায়ী হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার তপস্যার ন্যায়। এই মহতী তপস্যা আপনার শক্তিতে অদৃষ্টকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানবই

অধ্যবসায়ের গুণে জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, কারণ দৈববল অধ্যবসায়ী ব্যক্তির সহায় হইয়া থাকে। "God helps those who help themselves." এই সুপরিচিত ইংরাজী প্রবচনটির ইহাই মর্মার্থ।

যে সয় সে রয়

এই সংসার কর্মশালা। কর্মকারের কারখানা যেমন লৌহকে পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিয়া গুরুভার হাতুড়ি দিয়া বারংবার আঘাত করিয়া উহাকে সুদৃঢ় এবং অভীষ্ট আকৃতি প্রদান করা হয়, সংসারে মানুষের অবস্থাও তাই। তাহাকে সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হয়। আঘাতে আঘাতে তাহাকে সুদৃঢ় হইতে হয়। আবার বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাহার মৌলিক ভাবনিচয়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকে। এরূপ যাহার ঘাত-সহ না হইবে সংসারের পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের পীড়নময় সংঘাতে টিকিয়া থাকিতে না পারিলে—তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

মানবদেহে যে কত রকমের ব্যাধি জন্মে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শারীরিক ব্যাধিতে ভুগিতে হয় না, এমন মানুষ সংসারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি সংস্কৃত প্রবচন আছে, 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'। এই সব ব্যাধিতে ভুগিয়া ভুগিয়া শিখিতে হয়, কেমন করিয়া রোগের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। অতি ভোজনের ফলে উদরের পীড়া হইয়া থাকে এই কথা কে জানে? যে ব্যক্তি অতি ভোজনের ফলে উদরের পীড়ায় ভুগিয়াছে, সেই শুধু ইহা জানে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই ভবিষ্যতে সে আর কখনও অতি ভোজনের লোভ করিবে না। যখন দেখা যাইবে যে কোমল দেহই রোগের আগার, দেহের অতি মৃদুতাই রোগাক্রমণের প্রধান কারণ, তখনই মানুষ চাহিবে শারীরিক চর্চার দ্বারা দেহকে সুদৃঢ় করিতে। এইরূপে রোগমুক্তির উপায় তাহার পরিজ্ঞাত হইবে। শরীরের সহনশীলতাই শরীরকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। শারীরিক চর্চার অর্থও এই সহনশীলতার

অভ্যাস। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধীরে ধীরে নিয়মিত ভাবে ছোটখাটো আঘাতের সম্মুখীন করার নামই শরীর-চর্চা বা ব্যায়াম।

শুধু শারীরিক ব্যাপারে নহে,—মানুষের মানসিক ক্ষেত্রেও এইপ্রকার সহনশীলতার অভ্যাস করিবার প্রচুর অবকাশ আছে। মানুষ শৈশবে নিতান্ত কোমল-প্রকৃতি থাকে। তাহার সুকুমার চিত্ত অতি অল্প পীড়ায়ই কাতর হয়। কিন্তু সংসার অতি নিষ্ঠুর। কাহারও চিত্ত নিতান্ত কোমল ও স্পর্শকাতর বলিয়া সে ক্ষমা করে না। জীবনযুদ্ধে প্রত্যেককে প্রত্যক্ষ ভাবে অবতরণ করিতে হয়। মানুষের মনও ধীরে ধীরে সহিতে শিখে। সংসারের মানসিক পীড়া সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে, এক, প্রিয়ের (বা প্রার্থিত বস্তুর) অসঙ্গম, আর অপ্রিয়ের (অবাঞ্ছিত বস্তু বা অবস্থার) সঙ্গম। যাহা চাই তাহা পাই না, যাহা পাই তাহা চাই না। ইহাই মানসিক ক্লেশের কারণ। বাঞ্ছিত বস্তু বা অবস্থার অসদ্ভাবে মানুষের অনুক্ষণ হইয়া থাকে। ছাত্রেরা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন না,—ব্যবসায়ী প্রতীক্ষিত উচ্চদরের বাজারটির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কেহ হয় ত আশা করিয়াছেন নিঃসন্তান নিকট-আত্মীয়ের প্রচুর ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবেন, এমন সময়ে বৃদ্ধবয়সেই ঐ আত্মীয়ের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল,—এই প্রকার, এবং ইহা অপেক্ষা আরও কত গুরুতর আশা-ভঙ্গের আঘাত মানুষের জীবনে সহিতে হয়। আবার অবাঞ্ছিত অবস্থার অভ্যাগমও মানুষের জীবনে কতই হইতেছে। কাহারও বা কর্মক্ষেত্রে অতি অপ্রীতিকর একটি মানব হইলেন, কেহ বা মনের মত আত্মীয় লাভ করিতে পারিলেন না, ইত্যাদি মনকষ্ট কতই মানুষের রহিয়াছে।

এই প্রকার দুঃখে যখন মানুষের জীবন স্বভাবতঃই জর্জরিত, তখন প্রতিটি দুঃখেই মানুষ যদি অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহার জীবনই ব্যর্থ হয়। দুঃখের প্রভাবে মানুষ অনেক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু এই প্রকার অবসাদ ও মৃত্যুর মধ্যে কোনই গৌরব নাই। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে,—সমস্ত কঠোরতার মধ্যে, নিপীড়নের মধ্যে তাহাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। এই জন্য ধীরে ধীরে তাহার মনকে সহিষ্ণু করিয়া তুলিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে,—এই সংসার অসংখ্য লোকের বাসস্থান। এই অসংখ্য লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি কখনই একপ্রকার হইতে পারে না। পৃথিবীর তাবৎ-ঘটনা প্রবাহই যে একটিমাত্র লোকের রুচির অনুসারী হইবে, ইহা কখনই

আশা করা যায় না। এই প্রকার ভাবনা আমাদের মনকে পরমত-সহিষ্ণু (Tolerant) করিয়া তুলে। বিভিন্ন রুচি ও স্বার্থের সংঘাতে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পদে পদে ব্যাহত হইলেও, তাহা অস্বাভাবিক নয়। ইহাতে মনে করিবার কারণ নাই যে বিশেষ করিয়া আমারই দুরদৃষ্ট,—আমার উপর ভগবানের আক্রোশ আছে বা আমার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। উদার সহিষ্ণুতার ফলে আমরা সকল দুঃখ সহিবার শক্তি লাভ করিতে পারি। ধীরে ধীরে দুঃখকে জয় করিবার, প্রার্থিতকে অর্জন করিবার শক্তি আমরা লাভ করিতে পারি।

জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে, মানুষকে সর্বদাই সতর্ক হইতে হইবে। প্রকৃতির বিধান অতি বিচিত্র। মানুষ সুদীর্ঘ কালের সভ্যতার সাধনায়ও প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারে নাই—তাহার কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে সে অসম্পূর্ণ পরিচয় মাত্র লাভ করিয়াছে। মানুষকে আরও সাধনার দ্বারা প্রকৃতির অনুশীলন করিতে হইবে। তাহার বিচিত্র শক্তিকে চিনিয়া সকল শক্তিই যাহাতে আমার সাধনার আনুকূল্য করিতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে সংসার সুখের শয্যা নহে। Life is not a bed of roses. সাধনা দিয়াই জীবনের পরিণামকে সুখময় করিতে হইবে। দুঃখের কণ্টক একেই সুখের গোলাপটি ফুটিয়া থাকে। সংসারের শুধু প্রাকৃতিক কঠোর মূর্তিটি দেখিলেই চলিবে না। তাহার অন্তর্নিহিত আনন্দকেও চিনিতে হইবে। বিঘ্ন-সঙ্কুল কণ্টকময় বন্ধুর পথে মানুষের এই যাত্রার মধ্যে একটা বীরত্ব আছে। এই বীরত্বের গৌরবে মানুষের সকল দুঃখের গ্লানি দূর হইয়া যায়, সংগ্রামের সমস্ত কণ্টকিত সিদ্ধির শ্যামল পল্লব-দলে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব গৌরব লাভ করে। এই আপাতনিষ্ঠুরতার অন্তরালে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার মঙ্গলেচ্ছা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। রুদ্রের রক্ত জটাজালে আচ্ছন্ন ভয়হারিণী অলকানন্দার কুলু-কুলু-ধ্বনি কান পাতিলেই শুনা যায়। বিঘ্ন-বিপদের সহিত যুধ্যমান মানবের মস্তকে শ্রান্ত ললাটদেশেই শান্তির সমীরণ সুখাবহ হইয়া থাকে। ক্রীড়াময় অলস জীবন সুখের নয়। শ্রমের পরই বিশ্রামের সার্থকতা। শ্রম ও সংগ্রামের ভিত্তির উপরেই মানবের বিজয়পতাকা প্রোথিত হয়।

———

জ্ঞানই শক্তি

[সংকেত :—জ্ঞান কি ?—চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান—তাহার উপকারিতা—বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার উপযোগিতা—শারীরিক শক্তির সহিত জ্ঞানের শক্তির তুলনা—উপসংহার।]

সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই প্রতি পদে শক্তির প্রয়োজন। শক্তিহীনের জীবনই বৃথা, বাঁচিয়া থাকিলে সে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে,—মরিলেই সে বাঁচিয়া যায়। জ্ঞানীরা বলেন, এ সংসারে জ্ঞানের তুল্য শক্তি নাই। এই জ্ঞান কাহাকে বলি? প্রকৃতির নিয়ম-পরম্পরা ও মানব-চিত্তের ভাবনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া আমরা মনে করি। যে সমস্ত গূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুসারী হইয়া প্রকৃতির কার্যপরম্পরা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাও যেমন একটি জ্ঞাতব্য বস্তু, মানব-মনের বৃত্তি-নিচয়ও তেমনি একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। কি করিয়া মানব-মনে বিশিষ্ট ভাবের উদয় হয় এবং কেনই বা হয়, সে সমস্ত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এক কথায় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান সমূহ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই জ্ঞানের সম্বল লইয়া যদি আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তবে সফলতা নিশ্চয়ই আমাদের করায়ত্ত হইবে, আমরা নিশ্চয়ই জগজ্জনের সম্মান ও প্রীতি লাভ করিব এবং নিজের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হইব। এমন কি সমগ্র পৃথিবীও আমাদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে।

সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই আত্মচেতনা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যদি আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন থাকি তবে ঐগুলি দূর করিবার জন্যও আমাদের মনে অনুক্ষণ একটা ইচ্ছা জাগিয়া থাকে। যদি আমাদের বিবেচনা বা বিবেক সর্বদা সচেতন থাকে, তবে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে আমরা সহজে চিত্ত-দৌর্বল্যের দ্বারা অভিভূত হই না। নিজেদের সম্বন্ধে আত্মসচেতন থাকার এই সুবিধা। বিশ্ব জগতের সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকিলেও যে আমাদের

কতখানি সুবিধা হইতে পারে তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইহাতে মানুষের চিত্ত জয় করা সহজ হয়। জনসংঘের উপর নেতৃত্ব করিতে হইলে, নিজের অভিমত অনুসারে অপর মানুষকে পরিচালিত করিতে হইলে, লোকচরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলে চলিবে কেন? জনসংঘের প্রবণতা, বিভিন্ন মানুষের চিত্তের গতি, তাহাদের রুচি, তাহাদের দোষ ও তাহাদের গুণগুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে মানুষ কিছুতেই তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। যে সমস্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজনৈতিকগণ এক একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া অগণ্য মানবের উপর নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা জনসংঘের দুর্বলতা কোথায়, তাহা খুব ভাল করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই দুর্বল স্থানটিতে আঘাত করিতে পারিলেই তাহারা সহজেই অবনত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া যুক্তি-তর্ক প্রয়োগের দ্বারা অপরের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে না পারিলে, বিশিষ্ট বচন-ভঙ্গী দ্বারা তাহাদের হৃদয়-বৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে না পারিলে,—কখনই বহু সংখ্যক চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। এই জন্য ঐহিক উন্নতি লাভের পক্ষে লোকচরিত্রজ্ঞান একেবারে অপরিহার্য।

কিন্তু ইহাই সব নয়। আধুনিক সভ্যতার সর্বপ্রধান অস্ত্র কি? প্রকৃতিকে জয় করাই—নব্য সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রকৃতির গোপন-শক্তির ভাণ্ডারগুলি আজ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নব্য আবিষ্কারকেরা প্রকৃতির শক্তিকে এমন করিয়া করায়ত্ত করিয়াছেন যে তাহা মানুষের শক্তিকেই বাড়াইয়া দিয়াছে। প্রকৃতি আজ দাসীর মত মানবের দ্বারে খাটিতেছে,—মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও আরাম বাড়াইয়া দিবার জন্য সে আজ অবিরাম পরিশ্রম করিতেছে। প্রকৃতির যে সব শক্তির গূঢ় উৎসগুলি এতকাল রহস্যাবৃত থাকায়, মানব-সমাজের ভয়ের কারণ স্বরূপ ছিল, আজ মানুষ জ্ঞানবলে প্রকৃতির সেই সব গূঢ় নিয়মশৃঙ্খলা আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির রাজ্য জয় করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়াছে।

জ্ঞানের শক্তির কথা উঠিলে, অনেক সময় শারীরিক শক্তির সহিত তাহার তুলনা করা হয়। কিন্তু জ্ঞানের শক্তি শারীরিক শক্তিকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আধিপত্য করে, সমাজে শারীরিক শক্তিও তেমনি মানসিক শক্তির প্রভুত্ব স্বীকার

করিয়া চলে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের ব্যবস্থা ও উপদেশ মতই দেশের কর্মশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণেরা শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান্ না হইয়াও তাঁহাদের জ্ঞানের শক্তিতে সমাজে অবিসম্বাদী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শারীরিক শক্তির স্বরূপ মহারাজগণের মুকুট-সনাথ শির উপবাস-শীর্ণ ব্রাহ্মণের পদতলে অবনত হইত। সর্বদেশে এবং সর্বকালে এই জ্ঞানের শক্তিই সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বপ্রধান হইয়া থাকিবে, ইহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না।

ক্ষমা

[[illegible]]

এ সংসারে ক্ষমার ন্যায় ধর্ম নাই, ইহা মানব-হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্য। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা ক্ষমা-গুণকে পরম গৌরবের চক্ষে দেখিতেন। যিনি আপন-পর, শত্রু-মিত্র সকলকেই ক্ষমা করিতে পারেন, এ সংসারে তিনিই ঈশ্বরতুল্য।

মানুষের অনেক স্বাভাবিক দুর্বলতা রহিয়াছে। এ সংসারে ত্রুটিহীন নিখুঁত নির্দোষ চরিত্র অতি বিরল। জ্ঞানী ও সংযত-চরিত্র ব্যক্তিরাও কখন কখন পথভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। কাজেই, এ সংসারে ক্ষমার অবকাশ যথেষ্ট রহিয়াছে। ক্ষমা হৃদয়ের অসামান্য উদারতার ফল-স্বরূপ। অনেক সঙ্কীর্ণ-চিত্ত লোক আছেন, যাঁহারা স্বভাবতঃ ক্ষমা করিতে অসমর্থ। তাহাদের নিজেদের সহস্র দোষ থাকিলেও, তাঁহারা কেবল পরের দোষ ঘোষণা করিয়াই সময় কাটান,—ইহাতেই তাঁহারা সুখ পান। এই সকল নীচমনা ক্রূর ব্যক্তি না করিতে পারেন এমন অপকর্ম নাই। উদার-হৃদয় ব্যক্তিরা ক্ষমা করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। ক্ষমার যে একটা অলৌকিক আনন্দ আছে তাহার সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছেন।

ক্ষমা মানব-সমাজের চিত্ত জয় করিবার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। দোষী ব্যক্তি কঠোর শাস্তিতে যতটা না সংশোধিত হয়, সহৃদয় ক্ষমার প্রভাবে তদধিক সংশোধিত হইয়া থাকে। মানুষকে ভয়ের দ্বারা শাসন করার অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা শাসন করাই অধিক সার্থক হয়। ভয়ের বন্ধন নিমেষে ছিন্ন হয়, প্রেমের বন্ধন অটুট। এই প্রেমই ক্ষমার ভিত্তি। এই প্রেমের আস্বাদ যে পাইয়াছে, সে হৃদয় হইতে সমস্ত গ্লানি দূর করিতে পারে, প্রতিহিংসার কল্পনা আর তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। মোগল-সম্রাট আকবর ও পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ শত্রুগণের সহিত ক্ষমাময় সদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়াই তাঁহারা নিজে নিজেই তাঁহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন —তাঁহাদের সেই আধিপত্য স্থায়ীও হইয়াছিল। কাজেই, দেখা যাইতেছে, যাহা ধনবলে, বাহুবলে এবং প্রভুত্ববলে সংসাধিত না হয়, এক ক্ষমার মহিমাতেই তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

রামায়ণ-মহাভারতে অসামান্য ক্ষমার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যখন পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বনে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের চিরশত্রু দুর্যোধন তাঁহার ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখাইবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য সৈন্য লইয়া সেই বনে গমন করেন। এই সময় গন্ধর্বগণের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। গন্ধর্বগণ দুর্যোধনাদিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া, বন্দী করিয়া স্বর্গে লইয়া চলিলেন। এই সময় কৌরবেরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলেন। দুর্যোধনাদি চিরদিন তাঁহাদের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির সে সমস্ত ভুলিয়া ভ্রাতৃগণকে পাঠাইয়া গন্ধর্বদের হাত হইতে দুর্যোধনকে সপরিবারে উদ্ধার করিয়া দিলেন। ইহাতে স্বল্পকালের জন্য দুর্যোধনের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরোধ-ভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল।

পারিবারিক জীবনেও ক্ষমার গুণ অপরিসীম। ক্ষমার বন্ধন শিথিল হইলেই পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, স্বামী-স্ত্রীতে, প্রভু-ভৃত্যে বিশ্লেষ ও মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকে। এজন্য পারিবারিক জীবনেও ক্ষমাগুণের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ক্ষমাময় উদার অন্তঃকরণ না হইলে, শিশুর উপদ্রব, পীড়িতের আর্তনাদ, নির্বোধের অকারণ উত্তেজনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দ্য সহিয়া উঠা যায় না। পক্ষান্তরে যে পরিবারে ক্ষমাগুণের আধিক্য

আছে, সেখানে চিরদিন শান্তি বিরাজ করে। জননীর ক্ষমার তুলনা হয় না,—ইহা স্বর্গীয়। ভগবানের ক্ষমাও আমরা নিত্য-নিয়ত লাভ করিতেছি। আমরা নিরবধি কত দুর্বলতা প্রকাশ করিতেছি, কত পাপ করিতেছি, দয়াময় ঈশ্বর সমস্তই ক্ষমা করিতেছেন। যখন মনে হয় কি অপরিসীম উদারতার অনুপ্রেরণায় মহাত্মা যীশু ও মহাপুরুষ সক্রেটিস আততায়ীকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন,—তখন অতি ক্রূরমনা ব্যক্তির হৃদয়ও আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হয়,—প্রাণের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত মালিন্য যেন এক নিমেষে দূরীভূত হইয়া যায়। সার আইজাক নিউটনের ক্ষমাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। যে কুকুরটি তাঁহার বহুকালের গবেষণা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফল বাতির আগুনে ভস্মীভূত করিল, তাহাকে তিনি একটিও কটুকথা বলিলেন না—তাহার উপর একটুও বিরক্ত হইলেন না।

কি করিয়া মানুষের দোষ ক্ষমা করা যায়? দোষগুলি যে মানুষের পক্ষে অনিবার্য,—সকলেই যে ভ্রান্তির দাস—দোষের এই তত্ত্বটি হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিলেই, মানুষ ক্ষমা না করিয়া পারে না। মানুষ প্রেমাস্পদের দোষ সহজেই ক্ষমা করিয়া থাকে,—প্রেমের মধ্য দিয়া সে দোষের এই তত্ত্বটি বুঝিতে পারে বলিয়াই। জগতের এই প্রেমকে বিশ্বে যতই বিস্তারিত করিয়া দিতে পারিব, ততই আমরা ক্ষমাগুণের অধিকারী হইব।

ক্ষমা ভীরুর দুর্বলতা নয়, ক্ষমার মধ্যে অপরিসীম বীরত্ব নিহিত রহিয়াছে। ক্ষমা এই মরজগতে অমৃতস্বরূপ। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে অন্যায়ের প্রবলেই পুষ্টি হয়। তাই সবলকেও ক্ষমা করা কল্যাণকর নয়। অনেক দুরাচার এ সংসারে আছে, যাদের দোষ ক্ষমা করিলে, দোষ করিবার স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। ইহারা সকলে সাধুভাবের অতীত। ইহাদের জন্য ক্ষমা নয়,—রাজদণ্ড, সামাজিক শাসন প্রভৃতি ইহাদের জন্য আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু দুরাত্মাদিগকে যখন দণ্ড দিতে হইবে, তখনও তাহাদের প্রতি যেন বিদ্বেষবুদ্ধি না জাগে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যই তাহাদের হৃদয়ের গ্লানি দূর করিবার জন্যই যে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে,—ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

———

কুসংসর্গের ফল

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৫]

[সূচনা—চরিত্র গঠনে সংসর্গের প্রভাব—শিশুচিত্তে কুসংসর্গের প্রভাব—বালকগণের উপর কুসংসর্গের প্রভাব—কুসংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার উপায়—উপসংহার।]

"সংসর্গজাঃ দোষ-গুণাঃ ভবন্তি"—অর্থাৎ দোষ এবং গুণ সংসর্গ হইতেই জন্মিয়া থাকে। কথাটা অতি সত্য। সঙ্গগুণে দস্যু সাধু ও পুণ্যাত্মা হয়। ইহা যদি হইতে পারে, তবে কুসংসর্গের ফলে মানুষের চরিত্র ক্রমে কলুষিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু আর সৎ চরিত্র বা অসৎ চরিত্র লইয়া পৃথিবীতে আসে না। জন্মের পরে এই সংসারে সে যাহাদের সঙ্গে বাস করিয়া ধীরে ধীরে বড় হইয়া উঠে, স্বভাবতঃ তাহাদের চরিত্রই অনুকরণ করিতে শিখে। সুতরাং সংসর্গই প্রকৃতপক্ষে চরিত্র গঠনের এক উপাদান। সৎ-সংসর্গে বালক যদি অবস্থিত থাকে, তবে তাহার চরিত্র গঠনের অন্ততঃ অর্ধেক আয়োজন সুসম্পন্ন হইল মনে করিতে হইবে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে শুধু মাত্র সংসর্গ গুণেই বালক সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও মার্জিত রুচি হইয়া উঠে, মাতাপিতাকে ইহার জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কুসংসর্গের ফল ঠিক ইহার বিপরীত।

বালকদের উপরই কুসংসর্গের প্রভাব সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। ইহার কারণ কি ? কারণ এই, তরুণবয়সে অনুকরণ-প্রবৃত্তি অতি তীব্র থাকে। শিশুরা যাহা দেখে, তাহাই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। ভাল-মন্দ তাহারা বুঝে না। মন্দ বলিয়া কেহ কোন জিনিসকে নিন্দা করিলেও তাহাদের তাহাতে চৈতন্য হয় না। কারণ নীতি-শিক্ষাটা স্বভাবতঃই বালকদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়। অনুকরণের কৌতূহলই তাহাদের চিত্তবৃত্তিতে একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া থাকে। এমন কি, যদি কেহ তাহাকে কোন কার্য করিতে নিষেধ করে, তবে ঐ কার্য করিবার কৌতূহল তাহার আরও বাড়িয়া যায়।

কাজেই বালক-বালিকাগণকে প্রথম হইতেই অসৎ-সংসর্গ হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

মানুষের বয়স যত বাড়িতে থাকে, ভাল-মন্দের বিচারও ততই একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পায়। যাহার নিজের বিচার-বুদ্ধি যত প্রবল, সে সেই পরিমাণে অন্যের মন্দ প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের উপর সংসর্গের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ভাল ও মন্দের মধ্যে এ বিষয়ে একটু প্রভেদ আছে। কুসংসর্গের এমন একটা সহজ মোহ আছে, যাহা অনায়াসে মানুষের প্রবৃত্তিকে আকৃষ্ট করে। বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অনেক সময় কুসংসর্গের ফলে নিজের চরিত্র, নিজের সুখ-শান্তি ও ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত সমাজে বিরল নহে। যুবকবৃন্দ শিশুদের ন্যায় তত অনুকরণপ্রিয় নয় বটে, কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ এতই ভাবপ্রবণ যে, অতি সামান্য কারণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। পাপের আপাতমনোরম সহজ সুখ-সম্ভোগের লালসা যুবকগণের চিত্তে একবার জাগিয়া উঠিলে, উহা তাহাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে এমন একটা গভীর ছাপ রাখিয়া যায় যে সহজে উহা বিলুপ্ত হয় না। অসচ্চরিত্র বন্ধু-বান্ধবগণ এই সময় যুবককে পাপকার্যে উৎসাহিত করে। আর প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ প্রদানেরও কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের জীবনই পাপকর্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ যুবকগণের চিত্তে অনিবার্য প্রলোভনের সৃষ্টি করে। যুবকের চরিত্র যদি সুগঠিত ও অত্যন্ত দৃঢ় না হয়, তবে এই প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া নিজের জীবনকে সত্য পথে চালিত করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

বাল্যকাল হইতেই যদি মানুষ সুশিক্ষা লাভ করে, উচ্চ আদর্শের অনুকরণে জীবন কাটাইবার আগ্রহ যদি তরুণবয়সেই হৃদয়-মধ্যে জাগ্রত হয়, তবে ভবিষ্যৎ-জীবনে কুসংসর্গ মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। প্রস্তরনির্মিত সুদৃঢ় গৃহভিত্তি যেমন জলপ্লাবনেও কিছুমাত্র ক্ষতি-গ্রস্ত হয় না, মানুষও উচ্চ আদর্শের দ্বারা একবার অনুপ্রাণিত হইলে ভবিষ্যতে পাপের প্রলোভনে সহজে আত্মসমর্পণ করে না। কুসংসর্গ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ইহা ছাড়াও মানুষকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ মানুষের চিত্ত তো ইট, কাঠ, পাথরের ন্যায়

একটা শক্ত জিনিষ নয়। ইহা গতিশীল ও চঞ্চল। হৃদয়ে কতকগুলি সাধু প্রবণতা জন্মিয়া থাকিলে সহজে উহা বিলুপ্ত হয় না বটে, কিন্তু চঞ্চল মানব-মনের উপর কোন প্রলোভন বার বার আঘাত করিতে থাকিলে, ক্রমে অলক্ষিতে হৃদয়ের উপর উহার একটা প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেজন্য মানুষকে সদা সর্বদা কুসংসর্গ ও কুদৃষ্টান্ত হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কুপল্লীতে বাস করিতে নাই। কুলোকের সহিত বেশী মেলা-মেশা করিতে নাই। প্রথমে হয়ত অসচ্চরিত্র লোকের উপর আমাদের একটা ঘৃণা থাকে। কিন্তু ক্রমাগত মেলা-মেশা করিতে থাকিলে এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব মন্দীভূত হইয়া আসে, তখন ঐ লোকটির চরিত্রের দোষগুলিও আর দোষ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে যে, ঐ লোকটির চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহার সংসর্গে আমরা অন্তরের ভিতরে অসৎ হইতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রেমিক পুরুষের, সজ্জনের, মানুষকে ঘৃণা করিতে নাই। লোক যতই পাপী হউক, যত বড় দুর্দান্ত হউক, সকলকেই প্রীতি দিতে হইবে। এই উদার সত্য কথাটি কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে নয়। যাঁহারা সংসার মধ্যে [illegible] কাটাইয়া সত্যের [illegible] ভিত্তিতে বল করিয়াছেন, যাঁহাদের আর অধঃপতন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিতান্ত দুর্বল, তাহাদের চিত্ত স্থির নাই। এরূপক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে কুসংসর্গের ফল সহজেই [illegible]।

"তোমার পতাকা যারে দাও—
তারে বহিবারে দাও শকতি"

বাতাস আছে,—কেহ কি দেখিয়াছে? কিন্তু বৃক্ষপত্র যখন মর্মরিয়া কাঁপিয়া উঠে, তখন বুঝি বাতাস আছে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রতাপ-ক্লিষ্ট শরীর মৃদুসমীরণের হিল্লোলে যখন শিহরিয়া পুলকিত হইয়া উঠে, তখন বুঝি বাতাস আছে। কিন্তু এমন একটি সহজ জিনিষও মানুষের বুদ্ধির গোচর হইবার কালে মাঝে মাঝে বিস্তর বাধা পাইয়া থাকে। সংসারে ভগবদ্বিধিও এইরূপ একটি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মানুষের জীবন এমনই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে সর্বাপেক্ষা যাহা সহজ তাহাই তাহার কাছে সর্বাধিক বাধা পাইতেছে। সংসারে প্রতিদিন সহজ সত্যগুলিরই সবচেয়ে বেশি অপমান হইতেছে। যীশুখ্রীষ্টের প্রতিশ্রুত সেই Kingdom of Heaven যেন মানুষের জগৎ হইতে দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছে।

মানুষ আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত উদার, উন্মুক্ত পরিবেশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতান্ত খণ্ড ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করিয়া রাখিতে চায়। বৃহৎকে ধারণা করিবার শক্তি সে আজ হারাইয়াছে। তাই দেখিতেছি পদে পদে স্বার্থের সংঘাতে সাংসারিক জীবন-যন্ত্র বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষ-বাষ্পের জ্বালায় মানুষ ব্যক্তিগত শান্তি যতই হারাইয়াছে, ততই ব্যক্তিগত স্বার্থ-বুদ্ধি আরও সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়াছে, হানাহানি কাটাকাটির বিকট বীভৎস চীৎকারে উদার আকাশের প্রশান্তি ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। আর তাহারই আদেশে ঘূর্ণায়মান নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সর্পিল কুটিল পথে লোকযাত্রা অনন্ত দুর্গতির চক্রে আবর্তিত হইয়া ফিরিতেছে।

এই অন্ধকারে কে আলোক দেখাইবে? এই স্বার্থপর সন্দেহের ধূমাচ্ছন্ন পথের মোহানায় কাহার কণ্ঠধ্বনি সত্যের সহজবাণী উচ্চারণ করিবে? সেই শক্তি কোথায়? সত্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া কে এই মূক-বধির-অন্ধ লোকযাত্রাকে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে? যন্ত্র-চক্রের চেতনাহীন আবর্তনে সে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার গতিকে রুদ্ধ করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া, মৃত্যুকে ও দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া কে আজ লাল নিশান উড়াইয়া দিবে?

হায়! যাহা সহজ ও সত্য, সমাজ তাহাকে আজ দেখিয়াও দেখে না। পরস্পরের সহায়তায় বলীয়ান হইবার উদ্দেশ্যে একদিন মানুষ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই বন্ধনের মূলে ছিল গভীর বিশ্বাসের ও প্রেমের প্রেরণা। কিন্তু আজ পদে পদে মিথ্যাচার এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, সামাজিক জীবনে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের শাসনকে ডাকিয়া এই মিথ্যাচারকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করা হইতেছে। আজ মানুষের পরস্পরের নিরাপত্তাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বিচরণ করিতেছে। মনে হয়, মানুষ শীঘ্রই সামাজিক জীবনে বীতরাগ হইয়া পুনরায় সেই আদিম অরণ্যে ফিরিয়া যাইবে।

এই সংসারে আজও যিনি সত্যের পথে, প্রেমের পথে চলিবেন, প্রতিমুহূর্তে তাঁহাকে বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হয়। তিনি লাঞ্ছিত হইবেন, নিপীড়িত হইবেন ও একদিন গৃহহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই নিগ্রহকে স্বীকার করিয়া সত্যের ধ্বজা প্রবল হস্তে সংসারে তুলিয়া ধরিতে হইবে। ভগবানের এই বিশ্ব প্রচার করা ত সামান্য শক্তির কথা নয়। সেই শক্তি ভগবান যেন মানুষকে প্রদান করেন। মানবজাতির হীনতায় মর্মপীড়িত কবির কণ্ঠ হইতে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে,—সহজ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুকঠিন ব্রত উদ্যাপন করিবার অসামান্য শক্তি যেন ভগবানই মানুষের হৃদয়ে ঢালিয়া দেন। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার, অতি গৌরবময় সন্দেহ নাই,—কিন্তু এই গৌরবের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে অনেক দুঃখ। নিবিড় অন্ধকারময় পথের বুকে সত্যের ও প্রেমের জয়ধ্বজা হস্তে দণ্ডায়মান হওয়া বীরত্বের কথা সন্দেহ নাই। এই বীরত্বের মধ্যে গৌরব আছে যেমন, তেমনি আত্মবিলোপের আশঙ্কাও প্রতিমুহূর্তেই বিদ্যমান। ইহা সম্মানের রাজমুকুট হইলেও, কণ্টকের মুকুট—ধারণ করিতে শির রক্তাক্ত হইয়া উঠে।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা দুঃখ ও প্রেমের অশ্রু-সম্মিলিত স্রোতে তীর্থস্নান করিয়া এই সত্যের পতাকা হস্তে অন্ধ লোকযাত্রার পথের ধারে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের অদম্য শক্তি, অপার প্রেম ব্যর্থ হয় নাই। মহাকালের পথের ধারে তাঁহাদের প্রোথিত ধ্বজদণ্ড বিরাট ও অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

প্রেমাবতার যীশুর রক্তলিপ্ত কাষ্ঠময় পতাকা দ্বিসহস্র বৎসরের তমিস্রা বিদীর্ণ করিয়া আজিও আকাশে সগৌরবে উড়িতেছে। অর্দ্ধপৃথিবীর দুঃখ-তাপ-ক্লিষ্ট নর-নারী সেই পতাকার তলদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

আজি বিধুরা-ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ড রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় যুগাবতার মহাপুরুষ! ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে যাঁহারা যুগে যুগে নামিয়া আসেন, তাঁহারা আজ কোথায়? সত্যের পতাকা তুলিয়া ধরিবে কে? কোথায় সেই শক্তিশালী, প্রেমময় বাহু? কোথায় বুদ্ধ?—রাজার দুলাল হইয়াও যিনি সন্ন্যাসী, আজ বেদনা-বিধুর সংসার রাহুলের ন্যায় ভিক্ষাপাত্রহস্তে তাঁহার কাছে নির্বাণ চাহিতেছে। কোথায় প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য? যিনি অশ্রুর প্লাবনে সারা বঙ্গদেশে প্রেমের ফসল ফলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাই, যাঁহাদের বাণী স্বার্থ-সংঘাতের বিকট চীৎকার ছাপাইয়া জলদ-মন্দ্রে আকাশ-বাতাসকে কম্পিত করিয়া নির্ঘোষিত হইবে। তাঁহাদের চাই,—চরিত্রবল যাঁহাদের সহজাত ধন, ত্যাগের মধ্যেই যাঁহাদের আনন্দ, যাঁহারা সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষ। তাঁহারাই বর্বর অর্জিত শক্তিমান [illegible], জ্যোতির্ময় পথের যাত্রী, [illegible] প্রেমময় মহাপুরুষ। মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহাদের সূত্রে গ্রথিত হইয়া সংসার দীপ্তিমান হয়, তাঁহারাই ধর্মের প্রাণদাতা। সংসার পাপের প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্ন হইলে তাঁহারাই যুগে যুগে [illegible] ধর্ম ও লোকসমাজকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

প্রবন্ধ সংকেত

মিতব্যয়িতা ঃ—সূচনা—মিতব্যয়িতা বলিতে কি বুঝায়, মিতব্যয়ীর সহিত কৃপণের পার্থক্য কি ?

মিতব্যয়িতার প্রয়োজন—ভবিষ্যৎ চিরদিনই মানুষের অজ্ঞাত, পরে দুর্দিন আসিতে পারে, এখন সাবধান হইবার চেষ্টা না করিলে পরে অনুশোচনা করিতে হইবে। যথাযথ ব্যয় না করিলে শুধু ভবিষ্যতে নয় বর্তমানেও অনেক অসুবিধা হয়।

অমিতব্যয়িতার কারণ—অবিবেচনা, অদূরদর্শিতা, জীবনে শৃঙ্খলতার অভাব, বিলাসপ্রিয়তা, যশোলিপ্সা।

মিতব্যয়ী হইবার উপায়—আয় অনুযায়ী ব্যয় করা নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, বিলাসিতা যথাসম্ভব ত্যাগ করা।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য ঃ—সূচনা—মানুষের সৃষ্টি সমাজ, সমাজের উন্নতির ফলেই মানুষের উন্নতি, পরস্পরের বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারাই সমাজের সুস্থ এবং উন্নত।

প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্য—পরস্পরের দুঃখে অংশ গ্রহণ, পরস্পরের বিপদে-আপদে সাহায্য, সামাজিক জীবনে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা।

স্বার্থত্যাগ—সমাজে বাস করিতে গেলে কখনও কখনও নিজের সামান্য ক্ষতি বা অসুবিধা উপেক্ষা করা আবশ্যক, ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিলে কেহই লাভবান হয় না, বরং এক দিক দিয়া কিছু ত্যাগ করিলে অন্য দিক দিয়া তাহার পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

দুর্ব্যবহারের পরিণাম—পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব থাকিলে মিলিত ভাবে কাজ করা অসম্ভব, অথচ বর্তমানকালে সঙ্ঘবদ্ধ না হইতে পারিলে কোন কাজেই সাফল্য লাভের সম্ভাবনাই নাই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষতি করিলে প্রত্যেকেরই বলক্ষয় হইবে, মনের শান্তির ব্যাঘাত হইবে।

পরস্পরের মধ্যে মিলনসাধনের উপায়—সভা-সমিতি, পাঠাগার, পাঠচক্র প্রভৃতি স্থাপন, গ্রামে গান-কথকতা এবং অন্যান্য উৎসবের অনুষ্ঠান।

আতিথেয়তা ঃ—সূচনা—আতিথেয়তা বলিতে কি বুঝি, অতিথি শব্দের অর্থ, অতিথির সেবাই আতিথেয়তা।

সেকালের আতিথেয়তা—অতিথি-সৎকারকে পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করা হইত, শত্রুও অতিথিরূপে কাহারও গৃহে আসিলে তাহার সেবা করা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, এমন এক সময় ছিল যখন লোকে একটি পয়সা হাতে না লইয়াও সমগ্র ভারত বেড়াইতে পারিত।

বর্তমানকালের আতিথেয়তা—উভয় কালের তুলনা, একালে গ্রামাঞ্চলে আতিথেয়তার প্রাচীন আদর্শ এখনও অনেক পরিমাণে অনুসৃত হয়, নগরে অতিথি-সৎকারের নানা অসুবিধা।

উপসংহার—আতিথেয়তার প্রাচীন আদর্শের পুনঃ প্রবর্তন সম্ভব কি না—সে বিষয়ে মন্তব্য।

সমাজ-সেবা ঃ—সূচনা—সমাজ-সেবা বলিতে কি বুঝায়—সমাজ-সেবার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা—সেবক সংগঠন—সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের সংস্কার—সেবাকার্যে হৃদয়ের উদারতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা—বিশ্বমৈত্রীর প্রথম সোপান।

পরিশ্রমই সফলতার মূল ঃ—সূচনা—ইংরাজী প্রবচন Industry is the mother of success-এর বাঙ্গালা রূপান্তর, প্রবচনটির ভাবার্থ।

দৈব ও পুরুষকার—দৈবের উপর নির্ভর করা দুর্বলের লক্ষণ পুরুষকারের দ্বারা যে-কোন কর্ম সম্পন্ন করা যায়, ভাগ্য মানুষের করায়ত্ত, পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ নিজের অদৃষ্ট গঠন করিতে পারে।

প্রতিভা ও পরিশ্রম—প্রতিভার দ্বারা মানব স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে। অনেকে প্রতিভাকে সহজাত শক্তি বলিয়া মনে করেন। অনেকে বলেন, প্রতিভা পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত হইতে পারে। প্রতিভা সহজাত হউক বা না হউক একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিভার বিকাশ হয় এবং পরিশ্রমের অভাবে উহা মলিন হয়। সুতরাং সাফল্য লাভ করিতে হইলে পরিশ্রম করিতেই হইবে।

দৃষ্টান্ত—বিদ্যাসাগর, আশৈশব গুরুতর শ্রম স্বীকারের ফলে জীবনে সফলতা লাভ।

উপসংহার—বর্তমান ছাত্র সমাজের শ্রম-বিমুখতা, জাতির উন্নতিকল্পে ইহা দূরীকরণের চেষ্টা।

ব্যর্থতা—সূচনা—কর্মেই মানুষের অধিকার, সাফল্যের দ্বারা কর্মের বিচার করা উচিত নয়, সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই স্বাভাবিক।

সাফল্যের সোপান—ব্যর্থতার দ্বারা নিরাশ হইলে চলিবে না, বারংবার চেষ্টা করিলে সফলতা লাভ হইবে, যে ভীরু সেই বিহ্বল হয়, শক্তিমান্ লোক ব্যর্থতায় ত্যাগ করেন না।

ব্যর্থতার সুফল—দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইবে, সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিলে গৌরবের অধিকারী হওয়া যায়, ব্যর্থতা আমাদিগকে দুঃখের সম্মুখীন করে, তাই জীবনে তাহার প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত—মহাপুরুষগণের জীবন কথা হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ।

ক্রোধ ঃ—সূচনা—ষড়-রিপুর অন্যতম, মনুষ্যমাত্রেই অল্প বিস্তর এই রিপুর অধীন।

অপকারিতা—হিন্দু পুরাণে উক্ত হয়, ক্রোধের পিতার নাম লোভ, পত্নীর নাম হিংসা, পুত্রের নাম কলি এবং কন্যার নাম দুরুক্তি, ক্রোধ হইতে খলতা, হঠকারিতা, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অর্থদোষ, বাক্‌কলহ এবং পারুষ্য এই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়। সকল দেশের ধর্মশাস্ত্রেই ক্রোধ বর্জন করিবার উপদেশ আছে। অপকারিতা—উদাহরণ।

উপকারিতা—অবস্থা-বিশেষে এই বৃত্তির প্রয়োজনও আছে, এই বৃত্তির একান্ত অভাবে মানুষকে ভীরু করিয়া তুলে। অতএব এই বৃত্তিকে অন্যান্য সদ্‌বৃত্তির বশীভূত রাখিয়া চালনা করা আবশ্যক।

সংযম—ক্রোধ যিনি জয় করিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ।

উপসংহার—ক্রোধ সংযমের উপায়।

বিনয়ঃ—সূচনা—বিনয় বলিতে কি বুঝায়, বিনয়ের সহিত ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ, বিনয়ী হইলেই যে ব্যক্তিত্ব জলাঞ্জলি দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

বিনয়ের মাহাত্ম্য—বিনয় মনুষ্যের একটি মহৎ গুণ, যিনি যথার্থ বিদ্বান তিনি কখনও অবিনয়ী হইতে পারেন না, দেহের শোভা পরিচ্ছদ, আত্মার শোভা বিনয়।

বিনয়ীর বৈশিষ্ট্য—বাক্য ও ব্যবহারে বড়ত্ব [illegible] নিজের দীনতা এবং অক্ষমতা প্রকাশে অসঙ্কোচ, পরের উপকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ, ঔদ্ধত্য পরিহার।

দোষ—বিনয়ের আতিশয্য ভাল নয়, অতি-বিনয়ী ব্যক্তিকে লোকে দুর্বল মনে করিতে পারে, তাহাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতে পারে।

উপসংহার—যে স্বভাবতঃ বিনয়ী নয়, তাহাকে সাধনার দ্বারা এই মহৎ গুণ অর্জন করিতে হইবে।

বাগ্মিতাঃ—বাগ্মিতা বলিতে কি বুঝায়—যথার্থ বাগ্মীর কি-কি গুণ থাকা আবশ্যক—অভ্যাস ও সাধনা—স্বনামধন্য দুই-একজন বাগ্মীর উল্লেখ—বাগ্মিতার উপযোগিতা—বাক্য ও লেখনী।

অহংকারঃ—সংকেত—ষড়্‌রিপুর অন্যতম—মানুষের মনুষ্যত্বলাভের অন্তরায়—সর্বদেশে সর্বকালে ইহা নিন্দিত—পুরাণে, ইতিহাসে অহংকারীর পতনের দৃষ্টান্ত—অহংকার নিবারণের উপায়, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির মহত্ত্বের সহিত নিজের ক্ষুদ্রতার তুলনা—অহংকারে সুখ কিছুই নাই কিন্তু দুঃখ প্রচুর—অহংকারী নিজের অহংকারের আগুনে নিজে দগ্ধ হয় এবং অপরকেও দগ্ধ করে—প্রকৃত জ্ঞানী লোক অহংকার পরিত্যাগ করেন—বিনয় বিদ্বানের লক্ষণ—নিউটনের উক্তি—অহংকার ত্যাগ করিতে গেলে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে হইবে না। বিনয়ীব্যক্তিও তেজস্বী হইতে পারেন।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

খেয়া ঘাটের আত্মকথা

আমি প্রাচীন খেয়া ঘাট। বাদশাহ আকবর যখন সুবে বাঙ্গলার শাসনভার ফৌজদার নবাব খান্ জাহানআলির উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, সে কি আজিকার কথা? নবাব সাহেব নিজের প্রতিষ্ঠিত শহর রহিমাবাদে ভৈরব-পারের লোকজনের যাওয়া-আসার জন্য আমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নবাব সাহেবের উদ্যোগে নির্মিত চন্দ্রদ্বীপ-গামী চওড়া সড়ক ধরিয়া কত লোক আমার বুকের উপর দিয়া নদী পার হইয়া গিয়াছে। সেই অগণিত মানুষের চরণ চিহ্ন আমার বুকে কোথাও কি দেখিতে পাও?

ছোট ইট দিয়া গাঁথা, দুই পাশে দুইটি [illegible]। ঘাটের সোপানগুলি পায়ে পায়ে ক্ষয় হইয়াছে। নানাবিধ পাঁচশত বৎসরের ব্যবহারে কোথাও ইটগুলি খসিয়া গিয়াছে। [illegible] আজ আমার চেহারা। [illegible] বৃদ্ধ সভার প্রহরীর মত দিনরাত পরস্পরের দিকে যেন চাহিয়া আছে। তাহাদের ঝুরি ঝুলিয়া পড়িয়া স্থানটিকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

কালের স্রোতে নবাব খান জাহানআলি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শহর রহিমাবাদ আজ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। রহিমাবাদে আজ শহরের চিহ্ন-মাত্র নাই। দুই একটি বণিকবংশ প্রাচীন বাসস্থানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া এখনও সেখানে বাস করিতেছে। তাহারা ব্যবসায় ছাড়িয়া চাষ-বাস করিয়া দিন কাটায়। তাহাদের পূর্বপুরুষের সওদাগরী জীবনের স্মৃতি তাহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এখান হইতে আমি তাহাদের তীব্র আলোকোদ্ভাসিত যে সুসজ্জিত বিরাট বিপণিশ্রেণী দিনের পর দিন দেখিয়াছি, তাহার কথা আজিও ভুলিতে পারি না।

আগে কত লোক এখানে জমা হইত, আজকাল সারাদিনে মাত্র ২০।২৫ জন লোক নদী পারাপার হয়। প্রাচীন পাটনীবংশের একমাত্র বংশধর তিনকড়ি আজ লাঙ্গল লইয়া ক্ষেত-খামার করে। খেয়া দিয়া তাহার দিন চলে না।

আমার পৈঠা পর্যন্ত প্রসারিত একটি মোটা বটের ঝুরির সঙ্গে একখানা ভাঙ্গা নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া সে তাহার কর্তব্য শেষ করিয়াছে। পারাণীর 'বুড়ী' তাহাদের চালাঘরের ভাঙ্গা দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পারার্থী দেখিলেই তাহাদের কাছে পারের পয়সা চায়, কেহ দেয়, কেহ বা না দিয়াই উপেক্ষা ভরে চলিয়া যায়।

পুরানো কথা ভাবিতে গেলে আমার বুক কাঁপিয়া উঠে। স্মৃতির অরণ্য যেন ভিড় করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। কিন্তু সারাদিন চুপ করিয়া নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া থাকি, [illegible], নির্বাক, এই জরা-জর্জর জীবনে পুরানো কথা মনে করা ছাড়া আর কি-ই বা আমি করিব ?

স্মৃতির নিবিড় অরণ্য বিদীর্ণ করিয়া দুই একটি মুখ মনের কোণে উঁকি মারে। বেদেদের মেয়ে আতুরী। তার বাবা মোতিলাল তাহাকে বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিয়াছিল। [illegible] ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাহার মন বসিত না। মোতিলাল তাহাকে [illegible] বিশ্বাস করিত। [illegible] পইঠায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। একদিন সেই লোকটা পার হইয়া ওপারে চলিয়া গেল, আর আসিল না। বেদের মেয়ে আতুরী তারপর রোজ আসিয়া ঠিক ঐ পৈঠাটার উপর বসিয়া ওপারের দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিয়া চাহিয়া মাঝে মাঝে তাহার চোখ দিয়া দুই-একফোঁটা জল পড়িত। এই জল প্রথমে আমার বুকের উপর, তাহার পর গড়াইয়া গড়াইয়া নদীর জলে পড়িয়া মিশিয়া যাইত। আতুরীর বাপ-মা মরিয়া গেল। বাপের ভিটা আগলাইয়া সে নিঃসঙ্গ দরিদ্র জীবন কাটাইয়া দিল। কিন্তু রোজ তাহার একবার ঘাটে আসিয়া না বসিলে নয়। শেষে আতুরী বুড়ি হইল। তখনও সে প্রতিদিন ঘাটের সেই পরিচিত পইঠার উপর বসিয়া ওপারের দিকে চাহিয়া থাকিত। তারপর একদিন মরিয়া গেল। সে আজ তিনশত বৎসরের কথা। এতদিনেও আমি আতুরীকে ভুলিতে পারি নাই।

আর একবার ঠিক সন্ধ্যার আগে ভুমুল বাদ্য বাজাইয়া এক বিবাহের বরযাত্রীর নৌকা আসিয়া আমার পইঠার ধারে নোঙর করিল। এক মুহূর্তে হাসি-পরিহাস গান বাজনায় নদীর তীর যেন গরম হইয়া উঠিল। তারপর

তীব্র মশালের আলোয় পাল্‌কি করিয়া বর চলিয়া গেল, বরযাত্রীরাও তেমনি হাসির কলরোল তুলিয়া বরের পিছনে পিছনে চলিল। নৌকাখানি ঘাটে বাঁধা রহিল, তারপর অনেকটা রাত্রিতে আবার গোলমাল শুনিলাম। কি একটা ব্যাপার লইয়া কন্যাপক্ষের সঙ্গে বরপক্ষের ঝগড়া হইয়াছে। কন্যাপক্ষ রাগ করিয়া বরপক্ষকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। মেয়ের বিবাহ দেয় নাই, বরযাত্রীর দল ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। কয়েকজন উঠিয়া রহিমাবাদের বাজারে চিঁড়া ও কলা কিনিতে গেল। নৌকার ছাদের উপর একটি কোণে বর একাকী বসিয়াছিল। তাহার চাঁচর-চিক্কণ বাবরী চুলে চাঁদের আলো পড়িয়া চিকচিক করিতেছিল। তাহার ললাটের চন্দন-চর্চা এখনও মুছিয়া যায় নাই। দূরে মেয়ে-বাড়ী—বাজনা বাজিতেছে। তাহারা আর একটি ছেলেকে পাইয়া তখন কন্যা সম্প্রদান করিতেছে। নৌকার ছাদে বসিয়া বর একদৃষ্টিতে আমার নৌকার দিকে চাহিয়াছিল। সেই দৃষ্টি যেন আমার বুকে লাগিয়াছিল। আমি আজিও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

কত আর বলিব? বলিলে ফুরাইবে না। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি আমার বুকের এই ভগ্ন পঞ্জরে গাথা হইয়া আছে। পাঁচশত বৎসরের কত আত্মীয় আমার বুকে তাহাদের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। আজও আমার আত্মীয় আছে, আজিকার এই আত্মীয়তায় সুখ নাই, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু অতীতের বেদনায় সেই সুখ যেন একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনের দাঁড়িপাল্লায় বর্তমানের চেয়ে অতীতের ওজন যে অনেক বেশি ভারী হইয়া গিয়াছে। তাই আমি করুণদৃষ্টিতে স্রোতের দিকে তাকাইয়া থাকি। ঊষার নব-জাগরণের অরুণরাগ আমার জীবনে নূতন উল্লাস আনিতে পারে না—শুধু বেদনাময় করুণ-দৃষ্টিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রতাপে আমার হতভাগা দীর্ঘজীবন নদীর ব্যাকুল কলগানের সুরে উতলা হাওয়ায় শুধু হাহাকার করিয়া ফিরে। অপরাহ্নের ম্লান আলোয় জীবনে যেন মরণের নেশা লাগে। হায়! কবে আমার গত করুণস্মৃতি-জড়িত এই ভগ্নাবশিষ্ট ইটগুলো একেবারে খসিয়া পড়িবে। নদীর স্রোতে আমার এই লুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে। আমি অকূল নদীর তীরে বসিয়া দিনের মালা জপ করিতেছি, এ-মালার শেষ কবে পাইব?

———

একটি টাকার আত্মজীবনী

আমি একটি টাকা। আমার শ্বেত-চিক্কণ বিচিত্র কান্তি দেখিয়া তোমরা সহজেই বুঝিবে আমি রজতময়। বক্ষে যে লম্বাবান্ পুরুষের মুখমণ্ডল আমি ধারণ করিয়াছি—ইনি ভারত ও ইংলণ্ডের এককালীন সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড। বিগত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে টাকশাল হইতে আমি অত্যুজ্জ্বল মূর্তি লইয়া বাহির হইলাম।

প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না কোথায় যাইতেছি। আমার বহুসংখ্যক জ্ঞাতি-ভ্রাতা আমার সঙ্গে চলিলেন। একটা লাল রংয়ের শক্ত আবরণের মধ্যে আমি ছিলাম। পরে বুঝিতে পারিয়াছি—তোমরা উহাকে খেরুয়া-নির্মিত থলে বলিয়া থাক। এই প্রকার আরও কয়েকটি থলে যে আমাদের পাশে পাশে চলিয়াছে, আবরণ-বস্ত্রের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়া আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল কটাক্ষের দ্বারা আমি তাহা দেখিয়া লইলাম। প্রথমে 'আমাদের' থলেগুলি একটি 'মোটর লরী' নামক বিচিত্র যানে চলিল। এই যানের সাহায্যে আমরা নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া রেলগাড়ীতে প্রথম চড়িলাম। গাড়ীতে চড়িবার সময় মানুষের ভীষণ ভীড় দেখিতে পাইলাম।

গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন আমার বেশ ভাল লাগিল। আমার কাছের গাড়ীর জানালাটা একটুখানি ফাঁক করা ছিল; কত দেশ-বিদেশের পাঁচ-মিশালী হাওয়া খেরুয়ার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়া আমার গায়ে আসিতে লাগিল। অবশেষে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের একটি ক্ষুদ্র মহকুমা শহরে—নাম বলিব না—আমরা উপস্থিত হইলাম। একটি ছোট গুদামঘর, দ্বারদেশে এক বন্দুক-ঘাড়ে সিপাহী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মূর্তি ভীষণ—গোঁফজোড়া প্রকাণ্ড। মোটের উপর তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া, কেন জানি না, আমার হাসি পাইল।

তারপর কয়েকটা দিন একজায়গায় একেবারে চুপ করিয়া কাটাইলাম। বসিয়া বসিয়া বড় বিরক্তি জন্মিল। সেই অন্ধকার ঘরে কতক্ষণ মন ভাল থাকে? কিন্তু জুলাই মাসের পয়লা তারিখে অদৃষ্ট ফিরিল। আরও কয়েক জন

জ্ঞাতি-ভ্রাতার সঙ্গে আমি উক্ত মহকুমা-হাকিমের বেতন স্বরূপ তাঁহার 'মণি-ব্যাগ' নামক ক্ষুদ্র চর্মের থলিয়ায় আগমন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটি ইষ্টক-নির্মিত দ্বিতল গৃহে আমার ঊর্ধ্বগতি হইল। হাকিম মহাশয় উপরে গিয়াই আমাকে সেই চর্মগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া সযত্নে আর একখানি সুকোমল হস্তে অর্পণ করিলেন। বুঝিলাম এই হস্তের অধিকারিণী হাকিমের গৃহিণী। হাকিমের গৃহিণী কেন জানি না কিছুক্ষণ পরে আমাকে আমার আর কয়েকটি জ্ঞাতি-ভ্রাতার সঙ্গে একত্র করিয়া একটি বিচিত্র তোরঙ্গে রক্ষা করিলেন। এই তোরঙ্গটি উক্ত ভদ্রমহিলার নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার মধ্যে আমি একটি অভিনব সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে একটা সুন্দর মিষ্ট গন্ধ অনুভব করিলাম। নানাপ্রকার বৈচিত্র্যময় বস্ত্রাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কতিপয় তীব্র সৌগন্ধযুক্ত রঞ্জিত পত্রের একটি প্যাকেট,—একটি সাবানের বোটার মধ্যে রক্ষিত। সেই প্যাকেটের উপরে আমাদের সযত্ন প্রবেশ হইল। বুঝিলাম, আমাদের মান-মর্যাদা তুচ্ছ নয়। প্রায় একবৎসর এই স্থানে থাকিতে হইল। প্রত্যেক মাসেই আমাকে বাহির করিয়া গণনা করা হইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম, আমরা ঐ ভদ্রমহিলার [illegible] গোপনে সঞ্চিত হইতেছি। এইরূপ স্বচ্ছন্দ [illegible] সেজন্য দুশ্চিন্তা হইল। কারণ বাহির হইলে সুন্দর পৃথিবীর এবং অভিনব আবরণ [illegible] অনুভব করিলাম। নিরবচ্ছিন্ন সুগন্ধ ও সুকুমার পরিবেশ অধিককাল আর ভাল লাগিল না। আমি যেন হাঁপাইয়া উঠিলাম।

অবশেষে আমি একদিন মুক্তিলাভ করিলাম। একদা সন্ধ্যাকালে মহকুমা হাকিমের শ্যালক মহাশয় ভগিনীপতির গৃহে পদার্পণ করিলেন। ইঁহার বেশভূষা ও আকার-প্রকার দেখিয়া আমি বুঝিলাম, ইনি যুবক। কয়েকদিন পরে সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে তিনি অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিলেন। খুট্ করিয়া তালা-ভাঙ্গার শব্দ হইল। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপে স্থানভ্রষ্ট হইয়া শ্যালক মহাশয়ের হাফ্‌প্যান্টের গন্ধযুক্ত পকেটে আসিয়া আশ্রয় লইলাম, তাহাতে আমার তাৎকালিক অধিকারীর হস্তনৈপুণ্য অনুভব করিয়া গৌরববোধ করিলাম।

কিন্তু আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ছিল। শ্যালক মহাশয় আমাদের লইয়াই নিকটবর্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে ছুটিলেন। তাঁহার টিকেট ক্রয়ের মূল্যস্বরূপ তিনি

কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য মানব সমাজে আগ্রহের কিছুমাত্র কমতি হয় নাই। আমার পদমর্যাদা সমভাবেই রহিয়াছে, দেখিলাম।

বম্বের মহাজন সত্যই একজন 'মহাজন' ব্যক্তি। তাঁহার উদরের চক্রে আমারই মত নিখুঁত। তাঁহার আবাস রাজপুতানায়। তিনি শুনিলেন, নূতন রাজার আমলের টাকায় রূপার নাকি খাদ বেশি। তাই তিনি যতগুলি পুরাণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন লইয়া মহাবীরজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশে রওনা হইলেন। আমি তাঁহার বিশাল পেটিকায় স্থান লাভ করিলাম।

গৃহে গিয়া এই মহাজন একটি অন্যায় কর্ম করিলেন। তাঁহার ভদ্রাসনের উত্তর-পূর্বকোণে একটি মহাবীরের মন্দির রহিয়াছে। মন্দিরের ঈশান কোণে একটি ছোট পাথর এক লৌহ দণ্ডের সাহায্যে খুলিয়া ফেলা যায়। সেই পাথর খুলিলেই দেখা যাইবে একটা পুরানো সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলেই একটি অল্প-পরিসর গুপ্ত-কক্ষ। সেই গুপ্ত-কক্ষে বহু ধনরত্নের সঙ্গে আমিও রক্ষিত হইলাম। তদবধি এই রৌদ্রবাতাসহীন এই নরকতুল্য স্থানে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি। তোমাদিগকে সন্ধান বলিয়া দিলাম, যদি কেহ পারো, আমাকে উদ্ধার করিও। আমার সঙ্গে আর যাঁহারা আছেন, এখানে যদি আসিতে পারো, সকলেই তোমাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছে।

আমি যদি রাজা হইতাম

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, রাজা হইবার জন্য আমার মধ্যে অকস্মাৎ যে একটা দুর্বার ক্ষাত্রপৌরুষ স্বপ্নোত্থিত বীরের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মোটেই নয়। ভারতসম্রাটের তরফে যে সব রাজপুরুষ এইপ্রকার উচ্চাশাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সন্ধানে সর্বদা আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া কষ্ট পান, আমি তাহাদের কেহ নই। আমার দিক হইতে বিপদ ও তাহাদের দিক

হইতে ঝামেলা বাঁচাইবার জন্য—এই কথা পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করা বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

ভাবিয়া দেখিতে হইবে আমাদের আজকালকার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-তাপ-তপ্ত দিনের পর যে রাত্রিমান আসে, উহা আদৌ আরব্য রজনী নয়। আর আমাদের আনাচে-কানাচে যে সব রাজপুরুষ গোপনে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা কেহই বোগদাদের খলিফ হারুন-অল-রশীদের ন্যায় মনোবৃত্তি-সম্পন্ন নন। যদি হইতেন, তবে বর্তমান জল্পনা-কল্পনার ফলে হয়ত নিশাশেষে আবু হোসেনের ন্যায় সপ্ততীর্থ-সলিলে স্নাত হইয়া রাজদণ্ড হস্তে লইয়া পুরাপুরি রাজকার্য পর্যালোচনায় জীবনের চরম চব্বিশটি ঘণ্টা চরম নৈপুণ্যের সঙ্গে কাটাইতাম,—একটি মুহূর্তও অবহেলায় কাটাইতাম না। আর ইতিহাসে এই একটি দিনের কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া থাকিত।

কিন্তু আরব্য উপন্যাসের যুগ কাটিয়া গিয়াছে। সংসারেরও কাটিয়াছে, আমার জীবনও কাটিয়াছে, তবু অকস্মাৎ যখন বিশ্ববিধাতা একটা অতুল রাজসম্পদের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া লাভ নাই। চেষ্টা করিয়া দেখিলে, আর কি অর্ধঘণ্টার জন্যও জীবনে আমার সেই আরব্য রজনীর অপরূপ রহস্যের উতল হাওয়ার সাড়া, শুভমান মুহূর্তগুলি ফিরাইয়া আনিতে পারিব না? পরীক্ষাগৃহে লেখনীহস্ত নীরব কর্মরত প্রতিযোগী বন্ধুদের কথা, পরীক্ষার আকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া যাইব, কাননে আবার প্রভাতের হাওয়া বহিবে, উষার অস্পষ্ট অরুণালোকে জীবনের কর্মজীবনের সমস্ত কাহিনীগুলা অপরূপ রহস্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। সঙ্গীরা সব কোটালপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, সদাগরের পুত্রে পরিণত হইয়া উঠিবে এবং তাহার মধ্যে বিগত জীবনের গৌরবময় দিগ্বিজয় কাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস পিছনে লইয়া আমি নিঃশঙ্ক নিঃসপত্ন রাজ্যসুখের অধিকারী হইব।

পূর্বাকাশ নবারুণরাগে রঞ্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বারে ভৈরবী রাগিনীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিবে। বৈতালিকগণ গৌরবোচ্ছ্বসিত ভাষায় মহারাজের বন্দনাগান করিবে। আমি প্রাতরুত্থানপূর্বক সর্বপ্রথম জবাকুসুমবর্ণ উদীয়মান দিবাকরকে বন্দনা করিব। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সভাপরিচ্ছদে ভূষিত হইব। সভাঘোষগণ রাজার সভাপ্রবেশ বার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা

করিতে থাকিবে। বন্দিগণ রাজার গৌরবগীতি গাহিতে থাকিবে। সভায় প্রবেশ করিয়া মহারাজ রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। গুণীদের ও অমাত্যদের যথাযোগ্য আসন ও সম্ভাষণ বিধানপূর্বক রাজা রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে থাকিবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়ের সজ্ঞ যেন রাজার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

রাজার আচরণ সর্বতোভাবে আভিজাত্য গৌরবে মণ্ডিত হইবে। যে কপট আভিজাত্যের গাম্ভীর্য হৃদয়ের সর্বাধিক প্রকাশকে পীড়িত ও সঙ্কুচিত করে তাহা আমার অভিপ্রেত নয়। সম্পূর্ণাঙ্গ হৃদয়ের সমগ্র অভিব্যক্তি যেন সুরুচির সহজ কৌলীন্যে গভীর একটা অসামান্য গভীরতা ও বিশালতা লাভ করিবে। হৃদয়ের উদারতা ও মহানুভবতা প্রত্যেকটি আচরণেও সহজ প্রকাশ লাভ করিবে। রাজার সৌজন্যে প্রজা-সাধারণ পরিতুষ্ট, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজশক্তি ঈর্ষাযুক্ত ও শত্রুরাষ্ট্র আতঙ্কিত থাকিবে।

প্রত্যেকটি রাজকার্য এবটি রাজার প্রত্যেকটি আচরণের চতুর্দিকে অনুক্ষণ একটি অনির্বাচ্য রহস্যের জাল বিরাজ করিবে। রাজার অভিষেক পূর্ব জীবনের গৌরবময় ইতিহাসের রহস্য-জটিল ভাব রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী আচরণে ক্ষুণ্ণ হইবে না। বেঙ্গমা, বেঙ্গমী, রাক্ষস, দানা, দৈত্য, শালবেতালের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ অসম্ভব নয়। রাজশক্তির চতুর্দিকে একটা অলৌকিকতা ইহাকে সর্বদাই লৌকিক লঘুতা হইতে দূরে রক্ষা করিবে।

আমার রাজ্যে দীনদুঃখী কেহই নাই। কাজেই উঁহাদের দুঃখ দূর করিবার প্রকাণ্ড ঝামেলা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। বস্তুতঃ কাহারও দুঃখ দূর করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। মাঝে মাঝে পররাষ্ট্রের আক্রমণটা চাই। রক্ষাব্যবস্থার চর্চা না থাকিলে শক্তির অস্তিত্বটাই যেন একটা সন্দেহজনক ব্যাপার হইয়া উঠে। কাজেই যুদ্ধ-বিগ্রহ মাঝে মাঝে থাকিবে।

হায়! আরব্য উপন্যাসের সেই মনোহর রাজ্য হইতে আমরা চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হইয়াছি। যেদিন কল্পনায় শুধু সৌন্দর্য আসিত, সংসারে বিঘ্ন কোথাও ছিল না,—সে দিন রাজার জীবনটা কি মোহময়ই না মনে হইত। মনে হইত সংসারের সকল সৌন্দর্য যেন তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া রাজার জীবন গড়া ছিল। আজ কঠিন সংসারের সম্মুখীন হইয়াছি। বুঝিয়াছি রাজার গলায় শুধু মুক্তামালা, শিরে লঘু ভার শুভ্র উষ্ণীষ থাকে

না—মণিখচিত মুকুট মাঝে মাঝে বড়ই গুরুভার হইয়া উঠে। সেই গুরুভারে সংসারে কত রাজার মস্তক ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। জীর্ণ কুটীরে কুটীরে মহারাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা করিতেছে।

ধূলার সংসারে রাজার শক্তি, তাঁহার জীবনের দুর্বিপাক যাহা থাকে থাকুক। কিন্তু কল্পনার তুলিতে শৈশবের মোহময় যে অপরূপ রাজার মূর্তি হৃদয়ের পাটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যের সংসারে তাহার দাবী চিরন্তন হইয়া থাকুক। মণিময় তাহার প্রাসাদচূড়া নবারুণ ছটায় চিরদিন চিক্কণ হইয়া থাকুক। প্রখর মধ্যাহ্নের কর্মচঞ্চল ধূলিজালে তাহা না-ই বা আচ্ছন্ন হইল।

আবুহোসেনকে বাদশাহ হারুন্-অল্-রশীদ পুরা একটা দিনের বাদশাহী দিয়াছিলেন। বিধাতা আমায় মাত্র অর্ধঘণ্টার এই যে বাদশাহী দিয়াছেন, তাহাতে ভৈরবী অভিষেকের শেষ হইতে না হইতেই বিদায়-প্রভাতের পূরবী বাজিয়া উঠে। তবু ইহা সত্য। তবু মেঘমেদুর আকাশে গুরুগুরু মেঘগর্জন শৈশবের যে মোহজাল হৃদয়ে বিস্তার করে, জীবনে তাহা মিথ্যা নয়। বুক দিয়া যাহার মূল্য খুঁজিয়া পাই না,—হৃদয় ভূমিতে সে সংস্কারের সহস্র শিকড় মেলিয়া বিরাট বনস্পতির ন্যায় জীবনকে ছায়া ও আশ্রয় দান করে। তাই স্বীকার করিতে দুঃখ নাই, মাঝে মাঝে এক স্বপ্নের বার্তা আমার পৃথিবীতে নামিয়া আসে। সেখানে আমি রাজা। তারপর সে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। তখন সেই স্বপ্নের অসন্তোষ হৃদয় কেবলই মনে আঘাত করে, আর অস্পষ্ট শব্দে বলিতে থাকে —'আমি যদি রাজা হইতাম'।

———

ডাক বিভাগ

[চিঠি-পত্র প্রেরণের প্রাচীন ব্যবস্থা ও তাহার অসুবিধা—চিঠি-পত্রের যাত্রা-পথ—প্রেরণের ব্যয়—বিভিন্ন বিভাগ ও তাহাদের কর্মপ্রণালী—উপসংহার।]

ইংরাজ সরকারের শাসনে ভারতবর্ষে যে কয়টি শুভ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, ডাক-বিভাগ তাহার মধ্যে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নয়। পূর্বে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। উহাতে এত অর্থ ব্যয় হইত যে, উহা ধনবান লোকের একটি বিলাসের ব্যাপার বলিয়াই বিবেচিত হইত—দরিদ্র ব্যক্তিদের চিঠি-পত্র লিখিবার আশা একেবারে সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু, এখন মাত্র তিনটি পয়সা ব্যয় করিলেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে-কোন স্থানেই পত্র প্রেরণ করা যায়। পূর্বে পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে ভাড়াটিয়া পত্রবাহক নিযুক্ত করিতে হইত। অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ পত্রবাহক সরকার হইতে নিযুক্ত থাকিত। এই ব্যবস্থায় পত্রখানি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত। বিপদসংকুল পথে পত্রগুলি লইয়া পত্রবাহক যে সর্বদাই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিত, তাহাও নয়।—শেষ পর্যন্ত হয়ত পত্রগুলি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিত না, পথেই নষ্ট হইত। জরুরী সংবাদ প্রেরণ করা ত চলিতই না, কিন্তু ইংরাজ সরকার ডাক-বিভাগের প্রবর্তন করিয়া, এই অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়াছেন। অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প সময়েই আজ নিকটে ও দূরে সর্বত্রই পত্রে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতেছে। দূর যেন আজ নিকট হইয়াছে,—প্রবাসের ক্লেশ যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

চিঠি পত্র ও প্রেরিত দ্রব্যের 'পার্শেল'গুলি বিভিন্ন যান-বাহনের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। 'রানার' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী আছে। উহারা চিঠি-পত্র ও পার্শেলের থলে ঘাড়ে করিয়া সাধারণতঃ তিন-চারি মাইল দূরবর্তী কোন বড় ডাক-ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। পথে কোন নদী বা খাল অতিক্রম করিতে হইলে, সেখানে ডাক-বিভাগ হইতে খেয়া-নৌকার ব্যবস্থা থাকে। রেল বা ষ্টীমারের পথ হইলে ত আর কথাই নাই। চিঠি-পত্র উহার

সাহায্যে অতি শীঘ্র উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে। এইরূপে ডাক-বিভাগ আজ দেশ ও কালের দূরত্ব জয় করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতের যে-কোন স্থানে আজ—বড় জোর দুই-তিন দিনের মধ্যে—পত্রাদি পৌঁছিতে পারিতেছে।

ডাক বিভাগে সরকারের আয় নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সাধারণ লোকের পত্রাদি প্রেরণ করিতে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য। এই ব্যয়ের সহিত ডাক বিভাগের দ্বারা দেশবাসী যে পরিমাণ উপকার লাভ করিতেছে, তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে ব্যয়ের কথাটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। ডাক বিভাগ যে দেশবাসীর কতই উপকার করিতেছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। নিরক্ষর শ্রমজীবীও ডাক বিভাগের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করে না। ইংরাজ সরকার ভারতে যতগুলি শুভকার্যের প্রবর্তন করিয়াছেন, ডাক বিভাগের মত এতটা জনপ্রিয় আর কিছুই হয় নাই। দেশবাসী সরকারের প্রত্যেকটি বিধি-ব্যবস্থা প্রথমে বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, অজ্ঞ শ্রমজীবীদের ত কথাই নাই। কিন্তু ডাক বিভাগকে সকলেই একবাক্যে পরম উপকারী বন্ধুর ন্যায় গ্রহণ করিয়াছে। সমুদ্র হইতে সূর্য যেমন কিঞ্চিৎ জল শোষণ করিয়া উহা বর্ষার জলধারায় শতগুণে ফিরাইয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জগদ্বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, ডাক বিভাগও ঠিক তাহাই। দেশবাসীর নিকট হইতে অতি সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া ডাক বিভাগ উহার সহস্রগুণ ফিরাইয়া দিতেছে।

ডাক বিভাগের মধ্যে অনেকগুলি শাখা আছে—মনিঅর্ডার, রেজিষ্ট্রেশন, সেভিংস ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি। মনিঅর্ডার বিভাগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে অর্থ প্রেরণের বন্দোবস্ত আছে। ডাক বিভাগ অতি অল্পমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ, যত দূরেই হউক, অতি সত্বর পৌঁছাইয়া দেয়। 'রেজিষ্ট্রেশন' বিভাগ ও 'ইন্সিওরেন্স' বিভাগে জিনিষপত্র দূর দেশে পাঠাইবার সুব্যবস্থা আছে। যাহাতে প্রেরিত জিনিষগুলি যথাযথ ঠিকানায় নির্বিঘ্নে পৌঁছে ডাক বিভাগ তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। পথিমধ্যে অভাবনীয় কারণে কোন জিনিষ নষ্ট হইয়া গেলে, ডাক বিভাগ তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' মিতব্যয়িতায় উৎসাহ দিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের দরিদ্র শ্রমোপজীবীরা যাহাতে দুই পয়সা জমাইয়া রাখিতে পারে এবং ঐ সঞ্চিত অর্থ ডাক বিভাগের সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে

পারে, গভর্ণমেণ্ট শুধু সেই উদ্দেশ্যেই সেভিংস ব্যাঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিভাগে আমানতী টাকার যৎসামান্য সুদ হিসাবে দিবার ব্যবস্থাও আছে। 'টেলিগ্রাফ'ও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ। সকল পোষ্ট অফিসে টেলিগ্রাফ করিবার ব্যবস্থা নাই, তবে দূর দেশ হইতে টেলিগ্রাফে কোন খবর আসিলে, যাহাতে ঐ খবর অতি ক্ষিপ্রভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা সকল পোষ্ট অফিসেই আছে। আজকাল বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ হওয়ায়, গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট অফিসের মধ্য দিয়া অতি অল্প মূল্যে কুইনাইন বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

এইরূপে ডাক বিভাগ আধুনিক জীবনযাত্রার সহিত অতি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বিভাগের কর্মচারীরা অধিকাংশই দেশীয়। সুতরাং দেশের অনেক লোক এই বিভাগে কর্ম করিয়া জীবিকা সংস্থান করিতে পারিতেছে। এমন সুপরিচালিত বিভাগ সরকারের পরিচালনায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশবাসীর হৃদয়ে ডাক বিভাগ অতি গভীর বিশ্বাস ও প্রীতির সঞ্চার করিয়াছে।

শহরের ধোঁয়া

আধুনিক জগতে ধোঁয়ার সৃষ্টি নানা কারণে হয়। প্রাচীনকালে এত কলকারখানা ছিল না, সেইজন্য ধোঁয়ার প্রাধান্যও এত ছিল না। কেবলমাত্র অপরিহার্য রন্ধন কার্য সমাধা করিবার জন্য যেটুকু পরিমাণ ধোঁয়ার সৃষ্টি হইত উহা অতি অস্পষ্ট। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যতই সভ্যতার চরম শিখরে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে সহরে কলকারখানার প্রসারও হইতেছে অদ্ভুত রকমের। বেশী ধোঁয়া হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ।

কলিকাতা মহানগরী ভারতের প্রধান সহর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের প্রসারের ফলে এখানে নানা প্রকারের কলকারখানার সৃষ্টি হইতেছে। সেই কারণে ধোঁয়াও একটু একটু করিয়া বাড়িতে শুরু করিয়াছে। এই সমস্ত কলকারখানার সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় এখনকার মত এত আইন-কানুন ছিল না। কিন্তু এখন বেশী আইন-কানুন হইলেও কলিকাতার

ভিতরে এবং বাহিরে এরূপভাবে কারখানা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে যে উহাদের কোথাও উঠাইয়া না দিলে ধোঁয়ার আধিক্য মোটেই কমিবে না।

শুধু কারখানার উপর দোষ চাপাইলেই হইবে না। কলিকাতায় এখন লোকের বসবাস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের রন্ধন কার্যের জন্য ধোঁয়ার সৃষ্টি বেশ হয়। পূর্বে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার হইত কিন্তু এখন সস্তায় কাঁচা কয়লা ব্যবহার হইতেছে, উহাতে যে পরিমাণ ধোঁয়া হইতেছে তাহা অবর্ণনীয়। মহার্ঘতার যুগে না হয় বুঝিলাম সস্তায় কার্য সমাধা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ধোঁয়া অপসারণের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন সেরূপ সুবন্দোবস্ত আদৌ নাই।

ইহা ছাড়া ভাগীরথীর বুকে বাণিজ্য জাহাজ, ষ্টীমার, লঞ্চ প্রভৃতি অবিরাম চলাচল করিতেছে, উহাতেও ধোঁয়ার সৃষ্টি কম হয় না।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া বন্ধ রাখিতে হইবে এমন কথা কেহ বলিবে না। তবে তাই বলিয়া কি সব অত্যাচার করিয়া আবহাওয়া দূষিত করিয়া সহিতে হইবে? না তাহা নয়। সব কিছু বাঁচিয়া জনস্বাস্থ্য যাহাতে না নষ্ট হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার জন্য আবশ্যক সরকার, কর্পোরেশন, সহরের অধিবাসী এবং কলকারখানার মালিকগণের সহযোগিতা।

এই ধোঁয়ার কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সমস্ত কলকারখানাগুলি সহরতলীতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কলকারখানাগুলি এরূপভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে ধোঁয়া চিমনীর মধ্য দিয়া বহু উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া যায়। প্রত্যেক বাড়ীতেও চিমনীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে এক বাড়ীর ধোঁয়া অন্য বাড়ীতে যাইতে পারিবে না। ধোঁয়া স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিয়া গেলে বাড়ীর জিনিসপত্র নষ্ট হইবে না, নানাবিধ গুরুতর রোগের আক্রমণ আশঙ্কাও থাকিবে না, শহরের অপরিচ্ছন্নতা কমিয়া যাইবে। শহরের বস্তিগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলা সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি দপ্তর খুলিয়াছেন। কোন মিল বা কারখানার মালিক ধোঁয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইলে এই দপ্তরে গিয়া খবর জানাইলে উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

একটি সৎ-সাহসের দৃষ্টান্ত

[সময় ও স্থান—যে ঘটনার জন্ত সাহস প্রদর্শনের অবকাশ ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা।]

গঙ্গানদীর সবুজ তৃণাস্তীর্ণ সুন্দর তটভূমি সেদিন প্রভাতসূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বৈশাখের পবিত্র মহাবিষুবা-স্নান-দানাদি উপলক্ষে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইয়াছে। এইখানে গঙ্গানদী বেশ প্রশস্ত। ওপারের তালগাছগুলির ফাঁক দিয়া সুদূর গ্রামখানি ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নদীর উপর অতি দূরে একখানি জেলে-ডিঙ্গি ভাসিয়া চলিয়াছে।

সকাল হইতেই বেশ জোরে বাতাস বহিতেছে। বাতাসের গতির ঠিক নাই। কখনও উত্তর হইতে দক্ষিণে, কখনও বা পশ্চিম হইতে পূবে বাতাস বহিতেছে। সেই বায়ুপ্রবাহে নদীবক্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি হইতেছে। আমরা নদীতীরে একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছি। আমার বন্ধু গণেশ, শচীন, রাজেন এবং যতীনও আমার সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে। ধর্মনিষ্ঠ পুণ্যলোভাতুর স্নানার্থিগণের কোলাহলে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুদূরে গঙ্গার একটি বাঁক উত্তর-পথে ঘুরিয়া গিয়াছে। সেই মোড় ঘুরিয়া একখানি নৌকা আমাদের দিকে আসিতেছে, দেখিতে পাইলাম। নৌকাখানি ছৈ-যুক্ত। দূর হইতে নৌকাখানিকে বেশ 'বোঝাই' বলিয়া মনে করিলাম। সেই উত্তাল-তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া অতি সন্তর্পণে নৌকাখানি অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় নৌকাখানি নদীবক্ষে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। তবে মাঝিটি নিপুণ। সে অতিকষ্টে কোনমতে সামলাইয়া লইতেছে। নৌকাখানি তখন একেবারে মাঝ নদীতে। মাঝি তীরে পৌঁছিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। আমরা বুঝিলাম, উহা একখানি যাত্রীর নৌকা। হয়ত নৌকার মধ্যে অনেক যাত্রী আছে। আমাদের দেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই তীর্থযাত্রার সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের সঙ্গে আনিয়া বিশেষ অবিবেচনার কাজ করেন। ভিড়ের মধ্যে এইসব বালক-বালিকারা যে কি কষ্ট পায়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহারা সে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। নদীবক্ষে সেই বিপন্ন নৌকাখানি দেখিয়া

আমরা মনে করিলাম, হয়ত ইহার মধ্যেও অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আছে। যদি নৌকাখানি কোনমতে নদীগর্ভে নিমগ্ন হয়, তবে সেই সব বালক-বালিকাদের জীবন-সংশয় ঘটিবে। এইরূপ মনে করিয়া আমরা ভয়ে ভয়ে নৌকাখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

এমন সময় পশ্চিম দিক্ হইতে একটি দমকা বাতাস বহিল। মাঝি অতিকষ্টে নৌকাখানি সামলাইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটি দমকা বাতাস বহিল—তারপর আর একটি। মাঝি নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিয়া সেই অগতির গতি শ্রীভগবানের নাম করিতে লাগিল। নৌকামধ্য হইতে ভয়ার্ত নরনারীদের করুণ আর্তনাদ যুগপৎ উত্থিত হইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি নদীগর্ভে ডুবিয়া গেল।

চোখের পলক পড়িল না। আমাদের বন্ধু গণেশ কোমরে কাপড় বাঁধিয়া বীরের ন্যায় নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিপন্নদের উদ্ধার করিতে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের মনেও অসীম সাহসের সঞ্চার হইল। বলিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আমরা চারি বন্ধুতে মিলিয়া একসঙ্গে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। গণেশ আগে সাঁতার কাটিয়া চলিল। আমরা চারিজন তাহার অনুসরণ করিলাম।

চারিদিক হইতে অতিকায় দৈত্যের মত তরঙ্গগুলি যেন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু আমরা তখন যেন অনন্ত সাহসের বলে বলীয়ান্ হইয়াছি। তীর হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে নৌকা ডুবিয়াছিল। আমরা সেইখানে সাঁতার কাটিয়া উপস্থিত হইলাম। যে যাহাকে পাইলাম, হাত ধরিয়া তীরের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিলাম। নৌকায় প্রায় দশ-বারোজন যাত্রী ছিল। তন্মধ্যে তিন-চারিজন নিজেরাই সাঁতার কাটিয়া নির্বিঘ্নে তীরে গিয়া পৌঁছিল।

যাহারা সাঁতার কাটিয়া তীরে পৌঁছিতে পারিল না, আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। এক-একজনকে তীরে রাখিয়া আসিয়া আবার আর একজনকে সাহায্য করিবার জন্য পুনরায় নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলাম। আমাদের উৎসাহের যেন সীমা ছিল না।

এইরূপে প্রায় সকলেই নিরাপদে নদীতীরে পৌঁছিল। শুধু একটি দশ বৎসরের মেয়ে তখনও আসিতে পারে নাই। আমাদের বীর-বন্ধু গণেশ উহাকে

লইয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমরা চারিজনের প্রায় প্রত্যেকেই দুই-তিন বার তীর হইতে নদীবক্ষে যাতায়াত করিয়াছি, সেজন্য সেই সময় আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু গণেশ চারিবার যাতায়াত করিয়াছিল। সে সাহসে-শক্তিতে সর্বদাই আমাদের অগ্রণী ছিল। কিন্তু এবার সেও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বালিকাটিকে লইয়া সে যেন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। এক-এক ক্রোধোদ্ধত তরঙ্গমালা তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছিল। অমিত ধৈর্য ও সাহসের সহিত গণেশ আবার সেই তরঙ্গ অতিক্রম করিতেছিল। কিন্তু আর যেন পারে না। আমাদেরও দেহে বা মনে তখন আর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যে, তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হই। সমবেত নরনারীরা চিত্রপুত্তলির ন্যায় তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই বীর ও আর্ত বালিকাকে সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। কিন্তু ভগবানের অপরিসীম করুণায় এ সময়ে একখানি কাঠের গুঁড়ি ভাসিয়া যাইতেছিল। উহা অবলম্বন করিয়া গণেশ সেই মৃতপ্রায় বালিকাটির সহিত নদীবক্ষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। তারপর শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে পুনরায় তীর লক্ষ্যে সাঁতার কাটিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই তীরে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সমবেত দর্শকগণের তুমুল জয়-ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। সকলেই এই বীর বালককে আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিল। আমি এই বীর বালকের সহচর হইয়া যে সৎকার্যে যোগ দিতে পারিয়াছিলাম,—ইহা মনে হইলে আজিও আমার হৃদয় গর্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

———

একটি রূপকথা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩]

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ আর তাঁহার ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ বড় গরীব। ভিক্ষা করিয়া কোন মতে দিন চালায়। কোন দিন খাওয়া জুটে—কোন দিন জুটে না। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণী ঘরের কাজ সমস্ত সারিয়া একাকিনী বসিয়া আছেন—ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া চাউল লইয়া আসিলে তিনি চাপাইবেন। দুপুর ঘুরিয়া গেল, ব্রাহ্মণ আসেন না। ব্রাহ্মণী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার মুখ মলিন। ভিক্ষার জন্য সারাটি দিনমান ঘুরিয়াও কোথাও এক মুঠা চাল পান নাই। তাই খালি হাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কিছুই আনিতে পারিলেন না, দেখিয়া ব্রাহ্মণী চটিয়া আগুন হইলেন। তিনি কত ভাষায় ব্রাহ্মণকে নানারকম ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন, আর এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? তাহার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল—এই রকম ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

ব্রাহ্মণ অন্যমনে চলিয়াছেন। হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। শেষে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন একটি গাছের তলায় বসিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই গাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার ঘুম পাইল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ ঘুমাইবার পর, যখন তাঁহার ঘুমের ঘোর অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছে, তখন গাছের ডালে যেন কাহার কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এখন, সেই গাছে থাকিত এক ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্মদৈত্য গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, 'ওহে ব্রাহ্মণ তুমি কি চাও?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি কিছুই চাই না, মরিতে চাই। অভাবের তাড়নায় আর আমি সহিতে পারি না।' ব্রহ্মদৈত্যের তখন দয়া হইল। বলিল, 'ভাল, মরিও না। আমি যাহা

বলি তাহা কব। তোমার দুঃখ দুব হইবে। এই দা-খানা লইয়া যাও। ঐ যে প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতেছ, এই দা' দিয়া উহাব একটি ডাল কাটিয়া আন। দেখিবে, অনেক লোক তোমাকে বাধা দিতে আসিবে। তুমি তাহাতে ভয় পাইও না, বলিও—আমি মবিতে আসিয়াছি, তোমাদেব ভয় কবি না। তাবপব তোমাকে আব কিছু কবিতে হইবে না।'—এই বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণকে একখানি দা' দিল।

তখন বেশ বাত্রি হইয়াছিল। চাবিদিকে ভীষণ অন্ধকাব। কোলেব মানুষ চোখে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণেব বড ভয় হইল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন,—মবিবে আমাব ভয় কি? আমি তো মবিতে চলিয়াছি। এই ভাবিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই দা-খানি হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ ধীবে ধীবে সেই বটগাছেব কাছে গেলেন। কোথাও জন-মানব নাই। প্রকাণ্ড বটগাছটাব ঘন ডালপাতাব মধ্যে অন্ধকাব যেন জাল পাকাইয়া আছে। চাবিদিক্ নিস্তব্ধ, যেন থম থম কবিতেছে।

ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে গিয়া বটগাছেব একটা নীচু ডালে একটা কোপ মাবিলেন। আব কোথায় যাইবে? চাবিদিক হইতে যেন হুড়মুড কবিয়া কাহারা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সেই বটেব ডাল-পাতাগুলি ছিঁড়িয়া, ভাঙিয়া যেন একটা ঝড বহিল। যেন বজ্রেব শব্দ শোনা গেল। ব্রাহ্মণ ভয়ে একেবাবে জড়সড হইয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন, বুঝিলেন, ইহাবা ভূত। এই বটগাছে অনেক ভূতেব বাসা।

একটা বিকট ভূত কাছে আসিয়া নাকি সুবে বলিল, 'তুই কি চাস? মবিবাব ভয় বাখিস না, যে আমাদেব গাছেব ডাল কাটিতে আসিয়াছিস্?' ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'না, আমি মবিতে ভয় কবি না। মবিবাব জন্যই আমি আসিয়াছি। তোমবা আমাকে মাবিয়া ফেল।'

এই সময় সেই ব্রহ্মদৈত্যও সেখানে আসিয়া হাজিব হইল। সে আসিয়া এক কোণে ভূতগুলিকে সাবধান কবিয়া দিল, বলিল, 'এই ব্রাহ্মণ বড গবীব। কষ্টে পডিয়া মবিতে চলিয়াছে। এ ভাল লোক। তোমবা ইহাকে একটু সাহায্য কব।' তখন তাহাবা ব্রাহ্মণকে এক কলসী ধান ও এক কলসী চাউল দিয়া বলিল, 'এই চাউল তুমি বাঁধিয়া খাইও। আব এই ধানগুলি তুমি

গাঁয়ের মাঠে কাল সকালেই বুনিয়া দিও। আর কাল রাত্রে যেমন করিয়া পার একশ'খানি কাস্তে আনিয়া এই গাছতলায় রাখিয়া যাইও।

ব্রাহ্মণ তখন খুব খুসী হইলেন। তিনি চাউল ও ধানের বস্তা দুইটা মাথায় তুলিতে গেলেন, কিন্তু দুইটা বস্তাই এমনি ভারী যে তাহার একটাও তিনি তুলিতে পারিলেন না। দেখিয়া একটা ভূত বলিল, 'বেশ, তুমি বাড়ী চলিয়া যাও। আমরা বস্তা দুইটি তোমার বাড়ীতে রাখিয়া আসিব।' ব্রাহ্মণ তখন আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলিলেন। যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণীর মনে বড় অনুতাপ হইয়াছিল। প্রথম তিনি নানা জায়গায় ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া বেড়ান, শেষে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণ বাড়ী গিয়াই দেখিলেন, দরজার কাছেই সেই বস্তা দুইটি পড়িয়া আছে। দেখিয়া ব্রাহ্মণের আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া তুলিলেন। তারপর দুইজনে মহানন্দে বস্তা দুইটিকে ঘরে তুলিলেন।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণ ধানের বস্তাটি মাথায় করিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন। চারিদিকে খোলা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ধানগুলি সেই মাঠে ছড়াইয়া দিয়া আসিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণী মনের সুখে ভাত রাঁধিয়া ব্রাহ্মণের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিলেন, তারপর সেই ভাত খাইলেন, খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ ঘুমাইলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন, সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। তিনি তাড়াতাড়ি মাঠের দিকে ছুটিলেন। মাঠে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। এই একদিনের মধ্যেই সারামাঠে ধানের গাছ হইয়াছে, সেই গাছে প্রচুর ধান হইয়াছে, ধান পাকিবারও আর বেশী দেরী নাই। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, রাত্রির মধ্যেই ধান খুব ভাল রকমে পাকিয়া যাইবে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া প্রতিবেশীদের নিকট হইতে একশ'খানি কাস্তে চাহিয়া আনিলেন, কিন্তু ধানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

তারপর ব্রাহ্মণ সেই একশ' কাস্তে লইয়া তাড়াতাড়ি হাটিয়া সেই বটগাছের তলায় আনিয়া রাখিলেন, আর ভূতদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'এই একশ' কাস্তে রাখিয়া গেলাম।' ভূতেরা বলিল, 'আচ্ছা যাও।'

ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া রাত্রিতে আবার আহার করিলেন, তারপর বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এদিকে ভূতেরা সেই একশ' কাস্তে লইয়া তখনই মাঠে গেল। তারপর সেই ধানগাছগুলি কাটিয়া আটি বাঁধিয়া ব্রাহ্মণের বাড়িতে আনিয়া ফেলিল। শুধু তাই নয়, তাহারা সেই গাছ হইতে ধানগুলিও ছাড়াইয়া একটা গোলা করিয়া তাহাতে তুলিয়া রাখিল, আর খড়গুলিও পৃথক করিয়া গুছাইয়া রাখিল। সেই প্রকাণ্ড গোলায় দশহাজার মণ ধান রাখা হইল। তারপর ভূতেরা কাস্তেগুলি রাখিয়া তাহাদের গাছে ফিরিয়া গেল।

পরদিন বিছানা হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এই দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। তাহাদের আর আনন্দ ধরে না। তাহারা একরাত্রেই দশহাজার মণ ধানের মালিক হইয়া গেলেন। সেই দিন হইতেই তাহাদের সকল দুঃখ দূর হইল। ব্রাহ্মণ আর ভিক্ষা করিতে যাইতেন না। ধান বিক্রয় করিয়া তিনি কোঠাবাড়ী প্রস্তুত করিলেন, ব্রাহ্মণীর গহনা গড়াইয়া দিলেন। তারপর দুইজনে মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

আমার বাঞ্ছিত জীবিকা

[সূচনা—বাঞ্ছিত জীবিকা—এরূপ জীবনোপায় নির্বাচনের কারণ—এরূপ উপায়ে নির্বাচিত জীবনযাত্রার চিত্র—উপসংহার।]

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬, ১৯২৮, ১৯২৯]

মানুষ যাহা আশা করে, তাহা সর্বদাই যে সফল হয় এমন নয়। তবু মানুষ আশা করে। আমারও জীবনে নানাপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। তবে সেগুলি স্বপ্নের মতই মোহময়, তাই সেগুলিকে গোপন রাখিতেই ভালবাসি। কারণ, আমার জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অযোগ্যতা আমি তো জানিই—আর পাঁচজনেও কতকটা জানে। সেই সব দুর্বলতা ও অযোগ্যতার পার্শ্বে আমার স্বপ্নটিকে আনিয়া দাঁড় করাইলে, অসঙ্গতিটা খুব বড় করিয়া চোখে পড়ে। তাই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে একটা সলজ্জ সুখের

আবরণ দিয়া আমার জীবনের স্বপ্নটি ঢাকিয়া রাখি,—কাহাকেও বলি না। তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে বলিতে হয়।

আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা একটু অদ্ভুত,—আর সকলের সঙ্গে হয়ত তাহা মিলিবে না। আমি খুব বড় লোক হইতে চাই না। খুব বেশী ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ীর কামনা আমার নাই। আমি চাই শুধু এমন একটি জীবিকা, যাহা দ্বারা আমি একটি সরল অনাড়ম্বর জীবন পরম সন্তোষের সহিত যাপন করিতে পারিব। সেই জীবিকা মানব জীবনের সত্য সাধনায় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে না। আমার পেটের অন্ন যোগাইতে যেন মনের বিরুদ্ধে কাজ না করিতে হয়, ইহাই আমি চাই।

আমার কাজটা এমন হইবে, যাহাতে আমার সাংসারিক প্রয়োজনের উপযোগী অর্থ মিলিবে, কিন্তু উহাই সব হইবে না। অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ কর্মের সহিত আমার কৃতিত্ব ফুরাইবে না। আমি যদি একটি সুযোগ্য শিক্ষক হইতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। এ সংসারে এমন কাজ আর কি আছে? এই বৃত্তি অন্ন দিয়া আমাকে এবং আমার আপনার জনকে বাঁচাইয়া রাখিবে, কিন্তু তাহার জন্য আমি যাহা করিব, অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে না। ছাত্রগণকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, তাহাদের মঙ্গল-চিন্তা করিব, তাহাদের চিত্তোন্নতির জন্য আমি দিবা রাত্র পরিশ্রম করিব।

এ সংসারে তাহাই অতি অধম বৃত্তি, যাহাতে মানুষকে শুধু অর্থের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হইয়া থাকিতে হয়। মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশিবে, ইহা কি এতই একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার যে, কিছু অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমস্তই শেষ হইয়া যাইবে? আমার বাঞ্ছিত বৃত্তিটিতে ইহা হইবার উপায় নাই। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠে, উহার ন্যায় মধুর ও উদার সম্বন্ধ আর কি হইতে পারে? ছাত্রের হৃদয়ে সুযোগ্য শিক্ষকের যে স্মৃতিটি বাঁচিয়া থাকে, তাহার মধ্যে স্বার্থের নামগন্ধ নাই,—ভক্তি আছে, প্রীতি আছে, কিন্তু আরও একটি বস্তু আছে, তাহাই সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহা সংস্কৃতি বা culture-এর সংস্পর্শ। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের যে সম্পর্ক, উহা সংস্কৃতির সম্পর্ক। শিক্ষক সম্বন্ধে সবগুলি স্মৃতিই এই সংস্কৃতির আবহাওয়ায় অসাধারণ ও উদার হইয়া থাকে।

শিক্ষকতার কার্য করিলে, আমার অনেকটা অবসর থাকিবে, সন্দেহ নাই। ঐ অবসর আমি পারিবারিক শান্তির মধ্যে কাটাইয়া দিয়া সুখী হইব। আমার পারিবারিক জীবন উপকরণ-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হয়, ইহা আমি চাই না। শিক্ষকতার বৃত্তি আমাকে এই সাহায্য করিবে। কারণ, শিক্ষকতা করিয়া আমি এত অধিক অর্থ পাইব না, যাহা আমার মনে অপব্যয়ের প্রলোভন জাগাইয়া দিতে পারিবে। আমার বাসগৃহে অত্যধিক আসবাব-পত্র থাকিবে না। সর্বত্রই একটা অনাড়ম্বর সরল সাত্ত্বিকতা বিরাজ করিবে। আমার জীবন উপকরণ-বহুল না হইলেও উহা নির্মল হইবে। উপকরণের বাহুল্য থাকিলে এই নির্মলতা রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। সেই নির্মলতাকে ব্যাপ্ত করিয়া শিক্ষাব্রতীর পবিত্র জ্ঞান সাধনা, রজনীগন্ধার ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিবে। আমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো ও সাহিত্য-সাধনার আনন্দ সদা বিরাজ করিবে, ইহা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চাশা। মানব সভ্যতার আদিতম কাল হইতে মানুষের যে বিচিত্র বাণী রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আমি উহা পাঠ করিব। আমার বাসগৃহের একটি কক্ষ পুস্তকরাশিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। আমার অর্থের প্রাচুর্য না থাকায়, আমি হাতে পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে কম মূল্যে ঐ গ্রন্থগুলি কিনিবার সুযোগ লাভ করিব। ইহাতে আমার লজ্জা নাই। ঐ বইগুলি আমি উত্তমরূপে পাঠ করিব। শুধু ঘরে আনিয়া সাজাইয়া রাখিব না। আমার লাল পেন্সিলের দাগগুলি পুস্তকের মধ্যে অলংকারের ন্যায় শোভা পাইবে, উহারা সাক্ষ্য দিবে, আর একটি "মনের মাধুরী"তে এই পুস্তক নিবদ্ধ বাণীগুলি মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমার জ্ঞানের ও রস-বোধের গভীরতার নিদর্শন স্বরূপ আমি দুই একটি গ্রন্থ রচনা করিব। ঐ গ্রন্থগুলির দ্বারা মানুষ আমার সত্য পরিচয় লাভ করিবে।

এইরূপে আমার জীবনকে বেষ্টন করিয়া একটি সংস্কৃতিসমৃদ্ধ, নির্মল, অনাড়ম্বর পরিমণ্ডল অনুক্ষণ বিরাজ করিবে। উহা তীব্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইবে না, মানসিক দৈন্যের দ্বারা বেদনাময় হইবে না। চারিদিকে আলো, চারিদিকে সৌন্দর্য, চারিদিকে আনন্দ—দেখিতে দেখিতে আমি পরিতৃপ্তচিত্তে সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিব।

———

একটি ছুটির দিন

[সংকেত :—ছুটির উপলক্ষে—আমোদ-প্রমোদ বর্ণনা—প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির বর্ণনা—উপসংহার।]

মহরম উপলক্ষ্যে একদিন স্কুল ছুটি। রুটিনের মোহ ভারাক্রান্ত আমাদের সারাটি বৎসরের মধ্যে ছুটির দিনগুলি যেন বিদ্যুতের ঝলক। তাই সেদিন ছুটি পাইয়া আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। ভাবিলাম, কি করিয়া এই ছুটির দিনটাকে সার্থক করা যায়।

ছুটির আমোদ উপভোগ করিতে গিয়া জন্ গিলপিনের কি দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা ইংরেজ কবির কবিতায় পড়িয়াছিলাম। কিন্তু বন্ধু রমেন উমা যখন বন-ভোজনের প্রস্তাব করিল আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। আমরা পাঁচটি ভাইবোন, আমার বন্ধু সমীর ও বিমল এই কয়জনে মিলিয়া আজিকার দিনটা বন-ভোজনের অনুষ্ঠান করিয়া কাটাইব, স্থির করিলাম। নদীর তীরে বিনয়দের বাগান-বাড়ি। প্রকাণ্ড নৌকা করিয়া আমরা পনের-ষোলটী প্রাণী সেই বাগান-বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। তখন সকাল সাতটা মাত্র।

সঙ্গে লইলাম চাল, ডাল, কিছু তরি-তরকারী, দা, বঁটি, হাতা, হাঁড়ি, বেড়ি, খুন্তি ইত্যাদি। আমার মেজদা আমাদের সঙ্গে অভিভাবক হইয়া চলিলেন। তিনি কলেজে বি, এ পড়েন। তাঁহার চশমা-পরা গম্ভীর মুখ, নীরব-নিস্তব্ধ ভাব। আমরা সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলি। তিনি আমার বাবার আদেশে আমাদের সঙ্গে চলিয়াছেন। নচেৎ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত তিনি খুব কমই মিশেন।

নদীর কূলে কূলে নৌকা চলিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ নৌকার সহিত আঘাত লাগায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করিতেছে। ওপারে তালগাছের মাথাটা প্রভাত-সূর্য কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বেশ বড় নদী। পর-পারের ছায়াচ্ছন্ন গ্রামখানি ধোঁয়াটে দেখাইতেছে। জেলেরা লম্বা লম্বা ছিপে চড়িয়া মাছ ধরিতেছে। কেহ কেহ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে। আমাদের নৌকা প্রায়

দুই মাইল চলিয়া, একটি ঘাটে গিয়া লাগিল। ইহাই বিমলদের বাগান-বাড়ীর ঘাট। মহা-কোলাহলের সহিত নৌকা হইতে তীরে নামিলাম। বাঁধানো ঘাট, তাহার অনতিদূরে প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃশ্য উদ্যান-বাটিকা। উদ্যান-রক্ষক উড়িয়া মালী আসিয়া তাড়াতাড়ি গেট খুলিয়া দিল। আমরা ভিতরে গিয়া বাগানের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

চারিদিকে ফুলের বাগান। মাঝখানে সুন্দর একতলা বাড়ী। বাগানে গোলাপ ফুটিয়াছে, যুঁইও বেশ ফুটিয়াছে। একপাশে কয়েকটি রজনীগন্ধার ঝাড়। উঠানে একটা শিউলি ফুলের গাছ। ঝরা-ফুলে তলাটি ছাইয়া গিয়াছে। উমা মহানন্দে ফুল কুড়াইয়া কোঁচড় ভরিতে লাগিল। আমরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। নিজেদেরই যে আহারের আয়োজন করিতে হইবে, আর সেইজন্যই যে এখানে আসিয়াছি, তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি, ছোট রান্নাঘরটিতে মেজদা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন। ইহারই মধ্যে নদীর ধারে গিয়া জেলেদের নিকট হইতে তিনি প্রকাণ্ড একটা কাৎলা মাছ কিনিয়া আনিয়াছেন। আমাদের চাকর সেই মাছটা কাটিতেছে।

আমরা নদীর ধারের একটা ক্ষেত হইতে বেগুন তুলিয়া আনিলাম। ক্ষেত্র-স্বামী নিকটেই ছিলেন। তিনি কিছুতেই উহার মূল্য লইলেন না। মেজদা স্বয়ং রান্না করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, আমরা কয়েকজন তাহার সাহায্য করিতে লাগিলাম। কেহ তরকারী কুটিলাম। কেহ বাটনা বাটিলাম। কেহ উদ্যান মধ্যবর্তী পুকুর হইতে কলসী করিয়া জল লইয়া আসিলাম। আনন্দের সীমা নাই। সন্তোষ আলু কুটিতে গিয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার জন্য সে একটুও দুঃখিত হইল না। উঠানের একটা আমগাছের ডালে দোল্‌না ঝুলানো হইয়াছে। কয়েকজন তাহাতে চড়িয়া মহানন্দে দুলিতেছে। আমরাও খানিকটা দুলিয়া লইলাম। আমাদের চাকরটি বাগানের একটা গাছ হইতে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা ডাব পাড়িয়া আনিল। সকলে মিলিয়া সেই ডাব কাটিয়া খাইলাম। এমন সুমিষ্ট ডাব যেন আর খাই নাই। ফুলের বাগানে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল নদীতীরে, পুকুর ঘাটে, নিকটবর্তী শস্যক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিয়া—আমরা যে সেদিন কি মাতামাতিটাই করিলাম, আর সেই মাতামাতির মধ্যে যে কতখানি আনন্দই পাইলাম, তাহা লিখিয়া জানাইবার ভাষা নাই।

বেলা একটা বাজিয়া গেল। রন্ধনের কাজ শেষ হইলে আমরা সকলে মিলিয়া নদীতে স্নান করিতে গেলাম। তখন বেশ একটু বাতাস বহিতেছে, নদীতে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। আমরা তাহাতে ভয় পাইলাম না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাঁতার কাটিয়া, ডুব দিয়া নদীর জল তোলপাড় করিয়া ফেলিলাম। শহরের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে আমাদের হৃদয় যেন বন্ধন-যন্ত্রণায় আই-ঢাই করিত। আজিকার এই উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে নানা-দিগ্‌দেশবাহিনী স্রোতস্বিনীর বক্ষে আমাদের সেই বন্ধন যেন এক নিমিষে ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল! আমরা মুক্তির আনন্দে বিভোর হইয়া গেলাম।

স্নান সারিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে গেলাম। সারাদিনের মাতামাতির পর অত্যন্ত ক্ষুধা-বোধ হইয়াছিল। চাকর বাগান হইতে কলাপাতা কাটিয়া আনিয়া খাইবার 'ঠাঁই' করিয়া দিল।

মেজদা নিজেই পরিবেষণ করিলেন। ব্যঞ্জনাদি যে নিখুঁত হইয়াছিল, তাহা নহে। ডালে নুন একেবারেই পড়ে নাই। বেগুনগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু সেই অন্ন-ব্যঞ্জন যে সেদিন কি অপরিসীম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়।

আহারের পর আরও কিছুক্ষণ খেলাধুলা করিলাম। তারপর বেলা পড়িয়া আসিল। আমরা ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। চাকর হাঁড়ি-বেড়ি প্রভৃতি তৈজসপত্রগুলি একে একে নৌকায় তুলিল। আমরাও নৌকায় চলিলাম। সেই বাগান-বাড়ীটার দিকে চাহিয়া আমার কিছুতেই ঘরে ফিরিতে মন সরিতেছিল না। একটি দিনের পরম আনন্দের স্মৃতির সহিত এই ক্ষুদ্র উদ্যান-বাটিকা চিরদিনের জন্য বিজড়িত হইয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যার আরক্ত আভা নদীর জলে রাশি রাশি সোনা ঢালিয়া দিল। গ্রামান্তরের মন্দির হইতে সুগম্ভীর শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। আকাশচারী চিল সকরুণ চীৎকার করিয়া ঘরে ফিরিল। দিনের কর্ম শেষ করিয়া শ্রমক্লান্ত সূর্যদেব পশ্চিমের অস্তশিখরে ঢলিয়া পড়িলেন। ওপারের তালগাছের মাথায় চাঁদ উঠিল।

ক্ষুদিরাম

১৯০৮ সালের মে মাস। মজঃফরপুরে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে দাঁড়াইয়া এক কিশোর বলিতেছেন—"আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। আমার পিতার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু। আমার নিবাস মেদিনীপুর। আমি ছাত্র। আমি ছয়দিন পূর্বে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য এখানে আসি। আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁহাকে হত্যা করিতে গিয়া আমি দুইটী নিরপরাধিনী ইংরাজ মহিলার প্রাণনাশ করিয়াছি।"

ইনিই ক্ষুদিরাম বসু—এবং এই ঘটনাই ইঁহার জীবনের সর্বশেষ ঘটনা। তিনি মাত্র উনিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন—কিন্তু ঐ স্বল্প অবসরেই যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতবাসী কেহ তাহা ভুলিবে না।

বর্ণ, দীর্ঘ চেহারা, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ান, প্রশস্ত বক্ষ—মাংসপেশী-গুলি গণিয়া দেখা যায়। উজ্জ্বল চক্ষু। মুখে একটা সদাপ্রফুল্লতার ছাপ ছিল, ক্রমে সেটা একটি প্রতিজ্ঞা-কঠোর ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। দেখিলে বুঝা যাইত, অনুক্ষণ কোন গভীর চিন্তা উহার অন্তরে তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছে। লাঠি, তলোয়াল, ছোরা খেলিতে অতিশয় পটু। সুস্থ দেহ। শুধু একবার ১৯০৫ সালে বড় কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন ভগিনী অপরূপার গৃহে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়েন দেখিয়া ভগিনী ওঝা ডাকিয়া আনিলেন। সংজ্ঞাহীন দেহ যেন সহসা সবলে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। ভূতেই পাইয়াছে বটে—কিন্তু দেশী নয়—'ওঝা তুমি এই বিলাতী ভূতগুলিকে সরিষা ছিটাইয়া তাড়াইতে পার?' ওঝা দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

মেদিনীপুরে ইঁহার জন্ম। নামের সঙ্গে একটা ইতিহাস আছে। ইঁহার মাতার পুত্রসন্তান বাঁচিত না। শেষে নিরাশ হইয়া স্থানীয় কালীমাতার নিকট তিন দিন অনাহারে ধর্ণা দিয়া থাকেন। দেবী স্বপ্নে বলিলেন—'এইবার একটি সন্তান হইবে, কিন্তু অল্পায়ু। তাহার স্বল্পপরিসর জীবনেই সে নিজের আসন স্থায়ীভাবে রচিয়া যাইবে।'

মাতা হরিষে বিষাদ পাইলেন। দেবতাকে ফাঁকি দিবার জন্য জন্মের সময় কন্যা অপরূপার নিকটে পুত্রকে দান করিলেন। তাহার পর তিনমুঠা চাল দিয়া কিনিয়া লইলেন। ক্ষুদের বিনিময়ে সন্তান ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম হইল ক্ষুদিরাম।

মাতা কিন্তু দেবতাকে ফাঁকি দিতে পারেন না। তবে দুঃখটা তাঁহাকে পোহাইতে হয় নাই—পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরেই লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

পিতা ত্রৈলোক্যনাথ মেদিনীপুরের নাড়াজোল রাজ-এস্টেটের তহশীলদার ছিলেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। নব-বিবাহের পর ত্রৈলোক্যনাথ মাত্র দুই সপ্তাহ বাঁচিয়া ছিলেন—তাহার পরই পরলোকের ডাক আসিয়া পৌঁছাইল। ক্ষুদিরাম তখন ছয়-সাত বৎসরের বালক।

ইহারই কিছুদিন পরে ক্ষুদিরাম তমলুকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে চলিয়া আসেন। ইঁহার স্বামীর নাম অমৃতলাল রায়। আদালতে চাকুরী করেন। তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে ক্ষুদিরাম প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। উত্তর-কালের চরিত্র এ বয়সের বা কৈশোরেই কিছুটা বুঝা যায়। স্কুল জীবনে তাঁহার একটি সদ্গুণ প্রকাশ হইয়াছিল। ক্ষুদিরামের এক সহপাঠী ছিলেন ফণীভূষণ। ১৩০৩ সালের ঘটনা। একদিন ফণী 'গোল্ড মিলের' একজোড়া ধুতি পরিয়া স্কুলে আসিলেন। কাপড়ের কলের ছাপ এবং তাহার গন্ধ উভয়েই চমৎকার। ক্লাশ-শুদ্ধ ছাত্র হাসিয়া অস্থির। ফণীভূষণ অপ্রস্তুত হইলেন। উপহাসের মাত্রা এবং [illegible] হইল। অকস্মাৎ ভিতর হইতে ক্ষুদিরাম স্বদেশী কাপড়ের মহিমায় এইরূপ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন যে সকলে চুপ হইয়া গেল। স্বদেশের কাপড় মোটা, খাটো বা পুরাতন বা শতছিন্ন হইলেও ক্ষতি নাই। এক চন্দ্র যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি সেই কাপড়ের স্বদেশী ছাপই তাহার সব দৈন্য ঘুচাইয়া দেয়।

শক্তি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার একটি পরিচয় দিই। শিক্ষক মহাশয় একদিন ছাত্রদের মুষ্টির বল পরীক্ষা করিলেন। [illegible] জমা হইল। একের পর এক প্রাণপণে টেবিলের উপর ঘুষি চালাইতে লাগিল—কিন্তু কাহারও আঘাতেই আটের কোটা অতিক্রম করিল না। ইহার পর ক্ষুদিরামের পালা। কিশোর ঘুষির পর ঘুষি মারিয়া চলিয়াছেন। তখন সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ত্রিশে। নিরস্ত

হইলে শিক্ষক দেখিলেন আঙুলের সন্ধি কাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে। একবার বাদাম গাছের উচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে শিক্ষক ডাকিলেন—'ন্যামিয়া এস।' ক্ষুদিরাম ডাল ছাড়িয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দেহে আঘাতের পরিমাণও সামান্য, তথাপি মুখে হাসি।

১৯০৩ সাল। Sir Herber Risltey বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব আনিয়াছেন। সারা বাংলায় বিক্ষোভের অগ্নি জ্বলিয়াছে। কার্জন বলিতেন—Partition of Bengal is a settled fact. সুরেন্দ্রনাথ সমুদ্র-গর্জনে প্রতিবাদ করিতেছেন—"We must unsettle the settled fact." মেদিনীপুরে ঢেউ আসিয়া লাগিল। ক্ষুদিরামের রাজনৈতিক জীবনের প্রভাত এইখানেই। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরবাসী শপথ করিল ভূষণ বলিয়া আর গলায় ফাঁসি পরিব না। বিদেশী চিনি, লবণ, বস্ত্র সব কিছু 'বয়কট'।

বাংলার এই যুগকে বলা হয় অগ্নিযুগ। ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয়, বাংলার রাজনীতিতে বুঝি এমন দিন আর আসে নাই। সেই যুগের যাঁহারা প্রধান ছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ধর্মমহাসভায় স্বামীজি তখন সবেমাত্র তাঁহার রুদ্রবাণী বাজাইয়াছেন, সকলেই ভাবিত তিনি দেশের এক নবযজ্ঞের উদ্‌গাতা। 'He is the true atheist who has no faith in himself'—শুনিয়া বাঙালী যুবকের শোণিত ধমনীতে দ্রুত ছুটিত। ক্ষুদিরাম বিবেকানন্দের গ্রন্থ পড়িতেন, পরমহংসদেবের উপদেশ শুনিতেন, গীতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। অন্তরে যেন মৃদু পদধ্বনির মত কাহার দৈববাণী শুনিতে পাইতেন। এই সময়ে পড়াশুনা ছাড়িয়া তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

অতঃপর মেদিনীপুরে যে কয়টি সভা হইয়াছে, ক্ষুদিরাম তাহাতে অগ্রণী। সভায় গেলে দেখা যাইত একটি ছিপ্‌ছিপে কিশোর অতিশয় ব্যস্ত,—তিনি ক্ষুদিরাম। আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। গৃহে ফিরিতে রাত্রি হইত। কি করিতেন কেহ বুঝিত না। পীড়িতের সেবা করা এইকালে একটা নেশার মত দাঁড়াইয়াছিল। সে সব রোগ সাধারণ নয়,—কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করিতেন—বালিসের তলা হইতে মাঝে মাঝে নেতাদের অগ্নিময় ভাষণের অংশবিশেষ বাহির হইয়া পড়িত।

১৯০৫ সালে কংশবাটী নদীতে বান ডাকিল। বন্যায় বাংলার যে দুর্দশা হয়, নদীর দুই পার্শ্বের অধিবাসীরা তাহার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সাহায্যের জন্য আর্তনাদ উঠিল। ক্ষুদিরাম দুই সঙ্গীকে লইয়া ক্ষেত্রে নামিলেন। দুয়ারে দুয়ারে পুরাতন কাপড় ভিক্ষা করিয়া ইনি বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ করিলেন। তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চালাঘর উঠিল, গৃহহারাদের গৃহের অভাব মিটিল। রুগ্ন, বৃদ্ধ এবং শিশুদের ক্ষুদিরাম পিঠে করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিলেন। সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ীতে ফিরেন নাই—গৃহে সকলে চিন্তায় আকুল। ইতিমধ্যে একদিনে বিদ্যুতের মত ফিরিয়া আসিলেন। অনুযোগ ও অভিযোগের পর স্কুলে পাঠাইবার জন্য ভগিনী এবং ভগিনীপতি আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন—কিন্তু ক্ষুদিরাম তখন ভিন্ন ডাকে সাড়া দিয়াছেন। চাপ একটু প্রবল হইল। তখন এক নিশীথে ক্ষুদিরাম গৃহ ছাড়িয়া গেলেন। ভগিনীর জন্য যে চিঠি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল—'আমায় সংসারী করিবার অভিলাষ ভুলিয়া যাও।'

তাহার জীবনের সূচীপত্রও পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে—অন্যথা সরকারের বেতনভোগী ভগিনীপতিকে বিপদগ্রস্ত করিতে চান না—তাই, গৃহত্যাগ করিলেন।

ইহারই একমাস পরে গভীর নিশীথে ভগিনী সচেতন হইয়া উঠিলেন। কে ডাকে? ক্ষুদিরাম আসিয়াছেন। ভগিনী দু'হাত বাড়াইয়া ভ্রাতাকে বুকে টানিয়া লইলেন। দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। এ কেমন করিয়া হইল। ভ্রাতা ধীরে ধীরে সব বলিলেন। এই এক মাস বাঁকুড়ায় এক কৃষকের গৃহে ছিলেন। কৃষক দরিদ্র, সহায়তা করিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ইতিমধ্যে তাহার রোগ হইল—ঐ দুর্দিনে ক্ষুদিরাম না থাকিলে দুঃস্থ পরিবার অনাহারে মরিত। ক্ষুদিরাম ভগিনীকে হাত দু'খানি দেখাইলেন—অনভ্যস্ত হাতে চাষ করিতে গিয়া ক্ষত হইয়াছে। দেহের স্থানে স্থানে আঘাতের চিহ্ন। ভগিনীর চক্ষে ধারা বহিল। বুঝিলেন মাতার স্বপ্ন ফলিতে চলিয়াছে।

জীবনে পরিবর্তন আসিতে লাগিল দ্রুততালে। গীতা, চণ্ডী নিত্যকার সহচর হইল।

পড়িয়া কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা আটিতেন। দরিদ্রের সেবা নিয়মিত চলিয়াছে। এক ভিখারী আসিয়া একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র মাগিল। ভিক্ষুক শীতে কাঁপিতেছে। ক্ষুদিরামের নিকটে পিতার শেষদান একজোড়া মূল্যবান শাল ছিল। কিশোর দ্রুত ছুটিয়া গিয়া, শাল দুইটি আনিয়া ভিক্ষুকের দেহে ফেলিয়া দিলেন।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে এক শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। বহু ব্যক্তির সমাগম হয়। ক্ষুদিরামের উপর ভার পড়িল কতকগুলি বিজ্ঞাপন বিলি করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের নাম 'বন্দে মাতরম্'। তাহার ইংরাজী অনুবাদ 'Empire' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দেখিয়া কর্তৃপক্ষ বলিলেন —'এ যে সাংঘাতিক বস্তু—একেবারে শ্বেতকায়দের মারিয়া ফেলিবার উস্কানি।' ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন। তাহার পর তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল—কিন্তু তিনি মুক্তি পাইলেন। জনতা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতেছিল—এইবার বীর কিশোরকে লইয়া মাতামাতি সুরু করিল। সে রাত্রিতে মেদিনীপুর আতস বাজির আলোয় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয় ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার দুইটি দল গড়িয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ আপোষ মীমাংসার পক্ষে। অরবিন্দ চরমপন্থী। নরম কথায় কাজ হইবে না, সোজাসুজি ইংরাজের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইবে। এই তাঁহার অভিমত। ক্ষুদিরাম অরবিন্দের দলে যোগ দিলেন। ঘাড়ে করিয়া স্বদেশী কাপড় লইয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন। এই ব্যবসায়িক ভ্রমণের অন্তরালে তিনি চরমপন্থীদের জন্য প্রচার করিতেন—যাহাতে দলের সভ্য সংখ্যা বাড়ে, দেশ আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হয়।

লাঠি এবং ছোরা খেলার শিক্ষাটা এইবার পাকা হইয়াছিল। একবার সমবয়সী দুই বন্ধুর কাছে এই অনুপম কৌশলের মহড়া দিলেন। সঙ্গীরা অবিশ্রান্ত ঢিল ছুড়িতে লাগিলেন। ক্ষুদিরামের দুই হাতে দুই লাঠি বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতে লাগিল। গতির ক্ষিপ্রতায় যেন একটা মাকড়সার জাল সৃষ্টি হইল। সেদিন একটিও লোষ্ট্র ক্ষুদিরামের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই।

বিভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া ক্ষুদিরাম শরীরচর্চার কেন্দ্র খুলিবার উৎসাহ যোগাইতে লাগিলেন। চরমপন্থীদের জন্য সভা এবং চাঁদা সংগ্রহেও ইহার সহিত অগ্রসর হইতেছিল। ভগিনীপতি উৎকণ্ঠায় তাহার সংস্রব এড়াইতে চাহেন। একটা গোটা সংসার শুধু তাহারই উপার্জনের উপর নির্ভর করে। ইতিমধ্যে কয়েকবার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তলব আসিয়াছে। ক্ষুদিরাম ভগিনীপতিকে বিঘ্নহীন করিবার জন্য দূরে দূরে থাকিতেন। ভগিনীর জন্য প্রাণ আনচান্

করিত বলিয়া মধ্যাহ্নে ভগিনীপতি অফিসে গেলে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা করিয়া যাইতেন।

ইহার পরের ঘটনাটি এই নবীন যুবকের অন্তিম অঙ্গ। কিংসফোর্ড তখন কলিকাতায় Chief Presidency Magistrate. তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্রভাবে দমন করিতেছিলেন। ১৯০৭ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তিনি 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' এবং 'নবশক্তি'র সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশকদের নানারকম দণ্ডবিধান করেন। সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করা তাঁহার কর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই দমননীতিতে বাংলার চরমপন্থীদল ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কিংসফোর্ডের ভবলীলা শেষ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইল। একবার বিচিত্র উপায়ে বোমা দিয়া চেষ্টা করাও হইয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। অতঃপর ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর উপর পড়িল কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার ভার।

কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে বদলী হইয়া গিয়াছেন। দুই বিপ্লবী বন্ধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বোমা এবং রিভলভার। দুইজনে এক ধর্মশালায় থাকিয়া সাহেবের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইল। সেদিন ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। দুইজনে সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষুদিরামের হাতে বোমা। দূর হইতে কিংসফোর্ডের ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহা ক্ষুদিরামের নাগালে পৌঁছিল। অকস্মাৎ বজ্রের মত শব্দ।—তাহার পরেই সব ধূমে ঢাকিয়া গেল। স্বাধীনতা যজ্ঞের হোতৃদ্বয় তখন মোকামা ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়াছেন।

এই কর্মের গুরুত্ব শুধু হাতে-কলমে কাজ করিয়া বলা যায়। কিন্তু হিসাবে একটু ভুল হইয়াছিল। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এত আয়োজন, তিনি সেদিন গাড়ীতে ছিলেন না। দুই ইংরাজ মহিলা সেদিন তাঁহার দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ইহার পর চারিদিকে চর ছুটিল। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম ওয়াইনি ষ্টেশনে মিঠাই কিনিতেছিলেন, সেখানে পুলিশ তাঁহাকে দুই রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার করিল।

তাহার পর বিচার হইল। দণ্ড হইল ফাঁসী। এই উনবিংশ বৎসরের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মরণের ভয় ছিল না। গীতার অমোঘ বাণী নিশিদিন তাঁহার কানে মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইত—'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্...।' মৃত্যুর আদেশ তিনি শান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিচারক প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কি ইহার জন্য দুঃখিত নও?' নবীন যুবক শির উন্নত করিয়া বলিলেন—'দুঃখ কিসের জন্য? আমি গীতা পড়িয়াছি। আমি ত সত্য কথাই বলিয়াছি।'

ক্ষুদিরামের কয়েকটি অন্তিম অভিলাষ ছিল। ভগিনী অপরূপাকে দেখিবার বড় সাধ ছিল। স্নেহময়ী আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া স্বামী পাঠাইলেন না। আর চাহিয়াছিলেন কালীমাতার চরণামৃত। সময় ছিল না বলিয়া সেটিও পাঠান যায় নাই। তাহার পর সেই চরম মুহূর্ত আসিল। ১৯০৮ সালের ২১শে জুলাই এই পবিত্র আত্মা ফাঁসীর মঞ্চে দাড়াইয়া ঊর্ধ্বলোকে প্রয়াণ করে। গণ্ডক-নদীর তীরে তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মীভূত হইল।

ক্ষুদিরামের অন্তিম অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যে অভিলাষের জন্য অকালে সেই অন্তিম মুহূর্ত আসিয়াছিল, আজ তাহা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই মুক্ত ভারতের পতাকার তলে দাড়াইয়া আজ অগ্নিযুগের প্রথম অর্ঘ, তরুণ দেশপ্রেমিককে নমস্কার করি।

সামরিক শিক্ষা

প্রাচীন মনীষীরা বলিয়াছেন—বল বা পশুশক্তিই প্রথম রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে। আধুনিক রাষ্ট্রবিদেরা এই মত স্বীকার করেন না, কিন্তু দেশরক্ষার মূলে পশুশক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

অস্ত্র দিয়া 'শত্রুজয় করা বা আত্মরক্ষা করা হইত' এটা ত বড় কাজ নয়, কিন্তু প্রতিনিয়তই ইহার আবশ্যকতা দেখি। অশোক যে ভারতবর্ষকে অহিংসানীতি শিখা দিয়াছিলেন কালক্রমে তাহাকেই শত্রুর শাণিত তরোয়ালের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইয়াছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং মরিয়া তাঁহার অনুচরদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন—হিংসা করিও না, তথাপি ইউরোপে তাঁহার পরবর্তীকালে যুদ্ধবিরতি ঘটে নাই।

সত্য, অহিংসা, প্রেম খুব বড় শক্তি। তাহার বলে পশুও বশ হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে শক্তিতে জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। পরিপূর্ণ অহিংসা না জাগিলে তাহার শক্তি বিকশিত হয় না, এবং পূর্ণ অহিংসার উদ্বোধন করিতে গেলে যে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন, তাহা বিরল।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াম্, তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ'—অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সম্মুখে কেহ আর শত্রুভাব পোষণ করে না। পরম সত্য কথা, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করিতে যে পথ পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাহার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাই। সুতরাং যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি কিন্তু কোমল। অযথা রক্তপাত ভারতবর্ষের চক্ষুঃশূল। তাহা ছাড়া বুদ্ধ এবং চৈতন্যের পর হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নির্বেদের ভাব আসিয়াছিল। ভারতবর্ষ যে বারে বারে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে, ক্ষাত্রশক্তির অভাবই তাহার কারণ।

অথচ আজ না জাগিলে চলে না। পরাধীন অবস্থায় ভারতের অবস্থা দেখিয়াছি। দুইটা মহাসমর গিয়াছে। ভারতবর্ষের হাত-পা গুটাইয়া থাকিলেও

চলিত—তথাপি ভারতীয় সৈনিক স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া স্বেচ্ছায় দূর বিদেশে গিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছে।

এই যদি পরাধীন জাতির ইতিহাস হয়, তবে আজ স্বাধীন ভারতে শিক্ষিত সৈনিকের কতখানি প্রয়োজন, তাহা উপলব্ধি করা সহজ।

মহাপুরুষেরা যাহাই বলুন, যত আশ্বাস বাণীই শুনাইয়া যান, আধুনিক সভ্যতা আগ্নেয়গিরি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া যত শঙ্কাই দেখান, তাহা শুনিবার জন্য পাশ্চাত্যজাতির আগ্রহ নাই। রণদুন্দুভির ঘনঘোর গর্জন যেন এখন হইতেই শোনা যায়। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ভারতবর্ষের ভূমিতে আবার একবার বিদেশীর শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিবে।

সমরবিমুখ বলিয়া ভারতবাসীদের একটা কলঙ্ক ছিল, দুই মহাসমরে ভারতবাসী সেই দুর্নাম ঘুচাইয়াছে। ইংরেজ সেনাপতিরা বিস্মিত হইয়াছেন যে, যাহাদের দুইশত বৎসর ধরিয়া একটা বন্দুক ধরিতে দিই নাই, তাহারা অকস্মাৎ এমন রণকুশলী হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? [illegible] ঘটিয়াছে, এইবার শিক্ষা দেওয়া চাই।

বিদ্যাশিক্ষার মধ্যেও [illegible] চর্চা করিতে হইবে। যুগের সহিত পা মিলাইয়া চলা চাই। রামচন্দ্রের একবাণে সপ্ততাল ভেদ, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, একলব্যের শরসন্ধান মনে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা জাগায়, কিন্তু আধুনিক রণক্ষেত্রে তাহাদের স্থান নাই। শুনিতে পাই বাবর প্রথম এদেশে কামান ব্যবহার করেন, ভারতবাসীর তখন তোপ ছিল না বলিয়াই পরাজয় ঘটে।

সে যুগের যুদ্ধ ব্যক্তিগত কৌশল দেখাইবার একটা ক্ষেত্র ছিল। আজ ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তরালে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার বুদ্ধিটাই কাজ করে। তলোয়ার লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ নাই, ঘোড়ায় চড়িয়া শূলহাতে শত্রুর দিকে ছুটিয়া যাওয়া যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। ধনুর্বাণের কথা না হয় বাদই দিলাম, গদা হাতে দুর্যোধনের সহিত ভীমের যুদ্ধ শুনিয়া আজ বরং বিস্ময় মানি।

মানুষ বুদ্ধি দিয়া যন্ত্রটিকে আনিয়াছে, তাহার সবটুকুকেই যথাসাধ্য রণক্ষেত্রে লাগাইয়াছে। বিজ্ঞান এখন শুধু মানুষের কল্যাণ করিয়াই শান্ত নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে অল্প আয়াসে অধিক শত্রু নিরাপদে বধ করা যায়, তাহারও পথ দেখাইয়া দিতেছে। যুদ্ধের মধ্যেও একটা নীতিজ্ঞান প্রাচীন কালে ছিল, এখন সে বালাই নাই। 'এটমবোমা' এক আঘাতে হিরোশিমার মত স্থানকে

ছারখার করিয়া দেয়। নৌযুদ্ধে শুধু বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলে না, ভাবিতে হয় জলের তলায় কোথায় মাইন পাতা আছে; টর্পেডো বোটের নির্মাণে আহ্লাদ প্রকাশ করিবার কিছুই নাই—তাহাকে শেষ করিবার জন্য 'ডেফ্থ চার্জ' আছে। বিষাক্ত বাষ্প আজকাল বড় একটা ছাড়া হয় না, কারণ মুখোস আবিষ্কৃত হইয়াছে। এরোপ্লেনে করিয়া বোমা ছাড়িবার ফন্দী যেমন মানুষ শিখিয়াছে, তেমনি উড়োজাহাজকে মাটিতে আনিবার কৌশল দিয়াছে বিমানধ্বংসী কামান।

আজিকার বিজ্ঞান, যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার একটি যন্ত্র হইয়াছে। শক্তি অনেক সময় অন্যায় আগ্রহ দেখায়। যুদ্ধের উপকরণ যাহারা অতিরিক্ত যোগাইয়াছে হীনবলদের তাহারা দাবায়। দেখিয়া সেই আদিমযুগের কথা মনে পড়ে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার নাই—শক্তিমানই শুধু বাঁচিয়া থাকিবে, দুর্বল ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরিয়া যাইবে।

কিন্তু যুগ পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়াই যাহারা স্বাতন্ত্র্য রাখিতে চান তাহাদেরও যুগের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতবাসীর বীরত্বের অভাব নাই—শিবাজী, রণজিৎসিংহ, লক্ষ্মীবাই, অগ্নিযুগের বাঙ্গালী বিপ্লবীরা তাহার প্রমাণ। কিন্তু শিক্ষাটা আদায় করিতে হইবে। ভারতবর্ষ বসুগর্ভা, অতীতের এই যে জনশ্রুতি বিদেশীকে বার বার ভারতের শান্ত ভূমিতে শোণিত ঝরাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছে, তাহা আজও সত্য। আত্মরক্ষা করিতে হইলে গোলাবারুদের ব্যবহার জানিতে হইবে।

আধুনিক যুদ্ধের যে শিক্ষা, ইংরাজের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ তাহা শিখিতে পায় নাই। বৈদেশিক শক্তির এই দিকে একটা বিষম ভয় ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের নমুনা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সুতরাং আজ ভারতবর্ষকে আপন দায়িত্বে তাহা শিখিতে হইবে।

দেরাদুনে সামরিক বিদ্যালয়ে ইংরাজ ভারতবাসীকে যুদ্ধ শিখাইতেন। সেখানে ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল নগণ্য, তাহাদের পদের মর্যাদাও বিশিষ্ট নয়। ইংরাজই অধিকাংশ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। আজ সে বাধা দূর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই চলিবে না। বিলাতে, আমেরিকায় যেমন আইন করিয়া যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেদিনও বাংলাদেশের মন্ত্রী নেতারে যুবকদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। দলে

দলে সাহায্যকারী বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য। সৈন্যদলে যখন কাজের চাপ পড়িবে, তখন ইহারাই দেশকে ভারমুক্ত করিবে। ভারতবর্ষ এক পরিকল্পনা করিয়াছেন—সতের হইতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বয়সের মানুষকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু ইহাই পর্যাপ্ত নয়। বাধ্যতামূলক আইন করিতে হইবে। স্কুল কলেজের ছাত্রদের যেমন ড্রিল শিখান হয়, তেমনি নিয়মিতভাবে সকলকে যুদ্ধবিদ্যা শিখান প্রয়োজন। রাষ্ট্র সবে নানা দুঃখ পোহাইয়া স্বাধীন হইয়াছে—তথাপি ইহারই ভিতরে সামরিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়ই বলিব। দেশে সামরিক শিক্ষার সাড়া জাগিয়াছে, ইহাই আশার কথা। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা মূলধন প্রদান করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকাও কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য, যাহাতে যুদ্ধের মালপত্র প্রস্তুত হয় এবং তরুণরা যুদ্ধ শিখে। পূর্ব পাঞ্জাবের শাসনকর্তা এই কাযের জন্যও এগার লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেশসচিব বলিয়াছেন—প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সামরিক বাহিনী গড়িয়া তোল। প্রয়োজনের সময় ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। জল-যুদ্ধের জন্য আয়োজন চলিতেছে।

এতকাল বিদেশী শাসনে থাকিয়া দেশ দুর্বল। ধর্মের বিভিন্নতাও উপেক্ষণীয় নয়। দেশে সামরিক শিক্ষার এই গ্লানি মুছিয়া যাইবে। সকলেরই এক লক্ষ্য—ভারতের স্বাধীন রাখা—বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী সকলেই সেই লক্ষ্যে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইবে—সুতরাং মিলনের পথও সবল হইবে।

দেশে সৈন্যের অভাব হইবে না, কিন্তু ভাবিতে হইবে উপকরণের কথা। দুই মহাযুদ্ধে ভারতবাসী পরাধীন থাকিয়াও অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র না পাইলে সৈনিক অচল। আধুনিকার যুদ্ধে সৈনিকের অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সমরোপকরণের প্রয়োজন অধিক। বিভিন্ন দেশ ধীরে ধীরে সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করিয়াছে—ভারতবর্ষের সে সুযোগ ঘটে নাই। আজ অকস্মাৎ স্বাধীনতার প্রভাতে দেখিতে পাই সব স্বাধীন দেশই পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত। ভারতবর্ষ যদি বিরাট উৎসাহ লইয়া এই আয়োজনে না নামে, তবে বিপদ ঘনাইয়া আসিতে বিলম্ব হইবে না।

অর্থ দিয়া পরের নিকট হইতে উপকরণ কিনিব—একথা বলিলে চলিবে না। সময় আসিলে সহায়তা খুব সুলভ হয় না। শত্রুর চর, অস্ত্রবাহী জাহাজ, বিমান

প্রভৃতি ধ্বংস করিবার জন্য বসিয়া থাকে। অস্ত্রবিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হইলে সামরিক শিক্ষা বৃথা।

কাঁচামালের অভাব ভারতবর্ষে দেখি না। উপযুক্ত কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে। যে বিজ্ঞান মানুষকে দুর্ধর্ষ করিয়াছে—তাহারই কঠোর সাধনা চাই। এই বিশাল ভূমিতে যে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে, তাহাকে এই পথে কাজে লাগাইলে ভারতবর্ষ এসিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইবে।

ভারতবাসীর অন্তরে দর্শন, বেদ, গীতা, উপনিষদের বাণী অনুক্ষণ ধ্বনিত হয়। প্রাচীন রাজগণের ইতিহাস পড়িয়া বুঝি শরণাগতকে রক্ষা করা রাজধর্মের অঙ্গ ছিল। হিংসা করিও না, এই কথাই সে জানে এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'—সকলেই সুখী হউক—এই তাহার জন্ম-জন্মান্তরের নীতি। সে যদি সামরিক শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া উঠে তবে বিশ্বাস করিবে—কাহারও শান্তির বাধা ঘটাইবে না। বরং দুর্বল শরণাগতের রক্ষার জন্য আপন শক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ভারতের চিরপুরাতন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

ভারতের সামরিক শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য—কিন্তু ইহারও পূর্বে একটা বিষয় ভাবিতে হইবে। মহামারীর কোপে, দুর্ভিক্ষে, অন্নাভাবে, বিদেশী রাজশাসনে লাঞ্ছিত জনগণ আজ ম্লানমুখে বিচরণ করে। তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সাহসবিস্তৃত বক্ষপট না হইলে মাতৃভূমির রক্ষার প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে?

———

প্রাথমিক শিক্ষা

গাছপালা বাঁচে, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীও বাঁচে, মানুষও বাঁচে। এই দিক দিয়া মানুষ হইতে ইহারা স্বতন্ত্র নয়। তথাপি প্রভেদ আছে, সেটা আসে শিক্ষা হইতে। মানুষের সমাজ এবং পশুর জগৎ এক নয়। যে কারণে ইহারা ভিন্ন তাহার কারণ দেখাইতে গেলে বলিব মানুষের অন্তরে শিক্ষা আছে, পশু তাহা হইতে বঞ্চিত। বাঁচাটাই বড় কথা নয়, শুইয়া বসিয়া, হাসিমুখে বিধাতার দেওয়া জীবন একরকম করিয়া কাটাইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু মানুষ উন্নত হইতে চায়, কল্যাণের পথ মুক্ত করিতে চায়, তাই তাহার শিক্ষা চাই।

কেমন করিয়া বাঁচিতে হইবে—তাহা বুঝিতে হইলে মননের প্রয়োজন—শিক্ষা সেই মননশক্তিকে জাগায়।

এই শিক্ষার বনিয়াদ গড়িতে হইলে তাহার সময় চাই, কাল ফুরাইলে কাজ হয় না। বর্ষাকালেই ধানের চাষ করিতে হয়, শীতকালে যদি কেহ বীজ বপন করে, তাহাতে পরিশ্রমটাই সার হয়, ফসল ফলে না।

শিক্ষার প্রশস্ত সময় শিশুবয়স। একটা পরিপূর্ণ জীবনও সমস্ত শিক্ষার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, তথাপি যে যতকাল এই পৃথিবীতে বাস করুক, শিক্ষার গোড়াপত্তন এই শিশুবয়সেই করিতে হইবে। বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া নানারূপ সমস্যা ভিড় করিয়া আসে। শিশুর মন ঐ সব সমস্যা হইতে মুক্ত। তাহা ছাড়া তরুণ মন কোমল, তাই গ্রহণ করিবার উপযোগী। সে সবে জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—জগতের প্রতি তাহার কৌতূহল অসীম। সে শুধু জানিতেই চায়। ঠিক কাদামাটির পিণ্ড গড়িয়া পিটিয়া নানা ছাঁচে ঢালা যায়, শিশুকেও যাহা শিখান যায় তাহাই শিখে। এই বয়সে স্মরণশক্তিও অধিক। বর্ণপরিচয়ের অ, আ, ক, খ মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও মনে থাকে। শিশু 'মিথ্যা বলা বড় দোষ' বলিয়া যে কথা পুঁথিতে পড়ে, তাহা চিরকালের জন্য ঐ মেঘনির্মুক্ত মনে আঁচড় কাটিয়া বসিয়া যায়। বড় হইয়া মনীষীদের কত নীতিকথা শুনা যায়, তখন বুঝিবার শক্তিও প্রবলতর তথাপি মনে তেমন সাড়া জাগায় না. কিন্তু 'মিথ্যা বলা দোষ' শিশু ভোলে না।

এই জন্যই প্রথম জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন। আজিকার শিশু আগামী দিবসের পৃথিবীর কর্ণধার। কোরকের ভিতরেই ফলের সম্ভাবনা আছে। কলি যদি শুকাইয়া যায় তবে ফুল ফোটে না, তাহার যত্নই ফুলের বিকাশ। শিশুকে শিখাইতে হইবে। জীবনের ভিত্তি হইল শৈশব। ইট, কাঠ, চূণ, বালি দিয়া গৃহের উপরের দিকটা সুন্দর করিয়া গড়িলেও ভিত্তির দোষে প্রাসাদ ধ্বসিয়া পড়ে। বনিয়াদটা শক্ত করিয়া গড়া চাই।

শিশুর দায়িত্ব নাই, সে যা পায়, তাহাই লয়। কিন্তু এই কারণেই একটা সুবিধা আছে। শিশুকে যে পথে খুশী চালান যায়। তাহাকে শিশুর মত হইয়া শিখাইতে গেলেই সে শিখে। একটু ধৈর্যের প্রয়োজন, কিন্তু তাহার বিহনেই শিশুর জীবন একঘেয়ে হইয়া যায়—খেলে-ধূলে সন্তুষ্ট হইয়া সে জীবনে আপনিও সুখ পায় না, পরেও কাজে লাগে না।

বঙ্গদেশে এই শিশুশিক্ষা উপেক্ষাই পাইয়াছে। কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বিশপ সাহেব যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহার মর্মকথা এই যে—বোম্বাইয়ে শতকরা ৮১ জন, মাদ্রাজে ১৭ জন আর বাংলায় মাত্র ৭ জনের কাছাকাছি প্রাথমিক শিক্ষা পায়। ইহার কারণও আছে। বাংলার অধিকাংশ কৃষক। ইহারা ঋণের ভারে জর্জর। রোগে, অভাবে, সংসারের অনিবার্য দুর্ভাবনায় ইহারা ঐ পথে পা বাড়াইতে চায় না। একটু বড় হইলেই পুত্র ক্ষেতে গিয়া পিতার সহায়তা করে, হালে লাগে, গরু সেবায় আত্মনিয়োগ করে। চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই সভা-সমিতি করিয়া। সকলেই চায় শিশুরা শিক্ষিত হইয়া উঠুক, তথাপি কাজটা ঠিক হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সহরে সহরে বাধ্যতামূলক (compulsory) প্রাথমিক শিক্ষার আইন হয়। এই আইনই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পল্লীগ্রামে ছড়াইয়া পড়ে—কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বাংলার চাষী কোনদিন পুঁথি পড়ে নাই—পুরুষানুক্রমে লিখিয়া পড়িয়া মানুষ হইবার এ অভিলাষ সে পোষণ করে না।

দেশের আয়তন অনুযায়ী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রচুর নয়। তাহার কারণ দারিদ্র্য। এমন অর্থ নাই যে গৃহ তৈয়ারি করিয়া শিক্ষক রাখিয়া বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়ান চলে। যে কয়টি বিদ্যালয় আছে, তাহারাও কার্যে বিশেষ পটু নহে। তাহারও কারণ অসচ্ছলতা। শিক্ষক পেটের অন্ন জুটাইবার মত অর্থ

পান না, সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার ক্ষুধা মিটে না, তাঁহার নিকট হইতে দেশ কতখানি আশা করিতে পারে? যিনি নিজের চিন্তায় মগ্ন, অপরকে শিক্ষা দিবার মত সামর্থ তাঁহার নাই। এই জন্যই পল্লী অঞ্চলে গুরুমহাশয়দিগের অন্তর ক্রোধপূর্ণ থাকে, নিজেদের দৈন্যের জ্বালা তাঁহারা বেত্রধারায় শিশুদের পৃষ্ঠে মিটাইয়া লন। ইহাতে উপহাসের কিছু নাই। শ্রেষ্ঠ বস্তুর জন্য শ্রেষ্ঠ বলি দিতে হয়। যে একটা মানুষের ভবিষ্যৎ গড়িয়া দিবে—তাহাকে অন্নের চিন্তা হইতে মুক্তি দেওয়া চাই।

কাল অনুযায়ী প্রণালীও আছে। শিশুর মনে দোলা দেয় এমন ভাবে শিখাইতে হইবে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাহার উপযোগী করিয়া শিক্ষা পরিবেশন করিতে হইবে। ইহার জন্য চাই বিশেষজ্ঞ। বড় তত্ত্বও শিশু বুঝিতে পারে—তাহাকে মাপসই করিয়া উপস্থিত করিতে হইবে।

শিশুদের যদি শিক্ষিত করিতেই হয় তবে সে ভার অক্ষরপরিচয়হীন দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গ্রামবাসীর স্কন্ধে চাপাইলে চলিবে না। তাহারা শিক্ষার মর্ম বুঝে না। দারিদ্র্যও সেই পথে এক বিরাট বিঘ্ন। এই ব্রতের ভার লইতে হইবে সর্বাঙ্গীনভাবে সরকারকে। বিলাতে পনের বৎসর অবধি বালকবালিকারা স্কুলে থাকিতে বাধ্য। তাহারা বিনামূল্যে বই পায়, কেহ কেহ অর্থসাহায্যও লাভ করে। ইহাদের প্রাথমিক শিক্ষার কাল অন্ততঃ আট বৎসর। আমাদের দেশে ইহার পরিমাণ চারি বৎসর। চারি বৎসর কোন শিক্ষার পক্ষেই পর্যাপ্ত নয়। ছয় হইতে সুরু করিয়া দশ বৎসরের মধ্যে শিশুরা কতটুকু শিখিতে পারে তাহা ভাবিলেই বুঝা যায়। ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। চাষীর পুত্রকন্যারা পিতার সাহায্য করে, কিন্তু দেশের চাষী বৎসরের প্রায় ছয়মাস দীর্ঘ অবকাশপূর্ণ দিন গুনিয়া কাটায়, এই সময়ে শিক্ষার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। কাজের দিন আসিলে নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। আসল কথা—কাহারও উপরে ভরসা না রাখিয়া কঠোর আইন করিয়া দেশের শিশুদের শিখাইয়া গড়িতে হইবে। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা চাই। শিক্ষকদের জীবন যেন দারিদ্র্যের চাপে দুর্ভর না হইয়া উঠে। দেশের অন্যান্য পরিকল্পনা কিছুদিন বন্ধ রাখিলেও ক্ষতি নাই। যাহারা দেশের ভরসা, তাহাদের মনের অন্ধকার না ঘুচিলে কল্যাণ নাই।

আজ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার যে অভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে অন্য

প্রয়োজন তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুধু পরিকল্পনায় ফল নাই—কাজ চাই। দেশ স্বাধীন হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ নিরক্ষরতা। শিশু বড় হইয়া আপন প্রতিভায় শিক্ষার পথ সুগম করে। তখন সহায়তার প্রয়োজন অল্প। বৃক্ষকে লালন করিতে হয় না, কিন্তু চারাগাছের মূলে জল সিঞ্চন না করিলে তাহার প্রাণ শুকাইয়া যায়। জাতির এই মেরুদণ্ডগুলিকে সুদৃঢ় করিয়া না গড়িলে, প্রাথমিক শিক্ষা সুদূরতম গ্রামে প্রবেশ না করিলে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিবার কিছু থাকিবে না—উত্তরকালে শিশুর অভিশাপের লক্ষ্য হইতে হইবে।

শ্যামাপ্রসাদ

রবীন্দ্রনাথের "শেষ শিক্ষা" কবিতায় আছে—

"বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি
কি শিখানু তারে—"

এই বাঘেরই যথার্থ প্রতিবিম্ব—বাংলার বাঘ আশুতোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ। রত্নগর্ভা যোগমায়া দেবীর কোমলতা এবং অমিততেজা আশুতোষের দৃঢ়তা—এই উভয় প্রকৃতির পরম মিলন ঘটিয়াছে শ্যামাপ্রসাদের চরিত্রে।

কলিকাতার ভবানীপুরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে মহাপ্রাণ শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি পরিচিত। ভবানীপুর মিত্র স্কুল হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে কলা বিভাগে প্রবেশ করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের পরিচয় তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রকাশ পায়। তাঁহার সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার তিনিই ছিলেন ছাত্র-সম্পাদক।

১৯২২ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী এবং ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা সুধা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শিতা থাকিলেও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং উহাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার উন্নতি বিধানার্থে তাঁহার যে সব কার্যকলাপ দেখি, তাহার প্রস্তুতিপর্ব বোধ করি এইভাবেই গড়িয়া উঠে।

১৯২৪ খৃঃ আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হন। এই বৎসর পিতার মৃত্যু হওয়ায় সিণ্ডিকেটে পিতার শূন্যস্থান তিনি পূরণ করেন। ১৯২৬ খৃঃ তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যান। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, এবং সুনিপুণ কর্মশক্তি এই সময় হইতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এইবার রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। অপর কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অল্প বয়সে কোনও ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ পদলাভ করেন নাই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নবগঠিত ব্যবস্থা পরিষদে তিনি নির্বাচিত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, দেশপ্রেম ও বাগ্মিতা দেশবাসীর মনে নূতন সাড়া জাগাইয়া তুলে। তিনি সর্ববরেণ্য নেতৃরূপে স্বীকৃতি পান। ১৯৩৮ খৃঃ কলিকাতা ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৩৯ খৃঃ তিনি মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং ১৯৪১ খৃঃ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। ফজলুল হক্ কর্তৃক আহূত 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থসচিব নিযুক্ত হন। ভাগলপুরে হিন্দুমহাসভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ সেই আদেশ অমান্য করিলে তাঁহাকে আটক করা হয়। ক্রীপস-কমিশন ভারতবর্ষে যে আলাপ-আলোচনা করেন, তিনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৪২ খৃঃ মেদিনীপুরে পুলিশী-অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি মন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগ করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায় তিনি যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা চিরকাল স্মরণ করিয়া রাখিবে।

তাঁহার রচিত "পঞ্চাশের মন্বন্তর" গ্রন্থখানি তদানীন্তন বঙ্গদেশের সরকার কর্তৃক কিছুদিনের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সাংবাদিকতার দিকেও তাঁহার দান অপরিসীম। ইংরাজী দৈনিক Nationalist এবং বাংলা দৈনিক "হিন্দুস্থান" তাঁহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ছাত্রদরদী শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের স্বাস্থ্যদাবিতে সর্বদা ছাত্রদের পাশে দাড়াইতেন। ১৯৪৬ খৃঃ দাঙ্গার পর বঙ্গদেশের একাংশ ভারতীয় ইউনিয়নে রাখিবার পক্ষে তিনি জনমত গঠন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক আহুত মন্ত্রীসভায় তিনি যোগদান করেন। গণপরিষদের সদস্যরূপে নূতন সংবিধান রচনায় তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। ১৯৫০ খৃঃ পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের অপরিসীম দুর্দশার প্রতিকারে অসমর্থ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ খৃঃ তিনি "পিপলস পার্টি" নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশের সর্বদিক হইতে তাহা সমর্থন লাভ করায় তিনি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিখিল ভারত জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই রাজনৈতিক দলটির সহিত যুক্ত ছিলেন সভাপতিরূপে।

বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাবোধি সোসাইটির তিনি সভাপতি মনোনীত হন ১৯৪৪ খৃঃ। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১৯৫২ খৃঃ তিনি দক্ষিণ-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাধিক্যে লোকসভায় নির্বাচিত হন। লোকসভায় অতি সহজেই তিনি বিরোধীদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে দলনির্বিশেষে সকলের স্বীকৃতি পান।

তাঁহার শেষ আন্দোলন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ নিজের জীবন দান। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অন্তর্গত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতির পরেও কেন এখানে প্রবেশের জন্য পৃথক 'অনুমতি পত্র' লাগিবে—তাহারই প্রতিবাদে তিনি বিনা পারমিটে কাশ্মীর ও জম্মুতে প্রবেশ করেন। দৃঢ়তার প্রতীক, নির্ভীক শ্যামাপ্রসাদ এই রূপে আন্দোলন চালান। কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং বিনা বিচারে অন্তরীণ রাখা হয়। অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেও তাঁহার সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। মুক্তিদান তো দূরের কথা। শেষে ২৩শে জুন আত্মীয়স্বজনহীন নির্বান্ধব পুরীতে রাত্রি ৩-৪০ মিঃ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মতে দেশের প্রত্যেকেই জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে স্বনামধন্য।

শ্যামাপ্রসাদ কখনও বিনা প্রতিবাদে অন্যায়কে স্বীকার করেন নাই। কোনও সম্মানের লোভই তাঁহাকে এই দৃঢ়তা হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। যাহাকে তিনি একবার সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ডের মতই যে কোনও উচ্চ সম্মানকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। মানবতার অবমাননায়, মনুষ্যের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ায় মানবাত্মার নির্যাতনে তিনি বজ্রের কঠোরতা লইয়া অগ্রসর হইতেন। বেদনায় মুহ্যমান নরনারীর কাতরতায়, অসহায়তায় তিনি তাহাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়জনরূপেই তাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। তাঁহার কাছে সর্বশ্রেণীর মানুষেরই অবাধ সাক্ষাতের অধিকার ছিল। এই দিক দিয়া তিনি পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহার অন্তর ছিল সব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে। ব্যবহার ছিল অমায়িক, উদার। তাঁহার জীবন কর্ম ও কর্তব্য, প্রীতি ও সেবার দ্বারা পূর্ণ। এ জীবনকে অনুশীলন করাই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য। যে যুগে ক্ষমতালোলুপ মানুষ নিজ স্বার্থকেই পরম কাম্য এবং তাহার পরিপূরণার্থ সর্বশ্রেণীর হীনতাকেই বরণীয় মনে করেন, সেই যুগে শ্যামাপ্রসাদের মত মহামানবের আবির্ভাব ভগবানের আশীর্বাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। অগ্নিদগ্ধ জীবনে শ্যামাপ্রসাদ শান্তিবারি। শ্যামাপ্রসাদের কর্মবহুল জীবন অনুকরণযোগ্য—এই জীবনেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় নিহিত, জীবনী-রচনা সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। এ পরিচয় নিহিত রহিয়াছে সাহিত্য ক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারে—মানবজাতির সর্ববিধ কল্যাণময় ক্ষেত্রে।

একটি ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা

জগতে অনেক বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আমার কাছে জীবন্ত বিস্ময় গত ২৮শে আশ্বিনের রাত্রি। সেদিন যে ভয়ঙ্কর-সুন্দরের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম তাহার স্মৃতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিস্মৃত হইবে না। আজিও তাহার কথা মনে হইলে এক অজানা ভয় ও শঙ্কাতুর বিস্ময় আমার সত্তার অণুপরমাণুতে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি রসের বিচিত্র স্পন্দন জাগাইয়া তোলে।

সেদিন ছিল রবিবার। পূজাবকাশে আমি আমার কাকার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ রওয়ানা হয়েছি। ময়মনসিংহ জিলার একটি পল্লী গ্রামে আমাদের আদি নিবাস। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর আমরা কলিকাতার অধিবাসী হইলেও সেই সাতপুরুষের মাটির মায়া এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই. তাই পূজাবকাশে কাকার পাকিস্তান যাইবার কালে আমিও তাঁহার সঙ্গী হইলাম। আমরা উভয়ে বিকাল পাঁচটায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম। বহু-দিনের ফেলে-আসা জীবনকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে আমার মন আকুল হইয়া উঠিল।

হিন্দুস্থানের সীমা পার হইবার পর গাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়া পড়িল এবং প্রতি ষ্টেশনে অপেক্ষাকালও দীর্ঘতর হইতে লাগিল, ফলে আমরা পরদিন সকাল ১০টার পরিবর্তে বিকাল ৫টায় সিরাজগঞ্জ জাহাজে উঠিলাম। সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মাঝে মাঝে দুই এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার দিকে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম পশ্চিম উত্তর কোণ হইতে একটি বিরাটকায় মেঘ প্রকাণ্ড দৈত্যের মত সমস্ত আকাশকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। জাহাজ কর্তৃপক্ষ যাত্রীদিগকে জানাইয়া দিল—'আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনায় জাহাজ এখন ছাড়া হইবে না।' আশ্বিনের ভরা পদ্মা দুই কূল প্লাবিত করিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়—জল ছাড়া কোন গ্রামের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। আমি পদ্মার এই রাক্ষসী মূর্তি আর কখনও দেখি নাই। অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করিতে

লাগিল। তথাপি ভরসা হইল, জাহাজ তীরে নোঙ্গর করা আছে—জাহাজ-ডুবির আশঙ্কা নাই। ঝড়ের বুকে পদ্মার এই সর্বগ্রাসী মূর্তি আরও কত ভয়াল হইয়া উঠে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার দুর্দম বাসনা লইয়া পদ্মার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছি। হঠাৎ এক বিরাট শব্দে আমার তন্ময়তা কাটিয়া গেল। পশ্চিমের দিকে চোখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। আদিগন্ত একটি নিকষ কাল পর্বত মূর্তি যেন বিকট শব্দে কর্ণরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া ভীমবেগে ছুটিয়া আসিতেছে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য। 'শ্রীকান্তে'র ঝড়ের কাহিনী পড়িয়াছিলাম কিন্তু জীবনে ইহাকে বাস্তবানুভূতির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিব কখনও ভাবি নাই। জাহাজের পাশের ত্রিপলগুলি আগেই নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের মধ্যম শ্রেণীর সামনে তবুও অনেকটা ফাঁক ছিল। তাহার মধ্য দিয়া দেখিলাম উত্তাল পদ্মার উন্মত্ত তরঙ্গের সঙ্গে ঝড়ের মাতামাতি বিদ্যুতের অসংখ্য লেলিহ জিহ্বার ক্রুর বক্রবাগে অন্ধকারের বুক চিরিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। আমাদের জাহাজটি একবার উঠিতেছে একবার নামিতেছে। আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণে বজ্রাধী ক্রোধবহ্নি ছড়াইয়া চতুর্দিকে বিশ্বচরাচর কাঁপাইয়া পুঞ্জীভূত আক্রোশে মহানাদে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার এই মহাগ্রাস হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার বুঝি বা কোন উপায় নাই। বিদ্যুদালোকে দেখিলাম—সুরু হইল রুদ্রের তাণ্ডব নর্তন। বজ্রপতনের কর্ণবিদারী ধ্বনি, ভীত মনুষ্যকণ্ঠের আর্ত চীৎকার, নীড়চ্যুত বিহগের করুণ বিলাপ, মৃত্যুভীত জীবের আর্তনাদ অন্ধকারের বুকে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

প্রমত্তা পদ্মা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ফেনশীর্ষ তরঙ্গ-গুলি রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া বিপুল স্পর্ধায় যেন আকাশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছে। শত শত ক্রুদ্ধা মহানাগিনীর ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া চারিদিকে আতঙ্ক ছড়াইয়া চলিয়াছে। সহসা সুরু হইল প্রবল বর্ষণ, উপরে বরুণদেবতার রুদ্ররোষ নীচে রণোন্মাদিনী খেয়ালী পদ্মার প্রলয়ঙ্কর মূর্তি—মনে হইল মাঝখানের ব্যবধানটুকু মুহূর্তেই বুঝি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। পদ্মার বুকে কখনও নামিয়া আসে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার—সে অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ না করিলে শুধুমাত্র বর্ণনার দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়ার সাধ্য নাই—কখনও বা হাসিয়া উঠে বিজলীচমক—বুঝি বা মনে হয় ব্যঙ্গহাসি—পরক্ষণেই অট্টরোলে আকাশ খণ্ড বিখণ্ড হইবার

উপক্রম হয়। এমনি করিয়া সারারাত্রি চলিল। সকালের দিকে ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইল। সেদিন দুর্যোগ-রাত্রির পরিবেশে মহা ভয়াল পদ্মার বুকে জীবনমৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া মহাঝড়ের যে 'ভীষণং ভীষণানাম্' ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, স্মৃতির মণিকোঠায় তাহা আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

সংস্কৃতে একটি কথা আছে, 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ' উদ্যোগী পুরুষেরাই লক্ষ্মী লাভ করেন। বস্তুত যাহারা অলস ও কর্মবিমুখ তাহারা জগতে কোন উন্নতি করিতে পারে না। উদ্যমহীনতা প্রগতি বিরোধী। সংসার-কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যবিমুখ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জীবনকে সুন্দর ও সফল করিতে হইলে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হইবে। কর্মক্ষমতা মানুষের সকল জড়তাকে দূর করিয়া তাহাকে অনন্ত শক্তির অধিকারী করে। মানুষ তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা। ভাগ্য নক্ষত্রে গড়ে না, মানুষই নিজের ভাগ্যকে গড়িয়া তোলে। জীবনের সকল পর্যায়ে সকল অবস্থাতেই যে নির্বিকার থাকিয়া অবিরাম সংগ্রাম করিয়া থাকে, ব্যর্থতার বেদনাও যাহাকে কর্মবিমুখ করিতে পারে না—সফলতার জয়মাল্য একদিন না একদিন সে লাভ করিবেই।

আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা মানুষের জীবনকে কতখানি ব্যর্থতা আনিয়া দেয়, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অলস ব্যক্তি কখনও আত্মবিশ্বাসী হইতে পারে না। জীবনের সহজ সাবলীল প্রাণপ্রাচুর্য হইতে সে বঞ্চিত হয়। আপন মনের জড়তায় আচ্ছন্ন থাকিয়া জীবনের চারিপাশে শুধু অবসাদের প্রাচীর রচনা করিয়া চলে। দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মনের দিক হইতে সে চিরদিন দুর্বল থাকিয়াই যায়।

মানুষ অনন্তশক্তির আধার। সে বিরাট শক্তি মানুষের অন্তরের মধ্যেই নিহিত আছে। সেই শক্তির জাগরণে ও প্রস্ফুরণে মানুষ পূর্ণাবত মানুষ।

এই অনন্তশক্তির জাগরণ ঘটে নিয়ত কর্মচক্রের আবর্তনে। কর্মপ্রবাহের মধ্যে দুর্বার বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িলে দেখিতে পাওয়া যাইবে সফলতার সহস্রদল ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে জীবনস্রোতের অমল স্বচ্ছতার মধ্যে। তখনই মানুষ লাভ করে সত্যকার আনন্দ। অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মসম্পাদনের মধ্যে যে অনাবিল আনন্দ আছে তাহার পূর্ণ স্বাদ লাভ করিয়া মানুষ জীবনকে করে সার্থক। কিন্তু অলস ব্যক্তির পক্ষে সে আনন্দ লাভ কখনও ঘটিয়া উঠে না। অতএব জীবনের প্রকৃত আস্বাদ হইতে সে হয় বঞ্চিত। যে ব্যক্তি কখন নিজের অন্তরশক্তির পরিচয় পাইল না, যে জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝিল না, যে জড়তার পশরা মাথায় করিয়া চিরজীবন ব্যর্থতার বেসাতি করিয়া চলিল, তাহার মত অভাগা কে?

কর্মই জীবন, কর্মহীনতাই মৃত্যু। জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে আয়ুর দীর্ঘতার মধ্যে নয়, কর্মশক্তির তীব্রতার মধ্যে। জীবনের পথ সহজ সরল নয়, বড়ই দুর্গম, পতন অভ্যুত্থানবন্ধুর। বাধাবিঘ্ন, বিপদ-আপদ জীবন-পথের নিত্য সহচর। নিশ্চেষ্টতা মানুষের মনকে একবার পাইয়া বসিলে এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি থাকে না, পতন-অভ্যুত্থানবন্ধুর জীবনপথে চলিবার মনোবল থাকে না, বিপদ অতিক্রম করিবার সাহস ও বৈবশ্য লোপ পায়, তখন জীবনের সার্থকতা হয় সুদূরপরাহত, ভাগ্যলক্ষ্মী হন অপ্রসন্ন, জীবন হইয়া উঠে দুর্বহ।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন, তাহা একটি বিরাট সংগ্রামক্ষেত্র। সেখানে একটি মুহূর্ত নষ্ট করিলে চলিবে না—নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না, দুর্বল হইলে চলিবে না, বীর্যবান, শক্তিমান হইতে হইবে। সবল ও বলিষ্ঠ আত্মার অধিকারী হইতে হইবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য', অখণ্ড নিষ্ঠা লইয়া, সাধনার একাগ্রতা লইয়া, জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। নিয়ত চলার প্রাণবাণীকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সকল জড়তার মোহনির্মোক পরিত্যাগ করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। জীবন ও জগতের গভীরতর তাৎপর্য বুঝিয়া লইয়া সকল নিশ্চেষ্টতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার মূল্য বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই ঋজুমুক্ত গতিমান জীবনের আলো ফুটিয়া উঠিবে, আলস্যের কুহেলিকা দূরীভূত হইবে।

বৈজ্ঞানিক যুগের জগৎ আজ দুর্বার গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'জগৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও হইতেছে 'নিয়তচলা'। অতএব এই পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সমানতালে চলিতে হইলে মুহূর্ত বসিয়া কাটাইবার অবসর নাই। যে বসিয়া থাকিবে জগতের বুকে তাহার অবলুপ্তি অনিবার্য। মানব সভ্যতার ইতিহাস আমাদের নিকট এই সত্যই উদ্ঘাটিত করে। কর্মহীন অলসজীবন পুঞ্জীভূত বেদনার করুণ কাহিনী—দুর্ভাগ্যের মসীলিপ্ত তমসায় সমাচ্ছন্ন। সে জীবনে কখনও সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে না।

মানুষ নিজেই তাহার ভাগ্যবিধাতা (Man is the architect of his own fate.) লক্ষ্মী চিরচঞ্চলা, মানুষের গতি দুর্নিবার! সফলতাকারী জীবন কখন ভাগ্যের কৃপাভিক্ষা করে না। সে জীবন সকল জড়তা বর্জনকারী সম্মুখাভিসারী কর্মচঞ্চল জীবন। পৃথিবীর বুকে নূতন তৃষ্ণা লইয়া নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা লইয়া জটিল কুটিলপথ অতিক্রম করিয়া উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; কণ্ঠে তাহার চলার বাণী—

শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষ্যি, আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও চলেছ চপলা লক্ষ্মী আলেয়া-হাস্যে বাঁধিয়া।
পূজা দিয়ে পদ করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা, আনিব তোমারে বাঁধিয়া।

তোমার দেখা একটি মেলা

ময়মনসিংহ জিলার উত্তর-পূর্ব কোণে সোমেশ্বরী ও গোমতী নদীর সঙ্গমস্থলে বিলাসপুর গ্রাম। গ্রামটি খুব প্রাচীন। ইহার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সোমেশ্বরীর তীরে সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। অনেকের ধারণা মন্দিরটি পাঁচশত বছরের পুরাতন। গতশতাব্দীতে এখানকার স্থানীয় জমিদার মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়াছেন। মন্দিরে এখনও বিগ্রহ পূজা চলে, ইহারও ব্যবস্থা জমিদারই করিয়াছেন। মন্দিরের সামনে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখে বট ও সপ্তপর্ণীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায়

প্রতিবৎসর বিষুব সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে। কয়েকবছর আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এখানকার মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের প্রধান আকর্ষণ মেলা হইলেও এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাও আমরা শুনিয়াছিলাম।

মেলার দিন সকালে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া রওয়ানা হইলাম। বিলাসপুর গ্রামের নিকটেই অন্য একগ্রামে আমার আরেক বন্ধুর বাড়ী ছিল। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া বিকালের দিকে আমরা সকলে মিলিয়া মেলায় উপস্থিত হইলাম। মেলাটির দক্ষিণে ও পশ্চিমে কলনাদিনী ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী অতিমন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। পূবে অবারিত মাঠ ধূসরদিগন্তের বলয়-রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে। উত্তরে একটি শুষ্কপ্রায় বিল। তাহার উত্তরে পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য। নদীর তীরে অগণিত বিপণিশ্রেণী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত। নদীতে অসংখ্য পণ্যবাহী নৌকা সারিবদ্ধ। উত্তর দিকে বিলের তটসীমা পর্যন্ত মেলার জন্য সাময়িক ভাবে তৈরী বহু চালাঘর। পূর্বদিকে মাঠের মধ্যে কিছুটা দূরে সার্কাসের ছাউনী পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে হাতী, ঘোড়া, বাঘ ও ভল্লুক ইত্যাদি পশু ও জন্তু সংগ্রাম বাঁধিয়াছে। বাঁশ, হোগলা ও দরমা দিয়া অসংখ্য ছোট ছোট ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে গাছ ... ভরা পাহাড়ের চি... ... পরিবেশে যেন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বাচলে দেখা দিয়াছে বাঁকা রজনীর চাঁদ। মানুষের কলকোলাহলের অতিসান্নিধ্যে প্রকৃতির এই নয়নাভিরাম দৃশ্য ক্ষণতরে আমাদিগকে যেন অন্যজগতে লইয়া গেল। হঠাৎ একটি করুণ ক্রন্দনে আমাদের তন্ময়তা ভাঙ্গিল। দেখিলাম একটি ছোট ভিখারী শিশু তাহার মায়ের ভূলুণ্ঠিত দেহের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেখানে উঠিয়া গেলাম। আমাদিগকে দেখিয়া ভিখারিণীটির চোখের কোণে অশ্রু ঝরিল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, সারাদিন সে কিছুই খায় নাই। শিশুটিকে বুকের দুধ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নাই। আমরা আমাদের একজনকে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার ও একটু দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পাঠাইলাম। খাবার দেখিয়া আনন্দে ভিখারি... চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুটি দুধ পাইয়া শান্ত হইল। খাওয়ার ... পর ভিখারিণীটি একটু সুস্থ হইলে আমরা প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া ভিখারিণীকে দান করিলাম। দুইটি গভীর কৃতজ্ঞতা ভরা

দৃষ্টি লইয়া ভিখারিণী আমাদের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। মুহূর্তে মনে হইল আমাদের মেলায় আসা দিনটিকে বিধাতা যেন পরিপূর্ণ সার্থকতায় ভরিয়া দিয়াছেন।

বিধাতার প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জানাইতে জানাইতে আমরা মেলাপ্রাঙ্গণের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। সুদূর পল্লীর নিভৃত বক্ষ সূর্যাস্তের পর আলোক সমারোহে অলকাপুরী ভ্রম হইল। সার্কাসের ক্রীড়াদর্শনেচ্ছু মত্ত জনতার ভিড়ে কাপড় বাঁচাইয়া পথচলা দুষ্কর হইল। রেকর্ডের উচ্ছল আনন্দসঙ্গীত সান্ধ্য পরিবেশের বুক চিরিয়া গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। কয়েকটি পার্বত্য নরনারী নিকষকৃষ্ণ দেহ লইয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। অদূরে দেখা গেল সরকারী প্রচার বিভাগের কর্মচারীরা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নিরক্ষর চাষীসম্প্রদায়কে দেশোন্নয়ন প্রচেষ্টা বুঝাইয়া দিতেছেন। মাঝে মাঝে ঔষধের বিজ্ঞাপনওয়ালার তীব্রকণ্ঠ দর্শনরত জনতাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে।

জনপ্রবাহের মধ্যে চলিতে চলিতে কখন যে আমরা সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের শিলাচত্বরের কোণে আসিয়া পৌঁছলাম বুঝিতেই পারি নাই। দেখিলাম পাশাপাশি কয়েকখানি ঘর। অধিক অপেক্ষাকৃত বড় একটিতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মকক্ষ। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক সাদাপোশাক পরিয়া সবুজ ব্যাজ লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠাইতেছে। আর একটি ঘরে পুলিশ কর্মচারীদের অফিস বসিয়াছে। মেলাপ্রাঙ্গণে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

মেলায় প্রবেশ করিবার পূর্বে আমরা সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। অত্যধিক লোকের চাপে আমরা বিগ্রহের কাছাকাছি যাইতে পারিলাম না। দূর হইতে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মন্দির পরিত্যাগ করিলাম। এবার আমাদের দৃষ্টি পড়িল সোমেশ্বরীর বিস্তৃত তটভূমির উপর। দেখিলাম সেই বালুকারাশির উপর নানা রকম পুতুলের দোকান। রকমারি পুতুলশিল্পের বৈচিত্র্যে আমরা বিস্মিত হইলাম। মেলার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিচিত্র পণ্যসম্ভারের অপূর্ব সমাবেশ। একসারিতে মিষ্টান্নসজ্জিত বিপণিশ্রেণী, অন্যান্য সারিতে কাপড়, জামা, জুতা, কাঁসা পিতল, খেলনা, প্রসাধনদ্রব্য, বেত ও কাঠের আসবাবপত্র, হাতীর দাঁতের পাটি ও নানাবিধ নয়নরঞ্জন দ্রব্যের

দোকান মেলার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্রেতাবিক্রেতার গোলমালে মেলাপ্রাঙ্গণ সততমুখর হইয়া উঠিল। কোথাও পুতুলনাচ হইতেছে। কোথাও বা ক্রীড়া-কৌতুক দেখাইবার অপূর্ব ব্যবস্থা হইয়াছে। কোথাও বা বাজীকর ডুগডুগি বাজাইয়া ক্রীড়াকৌশল দেখাইতেছে। একটু আগাইয়া দেখিলাম একটা বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। আমরা জনপিছু এক আনা দিয়া প্রদর্শনীতে ঢুকিলাম। সেখানে অনেক আগেকার উৎকৃষ্ট মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠশিল্পের সমাবেশ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। শিক্ষামূলক বিভিন্ন চিত্র ও তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ লক্ষ্য করিলাম। মেলার শেষপ্রান্তে আসিয়া আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। তখন গোধূলির সোনালী আলো সারা পশ্চিম আকাশকে অলক্তরাগরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষীণতোয়া তটিনীর স্বচ্ছজলের বুকে পড়িল আকাশের প্রতিবিম্ব, মনে হইল—

ঝলিতেছে কী তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল
দিগ্বধূ যেন অশ্রু ছলছল

হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল উত্তর দিগ্বলয়ে। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিলাম পাহাড়ের ধূসর ম্লানিমার মধ্যে মাঝে মাঝে আগুনের অজস্র ফোয়ারা। ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ়তর হইয়া আসিল। অদূরে দেখিলাম ধুনি জ্বালাইয়া একজন নগ্নপ্রায় সন্ন্যাসী, মুখে তাঁহার প্রশান্ত জ্যোতি। নিষ্ঠার কঠোর শান্তি ও বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্যের মধ্যে আত্মসমাহিত। আমি নিষ্পলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি যেন এ জগতের কোনো কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। ভাবিলাম সকল চঞ্চলতা, মুখরতা ও আবিলতার মধ্যে সত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন এই তপোমূর্তি দর্শন করিয়া প্রাণপুরুষের গভীরতর ও বিশুদ্ধতর পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিলাম। আজিকার মেলার দুইটি স্মৃতি চিরদিনের জন্য আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিল।

———

পশ্চাতে রেখেছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

মানুষ বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। অন্যান্য জীবের মত সে অন্নময় ও প্রাণময় সত্তার খোরাক যোগাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। যে মনোময় সত্তা, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার অধিকারী, তাহার চাহিদা আরও বেশী, সে জগৎকে ও জীবনকে একটা সুসমঞ্জস বিকাশ ও পরিণতির পথে ক্রমাগত আগাইয়া দিতে চায়; পরিবেশকে আরও সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে। শ্রেয়ৈষণার প্রেরণা লইয়া নিজকে সকলের মধ্য দিয়া বিলাইয়া দিতে চাহে—বিশ্বের মধ্যে নিজকে উপলব্ধি করিয়া সহৃদয় হইয়া উঠে। তাই মানুষ একক পশুজীবন যাপন করিতে পারে না, সৃষ্টি করিয়াছে সমাজ,—সংঘবদ্ধ শক্তির সংহতি। এই সমাজ মানব মহিমার মহত্তর নিদর্শন।

এই সংবদ্ধতা ও সহযোগিতামূলক জীবনধারা একদিকে যেমন সমাজ রচনা করিয়াছে অন্যদিকে তেমনি মানুষের অন্তরের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধনে সহায়তা করিয়াছে। এককথায় মানুষের সমাজচেতনার সঙ্গে হৃদয়সংবেদনাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাই মানুষ একার জন্য শুধু ভাবে না, সবার জন্যও ভাবে। নিজের উন্নতি শুধু চায় না, সমাজের উন্নতিও কামনা করে এবং যেখানে মানুষ প্রগতির পথে নিজের সঙ্গে সকলের, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে সেইখানেই গড়িয়া উঠে আদর্শ সমাজ। প্রাচীন যুগে আমাদের গৃহাশ্রম ধর্ম এই সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, মানুষকে সত্যকারের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে সমাজে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অভাব হইলে সমাজের ভারকেন্দ্র বিপর্যস্ত হইবে অনিবার্য। একটি অংশকে বাদ দিয়া অথবা উপেক্ষা করিয়া অন্য অংশ উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে পারে না। প্রতিটি মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা, প্রগতির দিকে ক্রমাগ্রসর গতি ও আন্তর শক্তির সম্যক বিকাশের উপর সমাজের প্রগতি নির্ভরশীল। মানুষমাত্রেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির

জন্যই মানুষের সেই অধিকারগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন। মানুষের এই মৌলিক অধিকারগুলিকে দলিত করিয়া, তাহাদের রক্তশোষণ করিয়া কেহ যদি সমৃদ্ধির অভ্রস্পর্শী প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চায়, তবে তাহার স্বার্থক্লিষ্ট প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত নির্মম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে সন্দেহ নাই। সমাজদেহকে জীবদেহের সঙ্গে উপমিত করা যায়। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টিতেই জীবদেহের পরিপুষ্টি। একটি অঙ্গ রোগগ্রস্ত হইলে সমগ্র দেহ পীড়িত হইয়া পড়ে, দেহের পরিপুষ্টি ব্যাহত হয়। তেমনি সমাজের কোন অংশ যদি অশিক্ষা, কুসংস্কার, অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের মধ্যে পড়িতে থাকে, তবে অন্য অংশের আগাইয়া যাওয়ার প্রচেষ্টা যতই অকপট হউক না কেন, তাহার গতি ব্যাহত হইবেই। যাহারা পিছনে পড়িয়া রহিল তাহাদের বঞ্চিত জীবনের সঞ্চিত ক্ষোভ ও পুঞ্জীভূত বেদনা অহরহ সমাজের প্রগতিশীল অংশকে নীচের দিকে টানিয়া নামাইবে। জীবদেহের একটি অঙ্গের পীড়া যেমন সমগ্র দেহের উপর প্রতিক্রিয়া ছড়ায়, তেমনি পরিবারের কিংবা সমাজের ব্যষ্টি মানবের উপরে উহার সুখে অসাম্য ও দুর্নীতির বাধা-বিঘ্ন সমগ্র পরিবার ও সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া ছড়াইবে। পরিবারের দুইটি লোককে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের অংশ আত্মসাৎ করিয়া যদি অন্য লোক নিজ সমৃদ্ধি ও উপভোগের সৌধ নির্মাণ করিতে চায় তবে তাহা তাসের ঘরের মতই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। ইহা কবিকল্পনা বা ভাববাদী উর্বর মস্তিষ্কের ভাবনা নয়, রূঢ় বাস্তবের বুকের উপর বৈজ্ঞানিক সত্য। জগতের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই আমরা এই সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিব।

মানুষের মধ্যেই নারায়ণের অধিষ্ঠান, তাই মানব নরনারায়ণ। এই নরনারায়ণকে উপেক্ষা করিয়া, বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া আমরা কোন স্বর্গের দেবতাকে বন্দনা করি। প্রত্যক্ষ সত্যকে অবহেলা করিয়া জগতের বুকে বিধাতার অভিশাপ কুড়াইয়া বেড়াইতেছি। তাই বিধাতার রুদ্ররোষে স্বৈরাচার, অত্যাচার আর নির্মম শোষণের বুকে জাগিয়া উঠে বিপ্লব, দেখা দেয় বিদ্রোহবহ্নি। স্বৈরাচার অত্যাচারকে রক্তের মূল্যে পাপক্ষালন করিতে হয়।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও লোভপরায়ণতা সমাজের বুকে দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে আনয়ন করে ভেদবুদ্ধি, মানুষকে অর্থগৃধ্নু করিয়া দানবে পরিণত করে, ব্যক্তিগত লালসাকে অপরিমিতভাবে বাড়াইয়া দেয়। ইহা সমাজকেন্দ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ, মানুষের মন হইতে একাত্মবোধ

মুছিয়া দিয়া, সমষ্টিগত সংহতিকে বিলুপ্ত করিয়া প্রগতির মূলে দারুণ আঘাত হানিয়াছে, সমাজ ও জগতের মধ্যে অসাম্য ও অনাচারের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজে আজ এক অংশকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদের জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করিয়া অন্য অংশ লোভলালসায় আত্মহারা হইয়া আত্মসুখ অন্বেষণের মায়ামরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর একটি দেশ অন্যদেশের উপর স্বৈরতন্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া চরম বর্বরতার পরিচয় দিতেছে।

তাই আজ পৃথিবীর বুকে একদল চলিয়াছে ঐশ্বর্যগত শক্তির বিপুল উল্লাসে সমৃদ্ধি ও উপভোগের নব নব পথ রচনায়—তাহারই পিছনে বঞ্চিত দলের মর্মান্তিক আর্তি সুপ্তিহীন উল্লাস-রজনীর প্রতিমুহূর্তকে শিহরিত কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে। সঞ্চয় ও বেদনার ক্ষমাহীন আক্রোশ প্রতিনিয়ত পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করিয়া তুলিতেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি পরিষদেও সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার আদর্শ টিকিতেছে না।

শ্রেণীভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, জাতিভেদ সত্ত্বেও মানুষ যে এক, এই সত্য আজ মানুষ ভুলিতে বসিয়াছে। 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'—কবির মহামন্ত্রের মূল্য আজ আমরা বুঝি না। বুঝি না সমাজের ও বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সুষম সহযোগিতায় মাটির বুকেই রচিত হইবে কল্যাণাবহ স্বর্গ। ভেদবুদ্ধিকে পরিহার করিয়া সৌভ্রাত্রের বাণী লইয়া সকলকে হাতে হাত মিলাইয়া চলিতে হইবে। দ্বন্দ্ব নয়, প্রীতির মন্ত্রে নিজকে দীক্ষিত করিয়া সকলের সঙ্গে একপথে চলিতে হইবে। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্' আমাদের এই প্রাচীন বাণী লইয়া সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। তাহা হইলে দুঃখ দুর্দশার অবসানে অসাম্য অবিচার অত্যাচার অসাম্যের রক্তস্নানে দেবতার অমর মহিমা পুনরায় দেখা দিবে।

জীবন মূল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণ পূত কর্মে

মানুষের আয়ুষ্কাল দীর্ঘও হইতে পারে স্বল্পও হইতে পারে কিন্তু ইহার উপর জীবনের মূল্যায়ন নির্ভর করে না। একটি কণ্টকবৃক্ষ অতিদীর্ঘ হইতে পারে কিন্তু জগতের বুকে উহার মূল্য অতি নগণ্য। কণ্টকভীত মানুষ সব সময়ই তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া থাকে। অন্যদিকে একটি সুগন্ধি পুষ্প অতি ক্ষীণ জীবন বহন করে তথাপি তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া থাকে। ফলে সকলের কাছেই তাহা পরম প্রীতিকর হইয়া উঠে। ফুলটি যখন ঝরিয়া পড়ে তখনও মানুষ উহার কথা ভুলিতে পারে না।

মানুষের 'জীবন মূল্য আয়ুতে নহে' একথা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তবে কিসের উপর জীবনের মূল্য নির্ভর করে? মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জগতে আসে না, নহিলে মানুষে ও ইতর জন্তুতে প্রভেদ থাকিত কোথায়? থাকে না। বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষ এ জগতে আসিয়াছে কর্তব্যের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া; তাহাকে নিরন্তর কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। মুহূর্তের অপচয় জীবনের অবক্ষয়। অখণ্ড কর্মপ্রচেষ্টাই জীবন। কর্মহীনতা ও নিশ্চেষ্টতাই মৃত্যুর নামান্তর।

কিন্তু কর্মেরও আবার রূপভেদ আছে। কর্ম সু ও কু এই দুই উপসর্গকেই গ্রহণ করিতে পারে। কু কর্মের জন্য জীবনভোর তৎপরতা ও অখণ্ড ধৈর্যও কি শ্রেয়বোধে সম্মানিত হইবে? না তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ দুষ্কৃতি মানব-সমাজের কোন কল্যাণসাধনই করিতে পারে না, তাহা পাপের জনয়িতা, শাশ্বত সত্যের বিরোধী। সু কর্মই মানবজীবনের অভিপ্রেত, তাহাই মঙ্গলাবহ। রত্নাকরের দস্যুজীবন কর্মতৎপরতার নিদর্শন হইলেও ঘৃণিত। কিন্তু যেদিন দস্যু রত্নাকর তপস্যার দ্বারা নিজকে পূত করিয়া সর্বকালের মানবের জন্য এক অমৃতময় জীবনসঙ্গীত রচনা করিলেন, সেদিন জগৎকে নূতন করিয়া তাঁহার জীবনের মূল্যায়ন করিতে হইল। অতএব কল্যাণপূত কর্মেই জীবনের মূল্য; এককথায় মানবকল্যাণের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মসম্পাদনই গভীরতর ও সত্যতর অর্থে জীবন।

এই জীবনপিপাসা যাঁহার আছে তিনি কখনও আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব হইতে পারেন না। জগতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁহার নিরন্তর ভাবনা। তিনি উপলব্ধি করেন 'জীবন বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা'। অবারিত কর্মস্রোতে তাঁহাদের সুপ্তশক্তি শতগুণিত হইয়া উঠে।

যাহারা নিজকে ঘিরিয়াই কর্মজাল রচনা করিয়া চলে তাহারা স্থূল অর্থেই মানুষ। আকৃতিতে মানুষ হইলেও প্রকৃতিতে তাহারা পশুজীবনের বড় বেশী উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। সত্যকার জীবনের আস্বাদ হইতে ইহারা বঞ্চিত। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহারা জীবনকে মৃত্যুর গহ্বরে টানিয়া আনে। জীবনে বাঁচিতে হইলে চাই ত্যাগ, সকলের মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দিবার মহৎ প্রবৃত্তি। কারণ—স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ

বৃহৎ জগত হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।

জগতের ইতিহাসে যাহারা নিজকে মানবের বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণ কর্মে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমায় বিরাজমান। সভ্যতার ইতিহাস তাঁহাদের প্রতি কখনও কৃতঘ্ন আচরণ করিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বিশ্বের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। জীবের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষের কল্যাণ সাধনে এই বীরাচারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সেবাব্রত বলিষ্ঠ হস্ত সেদিন যে ভাবে মানুষের দুঃখমোচনে তৎপর হইয়াছিল, মানুষকরার বেদনায় তাঁহার দীপ্তচক্ষু কিরূপ অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কখনও মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে না। বিদ্যাসাগরের জীবনকাল সুদীর্ঘ নহে কিন্তু মানব কল্যাণের জন্য, মানুষের দুঃখ মুছাইবার জন্য বেদনাবিদ্ধ এই মহাপুরুষ যে অশ্রুসাগরের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা কোথায়? কল্যাণপিপাসার মহাব্রত লইয়া যে পুরুষবীর জীবনে একক সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যে মনীষী জাতির মুক্তিপন্থা নির্মাণে অগ্রসর হইয়াছেন, বৃহত্তর কল্যাণে যে মহাত্মা সাম্প্রদায়িক পৈশাচিক উল্লাসের খড়্গাতলে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই রামমোহন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই গান্ধীজীর জীবনের মূল্যায়ন আয়ুতে না কল্যাণ পূত কর্মে? তমসার পরপার হইতে যে ঋষিকবি কল্যাণ সাধনায় জীবনের নিঃশ্রেয়সের বাণী শুনাইয়া জগৎকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন তাঁহার জীবনের মূল্য কি আয়ুতে, না কল্যাণ পূত সাধনায়?

জীবন অনিত্য—চিরকাল থাকিবে না—

"তার নিমন্ত্রণ নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

তথাপি এই অনিত্য জীবনকে নিত্য করিয়া তোলা যায়, ক্ষুদ্রকে করা যায় মহৎ, ক্ষণিককে করা যায় চিরন্তন—কিসের দ্বারা?—কল্যাণ পূত কর্মের দ্বারা। কল্যাণ পূত কর্মই 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবনে' আনন্দের সন্ধান লইয়া আসে, সাজাইয়া দেয় 'রূপহীন মরণেরে অপরূপ সাজে।'

একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

এবার 'চীনা অলিম্পিক দলের' সঙ্গে আই, এফ, এ, দলের যে ফুটবল প্রতিযোগিতাটি হইয়াছিল, তাহা দেখিবার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে 'চীনা অলিম্পিক দল' মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছিল। অতঃপর সমস্ত দল হইতে বাছাই করা খেলোয়াড়গণ লইয়া আই, এফ, এ, দলটি গঠিত হয় এবং চীনাদলকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে।

খেলার ৫।৬ দিন পূর্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি যখন ঘোষণা করা হইল তখন হইতে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে উত্তেজনা ও আলোচনার সাড়া পড়িয়া গেল। টিকিট সংগ্রহের জন্য সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মফঃস্বল হইতে ২।৩ দিন আগেই ক্রীড়ামোদীরা সহরে আসিতে লাগিল। খেলার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বদিন হইতে টিকিট-ক্রেতার ভিড়ে ময়দান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাক্লান্তি ভুলিয়া খেলা দেখিবার প্রমত্ত উল্লাসে সকলেই মজগুল হইয়া উঠিল। কেহ বা বৃক্ষচূড়ায় স্থান গ্রহণ করিল।

বিকাল ৫ ঘটিকায় খেলা আরম্ভ হইল। চারিদিকে জনসমুদ্র। তুমুল হর্ষধ্বনি ও ঘন ঘন করতালির মধ্যে খেলোয়াড়গণ ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। চীনাদলের খেলোয়াড়ের নাম স্মরণ রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আই, এফ, এ, দলের গোলে এস, শেঠ, ব্যাকে টি রহমন ও জোনস্; হাফব্যাকে

সর্বাধিকারী, ক্যাম্পিয়া ও এস, নন্দী ; ফরওয়ার্ডে পি, কে, ব্যানার্জি, সি গোস্বামী, কে পাল, আমেদ খান ও মুসা।

খেলার প্রথম হইতেই চীনাদল অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিল। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহারা মোটেই ছুটাছুটি করিতেছে না, স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া বলটিকে ধরিয়া নিজদলের অন্য খেলোয়াড়ের ঠিক পায়ের কাছে সরাইয়া দিতেছে। বলটি প্রতিপক্ষের দেহস্পর্শ বাঁচাইয়া মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে আর নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে চীনাদলের প্রতিটি খেলোয়াড়। তাহাদের এই সংযম মূলক খেলা দেখিয়া প্রতিপক্ষদল চিন্তিত হইয়া পড়িল ও দর্শকবৃন্দের মধ্যে একটি চাপা বিস্ময় গুঞ্জন করিতে লাগিল। ৫।৭ মিনিট প্রায় এই অবস্থাতেই কাটিল। চীনাদলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড এই সময় একটি বল পাইয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য সোজাসুজি গোলে সুট করিল। দুর্বার গতিতে বলটি আগাইয়া চলিল। আই, এফ, এ, দলের সমর্থকদের মনে আতঙ্কের ছায়া পড়িল। কিন্তু গোলরক্ষক এস শেঠ অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে বলটি ধরিয়া ফেলিল। এইবার বলটি পি, কে, ব্যানার্জির পায়ের নীচে গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে পি, কে, ব্যানার্জি বলটিকে কে, পালের কাছে সরাইয়া দিলেন। কে, পাল অধিকতর ক্ষিপ্রতায় আমেদ খানকে বলটি 'পাশ' করিলেন। আমেদ খান দ্রুতগতিতে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া বল লইয়া আগাইয়া চলিলেন। এবার খেলার মোড় ঘুরিয়া গেল। নূতন উৎসাহ ও উত্তেজনা আই, এফ, এ, দলের প্রতি খেলোয়াড়কে যেন পাইয়া বসিল। টি, রহমানের দীর্ঘ সট্ প্রতিবারই বলটিকে প্রতিপক্ষের গোলের সামনে ফেলিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু ঐ পক্ষের ব্যাক যেন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এই প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বলটিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া বড়ই দুষ্কর হইল। উভয় দলের সমান কৃতিত্বে ক্রীড়ামুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী নিস্পন্দ নির্বাক। এইবার সর্বাধিকারী চীনাদলের সেণ্টার অতিক্রম করিয়া বল লইয়া আগাইয়া চলিলেন। হাফব্যাকের কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটি দারুণ 'হাই শট' করিলেন। বলটি ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে লাগিল গোলরক্ষক বোধহয় মনে করিল বলটি গোলের উপর দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে। বল তখন দুর্ভেদ্য ব্যাকের মাথার বহু ঊর্ধ্বে, অতএব তাঁহার

করিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু জনতার মধ্যে মহাবিস্ময় দেখা দিল যখন ১০০ ফুট উচ্চ হইতে বলটি ক্রমাগত সোজাসুজি নীচের দিকে আসিতে লাগিল। শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষায় তাহারা নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। বিস্মিত জনতাকে মুগ্ধ সচকিত করিয়া বলটি গোলেব কোণ ঘেঁষিয়া গোলসীমানাব মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। গোলরক্ষক বলটির অবস্থান ঠিক আয়ত্তে আনিতে পাবে নাই। সমুদ্রগর্জনে জনকল্লোল এবাব ফাটিযা পড়িল। বিপুল আনন্দে আই, এফ, এ, দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা, সর্বাধিকাবীব করমর্দন কবিল। এমন সময় বিবতিব দীর্ঘ বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বিরতিব পব খেলা নূতন রূপ পবিগ্রহ কবিল। চীনাদল প্রবলবেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ব্যাকেব প্রচণ্ড 'শটে' বলটি চীনাদলেব ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে পাবিল না। কিন্তু অভূতপূর্ব সাফল্য আই, এফ, এ, দলেব মনে নূতন উৎসাহেব সঞ্চাব কবিয়াছিল অতএব তাহাবা পিছু হটিবাব নয়। বলটি দুই পক্ষেব পায়ে পায়ে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু চীনা দলেব প্রতি বিজয়লক্ষ্মী বোধহয় সেদিন সুপ্রসন্ন ছিলেন না। তাই তাঁহাদেব গোল সীমানায় এবাব একটি 'পেনালটি' হইয়া গেল। মুসাব 'শটে' একটি গোল হইযা গেলে চীনাদলেব জয় সুদূব পবাহত হইল। আশ্চর্যেব বিষয় এই যে চীনাদল কিন্তু নিবাশ ও নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহাবা আগেব মতই উল্লাস ও উত্তেজনায় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সকলেব প্রশংসা অর্জন করিল। দর্শকগণেব ঘন ঘন করতালি আই, এফ, এ, দলকে প্রোৎসাহিত কবিতে লাগিল। খেলাব তীব্রতা এবাব চবমে উঠিল। একটি মহাবিস্ময় মাঠেব একপ্রান্ত হইতে অপবপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটিতে লাগিল। চীনাদলের ফবোয়ার্ডেব 'শট্' কবিবাব প্রচণ্ড শক্তি, হাফব্যাকের হেড কবিবাব অভিনব কৌশল, বাইটইনেব 'পাশ' কবিবাব কৃতিত্ব বাববার আই, এফ, এ, দলকে নিরাশ কবিতে লাগিল। এমন সময় আমেদ খান বিপক্ষদলের পক্ষ হইতে বলটি সবাইযা লইযা ক্ষিপ্রগতিতে গোলেব দিকে ছুটিলেন। প্রতিপক্ষেব মনে এবাব আতঙ্ক দেখা দিল। চাবিটি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়েব অভেদ্য ব্যূহকে ভেদ কবিয়া গোলরক্ষক ও ব্যাককে সচকিত কবিয়া তিনি আগাইয়া চলিলেন। চীনের দুর্ভেদ্য প্রাচীবও এবার তাঁহাকে রোধ করিতে পারিল না। শ্বাসরুদ্ধ জনতাব নিষ্পলক প্রতীক্ষা, গোলরক্ষকের সচকিত

উৎকণ্ঠা একটি চরম মুহূর্তের জন্ম অপেক্ষমান। দর্শকের করতালির অভিনন্দন লাভ করিয়া আমেদ খানের তড়িৎগতি 'শট' গোলের মধ্যে বলটিকে ঢুকাইয়া দিল। উচ্চকিত জয়ধ্বনির বিপুল উল্লাস পুলকিত জনতার বুকে উদ্বেল হইয়া উঠিল। জনসমুদ্রের কলগর্জন অসংযত চাপল্যে ফাটিয়া পড়িল। আমেদ খানের উপর মুগ্ধ সমর্থকের অভিনন্দন সহস্র ধারায় উৎসারিত হইতে লাগিল এমন সময় খেলাশেষের দীর্ঘ বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বাংলার প্রধান প্রধান সামাজিক উৎসব

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি উৎসব আছে—যাহা তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব—যাহার মধ্য দিয়া জাতির উচ্ছল প্রাণধারা ও বিশিষ্ট জীবনধারা সদা স্পন্দমান হইয়া উঠে। নানা বিপর্যয় ও জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যেও বাঙালী যে এখনও মরে নাই তাহার প্রমাণ বাংলার উৎসবগুলি। একদিন ছিল যেদিন বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। সোনার বাংলা দুই হাতে তাহার সন্তানকে মুঠা মুঠা ঐশ্বর্য বিলাইয়াছে। উদার আকাশ ও মুক্ত বাতাস দিয়াছে তাহাকে নিটোল স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য। তাই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যেই মঙ্গলময় ধর্মভ রের কল্যাণশ্রীতে গড়িয়া উঠিয়াছিল এই উৎসবগুলি। এইগুলিই সমাজ জীবনের সংস্কৃতি, বাঙালীর প্রাণপ্রবাহকে বক্ষে ধারণ করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া বিংশতাব্দীর তটপ্রপাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জাতীয় জীবনের দুঃখগ্লানি সংকীর্ণতাকে মুছিয়া দিয়া একত্ববোধ, মমত্ববৃত্তি ও শ্রেয়ৈষণার কল্যাণকিরণে এই উৎসবগুলি ছিল শুভ্র সমুজ্জল।

কিন্তু হায়! বাঙালী আজ বড় দুর্যোগের মুখে! বঙ্গব্যবচ্ছেদ আজ তিন-চতুর্থাংশ বাঙালীকে ঘরছাড়া ছন্নছাড়া করিয়াছে। জীবন-মরণ সমস্যাকে বরণ করিয়া সেদিনের সম্পদশালী বাঙালী আজ পথের অনিশ্চয়তার মধ্যে নামিয়াছে।

প্রাণরক্ষার প্রাণান্তকর সংগ্রামে বাঙালী আজ পর্যুদস্ত। আজ তাহার কাছে জীবন একটা বিভীষিকা মাত্র।

তথাপি ইহাও নির্মম সত্য যে বাঙালী এখনও মরে নাই—শুধু জৈবদেহে নয়, মনের দিক দিয়াও তাহার মৃত্যু হয় নাই। তাই এই মৃত্যু-বিভীষিকার মাঝখানে দাঁড়াইয়াও বাঙালী তাহার প্রাণের উৎসবগুলিকে ভুলিতে পারে নাই। এখনও শরতের শিউলিঝরা আঙিনায়, শীতের কুহেলি সন্ধ্যায়, ঋতুরঙ্গ বসন্তের বিচিত্র রঙের খেলায় বর্ষার উদাস বিহ্বলতায় বাংলার ঘরে বাহিরে বিভিন্ন উৎসব বিচিত্র ধারায় উৎসারিত হইয়া আসে।

বাংলা ও বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। এই দুর্গার রূপ কল্পনা বাঙালীর নিজস্ব। দুর্গা মহাশক্তির প্রতীক—বরাভয়দায়িনী ঐশ্বর্যরূপিণী; দশহাতে তাঁহার ভক্ত সন্তানকে শ্রী ও ধী বিতরণ করেন। দক্ষিণে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, বামে বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণি ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—উপরে চালচিত্রে দেবাদিদেব প্রমথনাথ মহাদেব। দুর্গা একাধারে বাঙালীর কাছে মাতা ও কন্যা। পুরাণের রূপ কল্পনার সঙ্গে বাঙালী তাহার ভাব-কল্পনা মিলাইয়া দুর্গাকে আপন হৃদয়ের স্নেহপাত্রী করিয়া তুলিয়াছে। হিমালয়দুহিতা শিবগৃহিণী দুর্গা মাত্র তিনটি দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসেন। তাঁহার আগমনে আকাশে বাতাসে জাগে আগমনীর সুরমূর্ছনা—পতিগৃহে গমনে জাগে বিজয়ার বিরহ-বেদনা। মাত্র তিনটি দিনের আশায় বাঙালীর সারাটি বছর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ছেলেমেয়েদের মুখে আনন্দের অনাবিল হাসি শরতের শিউলি ফুলের মত ফুটিয়া উঠে। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রণাম, আলিঙ্গন, মিষ্টিমুখ চলিতে থাকে। বাঙালী শত্রুমিত্র ভুলিয়া সকলকে আপন বুকে টানিয়া লয়।

দুর্গাপূজা শেষ হইতে না হইতেই দেখা দেয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না প্লাবনের মধ্যে চারিদিকে হাস্যজ্যোতি ছড়াইয়া নামিয়া আসেন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। ঘরে ঘরে বিতরণ করেন ঐশ্বর্য। তারপর একাদিক্রমে আসে কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও কার্তিকেয় পূজা। অমানিশার মধ্যরাত্রিতে মহাকালীর আহ্বান। দীপালীর আলোকসজ্জা, বাজিপোড়ানোর আড়ম্বর মহাশক্তি পূজাকে জমকালো করিয়া তোলে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে বোনেরা ভাইদের কপালে মঙ্গলতিলক আঁকিয়া দীর্ঘায়ু কামনা করে।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বাঙালী পুরনারীরা পৌষ পার্বণের উৎসবে মাতিয়া উঠেন। পিঠাপুলির ধুম পড়িয়া যায়। পৌষের সান্ধ্যগগন সংকীর্তনের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে।

তারপর শীতের কুহেলিতলে দেখা দেয় শ্রীপঞ্চমী। বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানদায়িনী বীণাপাণির আরাধনায় মাতিয়া উঠে। বিদ্যালয়গুলিতে পূজার পবিত্র পরিবেশ রচিত হয়, বালক বালিকারা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিয়া অখণ্ড নিষ্ঠা লইয়া আগাইয়া যায় পূজাবেদীতলে, অকপট হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য উজাড় করিয়া দেয় দেবতার পদমূলে।

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতির বুকে রঙের খেলা—গাছে গাছে নূতন পত্রসমারোহ, মেদিনীর বক্ষে বক্ষে জাগে নবপ্রাণের স্পন্দন। এ হেন মধুর পরিবেশ দেখা দেয় ঋতুরঙ্গ উৎসব শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। আবীরে কুমকুমে বাঙালীর প্রাণমন ও বেশভূষা রঞ্জিত হইয়া উঠে।

বিষুব সংক্রান্তিতে দেখা দেয় বাঙালীর চড়কপূজার উৎসব, ধর্মদেবতার আবাহন। তারপর বছর ঘুরিয়া আসে কিন্তু বাঙালীর উৎসব যেন শেষ হয় না। রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমীর মধ্য দিয়া বাঙালীর বৈষ্ণব ভক্তিবাদ প্রকট হইয়া উঠে। নববর্ষের উৎসবে বাঙালী পুরাতন জড়তা ত্যাগ করিয়া নূতন জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে সর্পভয়ভীত বাঙালী দেবী মনসার পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

এমনি করিয়াই বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই আছে। জীবন-সংগ্রামে জর্জর বাঙালী এখনও আপনার জাতীয় উৎসবগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু পূর্বে যে প্রাণবন্যা এই উৎসবগুলির মধ্য দিয়া বহিত, আজ তাহা যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। আজিকার উৎসবে হৃদয়ের সাড়া নাই, আছে ঐশ্বর্যের বিলাস, নিষ্প্রাণ আড়ম্বরের আতিশয্য। পল্লীকেন্দ্রিক বাংলার সেই আনন্দোজ্জ্বল উৎসবমুখর প্রাণমাতানো দিনগুলিকে কি আর আমরা ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি সে যুগ হইতে চিরতরে নির্বাসিত হইয়াছি? এই প্রশ্ন আজিকার মাইক মুখরিত বিদ্যুদালোকদীপ্ত উৎসবের মধ্যে বারংবার আলোড়িত হইতে থাকে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

শিক্ষা মানবের মানস রসায়ন। ইহা মানব-মনের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি ও বিকাশে সহায়তা করে, মানুষের আন্তঃশক্তিকে জাগাইয়া তোলে, চিত্তবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ সাধন করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার যত বেশী, সে জাতি তত উন্নত।

অন্যান্য জীবজন্তুর শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই। একটি পাখী জন্ম হইতেই পাখী, একটি সিংহ জন্ম হইতেই সিংহ। কিন্তু মানুষ আকৃতিতে মানুষ হইলেও জন্ম হইতে মানুষ হয় না। তাহাকে জীবনপথে মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়া তবে প্রকৃত মানুষ হইতে হয়। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই সে মনুষ্যত্ব অর্জন সম্ভব।

প্রত্যেক মানুষেরই একটি মাতৃভাষা আছে। এই ভাষাতেই জীবনের প্রথম কথাটি মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। এই ভাষাতেই ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করি। ইহা আমাদের সারা জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সহচর। এই মাতৃভাষার মাধ্যমে মনের কথাটি যত সহজভাবে বুঝাইয়া বলিতে পারি, অন্য ভাষায় তেমনটি পারি না।

বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দুইশত বছরের ইংরেজের শাসনে আমরা মাতৃভাষাকে কৃপাকটাক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিলাম। আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ইংরাজীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হইত। ফলে যে শক্তি ও সময়ের অপচয় ঘটিয়াছে তাহাতে আমরা প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সুফল হইতে বঞ্চিত হইয়া এক একটি মসীজীবীতে পরিণত হইয়াছি ও ইংরেজ রাজত্বের বনিয়াদ শক্ত করিয়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছি।

আজ ভারত আর ইংরেজ সরকারের অধীন নহে, তাহাদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বশিক্ষা পদ্ধতিরও বিদায় দেওয়া উচিত। সুখের বিষয় এই যে আজ আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক মান পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে

গ্রহণ করিয়াছি; ইহাতে এখন পর্যন্ত আর কিছু না হউক, একটা বিরাট মানসিক শক্তির অপচয় হইতে কতকটা পরিমাণে ছাত্রসমাজ বাঁচিয়া গিয়াছে। তথাপি উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাব ক্ষেত্রে মাতৃভাষাব দ্বার এখনও উন্মুক্ত হয় নাই।

* বিদেশী ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেব একটা দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়। এই দীর্ঘ সময়ের প্রাণান্তকব প্রয়াসে যতটুকু বিদেশী ভাষা শিক্ষা লাভ হয় তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা। অতএব এই বিদেশী ভাষাকে আবশ্যিক না করিয়া তুলিয়া ঐচ্ছিক কবিয়া লইলে অনেকেই এই মানসিক ও আথিক শক্তির অপচয় হইতে বাঁচিয়া যাইবে। অধিকন্তু যাহাবা বিদেশী ভাষা শিক্ষায় অধিকতব আকৃষ্ট তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। একথা সত্য যে, যে ভাষা আমাদেব হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সতত সংযোগ বক্ষা কবিয়া আশৈশব আমাদেব ভাবেব আদান প্রদানে সুষ্ঠভাবে ক্রিয়াশীল, তাহাকে যদি আমরা সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কবি তবে আমাদেব শিক্ষাব পথ অধিকতব সুগম হইবে। বিশেষতঃ ভাষাব মধ্য দিয়া জাতিব আদর্শ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এক কথায় প্রাণসত্তাটি বিকাশ লাভ করে। এইজন্যই শিক্ষাব ক্ষেত্রে অন্য একটি ভাষার মাধ্যমে জাতিব প্রাণস্পন্দনটকু যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, শিক্ষাব গভীবতব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

অনেকেব মুখেই একথা শুনা যায় যে বাংলা ভাষা দুর্বল। বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা ইত্যাদি ধাবণ কবাব মত অপবিমিত শব্দসম্ভাব ইহাব নাই। এই সব উক্তি খুব ভাবসাম্য যুক্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। সাধু ও অকপট প্রচেষ্টায় মাতৃভাষাব শব্দসম্ভারকে প্রয়োজনমত বাড়াইয়া এইসব শাস্ত্রেব অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মাতৃভাষাব মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে।

উন্নত ভাষা ব্যতীত উন্নত সাহিত্য বচিত হইতে পাবে না এবং উন্নত সাহিত্য না হইলে কোন জাতিও উন্নতিব ও প্রগতিব পথে আগাইয়া চলিতে পাবে না। কাবণ ভাষা, সাহিত্য জাতিব মানসসম্পদ, জাতিব মানস পলিমাটিতে ইহাদেব উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, কাজেই উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে গ্রহণ কবিলে একদিকে যেমন জাতিব প্রাণসত্তা ও আত্মমর্যাদা সোচ্চার হইবে, অন্যদিকে তেমনি ভাষাও পরিপুষ্ট ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিবে।

শিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষার যোগ্যতা স্বীকার এবং কার্যক্ষেত্রে সেই স্বীকৃতির প্রয়োগ করিয়া যে দুইজন মহাপুরুষ বাঙালী জাতির মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন সেই দুই মহাত্মা রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের নাম বঙ্গদেশ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা মানুষের মনের পূর্ণ বিকাশ সাধন করে, স্বাস্থ্য দেহের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি বিধান করে। এই দেহ মনের পূর্ণ বিকাশেই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেহকে বাদ দিলে মনের অস্তিত্ব থাকে না, আবার মনকে বাদ দিলে দেহ জড়পদার্থ মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে দেহ মন পরস্পরের পরিপূরক। একের উন্নতিকে উপেক্ষা করিলে অপরের উন্নতি ব্যাহত হয়।

জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, বড়ই কঠিন, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর। এ জীবনপথে চলিতে গেলে নিরন্তর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; এই চলার পথের পাথেয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না। এই অপরিণত মন লইয়া যেমন কোন উচ্চচিন্তা, উচ্চ-আদর্শ, মহৎজীবন যাপন কল্পনাও করা যায় না, তেমনি দুর্বল দেহ লইয়া সংগ্রামবহুল জীবনের জটিল কুটিল পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টাও বাতুলতামাত্র।

অশিক্ষিত ব্যক্তির জীবন যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবনও তেমনি বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনের স্বচ্ছ প্রবহমানতা স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে থাকিতে পারে না। প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাবে তাহার দেহ বিকল হয়, ফলে মনও পঙ্গু হইয়া পড়ে। স্বভাব-সৌন্দর্য ও সম্ভোগেষণা এই দুই হইতে সে চিরবঞ্চিত। সে পরিবারের গলগ্রহ, সমাজের দুষ্ট ক্ষত, সুন্দর জীবনের জীবন্ত অস্বীকৃতি।

পূর্বকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষা পদ্ধতি ছিল তাহাতে দেহ মন উভয়কে সমান মর্যাদা দেওয়া হইত। ব্রহ্মচর্য ও ব্যায়ামাদির শিক্ষা মনকে পূর্ণ বিকশিত

করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জনে যেমন সহায়তা করিত তেমনি ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম শিক্ষা দেহকে নীরোগ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিত। গুরুগৃহের সংযত নিয়মনিষ্ঠা ও তপস্যারণ্যের পূত আদর্শ যে দেহ মনকে গঠন করিয়া তুলিত তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, দারুণসহিষ্ণু সমুন্নত জীবনাদর্শের উপযুক্ত আধার। সেই ধৃতবীর্য পুরুষদের জীবনে মেকি বা ফাঁকির স্থান ছিল না। তাহারা ক্ষীণায়ু ছিলেন না। শতবর্ষেও তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকিত, মনের চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত, বিশুদ্ধতর চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিত। তাঁহাদের প্রার্থনাই ছিল—

'পশ্যেম শরদঃ শতম্
জীবেম শরদঃ শতম্।'

আজ যে শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাতে দেহ মনকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় না। মনের বিকাশসাধনে যে শিক্ষা প্রয়োজন, আমরা আজিও সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এখনও নানা ত্রুটিবিচ্যুতিতে কণ্টকিত। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দেহের পরিপুষ্টি-সাধন নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। তাই আমরা কুব্জপৃষ্ঠ-ন্যুব্জদেহে অপুষ্টমনে যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বাস্তবজীবনের সম্মুখীন হই, তখন দিশাহারা হইয়া পড়ি।

অতএব মানুষ মাত্রেরই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য দেহ মনের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টিসাধন। সমাজের ও দেশের উন্নতি নির্ভর করে জনগণের উপর। স্বাস্থ্যহীন শিক্ষাহীন মানুষ সমাজ জীবনে বিরাট পক্ষাঘাত আনয়ন করে, দুষ্টক্ষতের মত সমাজ জীবনকে কলুষিত করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি দেওয়া, বালক-বালিকাদিগের সুশিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। জ্ঞানার্জন আমাদের দেহের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া পরমায়ুটুকু পর্যন্ত যেন কাড়িয়া না লয় সেদিকে সম্যক্ অবহিত হইতে হইবে।

আজ আমাদিগকে যেমন একদিকে প্রভূত মানসিক শক্তির অধিকারী হইয়া জননায়ক, চিন্তানায়ক হইতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে জীবন সংগ্রামে বলিষ্ঠ সৈনিক হইতে হইবে। আমরা দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া যাইব, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পর্বত অতিক্রম করিয়া তুহিন মেরু পার হইব। বুদ্ধিতে ও কর্মে দিকে দিকে [illegible] আমাদের অভিযান [illegible] তুলিব। [illegible]

মস্তিষ্কে আর বলিষ্ঠ বাহুর সমন্বয়ে নূতন জীবন রচনা করিব। তাহা হইলে দেখিব সভ্যতার নূতন তোরণ দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে।

দেশের সম্পদ, দেশের শক্তি, দেশের ভবিষ্যৎ—দেশের শিশুগণ। তাহারাই একদিন আদর্শ পিতা হইবে, আদর্শ মাতা হইবে, আদর্শ গণনায়ক হইবে, শিল্পী, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক হইবে। ইহাদের এক একটী জীবনের মূল্য অপরিমেয়। এই শিশুদের জীবনকে স্বাস্থ্যে শিক্ষায় সুঠাম সুন্দর ভাবে গড়িয়া তোলাই স্বাধীন রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ জাতির যাহারা জনক জননী হইবে, তাহাদিগকে তো কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। পিতা-মাতা নীরোগ বলিষ্ঠ সমুন্নত মানসিক শক্তির অধিকারী হইলে তাহাদের সন্তানগণও স্বাস্থ্যবান ও মননশীল হইবে। তাই জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষাকেই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া উচিত। শহরের আলো-বাতাসহীন পরিবেশ হইতে বিদ্যালয়গুলিকে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বাঞ্ছনীয়। প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে উপযুক্ত শরীর চর্চার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাদ্য-দ্রব্যের ভেজাল নিবারণেও রাষ্ট্রকে তীব্র দৃষ্টি দিতে হইবে। বালক-বালিকাদিগকে সংযম, শ্রমনিষ্ঠা ও সদাচার শিক্ষা দিতে হইবে। নিটোল স্বাস্থ্যের নিবিড় শান্তি ও অমেয় আনন্দের মূল্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্র যদি তাহার এই গুরুদায়িত্ব অকপটে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তবেই জাতির কল্যাণ। স্বাধীনতালাভের পর হইতে আমরা সে দিকে দৃষ্টি দিয়াছি, জাতীয় সরকার জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বহুবিধ নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন।

আশা করি শিক্ষা স্বাস্থ্যের সুসমঞ্জস মিলনে বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের যুবসমাজ অনাময় বলিষ্ঠ দেহ, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া ভারতকে পুনরায় সেই স্বর্গে জাগরিত করিতে সমর্থ হইবে—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি...."

‘হাস্যমুখে করব মোরা অদৃষ্টেরে পরিহাস’

মানুষ সাধারণতঃ অদৃষ্টবাদী। সে বিশ্বাস করে অদৃষ্টই তাহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা সবই যেন অদৃষ্টের বিধানে অমোঘভাবে মানুষের জীবনে নামিয়া আসে। তাই অদৃষ্টের হাতে সে অসহায় ভাবে নিজেকে সঁপিয়া দেয়। মনে করে ‘তোমার হাতের পুতুল আমি, যেমনি নাচাও তেমনি নাচি।’

এ হেন মনোভাব মানুষের আত্মশক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলে। পুরুষকার বলিয়া যে একটি জিনিস আছে, ইহার সঙ্গে এরূপ মনোভাব-সম্পন্ন মানুষের সাক্ষাৎ পরিচিতি ঘটিয়া উঠে না। জীবনের মূলে আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে মানুষ কখনও বড় হইতে পারে না। আত্মবিশ্বাস ও পুরুষকার মানুষকে দুর্ধর্ষ শক্তির অধিকারী করে। অদৃষ্ট বা দৈব বলিয়া জীবনে যদি কিছু থাকে থাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু অদৃষ্টের প্রতি দৃক্ষেপ না করিয়া একমাত্র পুরুষকারকে সম্বল করিয়া যে মানুষ জীবনপথে আগাইয়া যাইবে, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়কে তুচ্ছ করিয়া যে অখণ্ড আত্মপ্রত্যয়কে সদা জাগ্রত রাখিয়া কর্মশক্তিকে অতন্দ্র করিয়া তুলিবে, সেই জীবন পথের প্রকৃত আস্বাদ ও আনন্দ লাভে সমর্থ।

জীবনের মূল্য লাভালাভ, জয় পরাজয় ও সফলতা বিফলতার উপর নির্ভর করে না, করে কর্মের উপর। অদৃষ্টের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীলতার উপর। অদৃষ্টের উপর মানুষের কোন হাত নাই কিন্তু মানুষ আপনি শক্তিতে নিজের পুরুষকারকে গড়িয়া তুলিতে পারে, আত্মপ্রত্যয়—কর্মশক্তি পুরুষকার-সাপেক্ষ; দৈব-সাপেক্ষ নয়। অদৃষ্টের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পুরুষকারের নিয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস ও তাহার জন্য নিরন্তর সংগ্রামই জীবন। এ জীবনের সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন টিকিতে পারে না, ‘বিপদ বিস্ময়হত ভয়ে নতশির।’ পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ সেই মানব অদৃষ্টের নির্মম বিধানকে পরিহাসের অট্টহাসিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুর্বার বেগে আপন কর্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া

পড়ে। ধৈর্য ও সহনশীলতা তাহার জীবনের মঙ্গলায়ুধ। অখণ্ড নিষ্ঠা ও জীবনের প্রতি একটা অমেয় প্রীতি তাহার সকল প্রচেষ্টাকে অভিষিক্ত করিয়া রাখে। আন্তর শক্তি তাহার শতগুণিত হইয়া উঠে। সংসার সমরাঙ্গণের সে হয় বলিষ্ঠ সৈনিক। সেই আত্মপ্রত্যয়শীল বীরের তেজস্বিতা অদৃষ্টেরেই আতঙ্কিত করিয়া তোলে। সেই পুরুষ-সিংহের করায়ত্ত পৌরুষের কাছে নিয়তি নত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করে।

অতএব অদৃষ্টের ফাঁস গলায় পরিয়া জীবনকে বিড়ম্বিত করিলে চলিবে না। জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। অদৃষ্টের খেলায় হারজিতে অবিচল থাকিয়া প্রকৃত সৈনিকের মনোবৃত্তি লইয়া হাস্যমুখে কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। অদৃষ্টের উপর বৃথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া নিজের আন্তরশক্তিকে দুর্বল করিলে চলিবে না।

জগতে যাঁহারা মহত্তর জীবনকে বরণ করিয়াছেন তাঁহারা নিজেকে অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দেন নাই। কোন বাধা বিঘ্ন, বিপদ আপদ তাঁহাদিগকে ভয়ভীত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের অদম্য পুরুষকার কোন প্রতিকূল অবস্থার কাছেই নতিস্বীকার করে নাই। সকল প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে বরণ করিয়া আদর্শের তীর্থপথে অকাতরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন।

জীবনের অর্থ যে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে চায়, জীবনকে যে নিবিড়ভাবে আস্বাদ করিতে চায়, তাহাকে বীর্যবান ও নির্ভীক হইতে হইবে। এই বীর্যবত্তা ও অকুতোভয়শীলতা অদৃষ্টের প্রতি তাহাকে পরিহাসনিপুণ করিয়া তোলে। জীবনের বিফলতা ও অদৃষ্টের নির্মমতা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাহার কাছে "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" সকল বিফলতার মধ্যেও সে নির্বিকার, তাহার আত্মপৌরুষ অনমনীয়, আত্মপ্রত্যয় অটুট থাকে। এই যে অনমনীয় আত্মপৌরুষ ব্যর্থতার বুকে দাঁড়াইয়া আপনার জয় ঘোষণা করে, অজ্ঞাত অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেয়ালকে নির্মম উপেক্ষায় দলিত করিয়া কর্মভূয়িষ্ঠ সংগ্রামমুখর জীবনকে বরণ করিয়া লয়—ইহাই মানব মহত্বের নিদান এবং পার্থিবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সহস্রবিফলতার চেয়েও ইহা মহনীয়।

আজ এই প্রগতির দিনে মানুষ নিজকে ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে চায় না। আজ বৃহৎ বিশ্ব তাহাকে আহ্বান করিতেছে। অদৃষ্টবাদের

অহিফেন সেবন করিয়া উন্মাদনাহীন সংগ্রামবিমুখ ক্ষুদ্রজীবনের সুখ দুঃখ নির্লিপ্তের মধ্যে আত্মহারা হইলে চলিবে কেন ? নব নব আকাঙ্ক্ষা, নব নব ক্ষুধা বুকে লইয়া অসাধ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গে অভিযান করিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা,—কর্মমুখরতাই আমাদের নূতন জীবন বেদ।

বিত্ত হতে চিত্ত বড়

'বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের সত্য বাণী'। ভারত কখনও বিত্তকে বড় করিয়া দেখে নাই। তাহার কাছে চিত্তের স্থান বিত্তের বহু উপরে। পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি উপেক্ষা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রাচীন ভারত চিত্তশুদ্ধি ও চিৎপ্রকর্ষের সাধনা করিয়াছে। ঐশ্বর্যের ঔদ্ধত্য চিত্তের ঔদার্যের কাছে বার বার মাথা লুটাইয়াছে। অভ্রস্পর্শী রাজপ্রাসাদের স্বর্ণমুকুট তপস্যারণ্যের চিত্তসমুন্নতির পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ভারত ধনের মানুষকে নয়,—মনের মানুষকেই চিরদিন মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিয়া আসিয়াছে।

বর্তমান যুগ ধনতান্ত্রিক যুগ। বর্তমান সভ্যতা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মানুষের মর্যাদাও অর্থের উপর নির্ভর করে। বিত্তবান ব্যক্তিরাই সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে। বিত্তহীন ব্যক্তি চিত্তবান হইলেও সমাজে উপেক্ষিত ও জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে।

হউক। কিন্তু সমাজের বিশেষত আধুনিক অর্থসর্বস্ব সমাজের মাপকাঠিতে জীবনের সত্য বিচার চলে না এবং জীবনের গভীরতর সার্থকতাও সমাজের উপেক্ষা বা মর্যাদার উপর নির্ভর করে না। চিত্ত মানুষকে উদার, প্রেমিক করিয়া তোলে—সংসারের সকলকে সে আত্মপর নির্বিশেষে বুকে টানিয়া লয়—সকলের প্রতি তাহার সহানুভূতি ও সমবেদনা ঝরিয়া পড়ে। আত্মপরবোধের প্রাচীর তুলিয়া সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে না। তাহার "জীবন বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।"

বিত্ত মানুষকে সকল মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেয়; একটা মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করিয়া হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নাই, সেকথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে সেখানে বিত্ত ও চিত্তের মণিকাঞ্চন যোগ। চিত্তই সেখানে বিত্তকে মহান সার্থকতায় ভরিয়া দেয়।

বিত্ত মানুষকে কঠোর করিয়া তোলে। বৃথা আত্মাভিমানে আপনাকে ঘিরিয়া সংকীর্ণতার জাল রচনা করিয়া চলে। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার অবকাশ ও শক্তি হারাইয়া ফেলে। অর্থসঞ্চয় ও অর্থসংরক্ষণের উৎকণ্ঠা বিত্তবানের চিত্তস্থৈর্য ও মানসিক শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়। হৃদয়বৃত্তিকে সে দুর্বলতা বলিয়া মনে করে। বৃহত্তর জগতের অগণিত মানুষের সুখ দুঃখ বেদনা অনুভব করিতে পারে না। পরের জন্য তাহার অন্তঃকরণে কোন সহানুভূতি, সমবেদনা বা সহমর্মিতা নাই। সে নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব হইয়া উঠে।

চিত্ত মানুষকে সকলের সুহৃৎ করিয়া তোলে। নিপীড়িত মানবের জন্য বেদনার অশ্রু সহৃদয় মানুষকে ব্যাকুল করিয়া তোলে, ফলে সে জগতের দুঃখ মুছাইবার জন্য সেবার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া দেয়। এই সেবাব্রতে তাহার আত্মবশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব-মহিমাকে বরণ করে। হৃদয়ের কোমলবৃত্তির স্ফুরণে সূক্ষ্ম অথচ সংবেদনশীল অনুভূতিগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। জগৎ ও জীবনের এক পরম রহস্য তাহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়।

মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই সৃষ্টির পূর্ণ সার্থকতা আত্মপ্রসারণে, আত্মকেন্দ্রিকতায় নহে। মানব মহত্ত্বে—পশুধর্মে নহে। পশু আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু মানুষ শুধু নিজের জন্য নয়, পরের জন্যও ভাবে—বিশ্বের কল্যাণের কথাও চিন্তা করে, তাই সে মানুষ। বিত্ত মানুষকে এই পশুধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিতে দেয় না। চিত্ত মানুষকে পশুর গণ্ডী হইতে বহু ঊর্ধ্বে মানবধর্মের সমুন্নত আদর্শে পৌঁছাইয়া দেয়; আলোকের পথে, শিবের পথে, সুন্দরের পথে লইয়া যায়।

জগৎ ও জীবন মরধর্মা। একদিন না একদিন জীবনের বিনাশ হইবেই। ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। এই নিয়মের অমোঘতার মধ্যেও কিন্তু মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে—অবশ্য জৈবদেহে নয়—কর্মের মধ্যে, কীর্তির অবিস্মরণীয়তার

মধ্যে। চিত্তই মানুষকে এই অনশ্বর কীর্তির অধিকারী করে। বিত্তের সে শক্তি নাই। বিত্তের কঠিন হর্ম্যতলে নরনারায়ণের আরতি হয় না, অমরার আশীর্বাণী অহমিকার লৌহপ্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসে। চিত্তের উদার দেউলে মানুষদেবতার নিত্য আরতি।

'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'

সৃষ্টির আদিমযুগে মানুষ যখন অরণ্যে ও গহ্বরে বাস করিত, তখনও সে সম্পূর্ণ এককভাবে বাস করে নাই, দুই তিন জন মিলিয়া একত্র বাস করিত। পশু ও পক্ষীদের মধ্যেও অনেকেই দলবদ্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে। জীবজগতের ধর্মই হইল সংঘবদ্ধভাবে বাস করা। সভ্যতার প্রগতিপথে মানুষ পরিবার গড়িল, দল গড়িল, সমাজ গড়িল। সে সংঘবদ্ধতার মূল্য বুঝিল। শুধু নিজের জন্য নহে, পরের জন্য ভাবিতে শিখিল।

মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে মননশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। উন্নততর জীবন যাপনের জন্য তাহার নিরন্তর প্রয়াস। সমাজকে সুন্দরতর ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিবার জন্য নিত্যনিয়ত সে তাহার চিন্তাশক্তিকে নিয়োজিত করিতেছে। দেশের কল্যাণ চিন্তা তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আলোড়িত করিতেছে। মানুষের দুঃখদৈন্য তাহার অন্তরকে বেদনাবিদ্ধ করিতেছে। সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র সর্বোপরি মানুষের জন্য তাহার এই চিন্তা তাহাকে স্বতন্ত্র বা পৃথক হইয়া থাকিতে দেয় না। সেও সমাজের সামাজিক, দশের একজন, তাই সকলের জীবনের সঙ্গে তাহার জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দশের সঙ্গে হাত মিলাইয়া তাহাকে কাজ করিতে হইবে। দশের সঙ্গে একসঙ্গে চলিতে হইবে। দশের মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল। দশের প্রগতির সঙ্গে তাহার প্রগতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের এই উপলব্ধির মধ্যেই 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই বাণীর সার্থকতা।

মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই; বিভেদ বৈষম্যও অনেক, তথাপি এই বিভেদ বৈষম্য, তাহাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না। একটা উচ্চতর আদর্শ, সমুন্নত জীবন-পদ্ধতি সকল বিভেদ বৈষম্যের মধ্যে একটি সাম্যের যোগসূত্র রচনা করে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করে, সকল অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করে। একটা বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা মানুষের সকল বিভেদ বৈষম্যের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সুষমা আনয়ন করে। এই সুষমার মধ্যেই মানবজীবনের শক্তি ও সৌন্দর্য বিধৃত।

এই যে বৃহত্তর কল্যাণ-পিপাসা ইহারই নাম মানবতা বা মানবপ্রেম। ইহারই ফলে প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রত্যেক মানুষেরই সমান উৎকণ্ঠা। ইহারই ফলে ব্যষ্টি সমষ্টিকে আত্মীয় মনে করে। উত্তরমেরুর জন্য দক্ষিণমেরু বিনিদ্র রজনী যাপন করে, প্রতীচীর দুঃখে প্রাচীর অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

বিশ্বের মানবসমাজ আজ অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। এই নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের জন্যই একের বিভ্রান্তি অন্যকে সমপরিমাণে বিচলিত করে। ইঙ্গ-ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ সমগ্র বিশ্বের বেদনাকে উদ্বেল করিয়া তোলে। কোরিয়ায় আণবিক বোমাবর্ষণ সমগ্র জগতকে মীমাংসার জন্য তৎপর করিয়া তোলে। এই সমস্তের পিছনে রহিয়াছে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ কামনা—'সকলের তরে সকলে আমরা' এই উপলব্ধি।

বৃহত্তম মানবতাবোধ মানুষকে ক্রমাগত পরের কল্যাণ-কামনায় নিজকে উৎসর্গ করার প্রেরণা দেয়। সমাজের দুঃখ বেদনা ব্যথাকে তখন মানুষ নিজের ব্যথা বেদনা বলিয়া মনে করে। মানুষের দারিদ্র্য, মানুষের নির্যাতন তাহাকে করুণাকাতর করিয়া তোলে। সেবার মহৎ প্রবৃত্তি লইয়া সে জীবনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সেবার মধ্য দিয়া সে নিজকে বিলাইয়া দেয় পরের জন্য। আত্মোৎসর্জনের মধ্যে উপলব্ধি করে মানবজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ 'জীবন বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।' জীবনের আচরিত কর্মে ফুটিয়া উঠে 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই বাণীর সত্যতা।

জগতের মধ্যে যে মানুষ নিজেকে লইয়া বিব্রত, কেবল আত্মোদর আত্মপোষণই যাহার জীবনের লক্ষ্য, যে আকৃতিতেই মাত্র মানুষ, প্রকৃতপক্ষে সে মানুষ নামের অযোগ্য। পরের জন্য যে ভাবে না, পরের কল্যাণসাধনে যাহার হস্ত প্রসারিত হয় না, তাহার জীবনের কি মূল্য আছে? এই দুঃখদৈন্য-বেদনা-

প্রপীড়িত জগতে, আপদ্ বিপদ্ বন্ধুর পথে কত বিপন্নের করুণ আর্তনাদ, কত দুঃস্থ আতুরের ব্যাকুল আর্তি, কত বুভুক্ষুর অসহায় দৃষ্টি, কত অকিঞ্চনের নীরব দীর্ঘশ্বাস আমাদের পথচলাকে নিত্য নিয়ত বিঘ্নিত করিতেছে। আমরা যদি তাহাদের দিকে উপেক্ষা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাই তবে মনুষ্যত্ব ধর্ম হইতে আমাদের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। আর যদি তাহাদের দুঃখে আমাদের সমবেদনাদ্রব অন্তরের করুণা ঝরিয়া পড়ে, আমরা যদি তাহাদের দুঃখ ঘুচাইবার, জীবনকে সুখী করিবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করি, অশিক্ষিতকে শিক্ষা, অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, গৃহহীনকে গৃহ দেওয়ার—এক কথায় মানবমঙ্গল ব্রত গ্রহণ করি তাহা হইলে এই মাটির ধরায় নূতন পৃথিবী রচিত হইবে, কল্যাণালোকে সমাজজীবন প্লাবিত হইয়া যাইবে।

'বাঁচা' মানেই হইতেছে আত্মপ্রসারণ শুধু আত্মসংরক্ষণ নয়। পরের মধ্যে নিজকে প্রসারিত করিয়া দেওয়ার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। এই সার্থকতার চরম উৎকর্ষ জগতের কল্যাণকর্মে। মানবের কল্যাণকর্মে সর্বদা নিজকে নিয়োজিত করিতে হইবে। সমাজের বুকে বিভিন্ন মঙ্গলধর্মী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া মানুষের কল্যাণ করিতে হইবে। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাতৃসদন, সমবায় ঋণদান সমিতি, সেবাসংঘ, অনাথাশ্রম প্রভৃতি কল্যাণাবহ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অখণ্ড নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজের মধ্যে কোন অংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সকলের সুসমঞ্জস সমৃদ্ধিতে সমাজকে ক্রমাগত সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে হইবে। এই উপলব্ধি যদি আমাদের অন্তরে সত্য হইয়া উঠে তবে অহংবোধে আচ্ছন্ন আত্মাভিমানস্ফীত স্বাতন্ত্র্যবোধ লুপ্ত হইয়া যাইবে। মানুষের মনে এক অপূর্ব সুন্দর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হইবে—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিজকে অন্য হইতে পৃথক করিয়া, অন্যকে অস্বীকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে না;—পরের মধ্যে, সকলের মধ্যে নিজকে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মপর ভেদাভেদকে লুপ্ত করিয়া দেয়। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই বাণী তখন সমাজজীবনে সত্যতর হইয়া উঠিবে। শ্রেয়োবোধের কল্যাণ-কিরণে মানবজীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ধরণীর বুকে নূতন স্বর্গ নামিয়া আসিবে।

একতাই শক্তি

কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বহু লোকের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করাকে একতা বলে। কোন কার্য একজনে যেরূপভাবে সম্পন্ন করে বহুজনে মিলিয়া তদপেক্ষা সুষ্ঠুরূপে উহা সম্পন্ন করিতে পারে। কাহারও দুঃখকষ্ট দেখিয়া বহু লোকের প্রাণ যখন চঞ্চল হইয়া উঠে, সকলে মিলিয়া অকুণ্ঠভাবে যখন তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় তখনই বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে একত্ববোধ জাগিয়াছে। মনুষ্যসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা দেখিতে পাই মানুষ এককভাবে কত অসহায়। কিন্তু যখনই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর তাহাদের জীবন গঠন করে, তখনই মানুষ অমিত শক্তির অধিকারী হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে আমাদের জীবন-ধারণের উপযোগী করিয়া তুলিতে আমাদের প্রতিবেশীদের ও সমাজের অন্যান্য লোকের সহায়তা অনিবার্য রূপেই প্রয়োজন হয়। তাই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন বলিয়াছেন, "Co-operation is life and competition is death."

বাল্যকালে পড়িয়াছি এক কৃষকের গল্প। পরস্পরবিরোধী চারি পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যে এক আটি ছড়িস্বরূপ উপলক্ষ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা একটি সাধারণ গল্পের ন্যায়ই বটে কিন্তু গভীরভাবে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে উহাতে মানব-জীবন ও মানব-সমাজের চিরন্তন সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, যে কেহই অপরের সাহায্য ব্যতীত বাস করিতে পারে না। আজ যদি পৃথিবীতে সমাজ বলিয়া কিছু না থাকিত, 'একতা' কথাটির অস্তিত্ব থাকিত না, তাহা হইলে পৃথিবীর মানুষগণ কবে কোন্‌কালে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত! বাইবেলে আছে, ঈশ্বর প্রথম পিতামাতা আদম্‌ ও ঈভ্‌কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন, "যাও, পৃথিবীতে গিয়া কাজ কর।" কিন্তু তিনি ত' কেবল একজনকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে পারিতেন, দু'জনের কি প্রয়োজন ছিল! এই স্থল হইতে বুঝা যায়, যে একজনের সাহায্য ব্যতীত অপরে বাঁচিতে পারে না। দুইজন না হইলে মানুষের বংশবিস্তার সম্ভব হইত না। যুগস্রষ্টা পরমহংস বুঝিয়াছিলেন যে তিনি একাই

পৃথিবীতে আলোড়ন আনিতে পারিবেন না। তাই যেদিন জগৎমণি সারদা আসিয়া নতমস্তকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন সেইদিন হইতে শুরু হইল ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন। আলো ও অন্ধকারের সম্বন্ধ যেরূপ নিবিড়, দিবস ও শর্বরীর সম্পর্ক যেরূপ প্রবল, পৃথিবী ও স্বর্গ পরস্পব যেরূপ অভিন্ন, মানুষও পরস্পর পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একতার পরিপোষক হইতেছে ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রীতিস্নেহের বন্ধন, উদারতা প্রভৃতি। একতা জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতির মধ্যে ভাববিদ্বেষের বীজ লুক্কায়িত, পরস্পরের মধ্যে যেখানে দলাদলি, সে জাতিব কোনদিন উন্নতি নাই। জাতিভেদ দূব করিবার জন্য মহামতি গোখ্‌লে, মহাত্মা গান্ধীজী, স্বামী বিবেকানন্দ কত না চেষ্টা করিয়াছেন! জাতিভেদপ্রথা যে জাতিব সর্বনাশেব মূল তাহা যে জাতি বুঝিয়াছে সেই জাতিই পৃথিবীব ইতিহাসে চিবস্মবণীয়।

বাশিয়াব ন্যায় সাম্যবাদী দেশ আব নাই। তাই আজ সকল দেশেব শীর্ষে দাঁড়াইয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, "আমবা একই ঈশ্ববেব সৃষ্ট জীব, আমরা ভাই ভাই।" আমেরিকাও সেই একত্ববোধেব জন্যই আজ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে চলিয়াছে। পৃথিবীতে তাই দেখা যায়, যে জাতিই উন্নতিব পথে আগাইয়া চলিয়াছে, সেই তাহাব পথপ্রদর্শক কবিয়াছে একত্ববোধকে।

একতাই বল, একতাই শক্তি। তাই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চল নামি, আষাঢ় আসিয়াছে, চল নামি। যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য।" অপরদিকে ইংরাজ কবি গাহিলেন,

"Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean,
And the pleasant land."

—সত্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণা যদি বিশাল জলবাশি গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে তেত্রিশ কোটী লোক একত্রিত হইয়া কেন ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করাইতে পারিবে না—নিশ্চয়ই পারিবে, তাই ঋষিকবি আশ্বাস-বাণী প্রদান করিয়াছেন, "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

একতা থাকিলে যেরূপ মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সেইরূপ একতা না থাকিলে মানুষকে বহু বিড়ম্বনা সহিতে হয়। ইহাতে ইহার নিদর্শনেরও

অভাব নাই। যদি তক্ষশীলারাজ পুরুরাজের সহিত মিলিত হইয়া দিগ্বিজয়ীর পথরোধ করিতেন তাহা হইলে পঞ্জাব জয় সম্ভব হইত না; যদি পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্র সম্মিলিতভাবে মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে হইত না।

আমরা মানুষ,—একজনের সাহায্য ব্যতীত অপরজন বাঁচিতে পারে না। চারি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিংশ শতাব্দীর এই গৌরবময় যুগে কোন মানুষের প্রতিভার বিকাশ হয় না—নির্জন অন্ধকারে কেহ থাকিতে ভালবাসে না—জনসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন-সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক সকলেই—কিন্তু ইহার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের সেই সমুন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে,

"মোর অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

কবে কোন সুদূর অতীতে কোন্ এক স্বনামধন্য ইংরাজ কবি বলিয়াছিলেন, "Unity is strength.' তাহার পর কত কাল চলিয়া গিয়াছে, কত যুগ দিয়াছে কালের পদতলে বলি। তবু কালের দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, সেই মহামুনিবাক্য আজও আধুনিক যুগের ঋষিকবি বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, "চল নামি, আষাঢ় আসিয়াছে, চল নামি…যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য,…আমরা সকলে মিলিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দিব।" সকল কবির এই উদাত্ত বাণী আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

পৃথিবীতে একপ্রকার লোক আছেন, যাঁহারা নিজেদের জ্ঞান ও শক্তির জন্য গর্ব অনুভব করেন, তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন, সকলেই তাঁহাদের পদানত।

কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁহারা প্রচুর জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ, তাঁহারা কখনও নিজেদের পণ্ডিত মনে করেন না। মূর্খ ব্যক্তিরাই তাহাদের মহান বলিয়া মনে করে। "Empty vessels sound much."—এবং পূর্ণোঽপি কুম্ভো ন করোতি শব্দম্"—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনও তাহার জ্ঞানের জন্য গর্বিত নয়। সে চায় সকলের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে। কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই। "উদারচরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—যাহারা উদারচরিত তাহারা সকলেই বন্ধু। তাহারা যখনই কোন কর্মে অগ্রসর হয় তখনই তাহারা অপরের সহিত পরামর্শ করে কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত তাহারা স্বয়ং গ্রহণ করে। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান কম, তাহারাই কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানে গর্ব অনুভব করে।

পুনরায়, যে দেশ যত ঐক্যবদ্ধ, যত জাতীয়তাপ্রিয়, সে দেশের ভিত্তি তত সুদৃঢ়। আজ সারা ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে প্রাচীন মহাপুরুষের সমুন্নত আদর্শ [illegible] ভারতবাসী আজ [illegible] স্বার্থপরতার নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী আমাদের [illegible] প্রতিক্রিয়াশীলতা।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দশা

'সমাজ' বড় ভীষণ, বর্তমান সমাজের বিশেষ করিয়া বাঙালী সমাজের পরিস্থিতি আরও ভীষণ। আবার এই সমাজের [illegible] রক্ষা করতে প্রত্যেক বাঙালীই একটু শশব্যস্ত। এইরূপ অবস্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দশা—ইহার কথা চিন্তা করিলেই প্রথমে আমাদের মনে পড়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরবস্থা। হয়ত পরিবারের সংখ্যা আট কি নয় জন। সেই অবস্থায় হয়ত গৃহে উপার্জনকারী মাত্র, একজন, অর্থাৎ এই আট কি নয় জনের ভরণপোষণের ভার ঐ একজনের উপর। আবার সেই একজনের উপার্জনের পরিমাণও এই যুগে খুব বেশী হইতে পারে না। সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা আবার নানাপ্রকার অতিরিক্ত খাটিয়া একজন খুব বেশী হইলে ২৫০৲-৩৫০৲ উপার্জন করিতে পারেন। আবার তিনি যদি শিক্ষক হন তাহা হইলে তাঁহাকে ভরণপোষণের জন্য ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত অবিশ্রাম মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে [illegible] এক মাসে

তাঁহার আয় ২০০৲-৩০০৲ টাকার অধিক হয় না। এই ২০০৲-৩০০৲ টাকায় পরিবারের অতগুলি লোকের ভরণপোষণ চালান একজনের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়া উঠে। আবার দেখা যায়—পরিবারের এমন কয়েকজন থাকেন যাঁহাদের কৃপাপরবশে অর্থ সংস্থানের সকল পথই বন্ধ হইয়া থাকে। অনেক সুপুত্র দেখা যায় যাহারা নির্লজ্জভাবে পিতার সামান্য আয় হইতে কিছু অপসারণ করিয়া সিগারেট প্রভৃতি অনাবশ্যক বস্তুর নিমিত্ত ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করে না। পিতার দুর্দশার কথা কিছুমাত্র চিন্তা করিবার অবসর তাহারা বোধ হয় পায় না।

আবার, ভগবানের কি বিধান! মানুষের আয় যত কমিতেছে, দ্রব্যের মূল্য তত বাড়িতেছে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য সামগ্রী ক্রয় করিয়াও এবং অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াও প্রত্যহ এক টাকা খরচ হয়। ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা? সরকার? সমাজ?

এর জবাবে বলা যায় ইহার জন্য দায়ী সরকারের নিষ্কর্মা কর্মকর্তাগণ; যাঁহারা শুধুমাত্র চেয়ারে বসিয়াই অর্থ উপার্জন করেন এবং অপরকে আদেশ করেন। এবং বর্তমান সমাজকেও ইহার জন্য কম দায়ী করা যায় না। কারণ, এই সমাজে অর্থের জোর ছাড়া কোন লোক টিকিতে পারে না। পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে একপ্রকার বলপ্রয়োগ করিয়াই চাঁদা আদায় করা হয় এবং যিনি দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ তাঁহার অপমানের এবং দুর্দশার আর অন্ত থাকে না।

আবার বাঙ্গালী সমাজে বাবুগিরি করা একটি আর্ট। ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন, বাহিরের পরিচ্ছদ দ্বারা ভিতরের অজ্ঞতা ঢাকিবার একটি প্রথা বাঙ্গালী ছাত্রসমাজে বিশেষ প্রচলিত এবং তাহাদের এই ব্যর্থ চেষ্টার ভারও তাহাদের পিতার উপর। আবার সমাজে এমন অনেক ছাত্রও দেখা যায় যাহারা পিতার বহু কষ্টোপার্জিত স্কুলের বেতন দ্বারা আমোদ করিয়া বেড়াইতে কুণ্ঠিত হয় না। পুত্রকন্যার সামাজিক বিলাসিতা, অর্থ উপার্জনের প্রাণপণ চেষ্টা যে কোন মানুষকে উন্মাদ করিয়া তুলিতে পারে। সমাজের রীতিনীতি, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোককে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। বর্তমান সমাজে গরীবের এনট্রান্স নেই, অনুরোধ নেই, মায়া-মমতা নেই, প্রীতি নেই, ভালবাসা নেই, আছে শুধু জঘন্য স্বার্থপরতা, নির্লজ্জ বিলাসিতা, অসহনীয় অত্যাচার। এর দ্বার খোলা আছে ধনীদের জন্য, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য নহে, এখানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য আছে নির্মম দুর্দশা।

ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র

প্রতিবেশী কে ?

যে বিপদে, আপদে, সম্পদে, উৎসবে, সকল সময়ে তাহার পার্শ্ববর্তী জনের সহিত থাকে, সেই প্রকৃত প্রতিবেশী। এখন ঠিক এইরূপ প্রতিবেশী ভারতের কি আছে? এত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ভারত কি তাহার সমদুঃখে দুঃখী খুঁজিয়া পায়? যদিই বা এমন কোন প্রতিবেশী থাকে তাহা হইলে ভারতের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? আর প্রকৃত প্রতিবেশী যাহারা নয় তাহাদের সহিতই বা ভারতের সম্পর্ক কি? ভারত কি কাহাকেও ঘৃণা করে? ভারত কি কাহারও হিংসা করে?

এই এতগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তানের কথা। এই পাকিস্তানের সহিতই ভারতের সম্পর্ক নিবিড়, ইহার সহিতই আবার ভারতের আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ। এখন এই ভারত ও পাকিস্তান—দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই আমার হৃদয়ে কিরূপ রেখাপাত করে তাহাই এখানে মূল বিষয়। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা এবং ভারতের বর্তমান অবস্থা—ইহার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দুই রাষ্ট্রের অবস্থা দুই রকম। কয়েক দিন পূর্বেও পাকিস্তানের অবস্থা এইরূপ ছিল যে প্রত্যহ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নূতন নূতন লোককে দেখা যাইত। খুনোখুনি, মারামারি পাকিস্তানের নিত্যনৈমিত্তিক কাযে পরিণত হইয়াছিল। পাকিস্তান চিরকাল আমেরিকার সাহায্যপ্রার্থী। আইসেনহাওয়ার ও ডালেস্ ইঁহারা কি অভিসন্ধিতে পাকিস্তানকে সর্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহা জানা যায় নাই। পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া আমেরিকা ভারতের অবশ্যম্ভাবী পক্ষাবলম্বী রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ লাগাইতে প্রস্তুত। যাহাই হউক ভারত চায় না পাকিস্তানের সহিত বা কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে। সে চায় শান্তি, তাহার জাতীয় পতাকায় চিরকাল শান্তির প্রতীক অশোক-চক্র বিদ্যমান। ভারত চায় না পাকিস্তানের সহিত তাহার শত্রুতা করিতে। কিন্তু, যাহাই হউক, অপর দিকে পাকিস্তানের উদীয়মান নবাগত একনায়ক জেনারেল আয়ুব খান মনে মনে কি দুরভিসন্ধির

জাল বুনিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। তিনি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর ইচ্ছা-শক্তির বিরুদ্ধে যাইবার ক্ষমতা এখন কোন পাকিস্তানবাসীর নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার হঠাৎ আবির্ভাবের কথা কিছু জানিয়া রাখা দরকার। আয়ুব খান ছিলেন পাকিস্তানের সমরবিভাগের একজন প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত। বহুকাল ধরিয়াই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী Iskander Mirza বহু অত্যাচার চালাইতে-ছিলেন। এইজন্য পাকিস্তানেব জনসংঘ মির্জার উপর ক্ষুব্ধ ভাব পোষণ করিতেছিলেন। এই সময় দেশে চোরাকারবারী প্রভৃতি বহু কার্য চলিতেছিল, যাহাব জন্য দেশে অবাজকতা চলিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটময় মুহূর্তে মির্জা হইলেন পদচ্যুত, শুধু পদচ্যুত নয় কারারুদ্ধ। Queta-য় এখন তিনি তাঁহার অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রভৃতি আকাশ-পাতাল কল্পনা করিতেছেন, এদিকে আয়ুব খানের নেতৃত্বে প্রচলিত হইল সামবিক আইন বা জঙ্গী আইন। বহু চোরাকাববারীকে গ্রেপ্তার করা হইল। ভারত হইতে মাল আমদানী-বপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইল। ভাবতের সহিত পাকিস্তানেব শেষ ক্ষীণ মায়াব বন্ধনটুকুও ছিন্ন হইল। ভারতেও কি ঐরূপ সামবিক আইনেব কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? মনে হয় আছে, কাবণ ভাবতেও ঐরূপ চোবাকারবার প্রভৃতি যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য কিছু কম হয় না। তবে এখনও পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের মাথায় ঐরূপ কোন খেয়ালের উদ্ভব হয় নাই। এখন ভারতও রকেট ছাড়িতে শিখিয়াছে, মহাশূন্য হইতে আজ কয়েকদিন হইল একটি টেষ্ট রকেট ছাড়া হইয়াছে, তবে রাশিয়াব রকেটকে স্পর্শ কবিতে এখনও বোধ হয় কিছু দেবী আছে। যাহাই হউক, ভাবত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন রকমের। Gen. Ayub Khan আবার শাসাইয়াছেন যে 'প্রয়োজন বোধ কবিলে তিনি ভাবতেব সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত।' এই কথায়, আমাদের কর্তাগণ কি ভাবিলেন কেই বা জানে। যাক্, যিনি যাই ভাবুন, আমাদের কাজ আমবা কবিয়া যাই।

———

"সংগ্রামই জীবন"

এই পৃথিবী কর্মময়। এস্থলে কর্মের প্রবাহ চলিয়াছে চিরকাল। এক কর্ম-প্রবাহের অবসান নাই, ইহা চিরন্তন। মানুষ কর্ম বিনা বর্তমান যুগে এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না। কর্মের মধ্যেই উন্নতি হয়।

কিন্তু মানুষের এই কর্মপ্রবাহের মধ্যে বাধা-বিঘ্নের উপল খণ্ড অজস্র বিদ্যমান। এই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই কৃতিত্ব। সেই বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইলে তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে হইবে; তবেই হইবে জীবন-যুদ্ধে জয়ী।

তাই কবি বলিতেছেন,

সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করো প্রাণপণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব,
করো যুদ্ধ বীর্যবান যায় যাবে, যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

কবি এই সংসারকে যুদ্ধক্ষেত্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। আবার আর এক ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,

"If there is no great opposition in the game, it is no game."

অর্থাৎ খেলায় যেরূপ প্রবল বাধা না হইলে খেলা সার্থক নয় সেইরূপ জীবনে উন্নতির পথে যদি কোন বাধা না আসে, মানুষ যদি সহজেই উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করে তাহা হইলে জীবন বিফল। কারণ, 'Life is not a bed of roses'—জীবন সুখশয্যা নয়। এখানে প্রতি পদে পদে মানুষ বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছে। সেইজন্য মানুষের রীতিমত সংগ্রাম করিয়া বিপদ এড়াইয়া যাইতে হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে,

'Survival of the fittest'—যুদ্ধে যে যোগ্যতম সেই টিকিয়া থাকিবে। যুদ্ধ করিতে যে অক্ষম তাহার পতন অনিবার্য। সংগ্রামই জীবনকে উৎসাহ দান করে। যতই বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় ততই মানুষ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে।

অর্থাৎ জীবনে উন্নতি করিতে হইলে আমাদের দৃঢ়চিত্তে জীবন-সংগ্রাম ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, সমগ্র বাধ-বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া জীবনের অজ্ঞতার অন্ধকারকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে। এবং সেই-দিনই জীবন হইবে সার্থক, আমরা সংগ্রামে সম্পূর্ণ জয়ী হইব।

শ্রমবিমুখতাই জীবনযুদ্ধে বাঙ্গালীর পরাজয়ের প্রধানতম কারণ

আজ সমগ্র পৃথিবীতে যে সকল জাতি শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পকলায় শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই পরিশ্রমী। তাহাদের ভিতর কোন জাতি-ভেদ নাই। প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ কর্মচারীও একসঙ্গে কাজ করিতেছে। প্রত্যেকটি নর-নারী সারাদিন পরিশ্রমের পর সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে, তাহাদের অন্ন গ্রহণ করে। পরিশ্রম করে না বলিয়া বাঙালী জাতির আজ এই অবনতি। তাহারা চায় বসিয়া বসিয়াই অন্নগ্রহণ করিতে। অলসভাবে বসিয়া বসিয়া অর্থ উপার্জন করিতে।

কিন্তু বর্তমান যুগে কোন মানুষ বসিয়া খাইতে পারে না তাহাকে কোন না কোন কাজ করিয়া খাইতেই হইবে। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে কায়িক পরিশ্রমকে নিতান্ত অমর্যাদাকর বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহারা নিজেদের জীবনমৃত্যু উপেক্ষা করিয়া মানুষের জন্য পথঘাট প্রস্তুত করিয়াছে, অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছে, স্মৃতি-সৌধ রচনা করিতেছে, নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মানুষের সারা বৎসরের খাদ্য-শস্য যোগাইতেছে, তাহাদিগকে আমাদের দেশে 'ছোট লোক' বলিয়া ঘৃণা ~~করে~~ করা হয় আর যাহারা ঘরে বসিয়া, আদেশ দিয়া খালাস হন, অপরের পরিশ্রমের উপর নিজেদের সৌভাগ্য গঠন করেন তাঁহারাই আমাদের এই অধঃপতিত দেশে 'ভদ্র' আখ্যা পান। এই ভদ্র-শ্রেণী কায়িক শ্রম যাহারা করে তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, যাহারা এই কায়িক পরিশ্রম করে তাহাদের জীবন ব্যর্থ নহে। এমন একদিন আসিবে যখন তাহাদের প্রভুত্ব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এই কায়িক পরিশ্রমকারীদের অবজ্ঞা করা

যে কত বড় অন্যায় তাহা বুঝা উচিত। জগতের উন্নতি করিতে হইলে, ব্যক্তি-গত সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পরিশ্রমকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। বাঙালীকে জানিতে হইবে পৃথিবী নিছক কল্পনাবস্তু নয়, শুধু বুদ্ধিজীবীর স্থান নয়। কল্পনার সঙ্গে কর্মশক্তি, বুদ্ধির সঙ্গে শ্রমের সুষ্ঠু মিলনই আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। সাজাহান তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর অনুরোধ রক্ষার জন্য পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যে কুশল শিল্পীদের দীর্ঘ ২২ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শাহজাহানের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহাদের কথা আর কেই বা মনে রাখে? এই যে তাজমহলের দিব্য সৌন্দর্য যাহা যুগ যুগ ধরিয়া শাহজাহানের ও মমতাজের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে তাহার কর্মীগণও আমাদের পূজার্হ। আজ আমরা এই দেশ হইতে ৩।৪ দিনে ইংলণ্ড যাইতেছি উড়োজাহাজে চড়িয়া। কিন্তু ইহার জন্য কত হাজার কর্মী দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, ইহাকে চালাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে যাহার জন্য আজ আমরা অনায়াসে বহু স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারি। কায়িক পরিশ্রম না করিলে খাদ্য প্রস্তুত হয় না, মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অচল হইয়া পড়ে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কায়িক শ্রম সমাজের ও ব্যক্তির জীবন-প্রবাহ অব্যাহত রাখিতে পারে, ইহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে। এই সকলের অভাবেই বাঙালীর আজ এই দুর্দশা। শ্রমবিমুখ ও পরিশ্রমে অসমর্থ ব্যক্তির জাতির জীবন-সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য। মনীষায়, শ্রমসামর্থ্যে, কর্মকৌশলে যে জাতি বা ব্যক্তি যোগ্যতম, সেই ব্যক্তি জাতি উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেন। বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইতেছে যে যোগ্যতম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া চলিতে পারে সেই জয়ী হইবে। আমাদের দেশে যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ জীবিত ছিলেন ও আছেন "Survival of the fittest" তাঁহারা সকলেই পরিশ্রমশীল। তবুও বাঙালী উহার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিবার জন্য তাহারা দুস্তর সাগর জীবন বিপন্ন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে সেইরূপ আমাদের এই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে, "Labour is sacred and labour is honourable." মস্তিষ্ক চালনা ও শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারাই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

———

—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—

পত্র লিখন প্রণালী

পত্র লিখন আমাদের ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদানে পত্র লিখন আমাদের বিশেষ সহায়ক। সাক্ষাৎ আমরা যে ভাবে কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবরাশিকে প্রকাশ করি, ঠিক সেইভাবে দূরস্থ বন্ধু-বান্ধবের, আত্মীয়-স্বজনের ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত আমরা পত্রের মাধ্যমে আলাপ-পরিচয় করিয়া থাকি।

লোকে সচরাচর যেরূপ ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে, পত্র লিখিবার সময়ও অনেকে প্রায় সেই প্রকারের ভাষাই ব্যবহার করেন। তবে কথা বলিবার সময় আমরা শুদ্ধাশুদ্ধি বা ব্যাকরণগত ত্রুটির বিষয় অনেক সময় সজাগ থাকি না কিন্তু পত্র লিখিবার কালে এসব বিষয়ে আমাদের প্রখর দৃষ্টি থাকা দরকার।

পত্র লিখনে বর্ণাশুদ্ধি, ব্যাকরণগত ত্রুটি, ভাবের জড়তা ও অশোভন উক্তি সর্বথা বর্জন করিতে হইবে। পত্রের ভাব ও ভাষা সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া দরকার।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার পূর্বে বাংলায় পত্র লিখিবার যে প্রণালী প্রচলিত ছিল অধুনা তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজকাল বাঙ্গলা পত্র সাধারণতঃ ইংরেজী পত্রের প্রথানুযায়ী লিখিতে হয়। পূর্বে পত্রের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষায় আশীর্বচন ও অভিবাদন লিখিত হইত, এখন সেই অংশ সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলাতেই রচিত হইয়া থাকে। আজকাল পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোদেশে দক্ষিণ কোণে যে স্থান হইতে ও যে দিনে পত্র লিখিত হয় সেই স্থান ও সেই দিবস স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আজকাল বাঙ্গালায় পত্র লিখিবার সময় গুরুজনকে প্রণাম বা নমস্কার, কনিষ্ঠকে আশীর্বাদ ও সমানকে সাদর সম্ভাষণ ও যথাবিহিত সম্মান-পূর্বক নিবেদন বা বিজ্ঞাপন দ্বারা বক্তব্য বিষয়ে সূচনা করা হয়। কেহ কেহ ইংরাজী রীতির অনুকরণে শুধু 'মহাশয়', 'প্রিয় মহাশয়' অথবা সম্ভাষিত ব্যক্তির নামের পূর্বে 'প্রিয়', 'প্রাণপ্রতিম' বা 'প্রাণাধিক' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পূর্বক পত্রের সূচনা করিয়া থাকেন।

এইরূপ আরম্ভের পর বক্তব্য বিষয় বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরিশেষে ইতি 'আশীর্বাদক', ইতি 'আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী', ইতি 'অনুগত', ইতি 'বশংবদ' বা ইতি 'সেবক' ইত্যাদি পদ লেখকের নামের পূর্বে লিখিয়া পত্র সমাপ্ত করা হয়।

পত্রের দুইটি ভাগ আছে। (১) পত্রের শিরোনামা বা বহির্ভাগ এবং (২) পত্রের অন্তর্ভাগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিতে এই শিরোনামে ও অন্তর্ভাগের প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দিতে হয়।

—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—

ছন্দ ও যতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য

Simpl e Ideas of Metres and Pauses

[ক] শ্বাসাঘাত, যতি, ছন্দ

বাক্যের প্রকার-ভঙ্গি দুই প্রকারের হইতে পারে—**গদ্য** এবং **পদ্য**। আমরা সচরাচর কথোপকথনে যে-ভাবে পদ-বিন্যাস এবং উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহাকে <গদ্য> বলে, আর কবিতা এবং গানের রচনা-ভঙ্গিকে <পদ্য> বলা হয়, যেমন—

<মহাভারতের কথা অমৃতের মত মিষ্ট। কাশীরাম দাস তাহা বলিতেছেন। তাহা যিনি শুনেন, তিনি পুণ্যবান্>—গদ্য।

<মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুন পুণ্যবান্॥>—পদ্য।

বাক্যের যে প্রকাশ-ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট-সংখ্যক অক্ষরের পরে বাগ্‌যন্ত্রের অল্পাধিক বিশ্রাম হয়, এবং তাহার জন্য বাক্যটি শুনিতে প্রীতিকর হয়, তাহাকে **পদ্য** বলে।

<মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে—শুনে পুণ্যবান্॥>

এখানে <মহাভারতের কথা>, এই কথা উচ্চারণ করিয়া বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্রাম

হইতেছে, তদনন্তর <অমৃত সমান> এই ছয়টি অক্ষরের পর আবার বিশ্রাম। সেইরূপ <কাশীরাম দাস কহে> এই আটটি অক্ষরের পর, এবং <শুনে পুণ্যবান্> এই ছয়টি অক্ষরের পরে পুনরায় বিশ্রাম হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এস্থলে ৮—৬—৮—৬, এইরূপ নির্দিষ্ট অক্ষরের পরে বাক্য দুইটির মধ্যে বিরাম এবং বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্রাম হইতেছে। এই দুইটি অংশে বেশ একটা তালের বা গতির মিল আছে, এবং শুনিতেও বেশ ভাল লাগে; অতএব ইহা পদ্য।

শুনিতে ভাল না লাগলে এবং যেখানে সেখানে শব্দ ভাঙ্গিয়া দিলে, পদ্য হইবে না। যেমন—

<একদা এক বাঘের। গলায় হাড় ফু॥
টিয়াছিল তখন সে। খুব জ্বর হইল॥>

ইহা পদ্য নহে।

বাক্যের মধ্যস্থিত পদ-সমূহ উচ্চারণ করিবার সময়ে পদসমূহের কোন এক বিশেষ অক্ষরের উপর যে জোর পড়ে, তাহাকে **শ্বাসাঘাত** বা **ঝোঁক** অথবা **বল** (Accent বা Stress) বলে।

নিম্নে এই শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক মোটা হরফের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ শব্দের আদ্য অক্ষরের উপরে ঝোঁক পড়ে, যথা—

<**গা**ছ, **অ**বলম্বন, **রে**লগাড়ী; **স্বা**ধীন; **দে**শবন্ধু> ইত্যাদি।

(খ) বাঙ্গালা ভাষায় যে-কোনও বাক্য, এক বা একাধিক শব্দযুক্ত কতক-গুলি বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে বিভক্ত হয়, প্রতি পর্বের শব্দার্থ সম্পূর্ণ থাকে। এইরূপ এক-একটি পর্বে সাধারণতঃ প্রথম শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত আসে, পর্বস্থিত অন্য শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত পর্ব-মধ্যে লুপ্ত হয়, যথা—

<**গা**ছকে আমরা | **উ**দ্ভিদ বলি, | **কা**রণ তাহা | **মা**টি ভেদ করিয়া | **উ**ঠে॥>; <**এ**কদা এক | **বা**ঘের | **গ**লায় | **হা**ড় ফুটিয়া | **ছি**ল॥>; <**তো**মাকে দেখিয়া | **আ**জ আমার | **স**মস্ত দুঃখের | **অ**বসান হইল॥>; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা বাক্যের প্রতি পর্বের পরে একটু করিয়া থামিতে পারা যায়, এইরূপ

থামায় বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্রাম ঘটে, এবং শুনিতেও ভাল লাগে। তবে এইরূপ বিশ্রাম, সাধারণ কথাবার্তার কালে ঠিক নিয়ম-মত বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটে না।

পদ্য পাঠ করিবার সময়ে নির্দ্দিষ্ট অক্ষরের পর বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্রাম হয়। এই বিশ্রামকে যতি (Pause) বলে।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে লম্বা দাঁড়ি দিয়া যতির স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে।

<মহাভারতের কথা | অমৃত-সমান। |
কাশীরাম দাস কহে, | শুনে পুণ্যবান্॥ | >

<উঠ শিশু, মুখ ধোও, | পর নিজ বেশ। |
আপন পাঠাতে মন | করহ নিবেশ॥>

<গভীর সুন্দর বনে | তুমি শ্যামাঙ্গিনী।
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে | নেত্র নিদ্রাকুল— |
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র | কালভুজঙ্গিনী' |
অবহেলে পা-খানি—আগ্রহে শার্দ্দূল॥ | >

<ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা | ছোট ছোট দুঃখ কথা |
নিতান্তই সহজ সরল। |
সহস্র বিস্মৃতিরাশি | প্রত্যহ যেতেছে ভাসি'।
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল॥ | >

প্রত্যেক চরণের যে যতি পড়ে, তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়।

একটি Syllable বা অক্ষর উচ্চারণ করিতে হইলে যতটুকু সময় লাগে, তাহাকে **মাত্রা** বা **কাল-পরিমাণ** অথবা **উচ্চারণ-কাল** বলে। মাত্রার হিসাব করিয়া পদ্য বা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ করিতে হয়।

প্রত্যেক স্বরবর্ণ, স্বাধীনভাবে থাকিলে অথবা ব্যঞ্জন বর্ণের পরে থাকিয়া হ্রস্ব উচ্চারিত হইলে, এক মাত্রা বলিয়া গণ্য হয়, এবং দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে, বা ইহার পরে হসন্ত বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, এই স্বরবর্ণ মাত্রা বলিয়া গণ্য হয়।

মাত্রা বা উচ্চারণ-কাল বাঙ্গালা ছন্দের মূল কথা। এক-ই ছন্দের কবিতার মধ্যে বিভিন্ন ছত্রকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ করিয়া যাইতে পারা

চাই। পাঠ তিন রকম রীতিতে হয়, তদনুসারে বাঙ্গালা ছন্দের তিনটী রকম, প্রকার বা ভেদ হয়। যথা—

[১] অক্ষরগুলি টানিয়া টানিয়া, কতকটা সুর করিয়া পাঠ করা যায়। এইরূপ ছন্দকে **তান-প্রধান** বা **অক্ষরমাত্রিক** ছন্দ বলা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সমস্ত বড় বড় বইয়ের ছন্দ এই ধরণের। যথা—

<ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি ॥>

[২] প্রবল শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক যেখানে ছন্দের বৈশিষ্ট্য, সেখানে ছন্দটীকে **শ্বাসাঘাত-প্রধান** ছন্দ বলা যায়। এই ছন্দে প্রতি ছত্র কতকগুলি পর্বে বিভক্ত হয়, এবং সাধারণতঃ প্রতি পর্বের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে। বাঙ্গালা ছড়ায় ও লোকমুখে প্রচলিত কবিতায় এই ছন্দের বিশেষ ব্যবহার আছে, সাহিত্যেও ইহা কিছু কিছু পাওয়া যায়। উদাহরণ—

<আকাশ জুড়ে' | মেঘ নেমেছে, | সূর্য্যি | ডুবে—ছে | >
<চাঁচর চুলে | জলের গুড়ি | মুক্তো ফলে—ছে ॥>

[৩] স্বরধ্বনিকে যেখানে দীর্ঘ বা প্রসারিত করিয়া পাঠ করিবার রীতি আছে, ছত্রটি কতকগুলি নির্দিষ্ট মাত্রার পর্বে বিভক্ত, এবং যেখানে শ্বাসাঘাত মোটেই নাই, এরূপ ছন্দকে **ধ্বনিপ্রধান** বা **মাত্রাবৃত্ত** ছন্দ বলে। যথা—

◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡

<জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।>

(অক্ষরের মাথায় প্রদত্ত) চিহ্ন হ্রস্ব মাত্রা, এবং—চিহ্ন দীর্ঘ মাত্রার পরিচায়ক)।

নিম্নে সাধারণতঃ তান-প্রধান বা অক্ষরমাত্রিক ছন্দের কথাই বলা হইবে।

যে পদ্যে কোন নির্দিষ্ট চরণের শেষের অক্ষরের সহিত অপর নির্দিষ্ট চরণের শেষের অক্ষরের **অন্ত্যানুপ্রাস** বা **ধ্বনি-সাম্য** অর্থাৎ **মিল** থাকে, তাহাকে **মিত্রাক্ষর** ছন্দ (Rhymed Verse) বলে। যেমন—

<অর্জুন চলিয়া যান। ধনুকের ছিটে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ। লাগে জিজ্ঞাসিতে>

<হে বঙ্গ !, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি',
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ॥>

অনেক সময়ে চরণের মধ্যেও দুই বা ততোধিক যতির শেষ অক্ষরের ধ্বনি-সাম্য থাকে। যেমন—

<তখন রোদের বেলা। সবাই ছেড়েছে খেলা।
ও পারে নীরব চখা-চখীরা।
শালিখ থেমেছে ঝোপে শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখীরা।>

কোনও চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর কোন চরণের শেষ অক্ষরের অন্ত্যানুপ্রাস, ধ্বনি-সাম্য, বা মিল না থাকিলে **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank Verse) হয়। যেমন—

<কহিলা বীরেন্দ্র বলী—"ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষস-রাজানুরাজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি,—কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি—
পরজন গুণহীন স্বজন তথাপি
নির্গুণ স্বজন, শ্রেয়ঃ—পর, পর সদা।>

মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকার-ভেদ আছে। তাহার মধ্যে প্রধান এইগুলি—

পয়ার

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর (বা ষোল মাত্রা) থাকে, এবং অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরে যতি থাকে, তাহাকে **পয়ার** বলে। প্রথম আট অক্ষরে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় ছয় অক্ষরে ছয় মাত্রা ও যতির জন্য বিশ্রাম দুই মাত্রা, সমস্ত ধরিয়া ষোল মাত্রা। যথা—

<বিশ্ববতী | মহিষীর | সতীনের মেয়ে—
ধরাতলে | রূপসী সে | সকলের চেয়ে ॥>

<যমুনার কূলে সব | যায় নানা রঙ্গে।
"শ্যামলী ধ | বলী" আনন্দিত অঙ্গে ॥>
<এত দিনে | বুঝিলাম ; | মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভু | বনে—নাই | আপন বলিয়া ॥>

ত্রিপদী

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে তিনটি করিয়া যতি থাকে তাহাকে **ত্রিপদী** বলে।

ত্রিপদীর দুইটি প্রকার-ভেদ আছে—**লঘু ত্রিপদী** এবং **দীর্ঘ ত্রিপদী**।

ষষ্ঠ, দ্বাদশ এবং বিংশ অক্ষরে যতি থাকিলে, **লঘু ত্রিপদী** হয়। যথা—

<কৈলাস ভুধর | অতি মনোহর—
কোটী শশী পরকাশ। |
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরাগণের বাস ॥>
<চণ্ডীদাস বলে— শুন সখাগণ |
অপার যাহার লীলা। |
রাখাল-মণ্ডলে। রাখালি করিয়া |
করে নানামত খেলা ॥ | >

অষ্টম, ষোড়শ এবং ষড়বিংশ অক্ষরে যতি থাকিলে, **দীর্ঘ ত্রিপদী** হয়। যথা-

<আশ্বিনের মাঝামাঝি— উঠিল বাজনা বাজি'।
পূজার সময় এল কাছে। |
মধু বিধু দুই ভাই | ছুটোছুটী করে তাই' |
আনন্দে দু'হাত তুলি' নাচে ॥>
<যশোর নগর ধাম— প্রতাপ-আদিত্য নাম।
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় | কেহ নাহি আঁটে তায় |
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥>

এতদ্ভিন্ন ত্রিপদীর আধারের উপর প্রস্তুত ভঙ্গ ত্রিপদী ছন্দ আছে। যথা।

<ওরে বাছা ধূমকেতু, | মা-বাপের পুণ্যহেতু, |
কেটে ফেল চোরে, | ছাড়ি দেহ মোরে,
ধর্মের বান্ধব সেতু ॥>

চৌপদী

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটি করিয়া যতি থাকে, তাহাকে **চৌপদী** (বা **চতুষ্পদী**) বলে। চৌপদীর **লঘু** এবং **দীর্ঘ** এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

লঘু চতুষ্পদীতে ৬+৬+৬+৬ বা ছয়ের কম, এইরূপ অক্ষর সমাবেশে প্রথম দুই চরণ সম্পূর্ণ হয়। যথা—

<চিরসুখী জন | ভ্রমে কি কখন | (৬+৬)
ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে ? ॥ (৬+৫)
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে | (৬+৬)
কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে ?>॥ (৬+৫)
<সজল সঘন | সেনা অগণন। (৬+৬)
করিবারে রণ | চলিল। ॥ (৬+৬)
শিরে পরে তাজ | যত তীরন্দাজ | (৬+৬)
সাজ সাজ সাজ | বলিল ॥> (৬+৩)

দীর্ঘ চৌপদীতে ৮+৮+৮+৮ বা আটের কম অক্ষর-সংখ্যা ধরিয়া দুইটা চরণ হয়। এতদ্ভিন্ন পাঁচ অক্ষরের আধারের উপরেও চৌপদী হয়। যথা—

<লুটিয়ে' পড়ে | জটিল জটা, |
ঘন পাতায় | গহন ঘটা, |
হেথা হোথায় | রবির ছটা— |
পুকুর ধারে | বট, |
দশ দিকে | ছড়িয়ে' শাখা |
কঠিন বাহু | আঁকা-বাঁকা, |
স্তব্ধ যেন—আছে আঁকা, |
শিরে আকাশ | পট ॥>

একাবলী

একাবলী ছন্দের শেষে মিল্-যুক্ত দুই ছত্রে এগারটি করিয়া অক্ষর আছে। যথা—

<পঞ্চমুখে গায় পঞ্চম তালে।
নাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥>

পয়ার, ত্রিপদী এবং চৌপদীকে অবলম্বন করিয়া আজকাল নানাপ্রকার ছন্দে কবিতা রচনা করা হইতেছে। এই-সকল কবিতায় অনেক সময় হসন্ত ব্যঞ্জন-বর্ণের বাহুল্য থাকে, এবং আরম্ভের অক্ষরে ও প্রত্যেক যতির পরে প্রথম অক্ষরে শ্বাসঘাত, বল অথবা ঝোঁক (stress accent) পড়ে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ ছন্দকে **শ্বাসাঘাত প্রধান** বা **বল-প্রধান** ছন্দ বলা যায়। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

<দিনের আলো | নিবে এল,' |
সূর্য্যি ডোবে | ডোবে, |
আকাশ ঘিরে' | মেঘ জুটেছে |
চাঁদের লোভে | লোভে। |
মেঘের উপর | মেঘ ক'রেছে, |
রঙের উপর রং, |
মন্দিরেতে—কাঁসর-ঘণ্টা |
বাজল ঠং | ঠং॥>

<খোকা তারি | মাঝখানেতে |
বেড়ায় ঘুরে, |
খোকা থাকে | জগৎ মায়ের |
অন্তঃপুরে॥>

<বীরসিংহের | সিংহশিশু |
বিদ্যাসাগর | বীর, |
উদ্বেলিত | দয়ার সাগর, |
বীর্য্যে সুগম্—ভীর ; |

জাগরে যে | অগ্নি থাকে |
কল্পনা সে নয়— |
চক্ষে দেখে | অবিশ্বাসীর |
হ'য়েছে প্র | ত্যয়>

<ভোর হ'লরে | ফরসা হ'ল, |
ফুটল উষার | ফুল-দোলা, |
আন্‌কো আলোয় | যায় দেখা ওই |
পদ্মকলির | হাইতোলা ॥> |

<ছিপখান্ | তিন্ দাঁড়, |
তিনজন | মাল্লা— |
চৌপর | দিনভর, |
দেয় দূর | পাল্লা | >

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ—

তোটক

বারটী অক্ষর—তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু ... লঘু। যথা :—

⌣⌣—⌣⌣—⌣

<দ্বি জ ভা ব ত তো ট ক ছ ন্দ ভ ণে।

⌣⌣—⌣⌣—⌣⌣—

ক বি রা জ.ক হে য ত গৌ ড জ নে। ॥>

ভুজঙ্গপ্রয়াত

ইহাতেও বারটী অক্ষর, তন্মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম লঘু হওয়া চাই। যথা :—

⌣— —⌣— —⌣— — ⌣ — —

<ম হা রু দ্র - রূ পে ম হা দে ব সা জে।

⌣— —⌣— —⌣— —⌣— —

ভ ভ ম্ভ ভ ভ ভম্ শি ঙা ঘো র বা জে।

⏑ — — ⏑ — — ⏑ — — ⏑ — —

ল টা পট্ট জ টা জু ট্ট সং ঘট্ট গং গা।

ছ ল চ্ছল্ ট ল ট্টল্ ক ল ক্কল্ ত র ঙ্গা॥>

তোটক ও ভুজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি কতকগুলি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মত ধরা-বাঁধা নিয়মে, <আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ> এবং দুই ব্যঞ্জনের (অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণের) অথবা হসন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বেকার হ্রস্ব স্বরকে, দীর্ঘ ধরিয়া পড়া হয়। এইরূপ ছন্দ প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংস্কৃতের ছত্রটী বিভক্ত হয়, সেই প্রত্যেক পর্বের ধ্বনিটার পরিমাণ সমান থাকে। যথা |

<বাবু কহিলেন, | "বুঝেছ উপেন" | করেছি বাগান | খানা।>

<ভূঁতের মতন | চেহারা যেমন, | নির্বোধ অতি | ঘোর।>

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য অনুভূত হয় না। আধুনিক বাঙ্গালায় নানা প্রকারের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হইয়া থাকে।

অলঙ্কার

Figures of Speech : Alliteration, Simile, Metaphor Antithesis, Irony and Hyperbole

সাধারণ কথোপকথনের ভাষার মত সরল ভাষায় মনের ভাব যতটা স্বচ্ছন্দ ভাবে করা যায়, ততই ভাল। কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় (বিশেষ করিয়া কাব্যের ভাষায়) কেবল ভাব প্রকাশ করিলেই হইল না, লোকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া ভাব প্রকাশ করিতে হয়। ভাষাকে লোকের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইলে, শব্দের এবং অর্থের প্রয়োগে বৈচিত্র সম্পাদন করিতে হয়। যে উপায়ে শব্দের প্রয়োগ, এবং অর্থের প্রকাশের বৈচিত্র আসে তাহাকে **অলঙ্কার** (**Figures of Speech**) বলে। সোনারূপার গহনা যেমন মানুষের দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় বলিয়া 'অলঙ্কার' নামে কথিত হয়, অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি শব্দ অর্থ প্রয়োগের রীতিও তেমনি ভাষার সৌন্দর্য বাড়ায় বলিয়া, এগুলিকে ভাষার 'অলঙ্কার' বলে।

ভাষার অলঙ্কার দুই প্রকারের—**শব্দালঙ্কার** এবং **অর্থালঙ্কার**।

[ক] শব্দালঙ্কার

শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের উপর যে অলঙ্কার নির্ভর করে, তাহাকে শব্দালঙ্কার বলে।

শব্দালঙ্কার প্রধানতঃ তিনটি—অনুপ্রাস, দ্ব্যর্থ (বা শ্লেষ) এবং যমক।

অনুপ্রাস

(Alliteration)

এক-ই বা এক-জাতীয় ব্যঞ্জন-ধ্বনির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলে, অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। যেমন—

<সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।>

<চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

<রসনা-রোচন, শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দ-বিলাস॥>

যমক (Analogue)

একই ধ্বন্যাত্মক শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে যমক হয়। যথা—

<পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব, ভব সে ভরসা॥>

<আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুয়া দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি॥>

দ্ব্যর্থ বা শ্লেষ (Paronomasia)

এক-ই শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে, দ্ব্যর্থ বা শ্লেষ হয়। যেমন—

<অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে, স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।>

দেবী অন্নপূর্ণা যখন সামান্য স্ত্রীলোকের রূপ ধরিয়া এক পাটনীর নৌকায় চড়িয়া গঙ্গা পার হইতেছিলেন, তখন পাটনী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি এই উত্তরটী দিয়াছিলেন। সাধারণ অর্থ হইলে কোনও গোলমাল নাই। কিন্তু ভিতরের অর্থ টী ধরিলে দেবীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যে যে শব্দে দ্ব্যর্থ আছে তাহা এই—

অতিবড বৃদ্ধ—(১) খুব বুড়া, (২) যাঁহার অপেক্ষা পুরাতন আর কিছুই নাই, অর্থাৎ শিবরূপে কল্পিত আদি পুরুষ পরমেশ্বর।

সিদ্ধিতে নিপুণ—(১) সিদ্ধিখোর, (২) অষ্ট সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি যাঁহার আছে।

কোন গুণ নাহি—(১) গুণহীন, (২) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের অতীত নির্গুণ ঈশ্বর।

কপালে আগুন—(১) হতভাগ্য, (২) কপালে অগ্নিস্বরূপ জ্যোতির্ময় তৃতীয় নেত্র অথবা চন্দ্রকলা।

কু-কথায় পঞ্চমুখ—(১) মন্দ কথায় আসক্ত, (২) যাহার পাঁচটী মুখ বেদ উচ্চারণে নিযুক্ত।

কণ্ঠভরা বিষ—(১) যাহার বাক্য বিষের মত কটু, (২) সমুদ্রমন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ করায় যিনি নীলকণ্ঠ।

দ্বন্দ্ব—(১) ঝগড়া, (২) একীভাব, অভেদাত্মা।

গঙ্গা—(১) কোন বিশেষ স্ত্রীলোক, (২) ভাগীরথী।

তরঙ্গ—(১) দর্প, জাঁক, (২) ঢেউ।

জীবন-স্বরূপ—(১) প্রাণের মত প্রিয়, (২) জলময়ী।

শিরোমণি—(১) পরমপ্রেয়সী, (২) মস্তক-ভূষণ—পৌরাণিক কথায় মহাদেব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

পাষাণ—(১) নিষ্ঠুর, (২) হিমালয়—উমার পিতা।

[খ] অর্থালঙ্কার

যে অলঙ্কারের দ্বারা অর্থ বা ভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, তাহাকে অর্থালঙ্কার বলে।

অর্থালঙ্কার প্রধানতঃ এইগুলি—<উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি,

নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি, অর্থান্তরন্যাস, বিশেষোক্তি, অপহ্নুতি, ব্যাজ-স্তুতি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, দীপক।>

উপমা (Simile)

সমগুণ-বিশিষ্ট দুইটী পৃথক বস্তুর সাদৃশ্য দেখাইলে, **উপমান** অলঙ্কার হয়। যেমন—<বালিকাটি হরিণের মত ভীরু>; এখানে <বালিকা> এবং <হরিণ> দুইটী পৃথক্ বস্তু; <ভীরুতা> ইহাদের সমান গুণ বা ধর্ম। ইহাদের সাদৃশ্য বলা হইল, অতএব এখানে উপমা অলঙ্কার হইল।

যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহাকে **উপমান** বলে; যাহাকে তুলনা করা হয় তাহাকে **উপমেয়** বলে, আর উপমান এবং উপমেয়ের সমান গুণ বা ধর্মকে **সামান্য** বা **সাধারণ ধর্ম** কহে। পূর্বোক্ত উদাহরণে <হরিণ> উপমান, <বালিকা> উপমেয়, এবং <ভীরুতা> সাধারণ ধর্ম।

<সদৃশ, ন্যায়, মত, তুল্য, যেন, সেরূপ, যথা, সমান> ইত্যাদি শব্দ উপমা-দ্যোতক।

<তাকায় তাই বোবার মত, মায়ের মুখচাঁদে।>

<তাদের শাখায় জটার মত ঝুলে প'ড়েছে শেওলা যত।>

রূপক (Metaphor)

উপমেয়কে উপমানের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিলে, **রূপক** হয়। যেমন—<জ্ঞানসূর্য উদিত হইলে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়>। এখানে <জ্ঞান> এবং <অজ্ঞান> উপমেয়, এবং <সূর্য> ও <অন্ধকার> উপমান, <জ্ঞান> এবং <অজ্ঞানকে> যথাক্রমে <সূর্য্য> এবং <অন্ধকারের> সহিত অভেদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

উপমান এবং উপমেয়ের সমাস করিয়া, কিংবা উপমেয়েতে <রূপ> বা <স্বরূপ> শব্দ যোগ করিয়া, অথবা একেকে অপরের বিধেয় বিশেষণ করিয়া, রূপকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

রূপকের উদাহরণ—

<তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।>

<ও যে আমার শিশিরকণা, ও যে আমার সাঁঝের তারা।>

<জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা।>

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor)

কোনও বস্তুতে অন্য কোনও পৃথক বস্তুর ক্রিয়া বা কর্ম আরোপ করিলে, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় ;

<যেন বুঝি>ইত্যাদি শব্দ উৎপ্রেক্ষার দ্যোতক।

<বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে> —এখানে অন্ধকারের উপর বস্ত্রাদির ধর্ম আরোপ করা হইল।

<ফেনিল ওই সুনীল জল নাচিছে সারা বেলা।>

<কুহেলি গেল ; আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।>

<সন্ধ্যাসমীরণে তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল।>

অতিশয়োক্তি (Hyperbole)

উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকে (উপমেয়ের স্থানে) উল্লেখ করিলে' অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

<তাহার মুখ হইতে সুধাবর্ষণ হইতেছে।>

<রাঙা দুটী ঠোঁটের কাছে মুক্তা আছে ফ'লে।>

নিদর্শনা (Transference of Attributes)

তুলনার ছলে অবাস্তব গুণ বা ধর্ম অথবা অসম্ভব কার্য্যের আরোপ করা হইলে, নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যেমন—

<অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুল-দল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?>

এখানে রাম কর্তৃক রাবণের পুত্র বীরবাহু বধের সহিত ফুল-দল দিয়া শিমুল গাছা কাটার তুলনা করা হইতেছে। বস্তুতঃ ফুলের পাপড়ী দিয়া গাছ কাটা যেমন অসম্ভব ব্যাপার, সেইরূপ রাম কর্তৃক বীরবাহুর বধ রাবণের নিকট তেমনি অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

দৃষ্টান্ত (Parallel)

দুইটি কার্যের তুলনা করিলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

<দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ;>

এখানে কোটাল কর্তৃক সুন্দরের প্রহার এবং রাহু কর্তৃক চন্দ্রের গ্রাস—এই দুই কার্যের তুলনা করা হইয়াছে।

<লিখ্‌তে গিয়ে হাতে-মুখে
মেখেছ সব কালী,
নোংরা ব'লে তাই দিয়েছি গালি!
পূর্ণশশী মাখে মসী,
নোংরা বলুক দেখি।>

সমাসোক্তি (Personification)

সমান কার্য, সমান বৈশিষ্ট্য বা সমান বিশেষণ দ্বারা কোন প্রস্তাবিত বিষয়ে, অন্য বিষয় বা বস্তুর আরোপ করিলে, সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।

<হায়রে! তোমার কেন দুষি, ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী,
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী সুভগে! তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি।
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি।>

এখানে রাধার এবং যমুনার কার্য, বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষণ সমান তাহার দ্বারা যমুনা যে রাধা অপেক্ষা ভাগ্যবতী, ইহারই ইঙ্গিত করা হইতেছে।

স্বভাবোক্তি

প্রাকৃতিক দৃশ্য বা কোনও বস্তু অথবা ঘটনার যথাযথ বর্ণনা করিলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

<তখন রোদের বেলা, সবাই ছেড়েছে খেলা,
ওপারে নীরব চখা-চখীরা।

শালিখ খেমেছে ঝোপে, শুধু পায়রার খোপে,

বকাবকি করে সখাসখীরা ॥—

তখন রাখাল ছেলে পাঁচনী ধুলায় ফেলে

ঘুমিয়ে' প'ড়েছে বট-তলাতে।

বাঁশ-বাগানের ছায়ে একমনে এক পায়ে

খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।>

অপহ্নুতি (Concealment)

কোন বস্তুকে নির্দেশ করিয়া তাহার স্বরূপ গোপন করিয়া তাহাকে অন্য বস্তু-রূপে প্রতিপন্ন করিলে, অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। যেমন—

<ও নহে আকাশ, নীল নীরনিধি হয,

ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয়;

ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত ফণিধর;

ও নহে কলঙ্ক—তাহে শায়িত কেশব।>

এখানে 'নহে', 'নহে', করিয়া প্রকারান্তরে আকাশ এবং সমুদ্রের মধ্যে সাদৃশ্যই স্থাপিত হইতেছে।

ব্যাজস্তুতি (Irony)

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিলে, ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়; যথা—

<অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ।

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥>

এখানে নিন্দাচ্ছলে শিবের স্তুতি করা হইতেছে।

———

প্রবন্ধ-রচনা

(স্কুল ফাইন্যাল ১৯৫৩)

(১) তোমার দেখা একটি মেলা, (২) বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল, (৩) একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, (৪) গঙ্গানদীর আত্মকথা, (৫) 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'।

(স্কুল ফাইন্যাল ১৯৫৪)

(১) নববর্ষ উৎসব, (২) বাঙলার একজন স্মরণীয় মনীষী, (৩) আধুনিক যুগে রেডিওর প্রভাব, (৪) 'জীবন মূল্ আয়ুতে নহে—কল্যাণপুত কর্মে'।

(স্কুল ফাইন্যাল কমপার্টমেণ্টাল ১৯৫৪)

(১) গ্রন্থাগার, (২) তোমার স্কুলের একটি তর্ক-সভার বিবরণ, (৩) সংবাদ-পত্র, (৪) তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গল্প-লেখক, (৫) জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

(স্কুল ফাইন্যাল স্পেশাল ১৯৫৪)

(১) একটি গ্রাম্য উৎসব, (২) যে সয় সে রয়, (৩) দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা, (৪) বিত্ত হতে চিত্ত বড়, (৫) তোমার স্কুলের একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

(স্কুল ফাইন্যাল ১৯৫৫)

(১) রবীন্দ্রনাথ, (২) তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, (৩) বঙ্গদেশে শরৎকাল, (৪) 'সকলেব তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমবা পরের তরে"।

(স্কুল ফাইন্যাল ১৯৫৬)

(১) বাঙলাদেশের পশুপক্ষী, (২) দেশোন্নতির কাজে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা, (৩) বনভোজনের বর্ণনা, (৪) 'হাস্যমুখে করবো মোরা অদৃষ্টেরে পরিহাস'।

(স্কুল ফাইন্যাল ১৯৫৭)

(১) তোমার জীবনের আদর্শ, (২) যে-কোন একটি উৎসবের বিবরণ, (৩) বুদ্ধদেব, (৪) সময়ানুবর্তিতা।

(স্কুল ফাইন্যাল ১৯৫৮)

(১) দেশ-ভ্রমণের আনন্দ ও উপকারিতা, (২) 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, (৩) শ্রমের মর্যাদা, (৪) জাতির একটি স্মরণীয় দিন।